কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড
কর্ত্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত
(১৮।১১।১৯৪৩ ও ১৪।১২।১৯৩৯ তারিখের কলিকাতা গেজেট দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞান-প্রবেশ

(সপ্তম হইতে দশম শ্রেণীর পাঠ্য)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য এবং
প্রাণিবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক

শ্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়

এম. এস-সি. (কলিকাতা), ডি. এস-সি. (লণ্ডন),
ডি. আই. সি. (লণ্ডন), এফ. এন. আই.

ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং
রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব 'পালিত' অধ্যাপক

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

এম্. এ. (কলিকাতা), পি-এচ. ডি. (বার্লিন), এফ. এন. আই.

প্রণীত

বাণীমন্দির
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

[স্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য তিন টাকা মাত্র]

প্রকাশক :
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ.
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ত্রয়োদশ সংস্করণ—১৯৪৫

প্রাপ্তিস্থান :
বাণীমন্দির
বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা
শিক্ষক-সমবায় লাইব্রেরী
যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

জড়-বিজ্ঞান

		পৃষ্ঠাঙ্ক
উপক্রমণিকা ঃ		/০—॥০

পদার্থ-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায় ঃ	পদার্থ	১
	পদার্থের গুণ ও শ্রেণীবিভাগ ...	১
	জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ...	৯
	প্লবতা ও আর্কিমিডিসের সূত্র ...	১৩
	বায়ুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম ...	২০
	বায়ুর প্লবতা শক্তি ...	২১
	বায়ুমণ্ডল ও উহার চাপ ...	২২
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	শক্তি	৩০
	শক্তির রূপান্তর	৩১
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	তাপ	৩৪
	তাপের উৎস ও পদার্থের উপর তাপের প্রভাব	৩৪
	কঠিন পদার্থের উপর তাপের প্রভাব .	৩৬
	জলের উপর তাপের প্রভাব	৩৭

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
	বায়ুর উপর তাপের প্রভাব : বায়ু-চলাচল	৪০
	থার্মোমিটার	৪২
	তাপ-সঞ্চালন	৪৫
চতুর্থ অধ্যায় :	দোলক	৪৯
পঞ্চম অধ্যায় :	আলোক	৫২
	আলোকের স্বরূপ	৫২
	আলোকের সরল রেখায় গমন ...	৫৩
	আলোকের প্রতিফলন ...	৫৬
	আলোকের প্রতিসরণ ...	৬০
	বর্ণ ও রামধনু	৬৬
ষষ্ঠ অধ্যায় :	চুম্বক	৭১
	চুম্বক পাথর	৭১
	চুম্বকন : বিদ্যুৎ-চুম্বক ...	৭৩
	ভূচুম্বকত্ব ও দিগ্‌দর্শী ...	৭৫
সপ্তম অধ্যায় :	বিদ্যুৎ	৭৭
	বিদ্যুতাধার	৮০
	বিদ্যুৎ পরিবাহী ও বিদ্যুৎ অন্তরক	৮১
	বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্রিয়া ...	৮৪

রসায়ন-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায় :	সাধারণ তত্ত্ব	৯০
	মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ ...	৯০
	পদার্থের সাধারণ মিশ্রণ ও রাসায়নিক যোগ ...	৯২
	সাধারণ মিশ্রণের পৃথক্ করণ ...	৯৫

বিষয়				পৃষ্ঠাঙ্ক
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	দহন	...	...	১০০
	লোহা, মোমবাতি, ম্যাগনেসিয়ম ও গন্ধকের দহন	...	...	১০১
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	বায়ু	...	...	১০৭
	বায়ুর উপাদান	...	...	১০৭
	অক্সিজেন	...	...	১০৮
	নাইট্রোজেন	...	...	১১০
	জলীয় বাষ্প	...	...	১১২
	কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড		...	১১৩
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	জল	...	...	১১৬
	জলের উপাদান	...	...	১১৬
	জলের গুণ	...	...	১১৭
	প্রাকৃতিক জল	...	...	১১৮
	হাইড্রোজেন	...	...	১২১

জ্যোতির্ব্বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়ঃ	সূর্য্য	...	...	১২৪
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	গ্রহ-উপগ্রহ	...	...	১২৯
	গ্রহগণের আপেক্ষিক দূরত্ব		...	১৩০
	চন্দ্র	...	...	১৩৬
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ		...	১৪২
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	সৌর বৎসর ও ঋতুসমূহ		...	১৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
পঞ্চম অধ্যায়ঃ আকাশমণ্ডল … …	১৫৬
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ধূমকেতু ও উল্কা … …	১৬৫

ভূতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়ঃ পৃথিবীর উৎপত্তি … …	১৬৮
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ভূত্বক্ ও ভূগর্ভ … …	১৭৩
ভূত্বক্—আগ্নেয় ও পালল শিলা …	১৭৩
পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের অবস্থা …	১৮০
তৃতীয় অধ্যায়ঃ ভূচাঞ্চল্য … …	১৮৪
পৃথিবীর বহিঃস্থ আবরণের চাঞ্চল্য	১৮৪
আগ্নেয় গিরি … …	১৮৮
চতুর্থ অধ্যায়ঃ মাটি … …	১৯১
মাটির শ্রেণীবিভাগ ও মাটির সহিত উদ্ভিদ্‌জগৎ ও কৃষি-কার্য্যের সম্বন্ধ … …	১৯৩
পঞ্চম অধ্যায়ঃ পাথর কয়লা ও খনিজ তৈল …	১৯৬
পাথর কয়লা … ..	১৯৬
খনিজ তৈল … …	১৯৮

দ্বিতীয় ভাগ

জীব-বিজ্ঞান

উপক্রমণিকা ঃ

জীবের বিশিষ্টতা ও জড়ের সহিত তুলনা, জীব-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখা, জীবের দেহকোষ, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর তুলনা … ১-১২

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

উদ্ভিদ-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়ঃ	উপক্রমণিকা	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	বীজ ও গাছের জন্ম	১৮
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	উদ্ভিদ্‌	২৬
	মূল ও তাহার কার্য্য	২৬
	কাণ্ড ও তাহার কার্য্য	৩৪
	পাতা ও তাহার কার্য্য	৪০
	ফুল ও তাহার কার্য্য	৬১
	ফল ও তাহার কার্য্য	৬৮
	বীজ ও তাহার বিস্তার	৭১
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	ধান্য ও মটর	৭৪
	ধান্য	৭৪
	মটর	৮২

প্রাণিবিদ্যা (Zoology)

প্রথম অধ্যায়ঃ	উপক্রমণিকা	৮৭
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	কেঁচো	৯৫
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	পতঙ্গ	১০২
	পতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ	১০৫
	পিপীলিকা	১০৬
	মৌমাছি	১১১
	মশা	১১৮
	প্রজাপতি	১২৩
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	মাকড়সা	১২৮

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	মাছ … …	১৩৪
	রুই মাছ … …	১৩৭
	নানা প্রকার মাছ … …	১৪২
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	উভচর … …	১৫০
	ব্যাঙ … …	১৫১
সপ্তম অধ্যায়ঃ	উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরতা	১৬২
অষ্টম অধ্যায়ঃ	পরিবেশের সহিত অভিযোজন …	১৬৪

শারীর-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়ঃ	উপক্রমণিকা … …	১৭১
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	মানবদেহ … …	১৭৩
	মস্তক ও দেহকাণ্ড … …	১৭৩
	হস্তপদাদি অবয়ব … …	১৭৪
তৃতীয় অধ্যায়	মানবদেহের উপাদান …	১৭৯
	রক্ত … …	১৮০
	নার্ভতন্ত্র … …	১৮৩
	অস্থি … …	১৮৭
	মাংস বা পেশী … …	১৮৮
	মেদ … …	১৯১
	ত্বক্ … …	১৯১
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	শোণিতসঞ্চালন তন্ত্র …	১৯৪
পঞ্চম অধ্যায়	শ্বাসতন্ত্র … …	২০১
	শ্বাসক্রিয়ার বিশিষ্টতা …	২০৪
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	পরিপাকতন্ত্র … …	২০৫
	খাদ্য ও তাহার উপাদান …	২১১

জড়-বিজ্ঞান

(Natural Science)

উপক্রমণিকা

বিজ্ঞানের উৎপত্তি (Origin of science)—বুদ্ধি ও বিবেচনা বলে মানব প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। সে হিংস্র

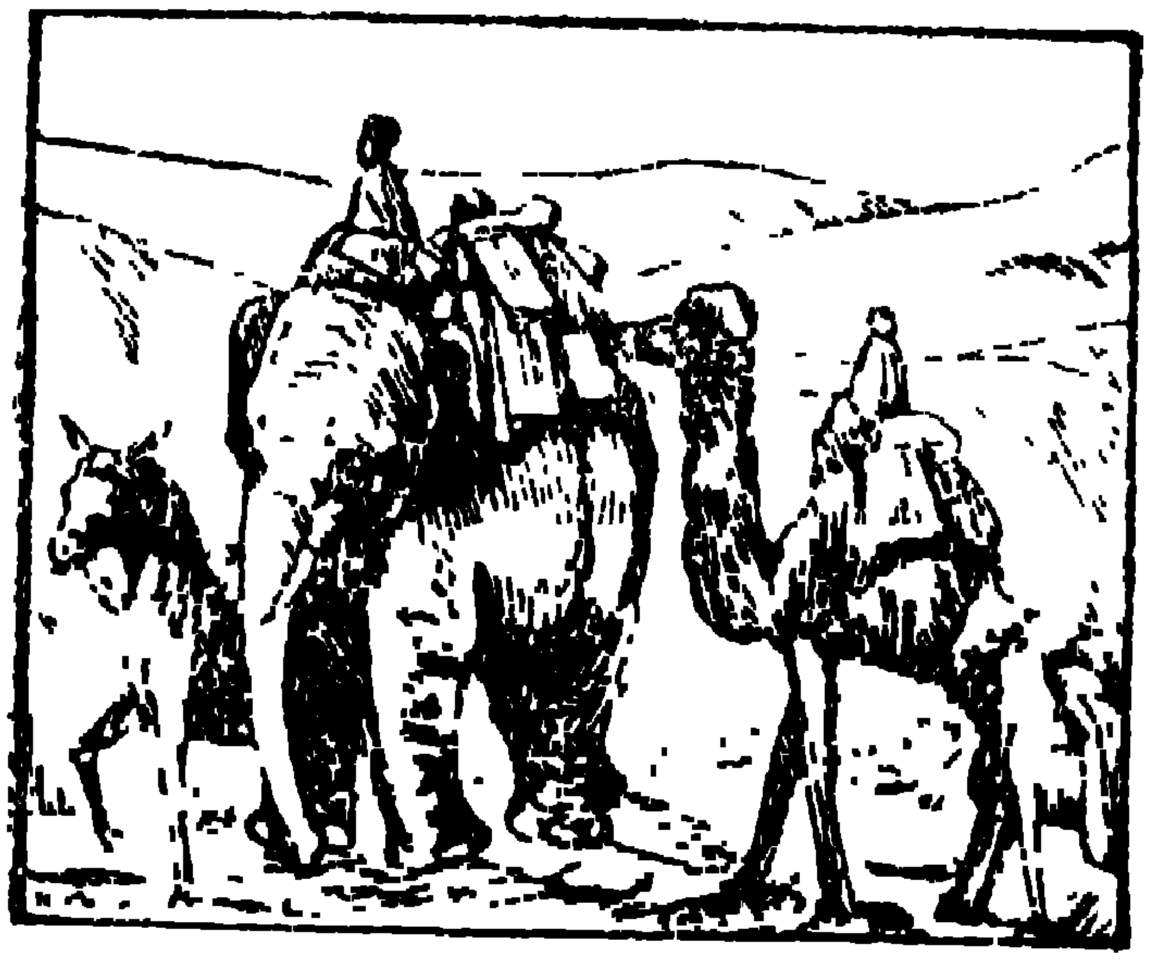

ভারবাহী জন্তু

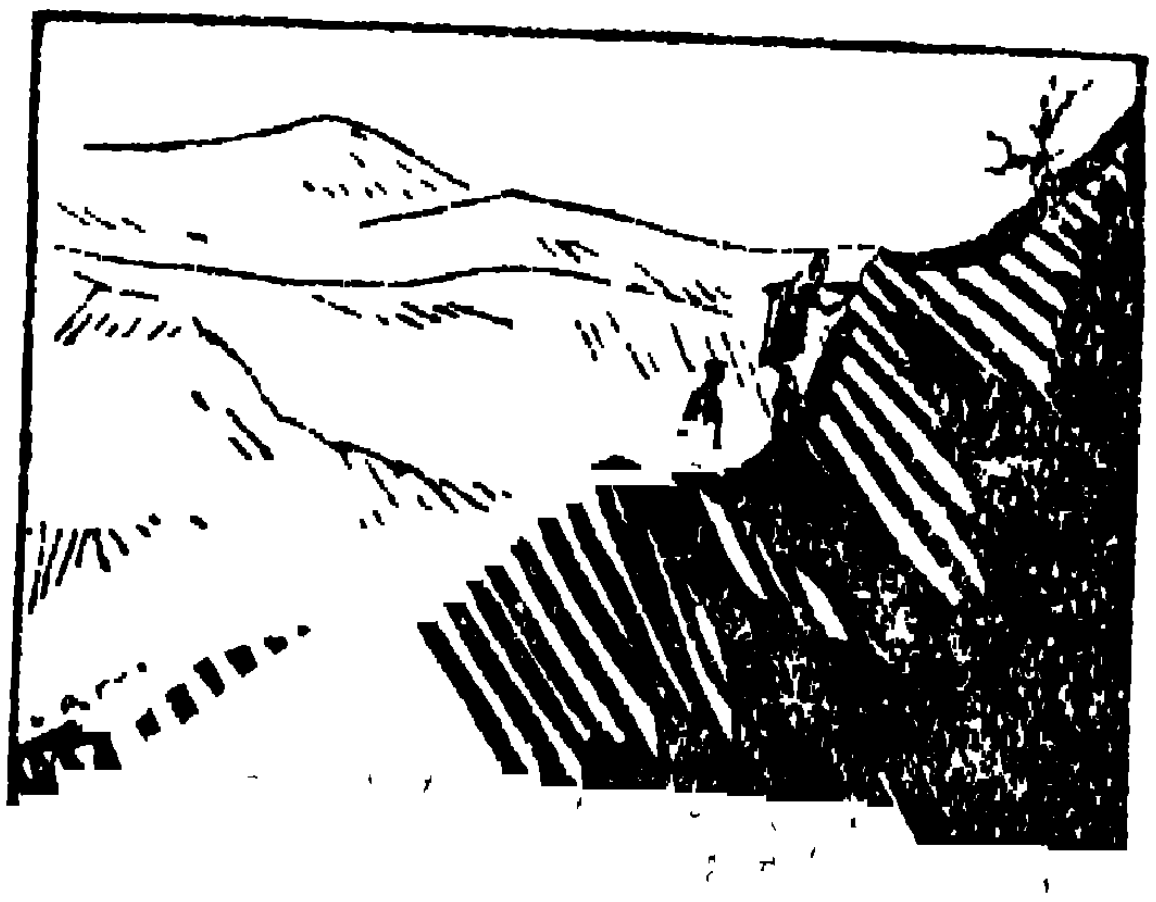

পর্ব্বতারোহণ

জন্তুকে বশে আনিয়াছে। বনের হাতী, ঘোড়া, উট ও গাধাকে মোট

গুহামানব

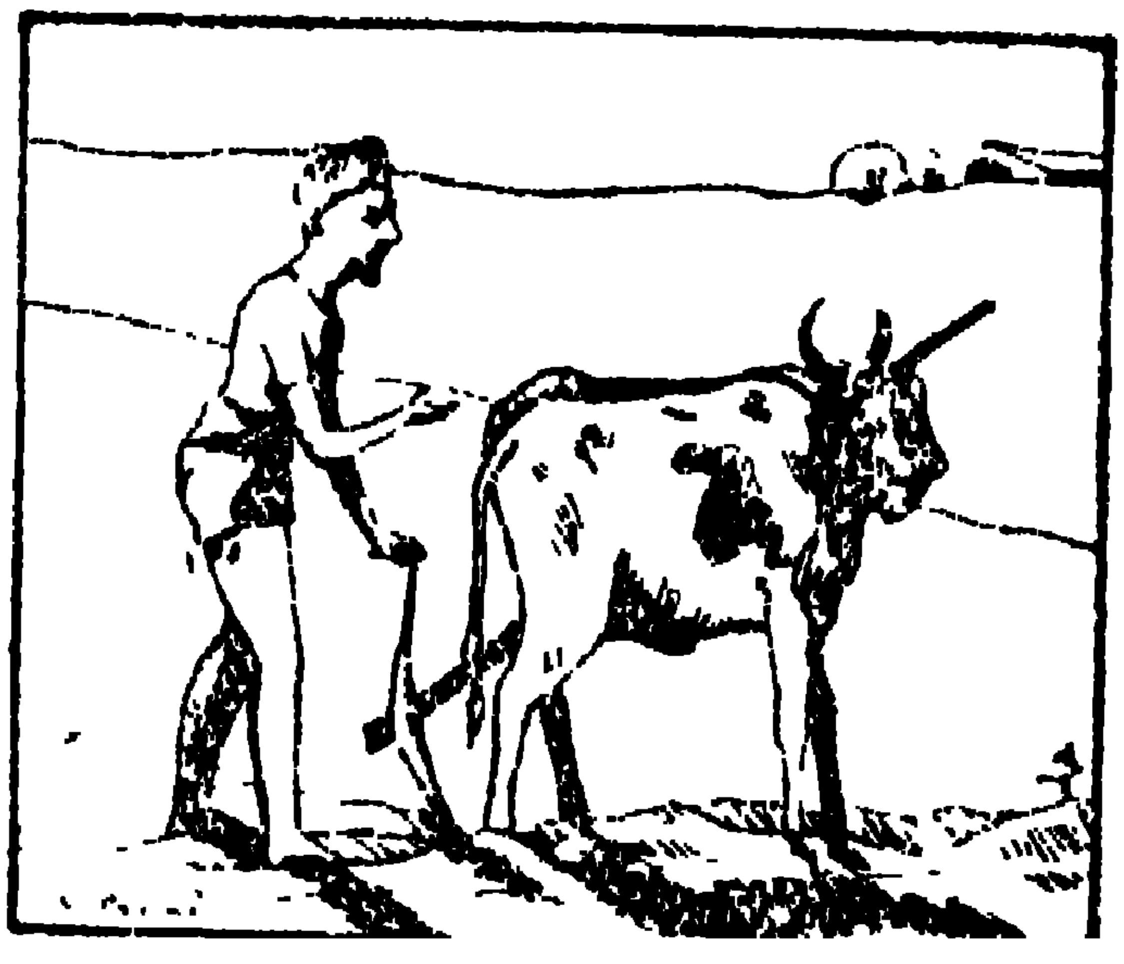

কৃষিকর্ম্ম

য়াছে। অত্যুচ্চ পর্ব্বত আরোহণ করিয়াছে। বেগবতী নদী ও

উত্তাল-তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়াছে। দৈহিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ না করিলেও বুদ্ধিবলে সে সকল সংগ্রামে জয়ী হইযাছে। এই বুদ্ধি ও বিচারশক্তিই হইল বিজ্ঞানের ভিত্তি।

রন্ধন

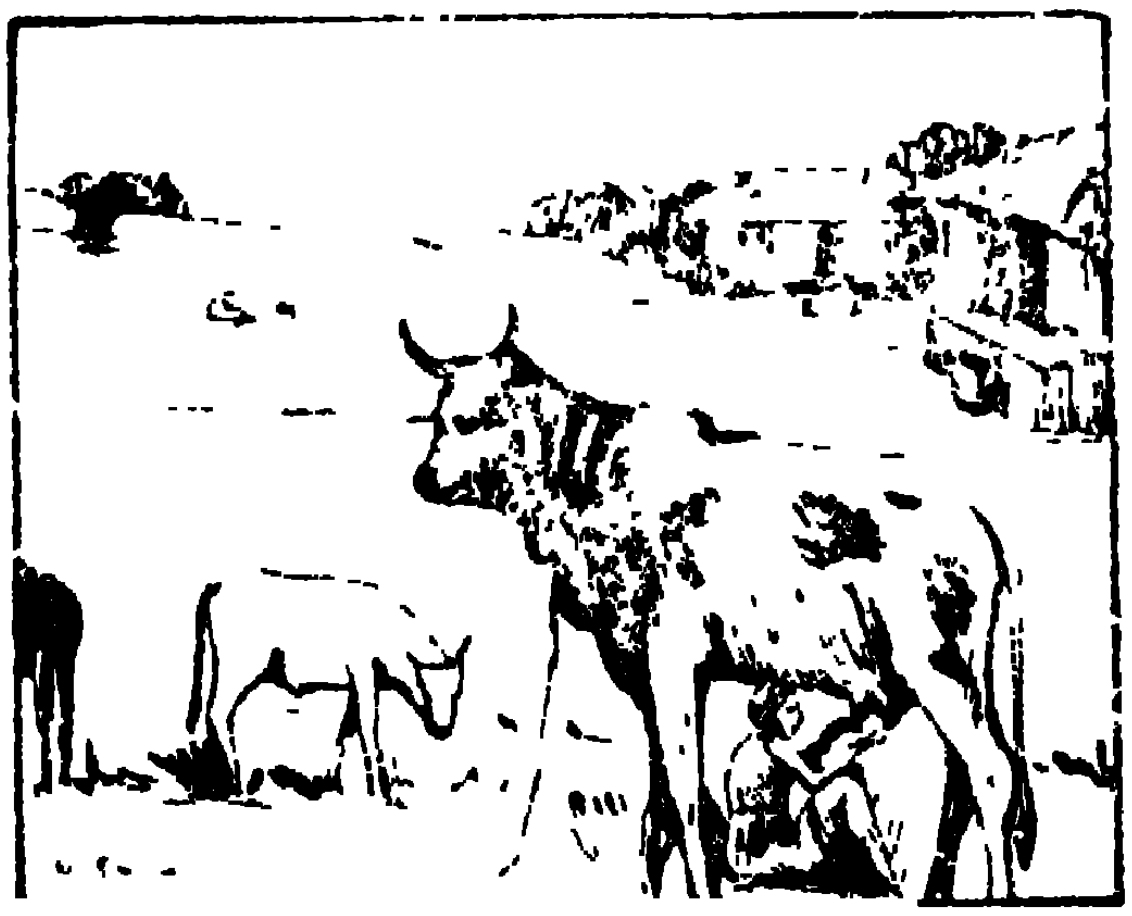

গোপালন

আদিম মানব পর্ব্বতগুহায় বাস করিত। তাহারা অস্ত্রের ব্যবহার জানিত না। কৃষি, রন্ধন, বা পশুপালন কিছুই বুঝিত না। কিন্তু এভাবে

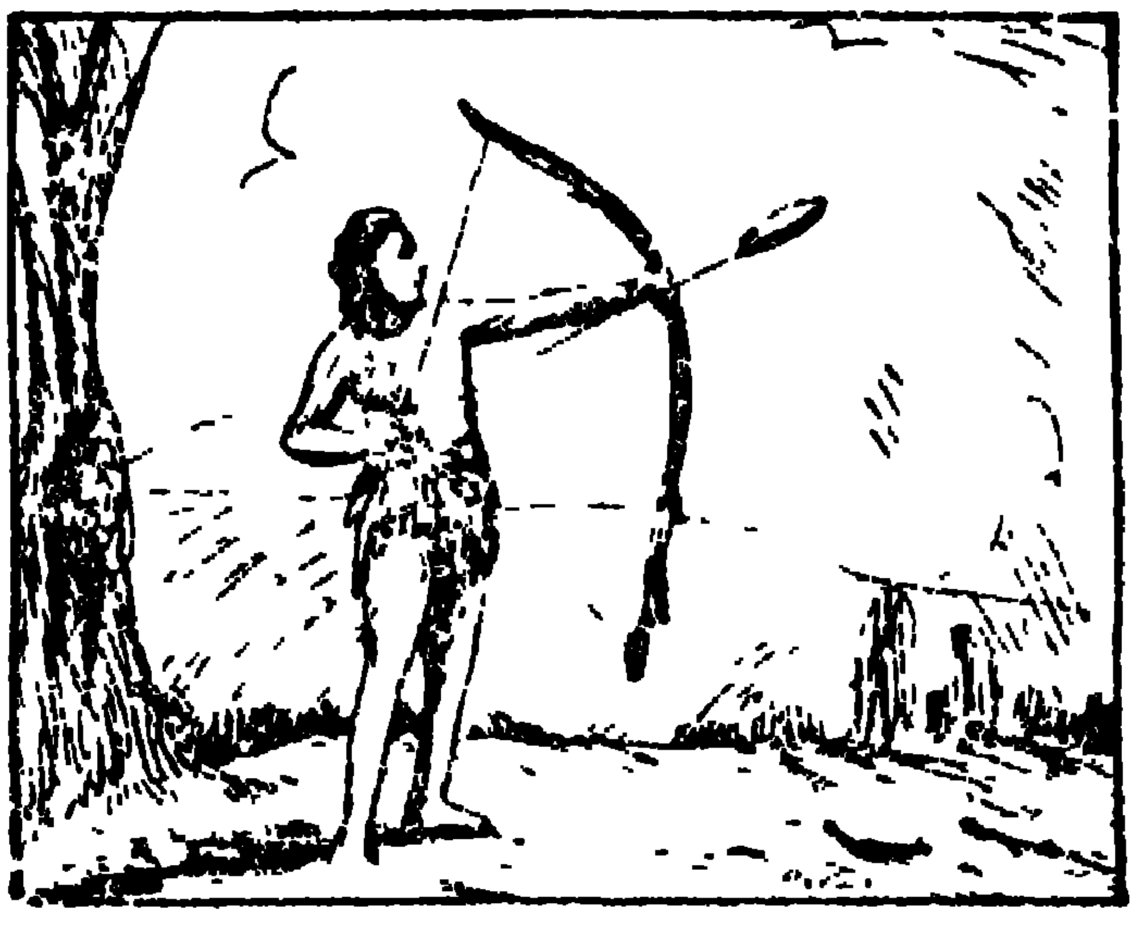

ধনু-নির্ম্মাণ

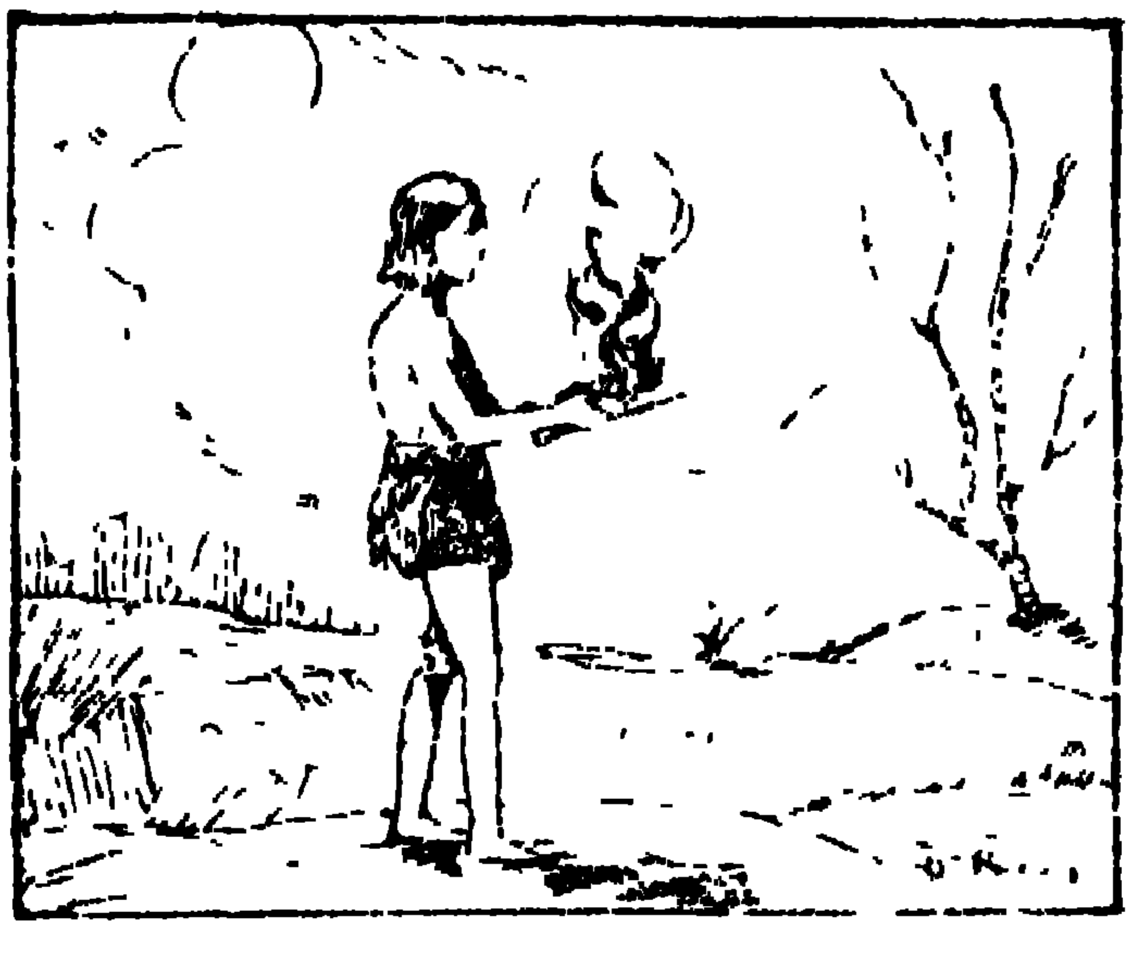

কাঠ ঘসিয়া আগুন জ্বালান

তাহারা থাকিতে চাহিল না। বাহিরের সহিত সংগ্রামে তাহারা গাছের ডাল বাঁকাইয়া ধনু তৈয়ার করিল। কাঠ ঘসিয়া আগুন জ্বালিল। পাথর

ঘসিয়া অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিল। ক্রমে সমাজবন্ধনে আসিয়া, কৃষি ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া সভ্যতার উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে তাহাদের বহু হাজার বৎসর পার হইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মানব সভ্যতার চরমোন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানের আরম্ভ হইল সেই দিন, যে দিন আদিম মানব আগুন জ্বালিতে শিখিল, বা পাথর হইতে অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিল।

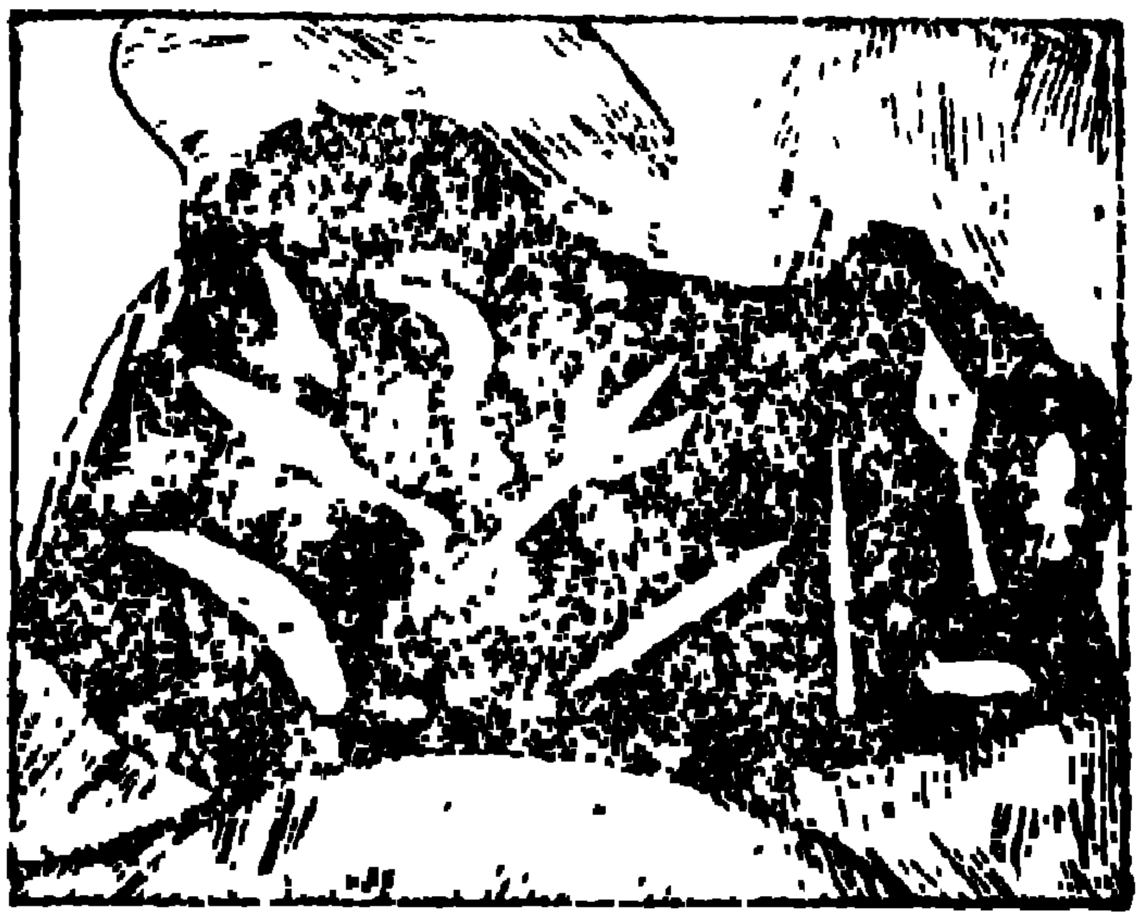

অস্ত্র-নির্ম্মাণ

বিজ্ঞান কোন সংস্কারাবদ্ধ নহে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সন্ধানই বিজ্ঞানের ধারা। পর্য্যবেক্ষণ, পর্য্যালোচনা এবং সত্যের অনুসন্ধানই বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র।

জড় ও জীব (Inanimate and animate objects)—অচেতন পদার্থ মাত্রই জড়। যাহার ভার আছে, যাহা স্থান অধিকার করে, যাহার অস্তিত্ব চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা অনুভব করিতে পারা যায়, তাহাকেই জড় পদার্থ বলে। জীবের জন্ম আছে, বুদ্ধিশক্তি আছে, মৃত্যু আছে, অধিকাংশের চলচ্ছক্তি আছে, কিন্তু জড়পদার্থের এরূপ কোনও গুণ নাই।

চেতন ও অচেতন পদার্থের সম্বন্ধ—
(Relationship between animate and inanimate objects)

প্রাণীর বা উদ্ভিদের দেহ অচেতন জড়পদার্থ দ্বারা গঠিত। জীবের মৃত্যু ঘটিলে, অর্থাৎ চেতনা বা প্রাণশক্তি অন্তর্দ্ধান করিলে, যাহা পড়িয়া থাকে তাহা অচেতন জড় পদার্থ মাত্র। জড়জগতের জল, বায়ু ও মাটি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া জীবগণ আপন আপন দেহ বৃদ্ধি করে।

পদার্থ-বিদ্যা (Physics)—মানবের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে পদার্থবিদ্যার স্থান খুবই উচ্চে। পদার্থবিদ্যার চর্চ্চা না করিলে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা, বৈদ্যুতিক চুল্লী, গ্রামোফোন, রেডিও প্রভৃতি কোন দিন আসিত না। মোটর চলিত না, আকাশে বিমানপোত উড়িত না।

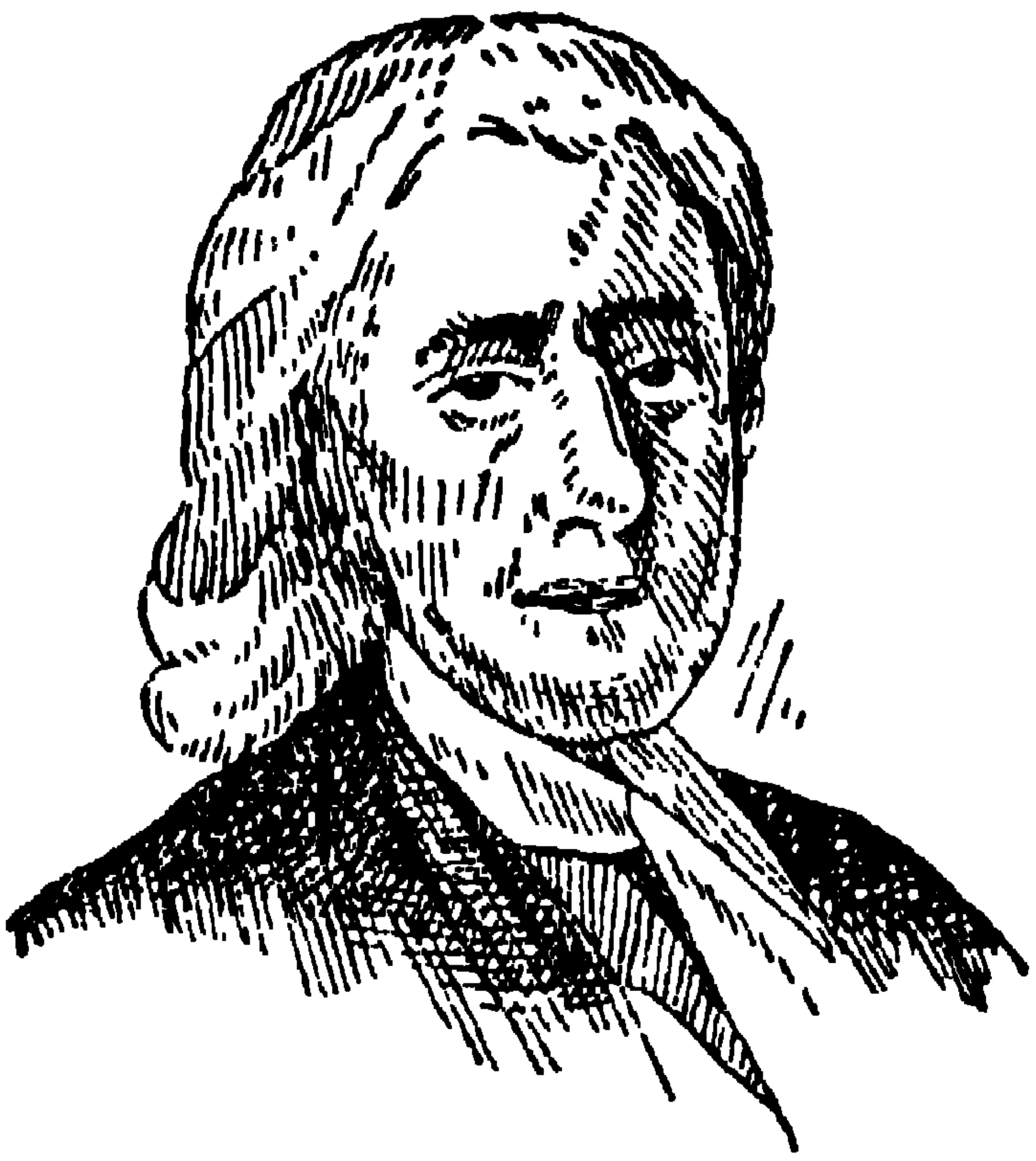

নিউটন

ভারতবর্ষে পদার্থবিদ্যার মূলতত্ত্ব পরমাণুবাদের প্রবর্ত্তক হিসাবে কণাদের নাম পাওয়া যায়। খৃষ্টের জন্মের আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে আর্কিমিডিস্ (Archimedes) ভাসমান ও মজ্জমান পদার্থের রীতি নির্ণয় করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যালিলিও দোলক-নীতি আবিষ্কার করিলেন। ইহা হইতে হায়গেনস্ (Huygens) ঘড়ি আবিষ্কার করেন। আবহাওয়ার প্রকৃতি এবং পর্ব্বতের উচ্চতা নিরূপণে ব্যারোমিটারের উদ্ভাবন করেন টরিসেলি (Torricelli)। নিউটন (Newton) প্রিজ্‌ম দ্বারা সূর্য্যরশ্মির বিশ্লেষণ এবং রামধনু ও অন্যান্য বিষয়ের তথ্য নির্দ্ধারণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওয়াটের (Watt) প্রতিভাবলে

ফ্যারাডে

ষ্টীম এঞ্জিনের আবিষ্কার হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার আরও দ্রুত প্রসার ঘটিল। ইটালিতে ভল্টা (Volta) তড়িৎ-প্রবাহ উদ্ভাবন ও উৎপন্ন করিলেন। তড়িতের সহিত চুম্বকের সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন আম্‌পিয়ার (Ampere)। ফ্যারাডে (Faraday) তড়িতের অনেক নূতন নূতন রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে, একটি তারের কুণ্ডলীর নিকট একটি চুম্বক আনিলে কুণ্ডলীর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া যায়। এই পরীক্ষার অর্থ তখন বুঝা যায় নাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পরীক্ষার ফলেই ডাইনামো চালাইয়া প্রচুর তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হইতেছে।

কেল্‌ভিন্ (Kelvin) ও ম্যাক্সওয়েলের Maxwell) কল্পিত ইথার-তরঙ্গের অস্তিত্ব হার্জ (Hertz) পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করেন। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক রনটুজেন (Rontgen) এক নূতন রশ্মির অস্তিত্বের আবিষ্কার করিলেন। তাহাতে অস্ত্রোপচারে প্রভূত উপকার হইয়াছে। আমেরিকায় আলভা এডিসন (Alva Edison) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত গ্রামোফোন ও ইলেকট্রিক বাল্‌ব দ্বারা মানবের অনেক উপকার হইয়াছে। ইতালীর বৈজ্ঞানিক মার্কনি (Marconi) বেতার দ্বারা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রসায়ন-বিদ্যা (Chemistry)—ভারতের প্রাচীন রাসায়নিকগণের মধ্যে নাগার্জ্জুনের নাম প্রধান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়র (Lavoisier) আধুনিক রসায়নের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনিই দহন-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বায়ুর উপাদান নির্ণয় করেন। প্রিষ্টলি (Priestley) অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। ক্যাভেণ্ডিশ (Cavendish) জল যে যৌগিক পদার্থ ও তাহার উপাদান যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তাহা আবিষ্কার করেন। সীলে (Scheele)

ক্লোরিন গ্যাস আবিষ্কার করেন। ক্লোরিন দ্বারা ক্লোরোফর্ম্ম প্রস্তুত হইয়া অস্ত্রোপচারে রোগীর যন্ত্রণা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পার্কিন (Perkin) আলকাতরা হইতে নানা সুন্দর রং প্রস্তুত করেন। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক বায়ার (Baeyer) সস্তায় কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিয়া নীলের চাষ উঠাইলেন। ডেভি (Davy) রসায়নে তড়িৎশক্তি ব্যবহারের প্রচলন করিলেন। তাহার ফলে সস্তায় এলুমিনিয়ম ধাতু প্রস্তুত হইল, ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং বা তাড়িতরঞ্জন (গিল্টি) হইতে লাগিল। নোবেল (Nobel) বিস্ফোরক বাহির করিয়া বড় বড় পাহাড় প্রভৃতি বিচূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। বিংশ শতাব্দীতে মাদাম কুরী (Madam Curie) রেডিয়ম আবিষ্কার করেন। ইহাতে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ ও নানাবিধ জটিল রোগের উপশম হইতেছে। রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে কৃত্রিম হাড়, চামড়া, হস্তিদন্ত, রেশম প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ক্রমোন্নতিতে মানবের প্রভূত উপকার হইতেছে।

ল্যাভয়সিয়র

জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy)—ইউরোপের বহু পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতে এই বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল। আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য ও ব্রহ্মগুপ্তের নাম এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ টলেমির (Ptolemy) মতে পৃথিবী সৌর-জগতের কেন্দ্র, অর্থাৎ সূর্য্য ও গ্রহগণ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ষোড়শ

শতাব্দীতে জার্ম্মাণ পণ্ডিত কোপার্নিকাস্ (Copernicus) প্রথম সিদ্ধান্ত করিলেন যে সূর্য্যই সৌরজগতের কেন্দ্র। আজ পর্য্যন্ত সেই মতই চলিতেছে।

ভূতত্ত্ব (Geology)—সূর্য্যের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন জ্বলন্ত বাষ্পময় জড়পিণ্ড কিরূপে ধীরে ধীরে পর্ব্বত-কন্দর-নদ-নদী-সাগর-সমতট শোভিত বর্ত্তমান ভূমণ্ডলে পরিণত হইয়াছে তাহা জানিতে পারি ল্যাপল্যাস (Laplace) ও জিন্সের (Jeans) পরিকল্পনা হইতে। ভূতত্ত্ব হইতে জানিতে পারি ভূমিকম্প হয় কেন, জ্বালামুখী পর্ব্বত অগ্নি উদ্গীরণ করে কেন। যে স্থান আজ সমুদ্রের অতল গর্ভে তাহা চিরকাল তথায় ছিল না। যে স্থান আজ বিশাল পর্ব্বত সে স্থান অতীতে সমুদ্রগর্ভ ছিল। দ্বীপের উৎপত্তি, জীবাশ্ম, কেরোসিন তৈল, পেট্রোলিয়ম, পাথুরিয়া কয়লা, খনিজ ধাতু প্রভৃতির তথ্য ভূতত্ত্ব হইতে জানিতে পারা যায়।

মাপ ও মাপকাঠি (Measurement and units)—কোন কিছুর পরিমাণ জানিতে হইলে, উহা একটা নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি বা "একক"-এর কতগুণ বলিতে হয়।

ইঞ্চি, ফুট, গজ ও মাইল—ইংলণ্ডের রাজকোষে একটি ধাতুদণ্ড রক্ষিত আছে, তাহার নাম ইয়ার্ড (Yard) বা গজ। ইহারই তৃতীয়াংশ ফুট, ও ফুটের দ্বাদশাংশ ইঞ্চি। ১৭৬০ গজে এক মাইল।

আলোক বৎসর (Light year)—যখন পৃথিবী হইতে গ্রহনক্ষত্রাদির দূরত্ব নির্দ্দেশ করিতে হয়, তখন মাপকাঠিও তদ্রূপ বিশাল আবশ্যক। এই মাপকাঠির নাম **আলোক বৎসর,** অর্থাৎ এক বৎসরে আলোক যতদূর চলে ততদূর। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল চলে। এই মাপে পৃথিবী হইতে সূর্য্য মিনিট আষ্টেক দূর, আর চন্দ্র দেড় সেকেণ্ডেরও কম।

দশমিক পন্থায় মাপ (Metric system)—বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে দৈর্ঘ্যের মাপ লওয়া হয় দশমিক পন্থায়, মিটারকে (m) একক ধরিয়া। মিটারের শতভাগ এক সেন্টিমিটার ((cm) ও সহস্রভাগ এক মিলিমিটার (mm)। হাজার মিটারে এক কিলোমিটার (km)।

ক্ষেত্রফল মাপ—ক্ষেত্রফল মাপের একক একবর্গ-গজ (square yard)। জমি-মাপের একক এদেশে বিঘা, ইংলণ্ডে একর (acre)।

ওজনের মাপ—ওজনের মাপের একক এদেশে সের। ইংলণ্ডের রাজকোষে এক ধাতুপিণ্ড রক্ষিত আছে, তাহার ওজনকে বলা হয় এক পাউণ্ড (pound)।

বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে গ্রাম (gramme)কে ওজনের একক ধরা হয়; ইহাকে দশগুণ বা দশভাগ করিয়া বড় ছোট একক পাওয়া যায়। যথা—কিলোগ্রাম (সহস্র গ্রাম), সেন্টিগ্রাম (গ্রামের শতাংশ) ইত্যাদি।

তুলাদণ্ড (Balance)—রাসায়নিক তুলাদণ্ডে, দণ্ডের মধ্যস্থলে একটি কাঁটা সংলগ্ন থাকে। দণ্ড ভূতলের সমান্তরাল হইলেই কাঁটা উল্লম্ব হয়, অগ্রভাগ স্কেলের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়ায়। তখন দুইদিকের ভার সমান হইল বুঝিতে হইবে।

তাপ ও চাপের মাপ—তাপমান ও চাপমান যন্ত্রের উপরে স্কেল চিহ্নিত আছে। একক ভেদে তাপমান যন্ত্র তিনপ্রকারের—(১) সেন্টিগ্রেড (Centigrade), (২) রেমার (Reaumur), (৩) ফারেনহাইট (Fahrenheit)।

সময়ের মাপ—সময়ের একক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সূর্য্যের আহ্নিক ও বার্ষিক গতি হইতে। অল্পকালের মাপ ঘণ্টা ($\frac{1}{24}$ দিবস), মিনিট, কিংবা সেকেণ্ড, কিন্তু দীর্ঘকালের মাপ হয় বর্ষকে মাপকাঠি ধরিয়া।

পদার্থ-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

পদার্থ (Matter)

পদার্থ, তাহার গুণ ও শ্রেণীবিভাগ

পদার্থ (Matter)—জগতের সকল পদার্থের পরিচয় পাই আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। আবার অধিকাংশ পদার্থের পরিচয় পাই চক্ষু দ্বারা দেখিয়া। মেঘ-গর্জ্জন বা এরোপ্লেনের শব্দ শুনিয়া মেঘের বা এরোপ্লেনের অস্তিত্ব বুঝি। ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া নাসিকায় প্রবেশ করিয়া বুঝাইয়া দেয়, ইহা কোন ফুলের গন্ধ। সন্দেশ যে মিষ্ট তাহার পরিচয় পাই জিহ্বায় স্বাদ পাইয়া। মলয় সমীরণ গায়ে লাগিলে তবে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করি।

এই বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সাহায্যে যাহা কিছুর পরিচয় পাই সবই কি পদার্থ? শব্দ, আলোক, তাপ প্রভৃতি পদার্থ নয়, তাহারা শক্তি (Energy)। সুতরাং আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগতে যাহা কিছুর পরিচয় পাই, তাহা হয় পদার্থ (Matter), না হয় শক্তি (Energy)।

পদার্থ-বিদ্যা (Physics)—ইহা দ্বারা পদার্থের গুণ, শ্রেণী ও পদার্থের উপর বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া জানিতে পারি।

পদার্থের প্রকার-ভেদ—পদার্থের প্রধানতঃ দুই ভাগ—চেতন ও জড়। চেতন পদার্থের মৃত্যু ঘটিলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাও

জড়। জড় পদার্থ আবার তিন প্রকার—(১) **কঠিন**, (২) **তরল**, ও (৩) **বায়বীয়**। ইট, কাঠ, লোহা কঠিন পদার্থ। জল, তেল, দুধ—তরল। ফুটন্ত জলের ভাপ ও আকাশের বাতাস—বায়বীয়।

তিন প্রকার জড় পদার্থের সাধারণ গুণ—

১। **ওজন** (Weight)—সকল পদার্থেরই ওজন আছে। যেমন ইট পাথরের আছে, তেল জলের আছে, তেমন বাতাস ও বাষ্পেরও আছে। কাহারও বেশী, কাহারও কম। তাপ, শব্দ বা আলোকের ওজন নাই। তাহারা শক্তি, পদার্থ নয়।

২। **বিস্তৃতি** (Extension)—প্রত্যেক পদার্থই খানিকটা জায়গা দখল করিয়া থাকে। একদিকের মাপ লইলে দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ, দুইদিকের মাপে পৃষ্ঠ (surface), এবং তিনদিকের মাপে আয়তন (volume) পাওয়া যায়। ছায়া, তাপ, শব্দ বা আলোক জায়গা দখল করে না; তাহারা পদার্থ নয়।

৩। **অভেদ্যতা** (Impenetrability)—দুইটি পৃথক্ পদার্থ এক সঙ্গে একই স্থান অধিকার করিতে পারে না। কাঠে পেরেক মারিলে উহা ভিতরে ঢুকিয়া যায় বটে, কিন্তু কাঠ দুই দিকে সরিয়া গিয়া পেরেকের স্থান করিয়া দেয়; কাঠ ও পেরেক একই স্থান দখল করে না। একটি খালি বোতল উপুড় করিয়া জলে চাপিয়া ধর, বোতলে জল ঢুকিবে না। কেন না, বোতলের ভিতরটা হাওয়ায় দখল করিয়া আছে। বোতল কাত কর, দেখিবে হাওয়া বুড় বুড় করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, জল ভিতরে ঢুকিতেছে।

৪। **নিষ্ক্রিয়তা বা জড়তা** (Inertia)—কোন পদার্থই আপনা হইতে চলিতে বা থামিতে পারে না। একটি বল পড়িয়া আছে, সে আপনা হইতে কখনও চলিবে না। ঠেলিয়া দিলে চলিবে, একবার

চলিলে আবার তার আপন গতিনিরোধেরও ক্ষমতা নাই। বলটাকে একবার গড়াইয়া দিলে উহা খানিকটা গিয়া থামিবে বটে, কিন্তু সে ত নিজের শক্তিতে থামিল না! ভূমির ঘর্ষণ (friction) জনিত রোধশক্তির জোরে থামিল। চলন্ত গাড়ী হইতে নামিবার সময় সাবধান হইয়া না নামিলে কি হয়? যতক্ষণ গাড়ীর মধ্যে ছিলে গাড়ীর সমান গতি তোমার সকল অঙ্গেরই ছিল। এখন মাটিতে পা ঠেকিয়া হঠাৎ পায়ের গতি থামিয়া গেলে সম্মুখ দিকে পড়িবারই সম্ভাবনা।

৫। **মহাকর্ষ** (Gravitation)—পদার্থ মাত্রই সর্বদা অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে। বিশ্ব-জগতের চেতন অচেতন সকল পদার্থ পরস্পরকে অবিরাম আকর্ষণ করিতেছে। তবে পৃথিবীর মত একটা প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড সকলকে টানিয়া রাখিয়াছে, সেজন্য পরস্পরের ক্ষুদ্র আকর্ষণ আমরা অনুভব করি না—কিন্তু পৃথিবী ছাড়িবার ক্ষমতা আমাদের নাই। পাখী, বেলুন, উড়ো জাহাজ, সকলকেই খানিকটা উড়িয়া, পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া আসিতে হয়। পাতা শুকাইলে যে মাটিতে পড়ে, সে পৃথিবী টানিতেছে বলিয়া। গাছ হইতে পাকা আপেল ফলের পতন দেখিয়া নিউটন (Newton) **মহাকর্ষের তত্ত্ব** আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যাহাকে পদার্থের ওজন বলি তাহার কারণ হইল এই আকর্ষণ-শক্তি। পদার্থটি যত জোরে পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার ওজন। এই আকর্ষণের মাত্রা পৃথিবী হইতে পদার্থ টির দূরত্বের উপর নির্ভর করে। পদার্থ টি পৃথিবীর যত নিকটে থাকিবে ততই আকর্ষণ বেশী হইবে। একই পদার্থের ওজন সমুদ্রতীর অপেক্ষা পাহাড়ের উপর কম হইবে।

৬। **বিভাজ্যতা** (Divisibility)—কোন কঠিন পদার্থ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বা কাটিতে কাটিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়। এক শিশি জল লইয়া জোরে ছড়াইয়া দিলে উহা সহস্র

কণাতে বিভক্ত হইয়া যায়। বায়বীয় পদার্থ আপনা হইতেই এইরূপ অসংখ্য খণ্ড হইয়া যাইতেছে। এক ফোঁটা লাল কালি এক গ্লাস জলে ফেলিলে অল্পক্ষণের মধ্যে সহস্রধা বিভক্ত হইয়া সমস্ত জলটাকে লালচে করিয়া দিবে।

৭। **স্থিতিস্থাপকতা** (Elasticity)—পদার্থ যেমন আছে, তেমনই থাকিতে চায়। একখণ্ড রবার লইয়া দুই হাতে টান, বাড়িবে। ছাড়িয়া দাও, আবার যেমনকার তেমনই হইয়া যাইবে। বাঁকা ইস্পাতের স্প্রিংকে টানিয়া ধরিলে সোজা হয়, ছাড়িয়া দিলে আবার গুটাইয়া যায়। বেতের ছড়িকে বাঁকাইয়া ধর বাঁকিবে, ছাড়িয়া দিলে আবার সোজা হইবে।

৮। **সচ্ছিদ্রতা** (Porosity)—পদার্থমাত্রই ঝাঁঝরা, তার অঙ্গে অসংখ্য ছিদ্র আছে। সে ছিদ্র এত সূক্ষ্ম যে চোখে দেখা যায় না। চোখে না দেখিতে পাইলেও তার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ব্লটিং কাগজের সর্ব্বাঙ্গে এইরূপ ছিদ্র আছে বলিয়াই কালি চুষিয়া লইতে পারে। টেবিলে কালি পড়িলে যে দাগ হয়, মুছিলেও যায় না, তাহাও কাঠে ছিদ্র আছে বলিয়াই।

৯। **সংসক্তি** (Cohesion)—সংসক্তি অর্থ চলিত কথায় যাহাকে বলি বাঁধুনি। এই সংসক্তি বা বাঁধুনির তারতম্য অনুসারে পদার্থের অবস্থাভেদ হইয়া থাকে। কঠিন পদার্থে এই গুণ বেশী, তরল পদার্থে কিছু কম, ও বায়বীয় পদার্থে খুব কম। এইজন্য একখণ্ড বরফ, পাথর বা লোহা মাটির উপর রাখিয়া দিলে ছড়াইয়া পড়ে না। জল, তেল বা পারা রাখিলে তৎক্ষণাৎ ছড়াইয়া যায়। বায়বীয় পদার্থের ত কথাই নাই। আটক করিয়া না রাখিলে পালাইবে।

১০। **রোধ** (Resistance)—শক্ত পাথরের মেজের উপর ছড়ি দিয়া মার, হাতে লাগিবে, পাথর যেমনকার তেমনই থাকিবে। জলের উপর মার, কিছু বাধা পাইবে; জল দুই দিকে সরিয়া যাইবে ও তরঙ্গ উঠিবে। বাতাসে চালনা কর, বিশেষ কোন বাধাই পাইবে না। অর্থাৎ কঠিনের রোধ খুব বেশী, তরলের কম, বায়বীয়ের আরও কম।

সংসক্তি যেখানে বেশী রোধও সেখানে বেশী, সংসক্তি যত কম রোধও তত কম।

১১। **সংনম্যতা** (Compressibility)—কঠিন পদার্থের উপর সাধারণ চাপ দাও, তাহার আয়তন ছোট হইবে না। তরল পদার্থের উপর সাধারণ চাপ দিলে সামান্য একটু কম হইবে। কিন্তু বায়বীয় পদার্থের উপর চাপ দাও, দেখিবে যে যত চাপ পড়িবে আয়তন তত কমিবে, যেন তাহার অন্ত নাই। এই গুণকে সংনম্যতা কহে।

১২। **জড়ের অবিনাশিতা** (Conservation of mass)—জড়ের ধ্বংস নাই। স্থূলজ্ঞানে যাহাকে বস্তুর ধ্বংস বলিয়া মনে হয় তাহা বাস্তবিক ধ্বংস নহে, রূপান্তর মাত্র।

জড় পদার্থের গঠন (Structure of mass)—জড় পদার্থকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিলে ক্রমশঃ এমন অবস্থায় আসিয়া পড়া যায় যে, সেই পদার্থের গুণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আরও বিভক্ত করা সম্ভব নয়। এইরূপ সূক্ষ্মতম অংশ অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **অণু** (molecule)। এই অণু পদার্থভেদে ভিন্ন, অর্থাৎ জলের বা তেলের, পাথরের বা চিনির অণু এক নয়।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক ড্যাল্টন (Dalton) অণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অংশের পরিকল্পনা করেন; তাহার নাম **পরমাণু** (atom)। আধুনিক

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে এই পরমাণু প্রোটন (proton) ইলেক্‌ট্রন (electron) প্রভৃতির দ্বারা গঠিত।

১। জন ডাল্টন

পরমাণু প্রায়ই একা থাকে না, দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলিত হইয়া একটি অণুর সৃষ্টি করে। আবার একটি পদার্থ বহুসংখ্যক অণুর সমষ্টি। অণুগুলি কিন্তু পরস্পর সংলগ্ন নহে। উহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধান থাকে, এই ব্যবধানের নাম **আণবিক ব্যবধান** (intermolecular space)। আণবিক ব্যবধান এত সূক্ষ্ম যে কল্পনার অতীত।

অণুগুলির মধ্যে একটা আকর্ষণী ও একটা বিকর্ষণী শক্তি থাকে। জড় পদার্থমাত্রেই এ দুই শক্তি সমান নয়। **কঠিন পদার্থে আকর্ষণী শক্তি প্রবল,** ও সেজন্য আণবিক ব্যবধান কম হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় পদার্থটি নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে। **তরল পদার্থে আকর্ষণী শক্তি অনেক কম,** কাজেই উহার অণুগুলি সহজে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে। তরল পদার্থে আণবিক ব্যবধানও অপেক্ষাকৃত বেশী। **বায়বীয় পদার্থে** অণুর আণবিক ব্যবধান এত বেশী যে উহাদের **আকর্ষণী শক্তি প্রায় কোনও কাজ করে না।** তাহার জন্য বায়বীয় পদার্থের নির্দ্দিষ্ট আয়তন বা আকার থাকে না।

পদার্থের স্বরূপ পরিবর্ত্তন (Change of state of matter)—**কোন কঠিন জড় পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে** উহার আণবিক বিকর্ষণী শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া যায় ও ফলে সেই পদার্থটি **প্রথম তরল ও তাহার পর বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়।**

বায়বীয় পদার্থে শৈত্য প্রয়োগে উহা প্রথম তরল ও পরে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। ইহা বিকর্ষণী শক্তি কমিয়া যাওয়ার ফল মাত্র।

একই পদার্থ—কঠিন, তরল ও বায়বীয়—তিন অবস্থায় থাকিতে পারে। বরফ কঠিন, তাহাকে গলাও জল হইবে; জলকে ফুটাও, বাষ্প হইবে। অর্থাৎ উত্তাপ লাগিলে বরফ জল হইয়া যায়, জল বাষ্প হইয়া যায়; আবার জলীয় বাষ্প শীতল করিলে উহা জলে পরিণত হয়, এবং জল অত্যন্ত শীতল করিলে বরফে পরিণত হয়। তাহা হইলে পদার্থের এই যে তিন অবস্থা তাহার মূলে রহিয়াছে উত্তাপ।

তিন প্রকার জড়পদার্থের বিশেষ গুণ—

(১) **কঠিন পদার্থ** বা শক্ত জিনিসের একটা নিজের আকার আছে। বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ না করিলে সে আকারের কোন পরিবর্তন হয় না। পাথর ভাঙ্গিতে, কাঠ কাটিতে, লোহা পিটিতে ও সূতা ছিঁড়িতে হয়। মোম কি গালাকে ভাঙ্গিতে বা পিটিতেও হয় না, আগুনের কাছে রাখিলেই তাহার আকার বদলাইয়া যায়।

(২) **তরল পদার্থের** কোন আকার নাই; যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এক ঘটি জলের আকার ঘটির মত। সেই জল গেলাসে ঢালিলে তাহার আকার হয় গেলাসের মত।

(৩) **বায়বীয় পদার্থের**ও নিজস্ব আকার নাই। যে আধারে রাখিবে উহা সেই আধারের আকার ধারণ করিবে। বায়বীয় পদার্থ, যত অল্পই হউক না কেন, যে পাত্রে ঢালিবে তাহা ভরিয়া যাইবে। ঘটিতে ঢাল ঘটি ভরিবে, বদ্ধ ঘরে ছাড়িয়া দাও ত সে ঘর ভরিয়া যাইবে। কঠিন বা তরল পদার্থ অপেক্ষা ইহার সংনম্যতাও বেশী।

যে পদার্থের সংসক্তি বেশী তাহার রোধও বেশী, কিন্তু সংনম্যতা কম। যাহার সংসক্তি কম তাহার রোধও কম, কিন্তু সংনম্যতা বেশী। মটর গাড়ীর টায়ার হাওয়ায় ভরা থাকে। হাওয়া অত্যন্ত সংনম্য বলিয়াই এই টায়ার এত আরামদায়ক।

কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের তুলনা

কঠিন	তরল	বায়বীয়
১। ওজন আছে।	১। ওজন আছে।	১। ওজন আছে।
২। সহজে আয়তন বা আকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না।	২। নিজস্ব আয়তন আছে; কিন্তু আকৃতি নাই। যে পাত্রে থাকিবে তাহারই আকৃতি ধারণ করিবে, কিন্তু আয়তন ঠিক থাকিবে।	২। নিজস্ব আয়তন বা আকৃতি নাই,—যে পাত্রে থাকিবে তাহারই আয়তন ধারণ করিবে।
৩। রাখিতে সাধারণতঃ পাত্রের বা আধারের প্রয়োজন নাই।	৩। খোলা আধারে রাখিতে পারা যায়।	৩। রাখিতে সাধারণতঃ বন্ধ আধারের প্রয়োজন।
৪। চাপ দিলে আয়তনের বিশেষ হ্রাস হয় না।	৪। চাপ দিলে আয়তনের বিশেষ হ্রাস হয় না।	৪। চাপ দিলে আয়তনের হ্রাস হয়।
৫। অংশ বিচ্ছিন্ন করিতে জোরের প্রয়োজন।	৫। অংশ সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়।	৫। অংশ সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়।

Questions

1. What are the general properties of matter? Why is it that sound and light are not considered as materials?
2. What are the three states of matter? Are they inter-convertible? Give examples.

জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম

(Physical properties of water)

জলের প্রয়োজনীয়তা—জীবন ধারণের জন্য জলের প্রয়োজন। ইহা যে শুধু পানীয়রূপেই আমরা ব্যবহার করি তাহা নহে, বিবিধ খাদ্যের সঙ্গে জল আমাদের শরীরে প্রবেশ লাভ করে।

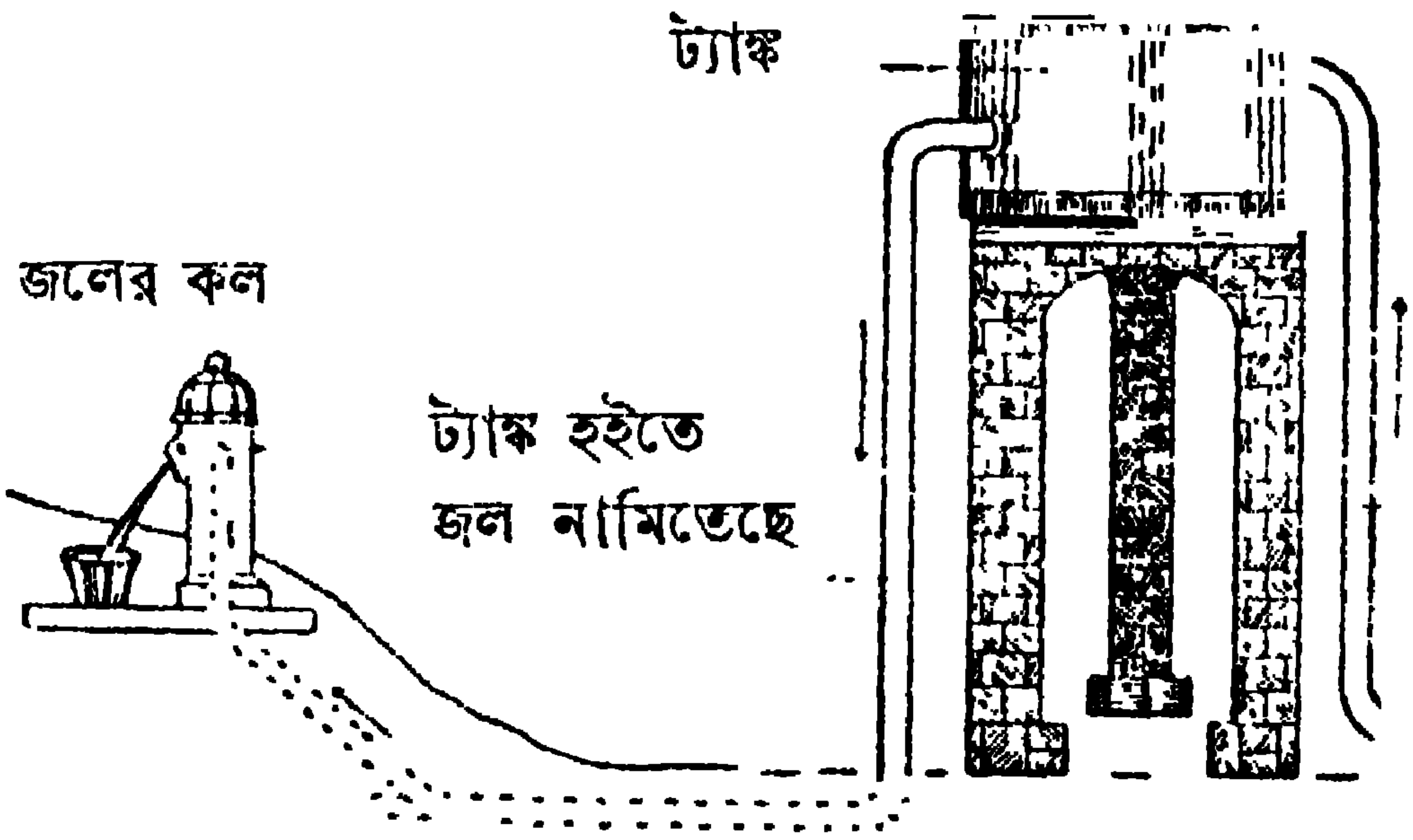

২। জল সরবরাহ

জলের ধর্ম্ম (Properties of water)—(১)—**জলের নিজের কোন আকার নাই, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট আয়তন আছে।** সাধারণতঃ জল স্বচ্ছ, আলোকের পথে ইহা বাধা প্রদান করে না ; তড়িৎ ও তাপশক্তি ইহার মধ্য দিয়া সহজে পরিচালিত হয় না। অল্প মাত্রায় জলের কোনও রং নাই, কিন্তু পরিমাণে বেশী হইলে নীলবর্ণ দেখায়। বিশুদ্ধ জলের স্বাদ নাই, গন্ধ নাই।

(২) **জল গড়াইয়া চলে ও সর্ব্বদাই নীচের দিকে ধাবিত হয়।** বড় সহরে বা বড় রেল ষ্টেসনে একটি লোহার বা পাকা গাঁথুনীর মঞ্চের উপর একটি সুবৃহৎ পাত্র বা ট্যাঙ্ক বসান থাকে (চিত্র ২)। ট্যাঙ্কের

উপর ও নীচের দিকে দুইটি মোটা নল লাগান থাকে। উপরের নলটির মধ্য দিয়া পাম্প সাহায্যে ট্যাঙ্কটি জলে পূর্ণ করা হয়। নীচের নল দিয়া বা আরও ছোট নল দিয়া ইচ্ছামত জল সরবরাহ্ করা হয়।

(৩) **জলের উপরিভাগ সর্ব্বদা সমতল,** কখন উঁচু নীচু হইতে পারে না। পুকুরের তলদেশের সকল ভাগ সমান গভীর না হইলেও উহার জলের উপরিভাগ সমতল। গ্লাসে কতকটা জল লইয়া কাত করিলে দেখা যায় ভিতরকার জলের উপরিভাগ সমতল।

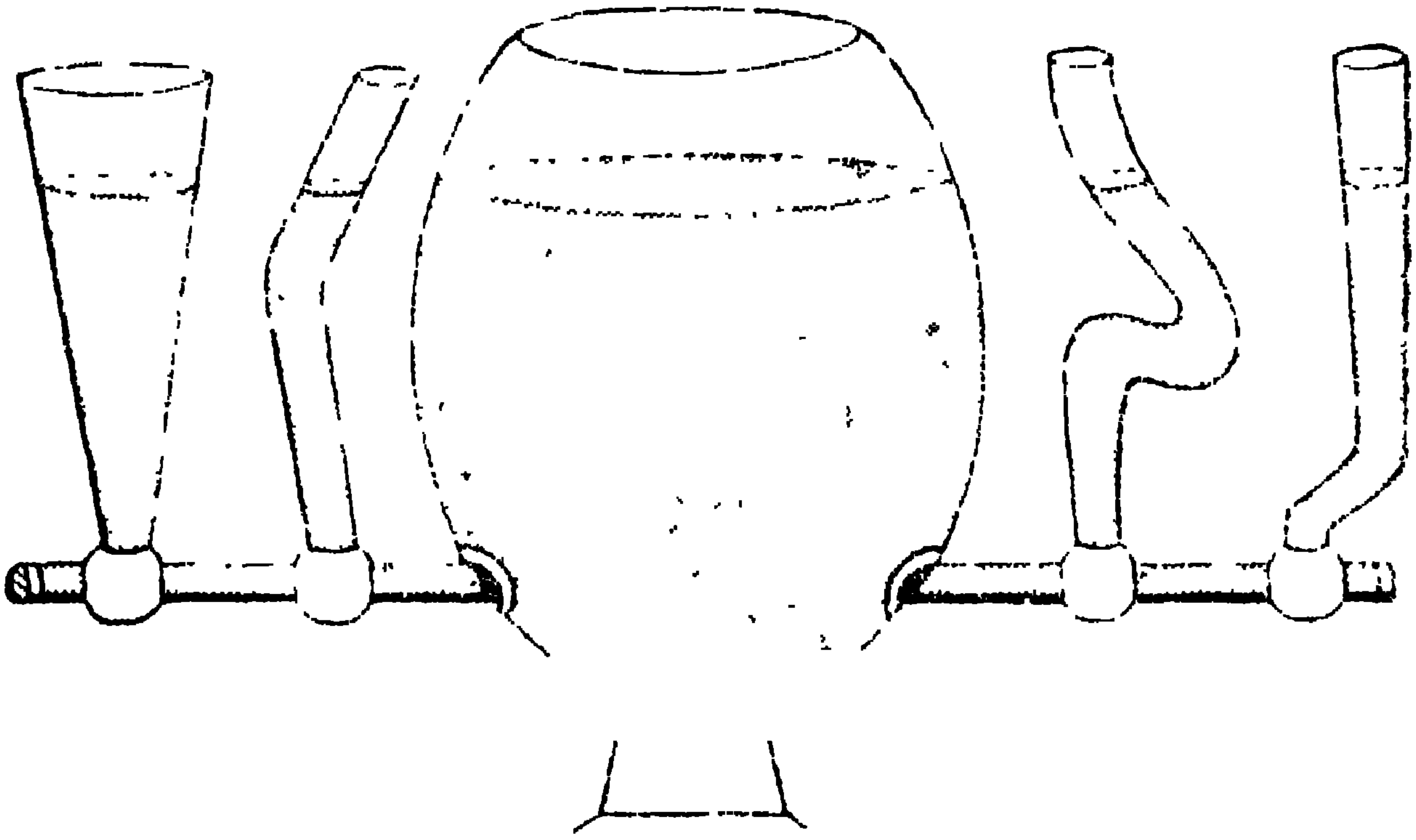

৩। সকল পাত্রেই জলের উচ্চতা সমান ও উপরিভাগ সমতল

বিভিন্ন আকারের কতকগুলি পাত্র একটা নল দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিয়া যদি একটিতে জল ঢালা যায় ত সকল পাত্রেই জল যাইবে এবং আধারের আকার অনুসারে জলের আকার হইবে। ইহা ছাড়া, সকল পাত্রেই জলের উচ্চতা একই হইবে।

(৪) **জলের উপর চাপ দিলে এই চাপ সকল দিকে সমানভাবে বিস্তৃত হয়।** এই মূল তথ্যের আবিষ্কারক প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক প্যাস্ক্যাল (Pascal)।

একটি ফাঁপা রবারের বলে একটি বড় ছিদ্র কর ও সেই ছিদ্রপথে জল ভর। পরে ঐ ছিদ্রপথ আঙ্গুল সাহায্যে বন্ধ কর। এখন একটি সূচ দিয়া বলের গায়ে অনেকগুলি ছিদ্র কর। ছিদ্রগুলি অত্যন্ত সরু বলিয়া সহজে জল বাহির হইবে না। বলটির উপর বেশ জোরে চাপ দাও। দেখিবে প্রত্যেক সরু ছিদ্রপথে ফিন্‌কি দিয়া সবেগে জল ছুটিয়া বাহির হইবে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে জলে চাপ দিলে উহা সকল দিকে সমভাবে বিস্তার লাভ করে।

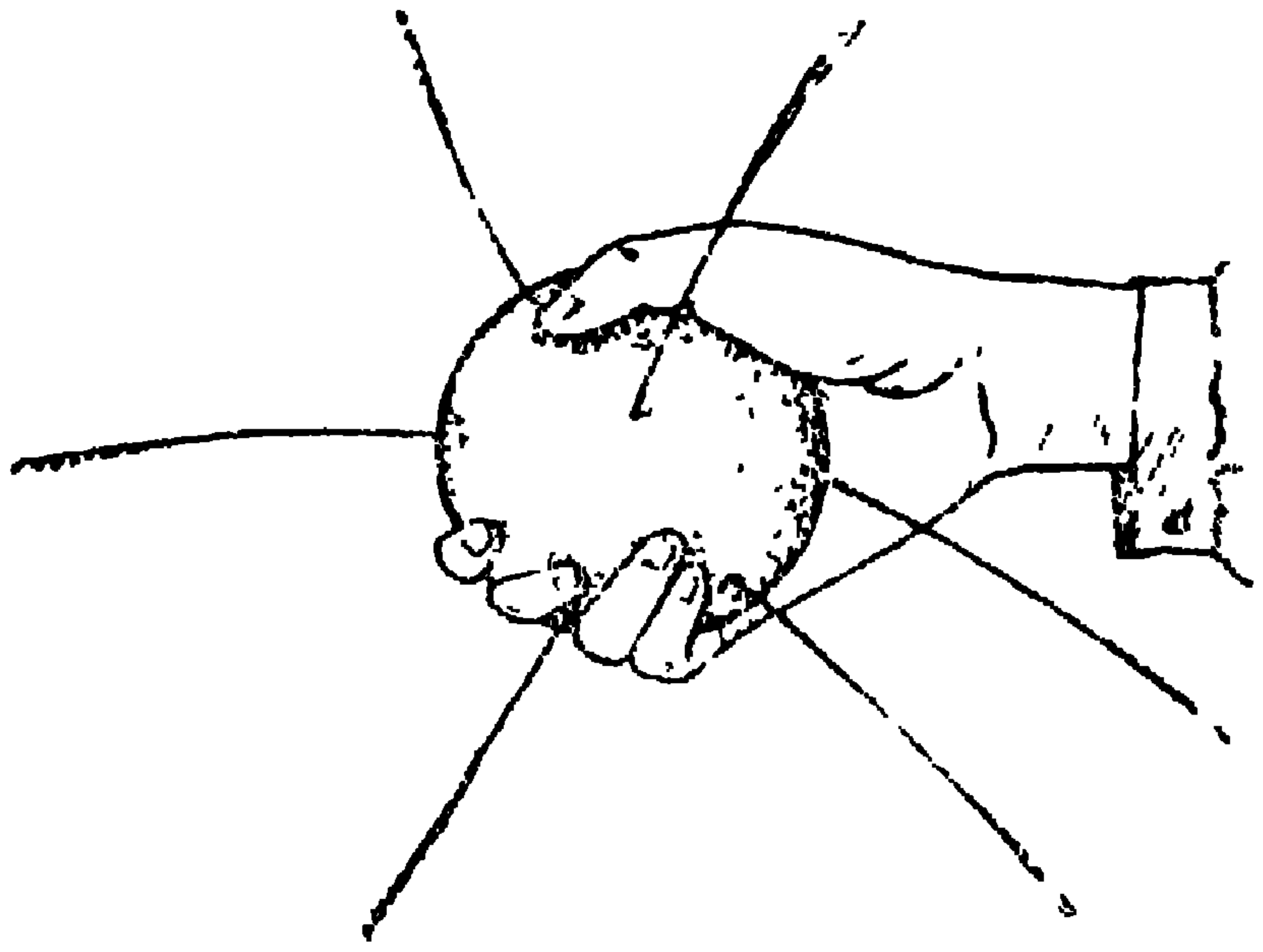

৪। চাপ সকল দিকে সমানভাবে বিস্তৃত হয়

(৫) **সাধারণ চাপে জলের আয়তন সঙ্কুচিত হয় না।** একটি পিচকারীতে জল ভরিয়া তাহার মুখ আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করার পর পিচকারীর ডাটিতে চাপ দাও। দেখিবে অতি সামান্য ঠেলা সম্ভবপর হইবে।

(৬) **জল শব্দবহ**—জলের মধ্য দিয়া শব্দ যায়। পুকুরে স্নান করিবার সময় মাথা ডুবাইয়া থাকিলেও বাহিরের শব্দ শুনিতে পাইবে। অন্যান্য তরল পদার্থেরও উপরিলিখিত প্রায় সমস্ত ধর্ম্মই সমান।

জলের চাপ (Pressure of water)—জল বা তরল পদার্থ মাত্রই (১) নিম্ন, (২) পার্শ্ব ও (৩) ঊর্দ্ধ দিকে চাপ দিতে থাকে। জলপূর্ণ পাত্রের তলদেশে যে চাপ পড়ে তাহাকে নিম্নচাপ ও পার্শ্বদেশে যে চাপ পড়ে তাহাকে পার্শ্বচাপ কহে। কূপের মধ্যে দড়ি বাঁধিয়া একটি বালতি ডুবান হইল। জলসমেত বালতি যতক্ষণ জলের নীচে থাকে ততক্ষণ দড়ি

ধরিয়া টানিলে দেখা যায় কত হালকা, কিন্তু জল সমেত বালতি জলের বাহিরে আসিলেই খুব ভারী বোধ হয়। বালতি জলের মধ্যে টানিলে জলের ঊর্দ্ধচাপই বালতিকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দেয় ও উহা হালকা মনে হয়।

জলের নিম্নচাপ (Downward pressure)—অন্য পদার্থের ন্যায় তরল পদার্থও নীচের দিকে চাপ দেয়। তরল পদার্থের নিম্নচাপের পরিমাণ উহার উচ্চতার ও ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে। উচ্চতা অর্থাৎ যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের মধ্যে তরল পদার্থের উচ্চতা বাড়াইলে নিম্নচাপ বাড়ে এবং উচ্চতা কমাইলে নিম্নচাপ কমে।

জলের পার্শ্বচাপ (Lateral pressure)—চারিটি ছিদ্রপূর্ণ একটি জলের পাত্রের ছিদ্রগুলি ছিপি দ্বারা বন্ধ করিয়া উহার মধ্যে জল ঢালিয়া দাও। যে ছিদ্রটি সকলের নীচে অর্থাৎ জলের উপরিভাগের উচ্চতা যাহা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সেই ছিদ্রে জলের চাপও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবে। ছিপিগুলি খুলিয়া দিলে সর্ব্বনিম্ন ছিদ্র দিয়া সকলের চেয়ে জোরে, সুতরাং সকলের চেয়ে দূরে, জল পড়িবে।

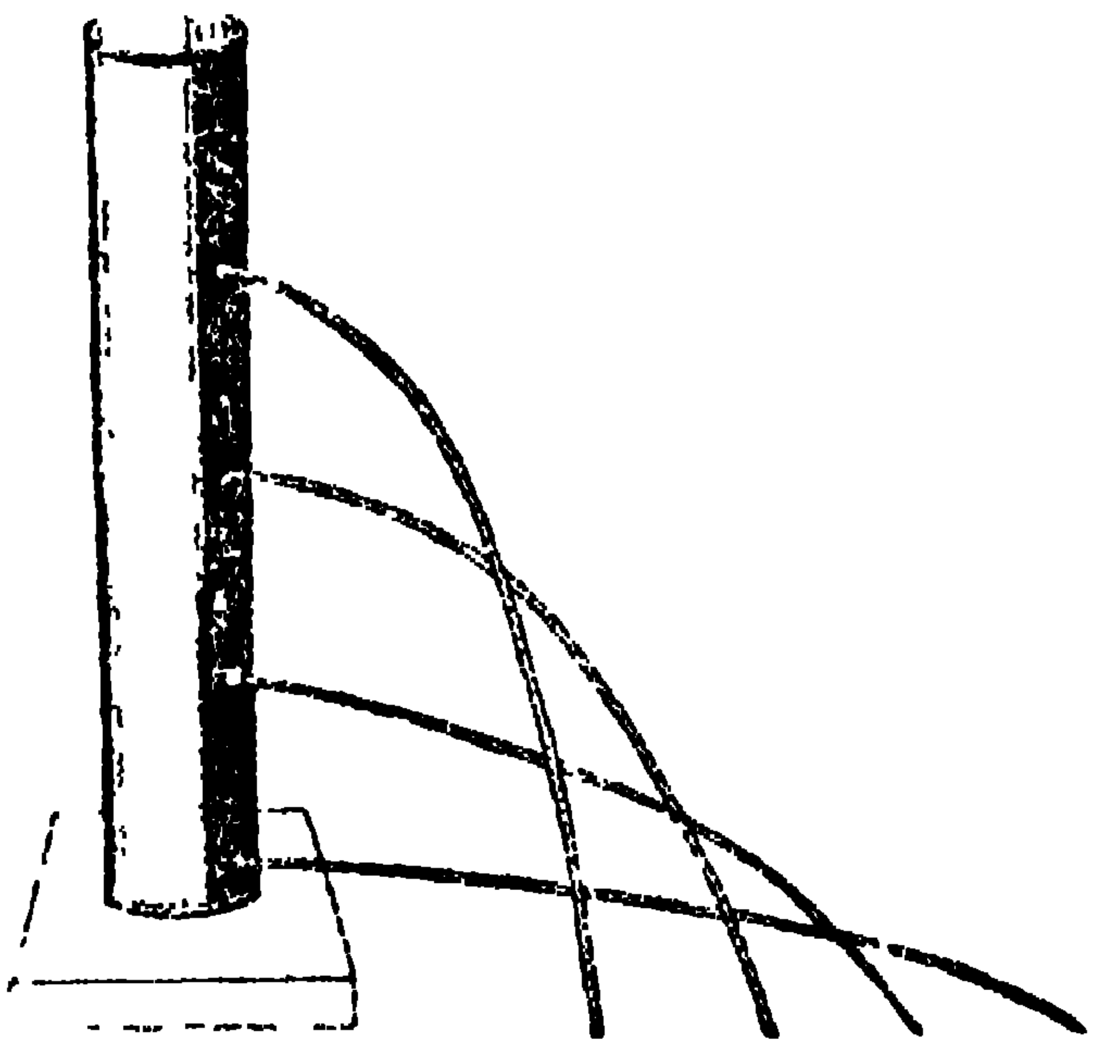

৫। জলের পার্শ্বচাপ

জলের ঊর্দ্ধচাপ (Upward pressure)—সোজাভাবে কলসী জলে ডুবাইতে গেলে দেখা যায় যে জল কলসীর তলায় উপর দিকে চাপ দেয় অর্থাৎ সোজাভাবে ডুবাইতে কষ্ট হয়। এই ঊর্দ্ধচাপও জলের গভীরতার উপর নির্ভর করে।

জলের ঊর্দ্ধচাপের পরীক্ষা—একটি কাচের চোঙের এক মুখ একটি টিনের চাকৃতি দিয়া বন্ধ কর। এই চাকৃতিটির কেন্দ্রে যেন একটি আংটি লাগান থাকে যাহাতে একটু সূতা বাঁধিতে পারা যায়। চাকৃতিটির সূতা চোঙের মধ্য দিয়া আনিয়া বাহির হইতে ধরিয়া রাখ। চাকৃতি সমেত চোঙটি জলের মধ্যে ঢুকাইতে চেষ্টা কর। দেখিবে বেশ জোর লাগিতেছে।

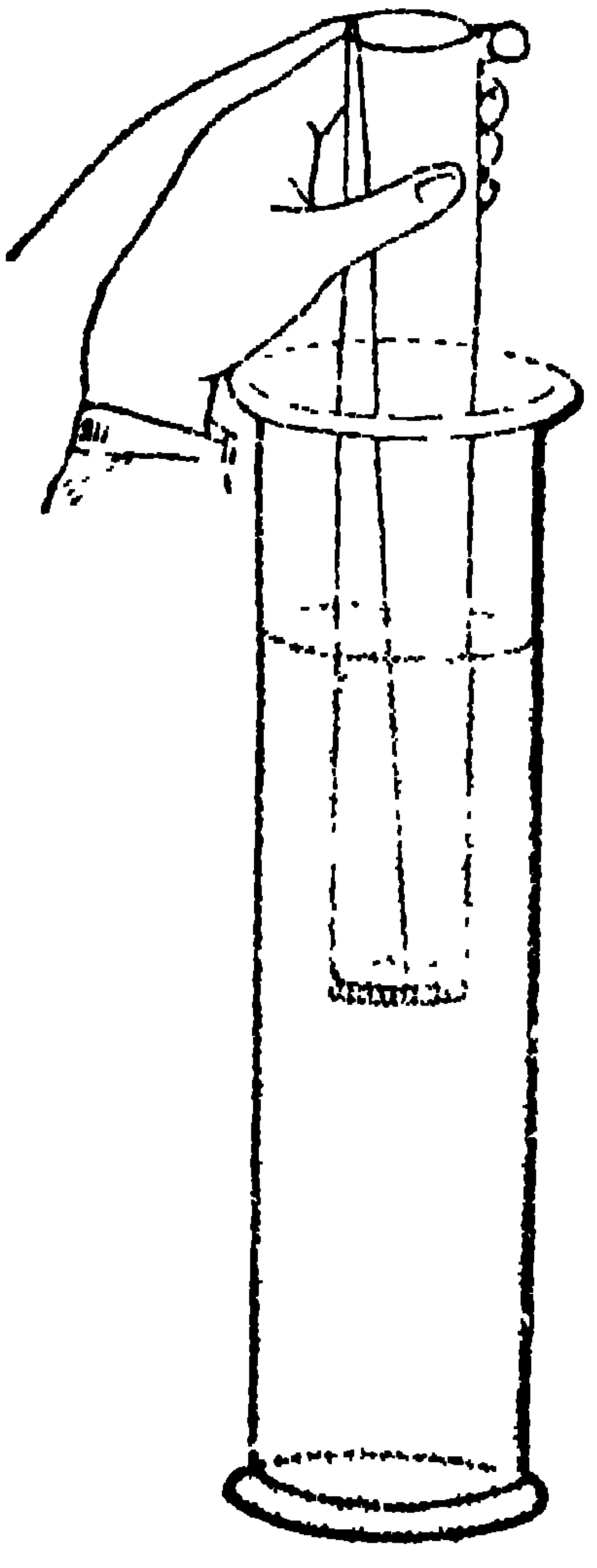

৮। জলের ঊর্দ্ধচাপ

এখন চাকৃতির সূতা ছাড়িয়া দিলেও চাকৃতি পড়িয়া যায় না। চোঙের ভিতর জল নাই। কেবল জলের উপর দিকের চাপের ফলে চাকৃতি পড়িয়া যায় না। তারপর চোঙটিতে জল ঢাল। যেই চোঙের ভিতরের জল ও চোঙের বাহিরের জল এক সমতলে আসিবে, অর্থাৎ চোঙমধ্যস্থ জলের নীচের দিকে চাপ ও চোঙের বাহিরের জলের উপর দিকে চাপ এক হইবে অমনি চাকৃতি চোঙ হইতে খসিয়া জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। চাকৃতির উপর চোঙের বাহিরের জলের ঊর্দ্ধচাপ এবং ভিতরের জলের নিম্নচাপ সমান হইবার ফলে মহাকর্ষের জন্য উহা জলের তলায় পড়িয়া যাইবে।

প্লবতা ও আর্কিমিডিসের সূত্র

জলের প্লবতা (Buoyancy of water)—একখানা ইট এক হাতে তুলিতে হইলে বেশ একটু জোর লাগে। সেই ইট জলের মধ্যে তুলিয়া ধর, মনে হইবে কোন জোরই লাগিতেছে না। এরূপ হইবার

কারণ এই যে, জল সেই ইটকে নীচে হইতে চাপ দিতেছে অর্থাৎ ঠেলিতেছে। এই চাপকেই **প্লবতা** (buoyancy) বলে। সকল তরল পদার্থেরই এই গুণ আছে।

প্লবতা পরীক্ষা (Experiments on buoyancy)— (১) একটি দাঁড়িপাল্লার এক দিকে দুইটি সমান আকারের স্তম্ভক আছে

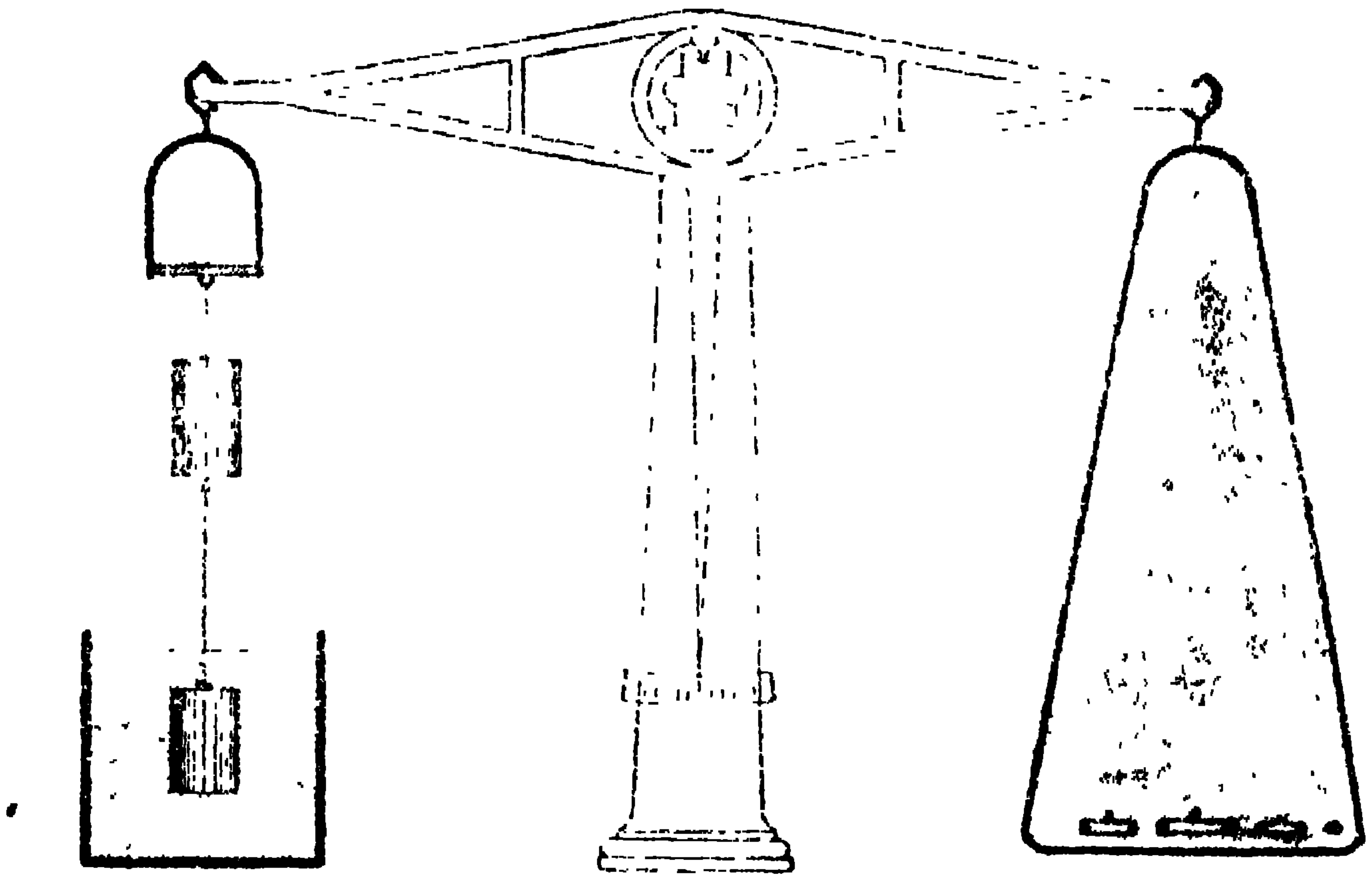

৭। প্লবতা পরীক্ষা

(চিত্র ৭)। উপরেরটি ফাঁপা এবং নীচেরটি নীরেট। স্তম্ভক দুইটি প্রথমে ওজন করিয়া লইয়া নীচের স্তম্ভকটি জলে ডুবাইয়া দাও ও ওজন লও, দেখিবে এবারে ওজন পূর্বাপেক্ষা কম হইবে। এখন ফাঁপা স্তম্ভকটি জলপূর্ণ করিয়া লইলে দেখিবে ওজন পূর্ববৎ হইয়াছে।

(২) একটা দাড়িপাল্লার একদিকে সূতা দিয়া এক টুকরা পাথর বাঁধিয়া ওজন কর। পরে সেইটি ঐ অবস্থায় এক বালতি জলে ডুবাইয়া রাখ ও আবার ওজন কর। দেখিবে ওজন অনেক কমিয়া গেল। এখন পাথরটুকরাটিকে এমন একটি জলপূর্ণ নলযুক্ত পাত্রে ডুবাও যাহাতে নলের

তলার দিক জলের সহিত সমান্তরাল থাকে। ডুবাইবামাত্র নল দিয়া খানিকটা জল বাহির হইয়া আসিবে। এই জল গেলাসে ধরিয়া ওজন কর। দেখিবে এই জলের ওজন ও পাথরটুকরাটি জলে ডুবানর দরুণ ওজনের যে হ্রাস হইয়াছিল এই দুই ওজন সমান।

আর্কিমিডিসের সূত্র (Archimedes' principle)—কোন পদার্থ জলে বা অন্য কোনও তরল পদার্থে ডুবাইলে তাহা যে আয়তনের তরল পদার্থ সরাইয়া দেয় পদার্থটি সেই আয়তন তরল পদার্থের ওজন হারায়। এই সত্যটি **আর্কিমিডিসের সূত্র** নামে খ্যাত।

ওজনের বিশেষ অর্থ—পৃথিবী যে পদার্থকে যত জোরে আকর্ষণ করিতেছে সেই জোর হইল তাহার ওজন। জলে ওজন কমিল কেন? পৃথিবীর আকর্ষণ নীচের দিকে, আর জলের প্লবতা উপর দিকে। দুইটি শক্তির পরস্পর যুদ্ধ বাধিল। যদি নিমজ্জিত পদার্থটি ভাসিয়া উঠে, তাহা হইলে প্লবতাশক্তির জয় হইল। যদি ভাসিয়া না উঠে, তবে মহাকর্ষের জয় হইল। কিন্তু পদার্থটি ভাসুক বা না ভাসুক, তাহার ওজন কমিবেই। এই ওজন কম থাকিবে ততক্ষণ যতক্ষণ সে জলে আছে। বাহিরে তুলিলেই আবার তাহার ওজন পূর্ব্ববৎ হইবে, অর্থাৎ পৃথিবী আবার পূরা জোরে তাহাকে টানিবে।

প্লবতাশক্তি ও সাঁতার—জাহাজ, নৌকা যে জলে ভাসে তাহা জলের এই প্লবতাশক্তির প্রভাবে। তোমরা যে সাঁতার দাও তাহাও এই শক্তির সাহায্যে। জন্তুর দেহ সমান ঘনায়তনের জলের চেয়ে হাল্কা, তাই জলের প্লবতাশক্তি তাহাকে ভাসাইয়া রাখিবে। কুকুর, বিড়াল, গরু সেইজন্য স্বচ্ছন্দে সাঁতরাইয়া বেড়ায়। তোমাদের মাথাটা ভারী, সমান ঘনায়তনের জলের চেয়ে সামান্য বেশী। পুকুরে পড়িলে স্বাভাবিক নিয়মে তোমার মাথা জলের মধ্যে চলিয়া যাইবে। জলের প্লবতাশক্তি মাথাটাকে

ভাসাইয়া রাখিতে পারিবে না। মাথা জলে ডুবিলে নাকে মুখে জল ঢুকিয়া দম বন্ধ হইয়া যাইবে। সাঁতার শেখা অর্থ মাথা তুলিয়া ধরিয়া ভাসিবার কৌশল শেখা। জানোয়ারদের মাথা হালকা ; আপন হইতে ভাসে।

সমুদ্রের জলে লবণ থাকায় উহার ওজন বেশী। সেইজন্য সমুদ্রে সাঁতার শেখা সহজ। ডেড্‌সী নামক হ্রদে লবণের পরিমাণ এত বেশী যে, চেষ্টা করিলেও ডুবিতে পারিবে না।

এক বাটি জলে একটা হাঁসের ডিম ছাড়িয়া দাও। ডিম ডুবিয়া যাইবে। সেই জলে দুই চামচ লবণ মিশাইয়া দাও, দেখিবে ডিম ভাসিয়া উঠিতেছে। জল সমান ঘনায়তনের ডিমের চেয়ে হালকা, কিন্তু লোনা জল সমান ঘনায়তনের ডিমের চেয়ে ভারী।

প্লবতা ও ওজন (Buoyancy and weight)—প্লবতা সকল তরল পদার্থেরই আছে। তবে তরল পদার্থ যত ভারী, তাহার প্লবতাও তত বেশী। প্লবতা নির্ভর করে যেমন ভাসমান দ্রব্যের গুরুত্বের উপর, তেমনই যে তরল পদার্থে ঐ দ্রব্যকে ডুবাইতেছে তাহার গুরুত্বের উপরও। এইজন্য লোহা পারদে ভাসে।

জল অপেক্ষা হালকা জিনিস জলে ভাসে। কিন্তু ভাসিবার সময় তাহার কতটা জলে ডুবিয়া থাকিবে ? ভাসমান পদার্থ যতটা জলকে স্থানচ্যুত করিয়াছে তাহার ওজন ও ভাসমান পদার্থটার ওজন এক হইবে। **বস্তুর ভাসা বা ডোবা জলের প্লবতার উপর নির্ভর করে।**

আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity)—আপেক্ষিক গুরুত্ব অর্থ জলের তুলনায় গুরুত্ব। পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব সাড়ে তের অর্থাৎ এক পেয়ালা পারদের ওজন সাড়ে তের পেয়ালা জলের ওজনের সমান। লোহার আপেক্ষিক গুরুত্ব আট অর্থ এই যে এক সের লোহার আয়তন এক সের জলের আয়তনের আট ভাগের এক ভাগ।

হাইড্রোমিটার—যে যন্ত্র সাহায্যে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করা হয় তাহাকে হাইড্রোমিটার কহে।

এই যন্ত্রের তিন ভাগ—(১) নীচের ভাগটি পারদভরা একটি ছোট পাত্র, (২) মধ্যভাগটি ফাঁপা মোটা একটি নল, (৩) উপর ভাগটি একটি সরু নল। যন্ত্রটি এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, জলে ছাড়িয়া দিলে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগটি জলমধ্যে ডুবিয়া থাকে, শুধু উপরের সরু নলটির খানিকটা বাহিরে জাগিয়া উঠে। যন্ত্রটিকে জলে ভাসাইলে যতটা বাহিরে থাকিবে, তেলে ভাসাইলে ততটা থাকিবে না, কেন না তেল জল অপেক্ষা লঘু। লোনা জলে ভাসাইলে বেশী বাহির হইয়া থাকিবে। দুধে ভাসাইলেও বেশী বাহির হইবে। ইহার কারণ এই যে দুধ ও লোনা জল, জল অপেক্ষা ভারী। এইরূপে বিভিন্ন তরল পদার্থে যন্ত্রটিকে ভাসাইয়া তাহার নল যেখান যেখান পর্য্যন্ত ডোবে সেই সেইখানে এক একটি দাগ কাটিয়া লওয়া হয়। এই সমস্ত তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব সোজাসুজি ওজন করিয়া আগেই হিসাব করা আছে।

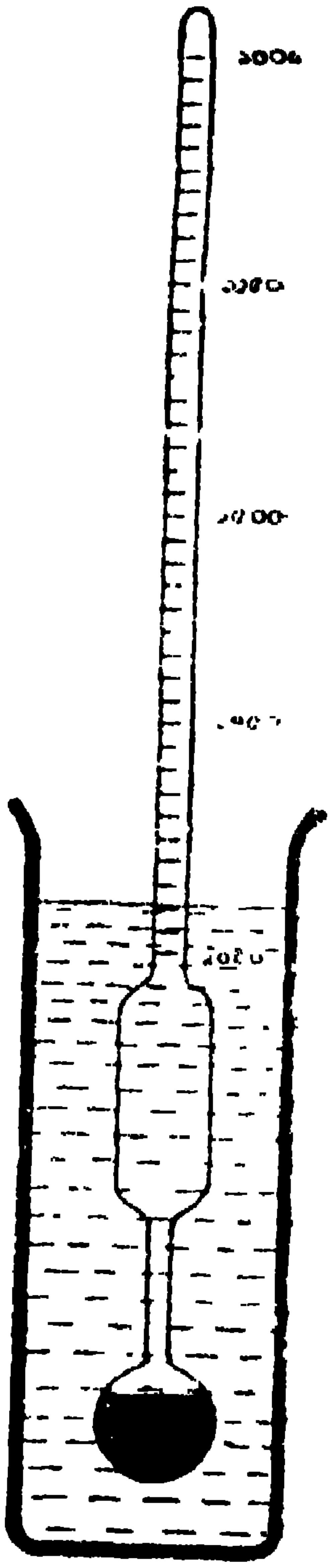

৮। হাইড্রোমিটার

যন্ত্রে দাগ কাটা হইলে পরে যে কোন অজানা তরল পদার্থে এই যন্ত্র ভাসাইলে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব সহজেই বাহির হইবে। এক অজানা তরল পদার্থে হাইড্রোমিটার ভাসাইলে, যেখান পর্য্যন্ত ডুবিল সেখানটা জলের দাগ ও দুধের দাগের মাঝামাঝি। তাহা হইলে বুঝা গেল যে অজানা পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব দুধের চেয়ে কম এবং জলের চেয়ে বেশী। দুধ খাঁটি কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য এই হাইড্রোমিটারের মত

এক যন্ত্র আছে, তাহার নাম **লাক্‌টোমিটার**। ইহা দুধে ভাসাইলে, দুধে কতটুকু জল আছে তাহা অবধি ধরা পড়ে।

সাধারণতঃ হাইড্রোমিটারের দাগগুলির পার্শ্বে যে সংখ্যা থাকে তাহা আপেক্ষিক গুরুত্বের সহস্র গুণ। অর্থাৎ যদি কোন তরল পদার্থে হাইড্রোমিটার ১৫০০র দাগ পর্যন্ত ডুবিয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব দেড় (১·৫) মাত্র।

জাহাজ জলে ভাসিবার কারণ—যে কোনও জিনিস জলে ডুবিলে বুঝিতে হইবে যে উহার ওজন সম আয়তন জলের ওজনের চেয়ে বেশী। না ডোবে ত বুঝিতে হইবে যে উহার ওজন সম আয়তন জলের ওজনের চেয়ে কম। নিরেট লোহার বল জলে ডোবে, কিন্তু সেই বলকে পিটিয়া কড়াই তৈয়ার করিলে ভাসে। লৌহনির্মিত প্রকাণ্ড জাহাজের ভিতরটা ফাঁপা। ইহা সম আয়তন জলের ওজন অপেক্ষা হালকা, সেকারণ জলে ভাসিয়া থাকে।

আর্কিমিডিসের সূত্রাবিষ্কারের গল্প—সিসিলি দ্বীপে হায়রো নামে এক রাজা এক তাল খাঁটি সোনা এক কারিগরের হস্তে দিয়া আদেশ করিলেন, এই সোনা দ্বারা এক মুকুট গড়িয়া আন। যথাসময়ে কারিগর মুকুট লইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইল। কিন্তু সোনার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নৃপতির সন্দেহ হইল। মুকুট না ভাঙ্গিয়া এ সন্দেহের সমাধান কিরূপে হইতে পারে? পণ্ডিতবর আর্কিমিডিসের কাছে মুকুট পাঠান হইল। তিনি মুকুট হাতে লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা করিলেন, কিন্তু সমস্যার সমাধান কিছুই হয় না। তারপর চৌবাচ্চায় স্নান করিতে করিতে আর্কিমিডিসের মাথায় চকিতের মত আলোক উদ্ভাসিত হইল। তিনি "ইউরেকা! ইউরেকা"! ("পেয়েছি! পেয়েছি!") বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে চৌবাচ্চা হইতে বাহির হইলেন।

মুকুটের ওজন লওয়াই ছিল। জলের মধ্যে ঝুলাইয়া পুনঃ তাহার ওজন লইলে বুঝা যাইবে কতটা ওজন কমিল। যতটা কমিল, সেটা মুকুটের সমান আয়তন জলের ওজন—অর্থাৎ যতটা জল সরাইয়া মুকুট জলমধ্যে আপন স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহার ওজন। ইহাই আর্কিমিডিসের আবিষ্কৃত তথ্য। হঠাৎ এই তথ্য মাথায় আসাতেই তিনি "ইউরেকা" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন।

৯। আর্কিমিডিস

মুকুটের ওজন পাইলে ও তাহার সমান আয়তন জলেরও ওজন পাইলে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টি দিয়া ভাগ করিলে মুকুট যে ধাতু দিয়া নির্মিত তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব পাইবে। যদি খাঁটি সোনা হয় ত ভাগফল হইবে উনিশ, যদি খাদ মেশান থাকে ত ফল হইবে আরও কম, কেন না অন্য সাধারণ ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব সোনা অপেক্ষা কম।

Questions

1. State the physical properties of water. How is water supplied in cities?
2. How would you show that water exerts pressure (a) downwards, (b) sideways and (c) upwards?
3. Explain the principle of Archimedes.
4. What is specific gravity?
5. Why does a heavy ship float on the sea, while a piece of iron sinks in it? Describe an experiment to illustrate the principle involved. (C. U. 1940)
6. Why does a piece of wood float while a piece of iron sinks in water? (C. U. 1945)

বায়ুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম
(Physical properties of air)

(১) **বায়ুর নিজস্ব আকার নাই আয়তনও নাই।** ইহার অস্তিত্ব আমরা নানা প্রকারে বুঝিতে পারি। (২) বায়ু প্রবাহিত হইলে ইহার **স্পর্শ** আমরা **ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করি।** ইহার অভাব হইলে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। ইহারই সঞ্চরণের ফলে ঝড়, ঘূর্ণিবায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনাবলী ঘটে। ঘরের আসবাব ছাড়া বাকী স্থান শূন্য মনে হইলেও উহা বায়ুতে পূর্ণ। বায়ু-সমুদ্রে আমরা ডুবিয়া আছি। আমরা না দেখিতে পাইলেও বায়ু নামক একটি স্বতন্ত্র পদার্থ যে আছে—লোহা, কাঠ, পাথরের মতই আছে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) বায়ুর সাহায্যে আমরা **সুগন্ধের ঘ্রাণ** পাই।

(৪) **চাপ দ্বারা বায়ু সহজেই সঙ্কুচিত হয়।**

কিন্তু চাপ সরাইয়া লইলে উহা পূর্ব্ব আয়তনে ফিরিয়া আইসে অর্থাৎ (৫) **বায়ু স্থিতিস্থাপক।**

(৬) **বায়ু শব্দবহ**—বায়ুর সাহায্যে শব্দ শুনিতে পাই। বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন যে কোন পদার্থের স্থিতিস্থাপকতাগুণ থাকিলে তাহার শব্দ বহনের ক্ষমতা থাকে। বায়ুর সাহায্যেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শব্দতরঙ্গ আসে।

বায়ুর ওজন—পদার্থ হইলেই তাহার ভার বা গুরুত্ব থাকিতে হইবে। অতএব বায়ুরও অন্য পদার্থের ন্যায় ওজন আছে, ইহা মানিতেই হইবে, কথাটা বিশ্বাস করা যতই কঠিন হউক।

বায়ুর ওজন সম্বন্ধে পরীক্ষা—একটি কাচের কুপী বা ফ্লাস্কের মুখে রবারের ছিপি আঁটিয়া দাও। ছিপিতে ছিদ্র করিয়া একটি

কাচের নল পরাইয়া দাও। নলের বাহিরের মুখে একটি রবারের নল লাগাও ও রবারের নলের মুখে একটি কাচের ছিপিযুক্ত নল আটকাইয়া রাখ। তার পর ফ্লাস্কের মধ্যে খানিকটা জল ঢালিয়া তাহা ফুটাও। যখন জলের বাষ্প রবারের নল দিয়া বেশ জোরে বাহির হইয়া আসিতেছে দেখিবে, তখন ছিপি আঁটিয়া ফ্লাস্কটি নামাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা কর। ফ্লাস্কের মধ্যে আর হাওয়া নাই, জলের ভাপ সমস্ত হাওয়াকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। ফ্লাস্কটি ওজন কর। এইবার ছিপি খুলিয়া দাও। শব্দ করিয়া বায়ু ফ্লাস্কে ঢুকিবে ও মুহূর্ত্তের মধ্যে ইহাকে ভরিয়া ফেলিবে; পুনরায় ওজন কর, দেখিবে যে ফ্লাস্কের ওজন বাড়িয়া গিয়াছে। যতটা বাড়িয়াছে তাহা পাত্রস্থ বায়ুর ভার, নহিলে বাড়িল কিরূপে!

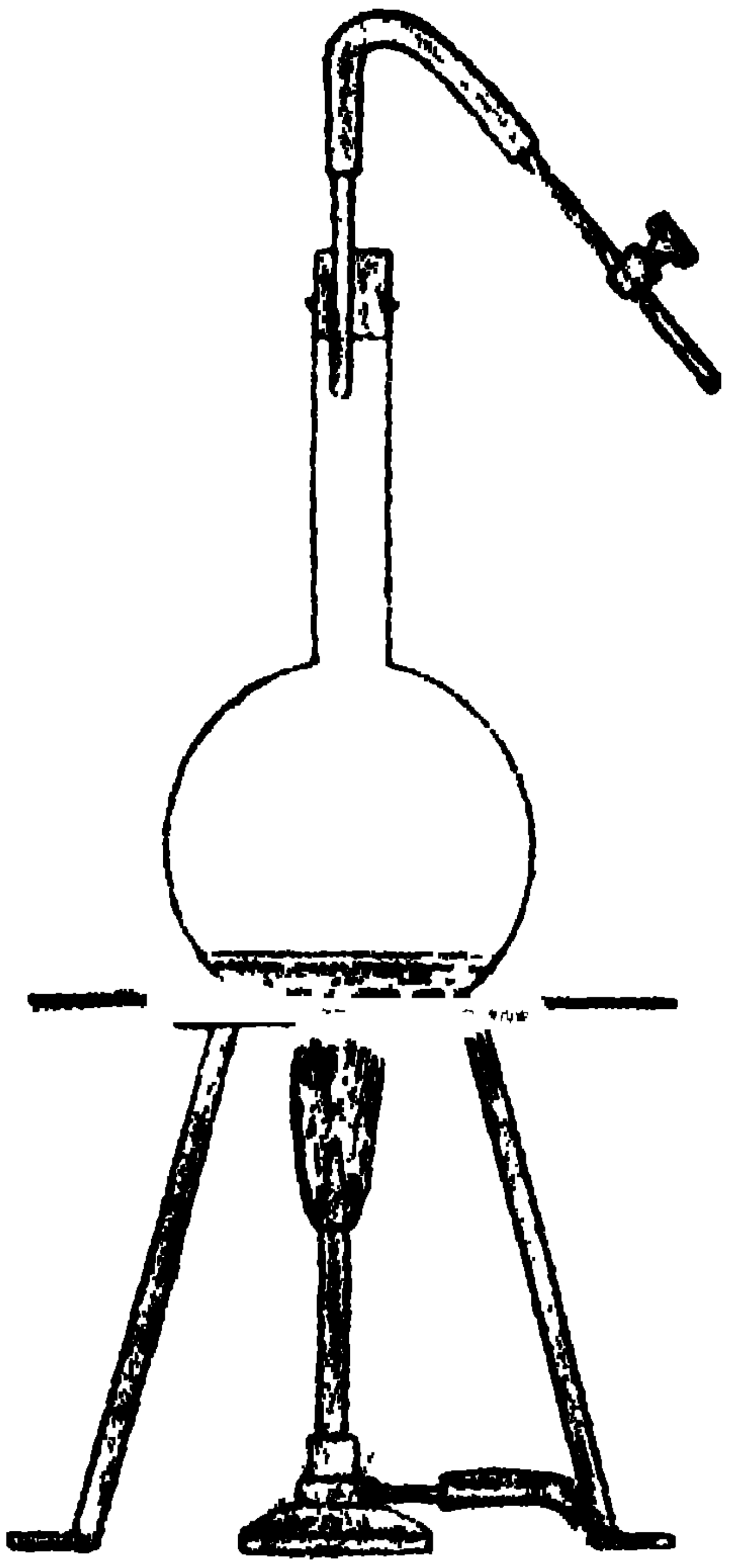

•। বায়ুর ওজন সম্বন্ধে পরীক্ষা

বায়ুর প্লবতা শক্তি (Buoyancy of air)

জলের ন্যায় বায়ুরও এই শক্তি আছে। বায়ু-সমুদ্রে যে সকল বস্তু ডুবিয়া আছে তাহাদের উপর বায়ুর একটা ঊর্দ্ধ চাপ আছে। তবে সেই চাপ এত কম যে বস্তুটি খুব হালকা এবং আয়তনে খুব বড় না হইলে সহজে বুঝা যায় না।

পাতলা রবারের বেলুনে বায়ু অপেক্ষা হালকা গ্যাস, যেমন হাইড্রোজেন, পুরিয়া ছাড়িয়া দিলে আকাশে উঠিয়া যায়। বেলুনটি আয়তনে যদি খুব বড় হয় তবে কোন ভারী জিনিস উহার সহিত বাঁধিয়া

দিলেও, আকাশে উঠিয়া যাইবে। এই প্রণালীতে উড়ো-জাহাজ (air ships) আকাশপথে উঠিয়া যায়।

বায়ুমণ্ডল ও উহার চাপ

(Atmosphere and its Pressure)

ভূপৃষ্ঠ যে বায়ুর আবরণে আবৃত উহার নাম বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের নানা স্তর। নীচের স্তরের বায়ু উপরের স্তরস্থিত বায়ু অপেক্ষা ভারী। বায়ুমণ্ডলের সমগ্র বায়ু পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট, সে কারণ বায়ু পৃথিবীকে আবেষ্টন করিয়া আছে।

বায়ুর নিজস্ব চাপ সম্বন্ধে পরীক্ষা—বায়ু সকল দিকে চাপ দেয়। সব দিকে সমান চাপ বলিয়া, বায়ুমণ্ডলের চাপ বাহিরে বুঝা যায় না।

(১) **বায়ুর নিম্নচাপ** (Downward pressure of air) —একটি কাচের চোঙ বায়ুপাম্পের প্লেটের উপর রাখ। প্লেট ও চোঙের

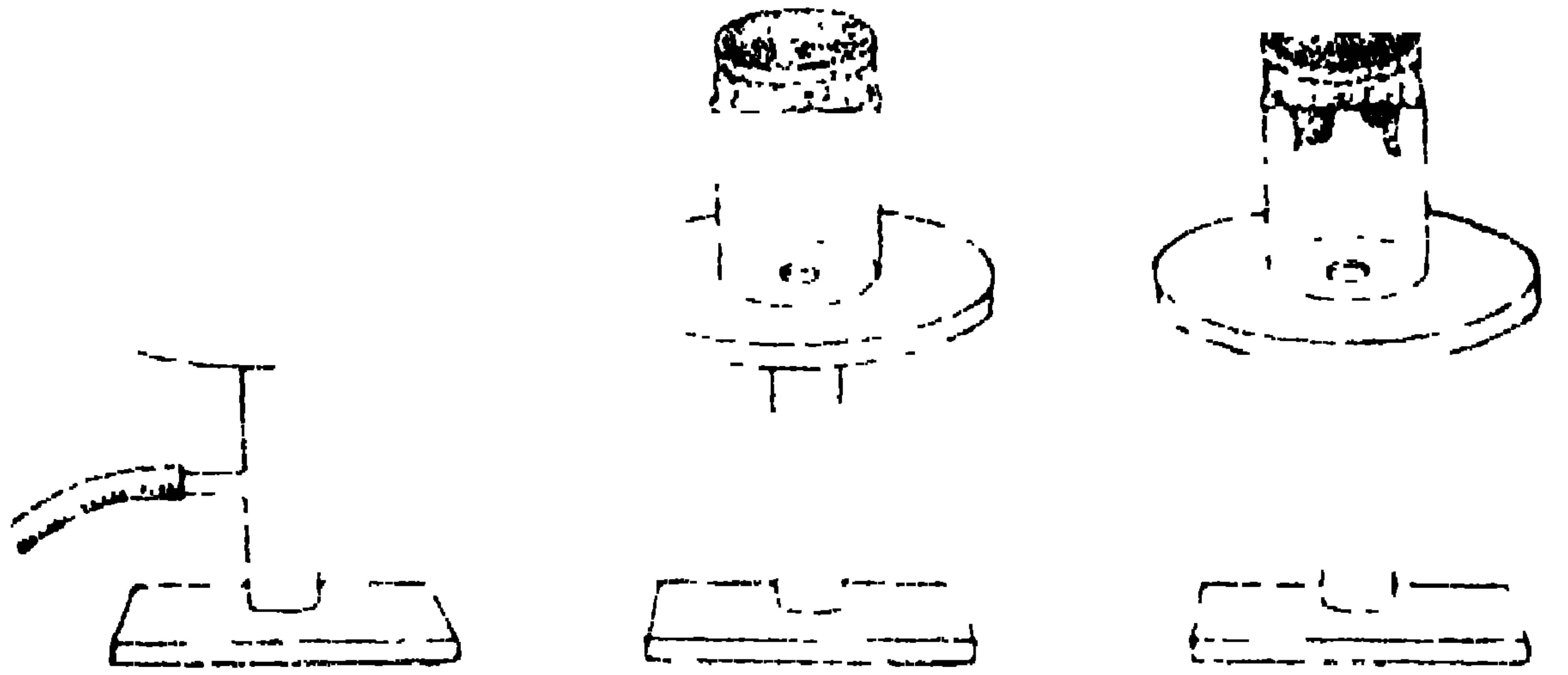

১১। বায়ুর নিম্নচাপের পরীক্ষা

নীচের কিনারায় ভেসিলিন দিয়া আটকাইয়া দাও যাহাতে বায়ু প্রবেশের ফাঁক না থাকে। চোঙের খোলা মুখটি পাতলা রবারের চাদর দিয়া মুড়িয়া

দাও। তারপর পাম্প চালাইয়া চোঙটি বায়ুশূন্য করিতে চেষ্টা করিলে প্রথমে রবারের চাদর চোঙের ভিতরের দিকে যাইতে চেষ্টা করিবে ও শেষে সশব্দে ফাটিয়া যাইবে। কারণ এই পাম্প চালাইবার পূর্ব্বে রবার-চাদরের উপরে ও নীচে বায়ুর সমান চাপ ছিল। পাম্প চালাইলে চোঙের ভিতরটা বায়ুশূন্য হওয়ায় উপরের বায়ুর চাপে রবার ফাটিয়া গেল।

বায়ুর ঊর্দ্ধচাপ (Upward pressure of air)—একটি কাচের গেলাস কাণায় কাণায় জলে ভরিয়া তাহার উপর এক টুকরা ভিজা কাগজ দিয়া ঢাকিয়া দাও যেন কোথাও ফাঁক না থাকে। এখন কাগজের উপর হাত চাপিয়া ধীরে ধীরে গেলাস উল্টাইয়া ধর। আস্তে আস্তে কাগজের উপর হইতে হাত সরাইয়া লও। দেখিবে, কাগজও সরিবে না, জলও পড়িবে না। বায়ুর চাপ কাগজকে ঠেলিয়া রাখিবে।

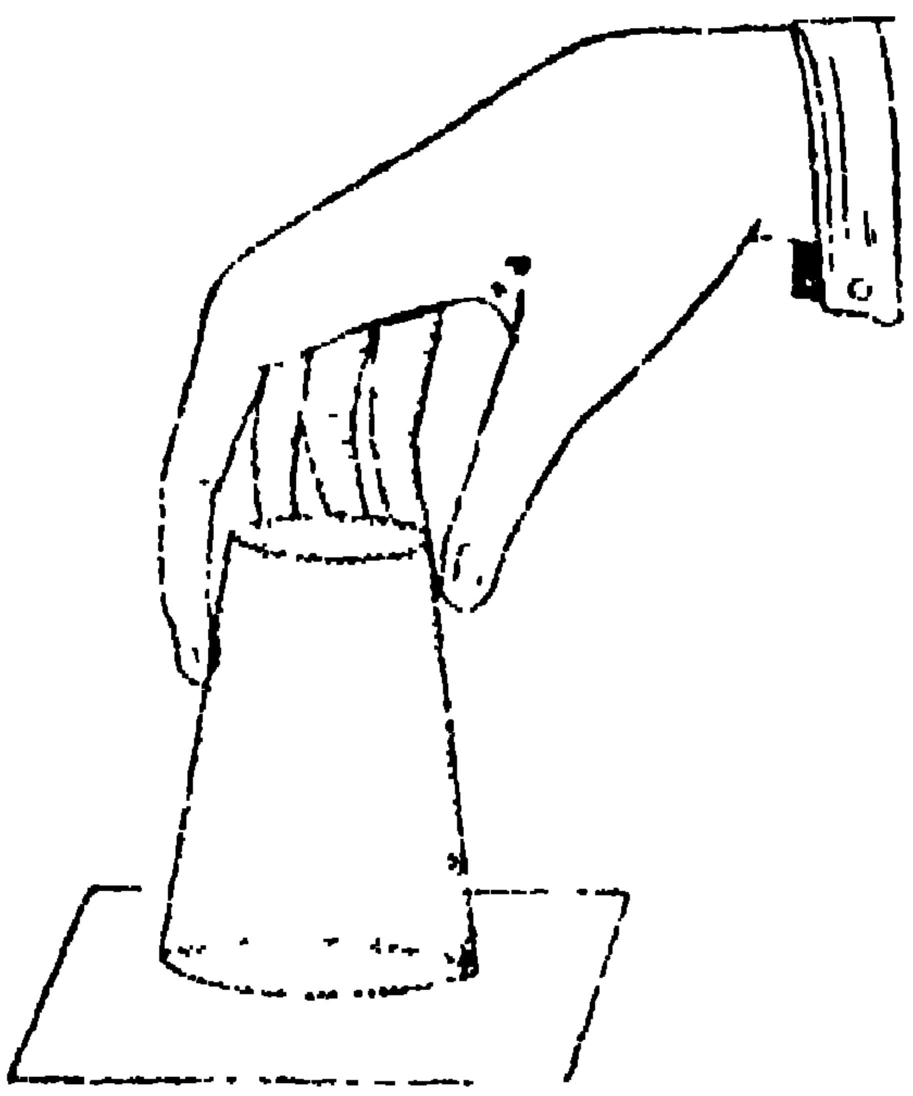

বায়ুর ঊর্দ্ধচাপের জন্য উপুড় করিলেও পড়িতেছে না

৩। **বায়ুর সর্ব্বদিকের চাপ** (Pressure in all directions)—মাগডিবার্গ (Magdeburgh) অর্দ্ধগোলক বলিয়া এক যন্ত্র আছে। উহা দ্বারা বায়ুর চাপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। যন্ত্রটি গোল

১৩। মাগডিবার্গ অর্দ্ধগোলক লইয়া গ্যেরিকের পরীক্ষা

পানের ডিবার মত, দুই ভাগে বিভক্ত, আঁটিয়া দিলে কোথাও ফাঁক

থাকে না। এক স্থানে একটি ছিদ্র আছে। দুই গোলার্দ্ধে হাতল লাগান আছে। হাতল ধরিয়া টানিলে সহজেই খুলিয়া আসিবে। এখন পাম্প লাগাইয়া ছিদ্রপথে সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া লইয়া ছিদ্র বন্ধ করিয়া দাও। তারপর হাতল ধরিয়া দুই জনে পূরা জোরে টানাটানি কর। কিছুতেই খুলিবে না। কেন না, বাহিরের বায়ুর চাপ দুইজনের সমবেত শক্তি অপেক্ষাও অনেক বেশী। এইবার ছিদ্র খুলিয়া দাও। ভিতরে বায়ু প্রবেশ করুক; দেখিবে গোলার্দ্ধ দুইটি আগের মত সহজেই খুলিয়া আসিবে। কেন না, এখন ভিতরে ও বাহিরে দুই দিকেই বায়ুর চাপ। এই পরীক্ষাটি গ্যেরিকে (Guericke) করিয়াছিলেন।

১৪। গ্যেরিকে

বায়ুর চাপের পরিমাণ—পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রতি বর্গ-ইঞ্চি (এক ইঞ্চি লম্বা এক ইঞ্চি চওড়া) স্থানের উপর বায়ুর চাপ প্রায় সাড়ে সাত সের। মানুষ বিশ ত্রিশ ফুট জলের নীচে ডুব দিলে তার কষ্ট বোধ হয়, জলের ভার যেন তাহাকে চাপিয়া ধরে। কিন্তু সমুদ্রের গভীর জলে শত শত ফুট নীচে কত মৎস্যাদি প্রাণী অবাধে বিচরণ করিতেছে। ঐ সমস্ত মৎস্যের দেহ গভীর জলের ভীষণ চাপ সহ্য করিবার মত করিয়া গঠিত। গভীর জলের কোন মাছ ডাঙ্গায় তুলিলে তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া মরিয়া যায়। কেন না, তাহারা এত বেশী চাপে বাস করিতে অভ্যস্ত যে বায়ুর চাপ কমিলে তাহাদের দেহ ফুলিয়া উঠিতে বাধ্য। উপর আকাশে বায়ু অনেক পাতলা ও তাহার চাপও অনেক কম। সেইজন্য বহু উর্দ্ধে উঠিলে কম চাপে মানুষেরও গা ফাটিয়া রক্ত পড়ে। মনে

রাখিও যে বায়ুর চাপ আমাদের দেহের উপর চতুর্দ্দিক হইতে পড়িতেছে। আমাদের দেহগহ্বরেও যথেষ্ট বায়ু আছে। অতএব বাহিরেও চাপ, ভিতরেও চাপ। এইসব কারণে আমরা বায়ুর চাপ বুঝিতে পারি না।

দুই মুখ খোলা নল জলে ডুবাইলে, বাহিরে যতটা জল ভিতরেও ঠিক ততটা জল উঠিবে। এখন যদি নলের বাহিরের মুখে মুখ লাগাইয়া শোষণ কর ত জল উঠিয়া তোমার মুখের মধ্যে আসিবে। মুখ দিয়া নলমধ্যস্থ বায়ু শুষিয়া লইলে তাহাতে বাহিরের বায়ুর চাপে জল তোমার মুখ অবধি উঠিয়া আসিল। হাতের কোন মাংসল জায়গায় মুখ লাগাইয়া যদি শোষণ করিয়া বায়ু সরাইয়া দাও, দেখিবে যে সেখানটা ফুলিয়া উঠিবে। বেশীক্ষণ শোষণ করিলে রক্ত বাহির হইবে।

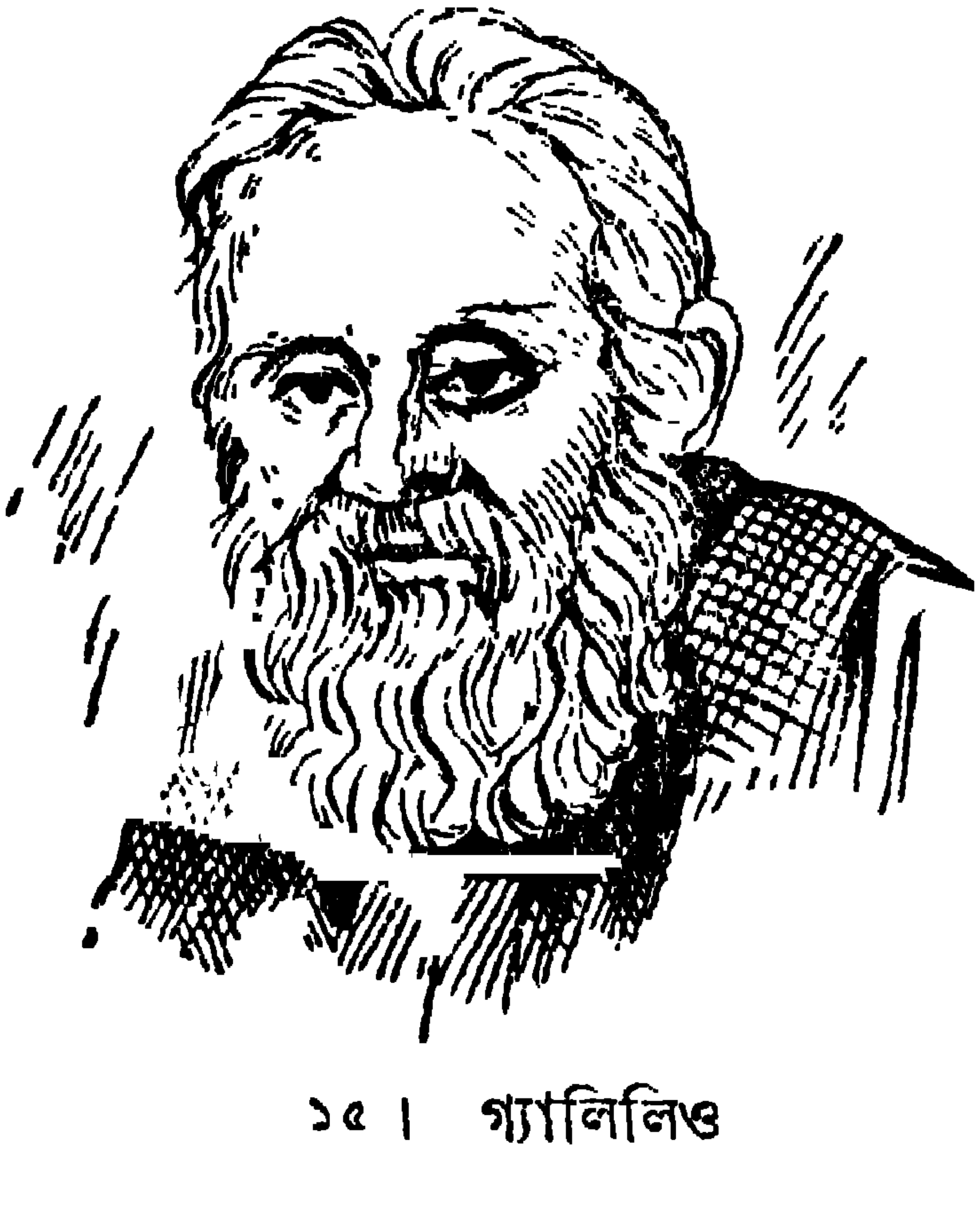
১৫। গ্যালিলিও

বায়ুর চাপ সম্বন্ধে গ্যালিলিওর পর্য্যবেক্ষণ—গ্যালিলিও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে পাম্প লাগাইয়া জল তুলিতে চেষ্টা করিলে জল চৌত্রিশ ফুটের উপর কিছুতেই উঠে না। গ্যালিলিও ইহার কারণ স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে সেই কারণ নির্ণীত হইয়াছে। বায়ুর চাপের অর্থ আমাদের মাথার উপর পঁচিশ ক্রোশ পুরু বায়ুমণ্ডলের ভার। এক বর্গ-ইঞ্চির উপর সেই ভার সাড়ে সাত সের। তাহা হইলে এক বর্গ-ইঞ্চির উপর যতটা উঁচু জল সাড়ে সাত সের ওজনের হইবে ততটা জলকেই বায়ুর চাপ ধরিয়া রাখিতে পারিবে, তাহার বেশী নহে।

বায়ুর চাপ সম্বন্ধে টরিসেলির আবিষ্কার—গ্যালিলিওর শিষ্য টরিসেলি (Torricelli) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, পাম্পের দ্বারা চৌত্রিশ ফুট জল উঠিবে বলিয়া সব তরল পদার্থ কিন্তু চৌত্রিশ ফুট উঠিবে না। কতটা উঠিবে নির্ভর করিতেছে সেই পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর। পারদের ওজন জলের সাড়ে তের গুণ। পারদ উঠিবে মাত্র ত্রিশ ইঞ্চি। এই তথ্য হইতেই সৃষ্টি হইল চাপমান্ যন্ত্র।

চাপমান যন্ত্র (Barometer)—একমুখবন্ধ বত্রিশ ইঞ্চি লম্বা একটা কাচের নল পারা দিয়া ভরিয়া ফেল। তারপর খোলা মুখটা আঙ্গুল দ্বারা বন্ধ করিয়া একপাত্র পারার ভিতরে উল্টাইয়া দাও। আঙ্গুল সরাইয়া লইলে দেখিবে যে খানিক পারা নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু কম-বেশী ত্রিশ ইঞ্চি পারা নলের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাত্রের উপর যে পঁচিশ ক্রোশ বায়ুমণ্ডলের চাপ পড়িতেছে, সেই চাপই পাত্রস্থ পারদের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধদিকে পরিচালিত হইয়া নলমধ্যে ত্রিশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের পারদ-স্তম্ভ তুলিয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং ঐ পারদ-স্তম্ভের ওজন বাতাসের চাপের সমান। ইহাই হইল টরিসেলির আদি চাপমান যন্ত্র বা ব্যারমিটার।

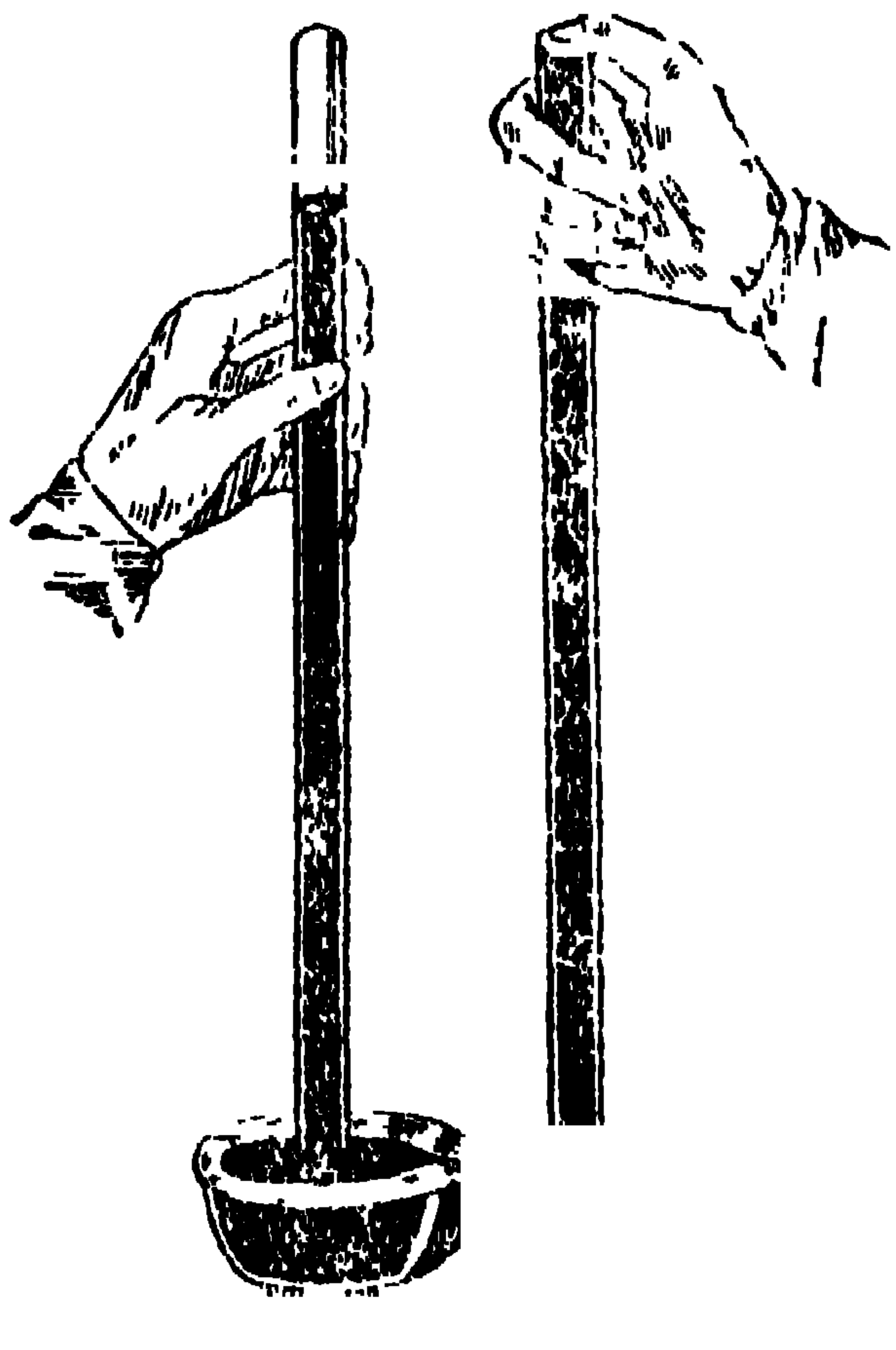

১৬। ব্যারমিটার

ব্যারমিটারের ব্যবহার (Uses of a barometer) —**বায়ু-চাপের পরিমাপের জন্য ব্যারমিটার ব্যবহৃত হয়।** বায়ুর চাপ প্রধানতঃ দুই কারণে কম-বেশী হয়। (১) প্রথম কারণ স্থানের

উচ্চতা। যত উপরে যাইবে, বায়ু স্বভাবতঃ তত হালকা হইবে, তাহার চাপ তত কমিবে। সুতরাং বায়ুর চাপ কলিকাতা অপেক্ষা দার্জ্জিলিংয়ে কম, দার্জ্জিলিং অপেক্ষা তিব্বতে আরও কম। যত উচ্চে যাইবে, ব্যারমিটারের পারাও তত নামিবে। অতএব পারার স্তম্ভের উচ্চতা দেখিয়া পৃথিবীর যে কোন স্থানের উচ্চতা নির্দ্ধারণ করা যায়। উড়োজাহাজ চালাইতে হইলে উচ্চতার নির্দ্ধারণ একান্ত আবশ্যক এবং ব্যারমিটার সাহায্যেই উচ্চতা নির্ণীত হয়।

(২) দ্বিতীয় কারণ এই ;—বায়ু নানা উপাদানে গঠিত, জলীয় বাষ্প তাহার অন্যতম। এই বাষ্প অপেক্ষাকৃত হালকা জিনিস। ইহার ভাগ বৃদ্ধি পাইলে বায়ুর গুরুত্ব সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়। ভার কমিলেই চাপ কমিল। চাপ কমিলেই আর ত্রিশ ইঞ্চি পারার স্তম্ভকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না; ব্যারমিটারে পারা নামিয়া যাইবে। গরম বাতাসে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে। গরম বাতাসের চাপ কম। শীতল বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকে। উহার চাপ বেশী। এক দিন কলিকাতার আবহাওয়া অফিসে ব্যারমিটার দ্রুত নামিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আবহাওয়া অফিসের অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ দ্রুত বাড়িতেছে। অর্থাৎ শীঘ্রই ঝড় তুফানের সম্ভাবনা। তিনি বন্দরে বন্দরে তার করিয়া খবর দিলেন। জাহাজে কাপ্তেনের নিকটেই ব্যারমিটার থাকে। সেই যন্ত্র দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারেন কখন বিপদের আশঙ্কা আছে।

বায়বীয় পদার্থের চাপ ও আয়তনের পরস্পর সম্বন্ধ (Relation between pressure and volume of a gas)—কোন বায়বীয় পদার্থের উপর চাপ পড়িলে আয়তন কমিয়া যায়। এই কারণেই আকাশের বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরগুলি উপরের স্তরের বায়ুর তুলনায় ঘনতর হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক বয়েলের আবিষ্কৃত নিয়ম বা সূত্র (Boyle's law)—তাপের কোন কম-বেশী না করিয়া কোন স্থানে আবদ্ধ বায়ুর উপর চাপ যত বাড়ান যায় তাহার আয়তন সেই অনুপাতে কমিয়া যায়। চাপ যদি দ্বিগুণ কর তবে আয়তন অর্দ্ধেক হইবে, চাপ যদি অর্দ্ধেক কর ত আয়তন দ্বিগুণ হইবে।

জল ও বায়ু সংক্রান্ত দুইটি যন্ত্র—পাম্প বা শোষক যন্ত্রটি মোটামুটি পিচকারী জাতীয়।

১। **পাম্প** (pump)—ইহার প্রধান ভাগ দুইটি। একটি পিচকারীর মত **চোঙা** (cylinder) ও দ্বিতীয়টি তাহার মধ্যে উপর নীচে চালাইবার একটি **ডাঁটি** (piston) ; জল ভিতরে আসিবার একটি

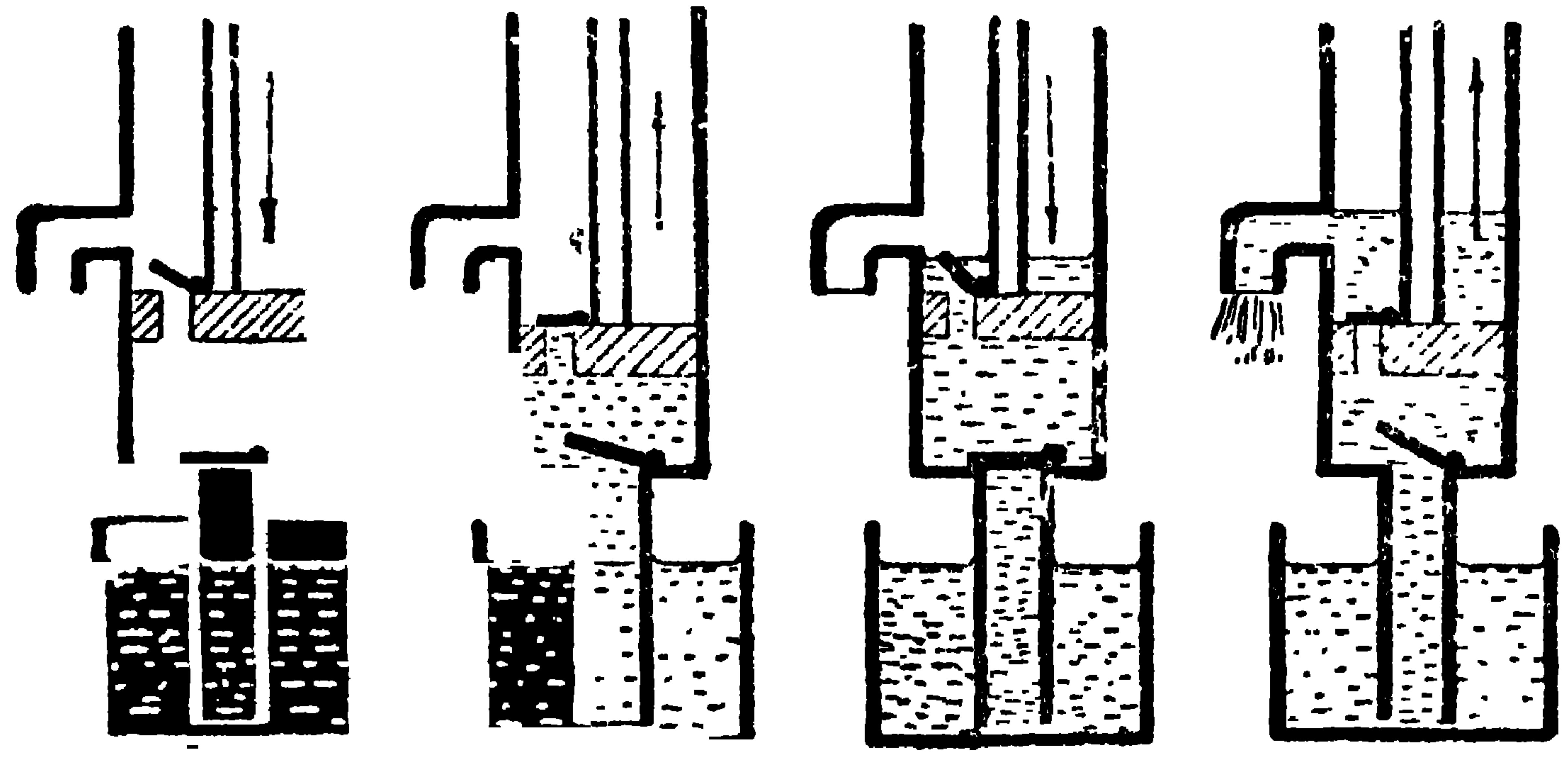

১৭। পাম্প

পথ আছে পিচকারীর মুখের মত। জল বাহির হইবার আর একটি পথ আছে উপর দিকে। ডাঁটির মাথায় ও চোঙার উপর একটি করিয়া **কপাট** বা **ঢাকন** (valve) আছে ; তাহা কেবল উপরের দিকে খোলে, নীচের দিকে খোলে না। ডাঁটি টানিলে বাহিরের বায়ুর চাপে নীচের ছিদ্র দিয়া জল উঠিয়া আসিবে। ডাঁটি ঠেলিলে তাহার মাথার ঢাকন খুলিয়া যাইবে,

জল চোঙার উপরিভাগে চলিয়া যাইবে। আবার ডাঁটি টানিলে উপরের জলটা উপরের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, নীচের ছিদ্র দিয়া নূতন জল উঠিয়া আসিবে। তখন ডাঁটির মাথার ঢাকন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অনবরত ডাঁটি উপর নীচে চলিবে, আর জল নীচের ছিদ্র, ডাঁটির মাথার ঢাকন ও উপরের ছিদ্র দিয়া আসিয়া অবশেষে বাহির হইতে থাকিবে।

২। **সাইফন** (siphon)—ইহার মধ্যে ডাঁটি (piston) নাই, শুধু একটি নল, ইংরেজী U অক্ষরের আকারের মত, কিন্তু অসমান বাহুবিশিষ্ট। নলের যে মুখ দিয়া হয় খানিকটা জল ভিতরে ঢাল। দেখিবে যে নলের দুই বাহুতে বা শাখাতে জল সর্ব্বদা সমান থাকিবে, নলের দুই মুখেই বায়ুর চাপ সমান, সুতরাং জল সমান থাকিতেই হইবে। ছোট বাহুর মুখ বন্ধ করিয়া জল ঢালিতে ঢালিতে নলের দুই দিকের কাণা পর্য্যন্ত ভরিয়া ফেল। তারপর দুই মুখ আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিয়া নলটিকে উল্টাও। উল্টাইয়া এক মুখ এক গেলাস জলের মধ্যে ডুবাইয়া আঙ্গুল সরাইয়া লও। পরে দ্বিতীয় মুখের আঙ্গুল সরাও। দেখিবে যে দ্বিতীয় মুখ দিয়া জল বাহির হইতে থাকিবে যতক্ষণ না গেলাস খালি হইয়া যায়। এইভাবে সহজেই উপর হইতে নীচে তরল পদার্থ স্থানান্তরিত করা যায়। ছোট শাখাটি সর্ব্বদা উপরের পাত্রে রাখিতে হয়। সাইফন দ্বারা কখনই নীচ হইতে উপরে অথবা একই উচ্চতায় জল পাত্রান্তর করা যায় না।

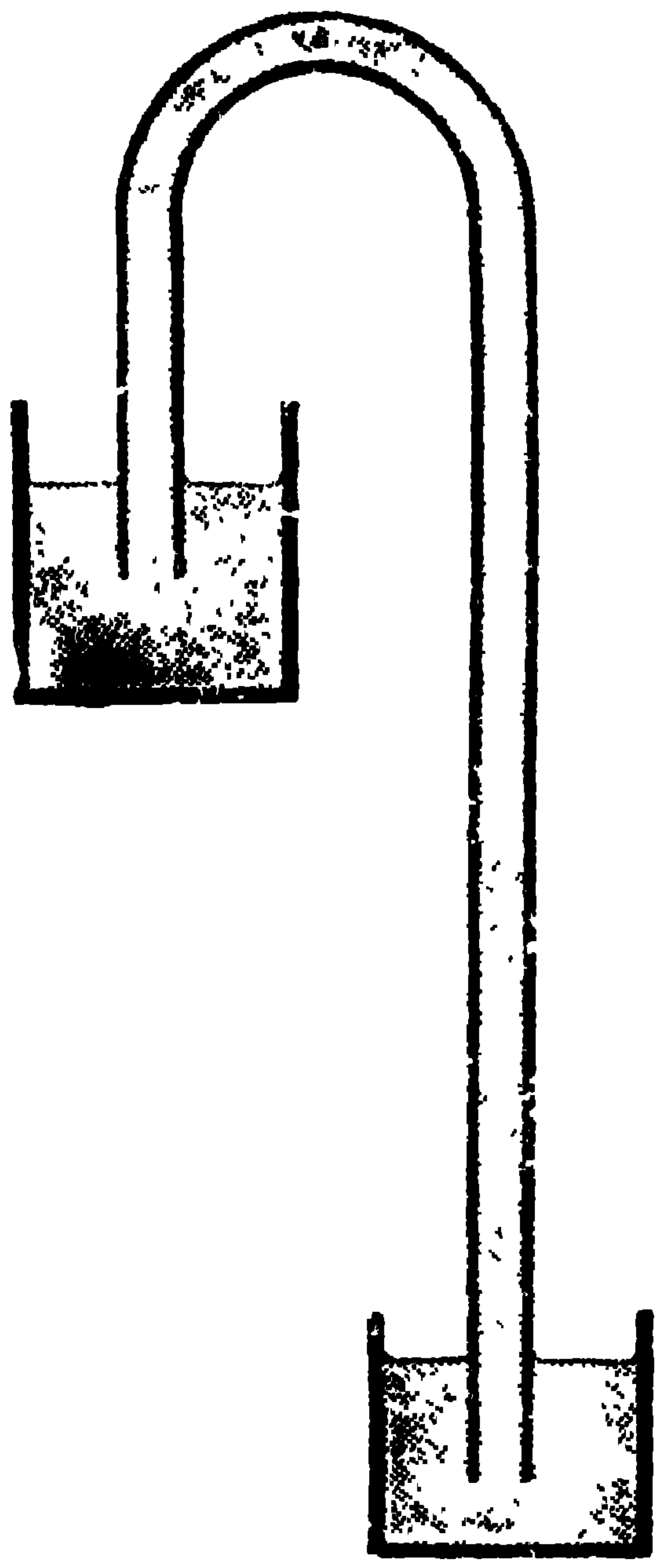

১৮। সাইফন

Questions

1. State the physical properties of air. How would you show that air exerts pressure (a) downwards, (b) upwards and (c) in all directions?
2. Describe the experiment of Torricelli regarding the pressure of air.
3. What is the utility of a barometer?
4. Explain the principles of the air-pump and the siphon.
5. How can you predict a cyclone with the help of a barometer? (C. U. 1944) X

দ্বিতীয় অধ্যায়

শক্তি (Energy)

গতিশক্তি ও স্থৈতিক শক্তি (Kinetic and Potential energy)—শক্তি বলিলে কার্য্য করিবার ক্ষমতা বুঝায়। ক্রিয়াতেই শক্তির প্রকাশ। পদার্থ শক্তির বাহন। একটি ঢিল ছুড়িলে, সেই ঢিল গিয়া দেয়ালে লাগিল। তোমার শক্তি আছে বলিয়া ঢিল ছুড়িতে পারিলে। ঢিল তোমার নিকট হইতে শক্তি পাইয়া দেয়ালকে আঘাত করিল। ঢিলের এই শক্তি গতিমূলক। তোমার দেহের পেশী কুঞ্চিত করিয়া তুমি সেই **গতিশক্তি** (kinetic energy) ঢিলটিকে দিয়াছ। ঢিল দেয়ালে লাগিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার যে শক্তি ছিল তাহা কি নষ্ট হইয়া গেল? নষ্ট হইয়া যায় নাই; কেন না শক্তির ধ্বংস নাই। যেখানে দেয়ালে লাগিয়াছিল বা যেখানে মাটিতে পড়িল, সেখানে দুই বস্তুর পরস্পর সংঘাতে তাপ উৎপন্ন হইয়াছিল। গতিমূলক শক্তি তাপে পরিণত হইয়াছে। ছাদের আলিসার উপর একখানা ইট আছে। ইটখানা যতক্ষণ আলিসার উপর আছে কোনও অনিষ্ট করিতেছে না। কিন্তু গড়াইয়া পড়িলেই বিপদ। নীচে ফুলগাছ থাকে ফুলগাছ ভাঙ্গিবে,

মানুষ থাকে মানুষের মাথা ফাটিবে। যখন ছাদের উপর ছিল তখন উচ্চে অবস্থানের জন্য ইহার ভিতরে একটা শক্তি নিহিত ছিল। যখন ইটখানা ছাদের উপর তুলিয়াছিলে তখন তুমিই তাহাকে এই শক্তি দিয়াছিলে। ছাদস্থ ইটখানির যে শক্তি, তাহাকে **স্থৈতিক শক্তি** (potential energy) কহে। ভূমিতল হইতে যত উপরে কোন পদার্থ তুলিয়া রাখিবে তাহার স্থৈতিক শক্তি ততই বেশী হইবে। ইটখানা নীচে পড়িবার সময় তাহার যে শক্তি প্রকাশ হইবে তাহার নাম গতিশক্তি। ইট যত নীচে আসিবে ততই তাহার স্থৈতিক শক্তি কমিতে ও গতিশক্তি সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকিবে। বস্তুতঃ **মোট শক্তি বাড়েও না, কমেও না।** ইহা নিত্য। কেবল এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে পরিচালিত হইতে বা **রূপান্তরিত হইতে পারে মাত্র।**

শক্তির প্রকারভেদ (Different forms of energy)

পদার্থের নানাপ্রকার শক্তি থাকিতে পারে। (১) **যান্ত্রিক শক্তি**— যথা, স্থৈতিক শক্তি, গতিশক্তি ইত্যাদি; (২) **রাসায়নিক শক্তি**— ইহার ফলে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে। যথা, জলমিশ্রিত গন্ধক দ্রাবক (sulphuric acid)-এ এক টুকরা দস্তা ফেলিয়া দাও হাইড্রোজেন বাষ্প বুড় বুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিবে, দস্তাটুকু জিঙ্ক সালফেট (zinc sulphate) নামক পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে এবং উত্তাপের সৃষ্টি করিবে। (৩) **তাপ,** (৪) **আলোক,** (৫) **শব্দ,** (৬) **বৈদ্যুতিক** ও (৭) **চৌম্বক শক্তি।**

শক্তির রূপান্তর (Transformation of energy)

শক্তির ধ্বংস নাই, নূতন সৃষ্টি নাই। ইহা চিরন্তন, অনন্ত রূপবিশিষ্ট। একপ্রকার শক্তি অন্যপ্রকার শক্তিতে পরিণত হইতে পারে।

শক্তির রূপান্তর পরীক্ষা (Experiments on transformation of energy)—(১) একটা গালার কাঠি লইয়া তাহাকে ফ্লানেল দিয়া ঘষ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। তাহার ফলে সেই গালা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাগজের কুচি আকৃষ্ট করিতে পারিবে।

(২) দেশলাই-এর বাক্সের উপর দেশলাই-কাঠি ঘষিলে জ্বলিয়া উঠে। এখানে দেশলাই-এর কাঠির গতিশক্তি উত্তাপ উৎপন্ন করিল ও তাহার মাথার মশলা রাসায়নিক শক্তির জন্য জ্বলিয়া উঠিল।

(৩) ঘড়ি যে চলে তাহা দম দাও বলিয়া। দম দিবার সময় ঘড়ির মধ্যের স্প্রিংটিকে তুমি জড়াইতেছ, পরে, স্থিতিস্থাপকতা গুণে স্প্রিংটি খুলিতে থাকে বলিয়া ঘড়ি চলে।

(৪) ছাদ হইতে ইট ভূমিতলে পড়িলে দুই পদার্থের সংঘাতে উত্তাপের সৃষ্টি হইবে আওয়াজও শুনা যাইবে। এখানে গতিমূলক বাহ্যশক্তি তাপ ও শব্দে পরিণত হইল।

(৫) গতিশক্তিকে যেমন তাপে পরিণত করা যায়, তেমনি তাপকেও আমরা নিয়ত গতিতে পরিণত করি। এঞ্জিনে কয়লা পোড়াইয়া রেল, পেট্রোল পোড়াইয়া মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেন চালাইতেছি।

(৬) তাপকে আলোতে পরিণত করা নিত্য দেখিতেছ। এক খণ্ড লোহাকে আগুনের মধ্যে রাখিলে তপ্ত হইয়া উঠে। বেশী তপ্ত হইলে আলোক বিকীর্ণ করে। ইলেকট্রিক কোম্পানী যে **বিদ্যুৎপ্রবাহ** (electric current) ঘরে ঘরে সরবরাহ করিতেছে তাহা এঞ্জিন চালাইয়া উৎপন্ন করা হয়। অর্থাৎ, এঞ্জিনের গতিশক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হয়। মোটর গাড়ীতে যে ব্যাটারি থাকে তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে ও প্রয়োজনমত জোগায়।

শক্তির মূল উৎস—এই পৃথিবী এক দিন সূর্য্যের শক্তি লইয়া সূর্য্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। সূর্য্যের আলোক ও তাপই পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা সন্তানবহুলা করিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যের আলোক ও তাপ আজ বন্ধ হইয়া যায় ত বসুন্ধরাতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী কতক্ষণ থাকিবে?

পদার্থ ও শক্তির তুলনা :

পদার্থ	শক্তি
১। ওজন আছে।	১। ওজন নাই।
২। বিস্তৃতি আছে।	২। বিস্তৃতি নাই।
৩। অভেদ্যতা আছে।	৩। অভেদ্যতা নাই।
৪। পদার্থ তিন প্রকার :	৪। শক্তি সাত প্রকার :
(ক) কঠিন—আকার আছে	(ক) বাহ্য শক্তি
(খ) তরল—আকার নাই	(খ) রাসায়নিক শক্তি
(গ) বায়বীয়—আকার নাই	(গ) তাপ শক্তি
	(ঘ) আলোক শক্তি
	(ঙ) শব্দ শক্তি
	(চ) বৈদ্যুতিক শক্তি
	(ছ) চৌম্বক শক্তি
৫। রূপান্তর হয়।	৫। রূপান্তর হয়।
৬। ধ্বংস নাই।	৬। ধ্বংস নাই।

Questions

1. What are the different forms of energy?
2. Why is it that a boat is rowed more easily with the current than against it?
3. Explain the different types of transformation of energy which takes place when a ball is thrown downwards?
4. Where does a river get its energy from? Explain the different kinds of transformation of energy in this case.
5. You light a match. What are the transformations of energy that take place. (C. U. 1943) X
6. Write an essay on the transformation of energy. (T. T. 1938, 1940)

তৃতীয় অধ্যায়

তাপ (Heat)

তাপের উৎস ও পদার্থের উপর তাপের প্রভাব

গরম ও ঠাণ্ডা—এ দুইটি কথাই আপেক্ষিক। বরফকে আমরা ঠাণ্ডা বলি, কিন্তু **জমাট অঙ্গারাম্লবাষ্প** (dry ice), বরফ অপেক্ষা অনেক বেশী ঠাণ্ডা। কলিকাতার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রকে ভীষণ গরম বলি। কিন্তু সিন্ধু কি বিকানীরের মরুপ্রদেশ হইতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় আসিলে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইবে।

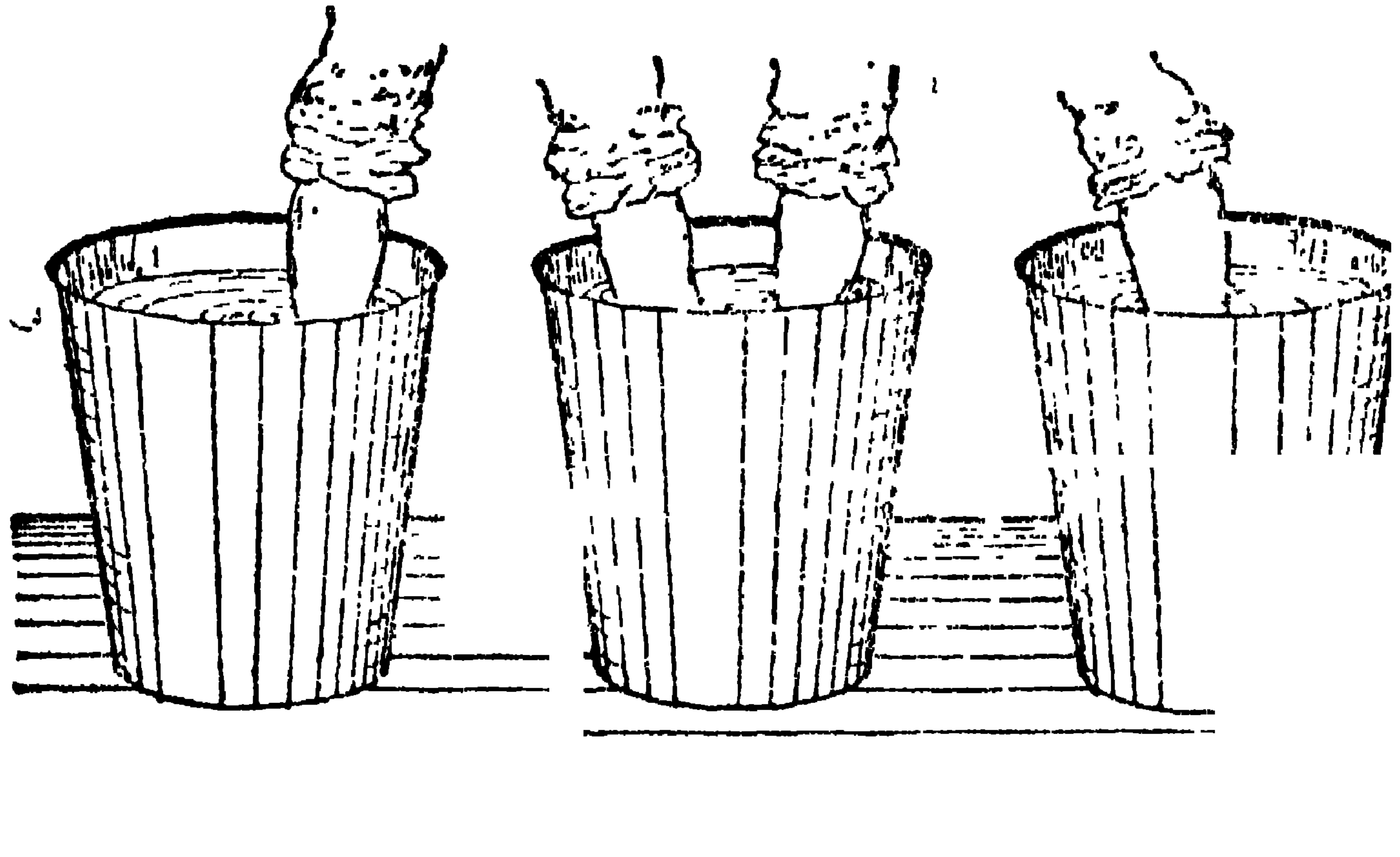

গরম জল　　　ঈষদুষ্ণ জল　　　ঠাণ্ডা জল

১৯। উষ্ণতা পরীক্ষা

পদার্থ মাত্রেরই উত্তাপ আছে, যত কমই হউক। আমাদের দেহের উষ্ণতা ৯৮·৪° ডিগ্রী। যে পদার্থের ইহা অপেক্ষা উষ্ণতা অধিক তাহা স্পর্শ করিলে গরম বোধ হইবে; উষ্ণতা কম হইলে ঠাণ্ডা মনে হইবে।

অঙ্গুলির দ্বারা গরম জিনিস ছুঁইলে তাহার উত্তাপ খানিকটা অঙ্গুলিতে আসে, সেজন্য গরম মনে হয়। ঠাণ্ডা জিনিস স্পর্শ করিলে অঙ্গুলির উত্তাপ খানিকটা বাহির হইয়া সেই জিনিসে যায়, সেজন্য ঠাণ্ডা মনে হয়। কাহারও জ্বর হইলে সাধারণতঃ গায়ে হাত দিয়া অনুভব করি গা ঠাণ্ডা অথবা গরম। কিন্তু আমাদের ত্বকের সাক্ষ্য সকল সময় বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ, পাশাপাশি তিনটি বালতি রাখিয়া প্রথম বালতিতে গরম ও তৃতীয় বালতিতে ঠাণ্ডা জল রাখ। দ্বিতীয় বালতিতে ঈষদুষ্ণ জল রাখ। এখন প্রথম বালতিতে বাম হস্ত ও তৃতীয় বালতিতে দক্ষিণ হস্ত কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া দুই হাতই পরে দ্বিতীয় বালতিতে ডুবাইলে দেখিবে বালতির জল বাম হস্তে ঠাণ্ডা আর দক্ষিণ হস্তে গরম বোধ হইতেছে।

তাপের উৎস (Sources of heat)—তাপের (১) প্রধান ও মূল উৎস সূর্য্য। সূর্য্য হইতেই আমরা মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ সমস্ত তাপ সংগ্রহ করি। তাপের (২) দ্বিতীয় উৎস ভূগর্ভ; (৩) তৃতীয়, দহনাদি রাসায়নিক ক্রিয়া; (৪) চতুর্থ, বিদ্যুৎ; (৫) পঞ্চম, ঘর্ষণাদি বাহ্যিক ক্রিয়া।

তাপ প্রয়োগের ফল—(১) **পদার্থ গরম হয়।** তাপ বাহির করিয়া লইলেই পদার্থ ঠাণ্ডা হয়।

(২) **অবস্থা পরিবর্ত্তন।** সীসক, মোম, দস্তা ও বরফ, ইহার যেটিকেই গরম কর গলিয়া যাইবে; অর্থাৎ কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তেমনই জল, স্পিরিট, পারদ ইত্যাদি তরল পদার্থ গরম করিলে ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হইবে।

(৩) **বাহ্য গুণের পরিবর্ত্তন।** একখণ্ড দণ্ড-চুম্বক লইয়া খুব গরম কর, ঠাণ্ডা হইলে দেখিবে উহার চৌম্বক-শক্তি লুপ্ত হইয়াছে।

(৪) **আয়তনের পরিবর্ত্তন।** গরম করিলে পদার্থের 'আয়তন বাড়ে, ঠাণ্ডা করিলে কমে।

(৫) **রাসায়নিক পরিবর্ত্তন।** তাপ প্রয়োগের ফলে কঠিন পদার্থ সব সময়ে যে গলিয়া যায় তাহা নহে। কাষ্ঠখণ্ডের উপর তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা গলিবে না। ক্রমশঃ পুড়িতে থাকিবে অর্থাৎ বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া নূতন পদার্থ উৎপন্ন করিবে।

তাপ ও ওজন—পদার্থকে যতই তাতাও না কেন, তাহার ওজনের কোন তফাৎ হইবে না। ওজন ঠিক রহিল, আয়তন বাড়িল, পদার্থ-কণা আগে যত ঘন-সন্নিবিষ্ট ছিল গরম করার পর, কণাগুলি আরও ফাঁক ফাঁক হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ঘনত্ব কমিয়া গিয়াছে।

কঠিন পদাথের উপর তাপের প্রভাব
(Effect of heat on solid bodies)

তাপ প্রয়োগে আয়তন বাড়ে ও ঠাণ্ডা করিলে কমে, তাহা কঠিনপদার্থে খালি চোখে দেখান শক্ত। ইহার সত্যতা প্রমাণ করা যায় এইভাবে :—

(১) একটি আংটি ও একটি পিতলের গোলক লও। তাহাদের মাপ এইরূপ হইবে যে গোলকটি আংটির মধ্য দিয়া ঠিক গলিয়া যাইতে পারে। এখন গোলকটিকে গরম কর, উহা আংটির ভিতর ঢুকিবে না। ঠাণ্ডা হইলে সহজেই আবার গলিয়া যাইবে।

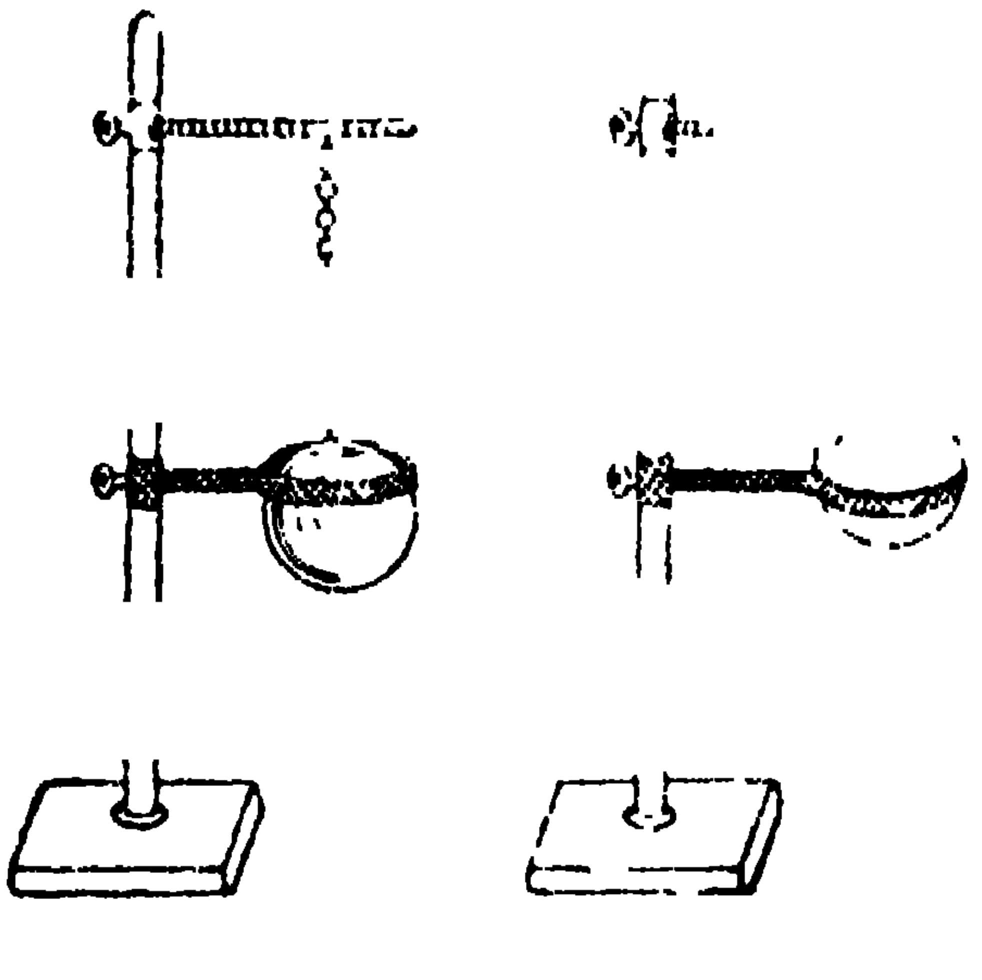
২০। তাপপ্রয়োগের ফল

(২) গরুর গাড়ীর চাকার উপর লোহার হাল (টায়ার) পরান থাকে। উহাকে খুব গরম করিয়া চাকার উপর লাগাইয়া জল ঢালা হয়। ঠাণ্ডা হইলেই উহা চাকাকে একেবারে কামড়াইয়া ধরে।

(৩) লক্ষ্য করিলে দেখিবে, যে লোহার লাইনের উপর দিয়া রেল চলে তাহা এক অবিভক্ত লৌহখণ্ড নহে, মাঝে মাঝে জোড় আছে। এই জোড়গুলিতে ফাঁক রাখা হয়। ফাঁক না রাখিলে রৌদ্রের তাপে, চাকার ঘর্ষণে লাইন গরম হইয়া লম্বা হইবার সময় বাঁকিয়া যাইত। বাঁকা লাইনের উপর দিয়া গাড়ী চলিতে পারিত না।

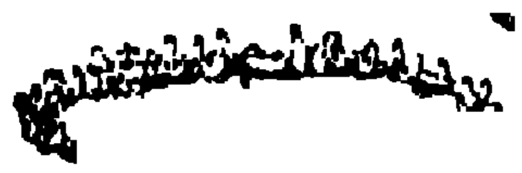

২১। চাকার উপর হাল পরান

জলের উপর তাপের প্রভাব
(Effect of heat on water)

জ্বলন্ত উনানের উপর কেটলিতে জল বসাইলে, জল ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয় এবং এই বাষ্প নল দিয়া বাহির হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। জলের এই অবস্থাকে **স্ফুটন** (boiling) বলে। সঙ্গে সঙ্গে কেটলির জলও কমিতে থাকে। কেটলির নলের একটু দূরে যে ধোঁয়ার মত পদার্থ দেখা যায়, তাহাকে সচরাচর লোকে ভুল করিয়া ষ্টীম কহে, কিন্তু সত্য ষ্টীম নলের ঠিক মুখে অদৃশ্য পদার্থ। নলের মুখের একটু দূরে যে ধোঁয়ার মত পদার্থ দেখা যায় তাহা নলের মুখ হইতে নির্গত অদৃশ্য ষ্টীম ঠাণ্ডায় জমিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হইয়া ধোঁয়ার আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কেটলিতে জল ফুটাইলে কেটলির ঢাকনি উঠানামা করিয়া শব্দ করে। অর্থাৎ তাপ পাইয়া জলীয় বাষ্পের আয়তন বাড়ে ও ঢাকনি

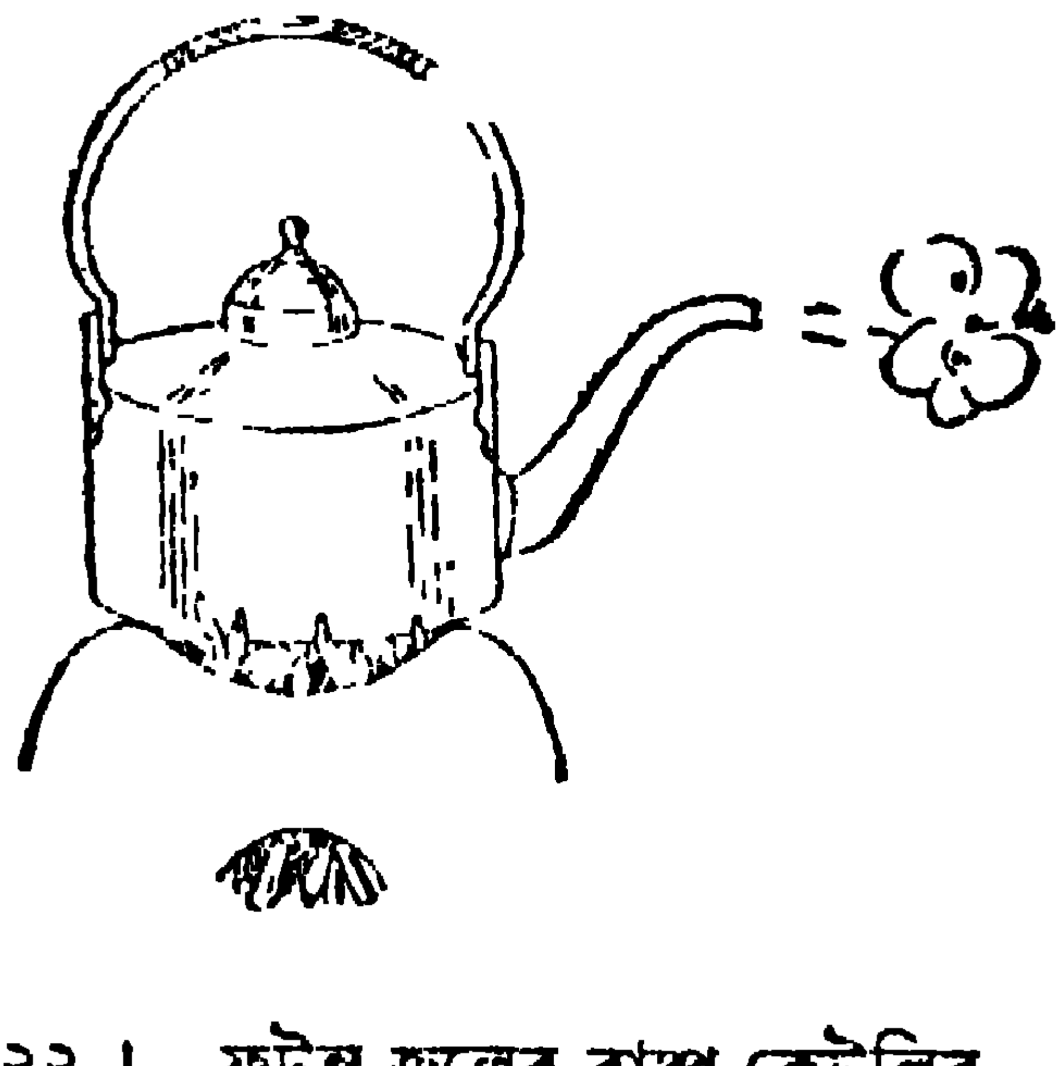

২২। ফুটন্ত জলের বাষ্প কেটলির নলের মুখে অদৃশ্য

উপরে উঠে, আবার কিছু বাষ্প বাহির হইয়া আয়তন কমিয়া যায়, ঢাকনিও নামে। ইহা হইতে ওয়াট্ (Watt) বাষ্পীয় এঞ্জিন আবিষ্কার করেন।

কেবল ফুটন্ত জল হইতেই বাষ্পের সৃষ্টি হয় না। সমুদ্র, নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতির উপরিভাগ হইতে সর্ব্বদা কিছু না কিছু জল বাষ্পে পরিণত হইতেছে। আমরা যে ভিজা কাপড় শুকাই তার অর্থ ভিজা কাপড়ের জলকে বাষ্পে পরিণত করা। ঘরের মেঝে জল দিয়া ধুইলে খানিক পরে একেবারে শুকাইয়া যায় অর্থাৎ মেঝের জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। অতএব জল সর্ব্বসময়ে বাষ্প হইয়া যাইতেছে।

যখন বরফ গলিতে আরম্ভ হইয়াছে তখন তাহার যে উষ্ণতা (temperature), যতই তাপ প্রয়োগ কর, সমস্ত বরফ গলিয়া জল হওয়া পর্য্যন্ত সে উষ্ণতা বিন্দুমাত্র কম বেশী হয় না। বায়ুর সাধারণ চাপে, ফুটন্ত জলের নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রা হইল ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে উহাকে যতই তাপ দেওয়া হউক, যতক্ষণ এক ফোঁটা জল অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ তাহার তাপমাত্রা ১০০° ডিগ্রীই থাকে।

এই দুইটি পরীক্ষা হইতে দেখা যায় যে বস্তুর যখন অবস্থান্তর হইতে থাকে তখন তাহার তাপমাত্রার পরিবর্ত্তন হয় না। তাহার কারণ, তখন সমস্ত তাপই তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে ব্যবহৃত হয়। এই তাপকে **লীন তাপ** (latent heat) বলে। অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে পর, তাপ প্রয়োগে আবার তাপমাত্রার বৃদ্ধি হইবে।

ফুটন্ত জলের সকল অংশ হইতেই বাষ্প উঠে। কিন্তু যখন জল ফুটান হয় না, যেমন নদী পুকুর বা গ্লাসের জল, তখন তাহার উপরিভাগ হইতে বাষ্প জন্মে। এই উপরিভাগ যত বিস্তৃত হয় **বাষ্পীভবনও** (evaporation) তত দ্রুত হইতে থাকে।

বেলে মাটির কুঁজায় জল ঠাণ্ডা হয় কেন ? বেলে মাটির ভিতর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া জল সর্ব্বদাই বাহিরে আসিয়া বায়ুর সংস্পর্শে বাষ্পীভূত হয়। এই অবিরাম বাষ্পীভবন হেতু পাত্রস্থিত জল কেবলই তাপ প্রদান করিতে থাকে, সেজন্য তাপ হারাইয়া জল ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। এই একই কারণে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাওয়া লাগাইলে ঠাণ্ডা বোধ হয়।

বাতাসের আর্দ্রতা (Humidity of air)—বাতাসে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে তাহাই উহার আর্দ্রতা। যখন এই পরিমাণ এমন হয় যে বাতাস আর বেশী জলীয় বাষ্প লইতে অক্ষম তখন উহা তাহার সম্পৃক্ত (saturated) অবস্থা।

রেডিওতে যখন বলে "আজ বাতাসের আর্দ্রতা (relative humidity) শতকরা ৫০।" তাহার অর্থ এই যে, বাতাসে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকা সম্ভব, তাহার শতকরা ৫০ ভাগ জলীয় বাষ্প আছে। গ্রীষ্মকালে বায়ু শুষ্ক থাকে। তখন উহা পরিমাণে বেশী জলীয় বাষ্প লইতে পারে। বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশী থাকে, সে কারণ উহা আর বেশী লইতে পারে না। সেজন্য বর্ষায় ভিজা কাপড় শুকান কঠিন হইয়া পড়ে।

Questions

1. What are the different sources of heat?
2. What are the different effects of heat?
3. Describe an experiment to show the effect of heat on solids. Mention two common examples to illustrate this effect. (C. U. 1944)
4. What is the effect of temperature on the density of water? Explain how the behaviour of water in this regard helps marine animals in the Arctic seas. (C. U. 1941)
5. Why is it difficult to dry a wet piece of cloth in the rainy season? (C. U. 1944)
6. Why do we feel cool in a breeze? (C. U. 1945)

বায়ুর উপর তাপের প্রভাবঃ বায়ু চলাচল
(Effect of heat on air : Ventilation)

বায়ুর উপর তাপের প্রভাব—তাপে বায়বীয় পদার্থের আয়তন কঠিন বা তরল পদার্থ অপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি পায় ও উহার আপেক্ষিক ঘনত্ব কমিয়া যায়।

একটি কাচের ফ্লাস্কের মুখ ছিপি দিয়া বন্ধ আছে ও সেই ছিপিতে ছেদ করিয়া একটি কাচের সরু নল ফ্লাস্কের ভিতর চলিয়া গিয়াছে।

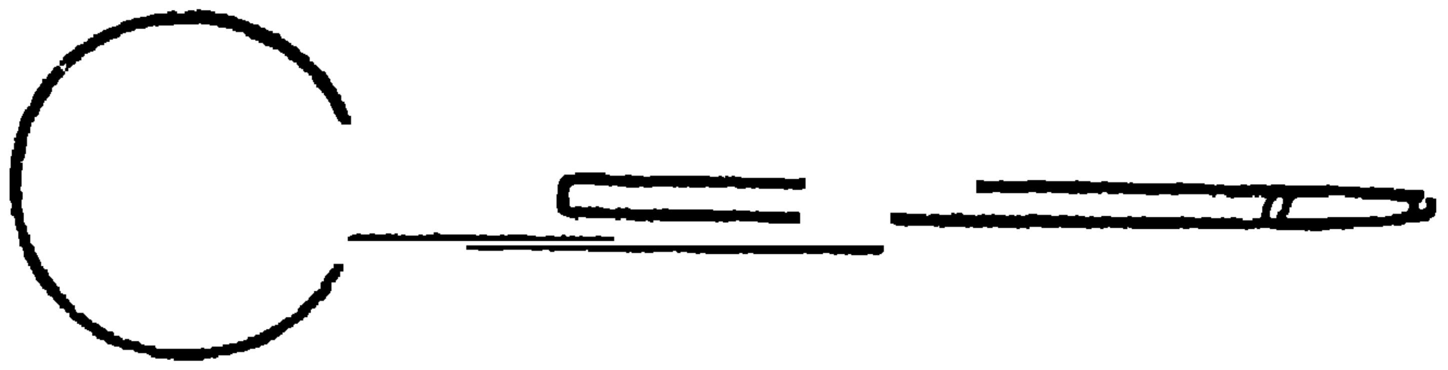

২৩। তাপে বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় কালির ফোঁটা অগ্রসর হইতেছে

এখন এই সরু নলের ভিতর এক ফোঁটা লাল কালি প্রবেশ করাইয়া, ফ্লাস্কটি নাড়িয়া কালি আরও ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দাও। এইবার ফ্লাস্কে তাপ দাও। তাপের ফলে ফ্লাস্কের ভিতরের বায়ু বৃদ্ধি পাইয়া লাল কালির ফোঁটাটিকে অনেকটা নলের বাহিরের মুখের নিকট ঠেলিয়া আনিয়াছে। তাপ বন্ধ কর, ঠাণ্ডা পাইয়া ভিতরের বায়ুর আয়তন কমে, কালির ফোঁটা বাহিরের বায়ুর চাপে নলের আরও ভিতরে চলিয়া যায়।

তাপে বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উহা হাল্কা হইয়া উপরে উঠে। এক পুরাতন প্রবাদ আছে, "আগুন জ্বলে যেখানে, ঝড় বয়ে যায় সেখানে।" জ্বলন্ত আগুন সংলগ্ন বায়ু তাপের প্রভাবে আয়তনে বৃদ্ধি পাইতেছে ও ক্রমাগত হালকা হওয়ার দরুণ উপরে চলিয়া যাইতেছে, আর চতুষ্পার্শ্বের অপেক্ষাকৃত শীতল ও ঘন বায়ু তাহার স্থান লইতেছে।

বায়ু চলাচল (Ventilation)—কোন বন্ধ ঘরের একটি দরজা খোলা রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া বায়ুপ্রবাহ কিরূপ চলিতেছে তাহা একটি সহজ পরীক্ষায় দেখিতে পারিবে। খোলা দ্বারপথে উপর নীচে দুইটি মোমবাতি জ্বালাইয়া দাও। দেখিবে, উপরের শিখাটি বাঁকিয়াছে বাহিরের দিকে, নীচের শিখাটি হেলিয়াছে ভিতরের দিকে। ইহাতে বুঝা যায় যে মেঝের কাছ দিয়া বায়ু প্রকোষ্ঠমধ্যে ঢুকিতেছে, আর উপর দিয়া উষ্ণ হালকা বাতাস প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে। এইজন্যই বন্ধ ঘরের দূষিত বায়ু যাহাতে বাহির হইয়া যায় সেজন্য কড়ির নিকট ছিদ্রপথ (ventilator) রাখা হয়, মেঝের নিকট কখনও থাকে না। ভেণ্টিলেটরকে কাজে লাগাইতে হইলে অন্ততঃ একটি জানালা বা দরজা খোলা রাখা উচিত।

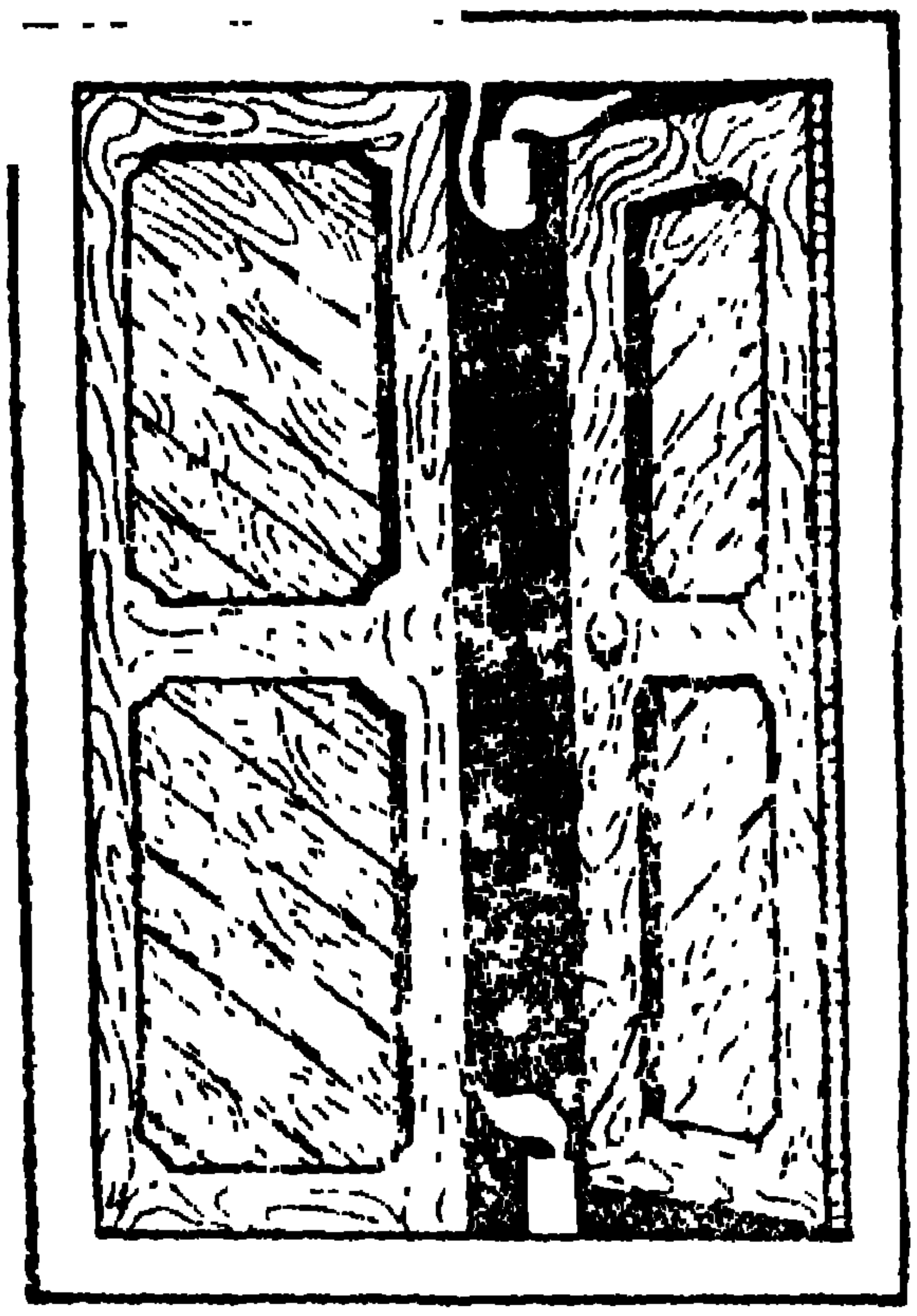

২৪। উপরের শিখাটি বাহিরের দিকে ও নীচেরটি ভিতরের দিকে মুখ করিয়াছে

Questions

1. What are the effects of heat on air?
2. Explain how the ventilation of a room is effected.
3. Illustrate the effects of heat on solid bodies.
4. Explain why there is always a strong wind when a house is on fire.

থার্ম্মোমিটার (Thermometer)

তাপ ও উষ্ণতা (Heat and Temperature)—তাপ এক প্রকার শক্তি, উহার প্রয়োগে পদার্থ গরম হয়। যে জিনিস যত গরম তাহা হইতে অন্য জিনিসে তাপ সঞ্চরণের সম্ভাবনা তত বেশী। কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ কত অধিক গরম, তাহার আপেক্ষিক পরিমাণকে শেষোক্ত পদার্থের উষ্ণতা কহে। এক উত্তপ্ত লৌহখণ্ড হইতে এক বালতি ঈষদুষ্ণ জলে সহজেই তাপের সঞ্চরণ হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক বালতি জলের তাপের পরিমাণ উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের তাপের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

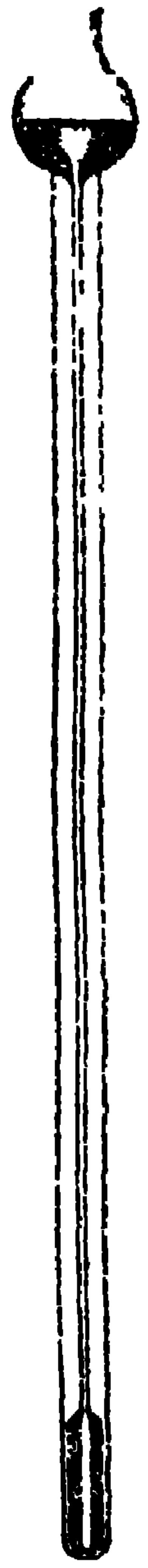

২৫। থার্ম্মোমিটার প্রস্তুতকরণ

উষ্ণতা নির্ণয় করে বলিয়াই **থার্ম্মোমিটারকে** (thermometer) তাপমান যন্ত্র কহে। তাপপ্রয়োগ করিলে তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি হয়, এই তথ্যটি থার্ম্মোমিটার নির্ম্মাণের মূলে নিহিত আছে।

থার্ম্মোমিটার প্রস্তুতকরণ—একটি আগাগোড়া সমান সূক্ষ্মছিদ্র বিশিষ্ট কাচের কৈশিক নল (capillary tube) লইয়া প্রথমে তাহার এক প্রান্ত গলাইয়া একটি বদ্ধ গোলক বা বাল্‌ব (bulb) প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। পরে তাহার খোলা মুখটি পরিষ্কৃত ও শুষ্ক করিয়া খানিকটা বিশুদ্ধ পারদের মধ্যে ডুবান হয়। এখন গোলকটি একটু গরম করিলে নলমধ্যস্থ বায়ু আয়তনে বাড়ে, ও তাহার খানিকটা নলমুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। পরে

গোলকটিকে ঠাণ্ডা করিলে [illegible] সঙ্কুচিত হয়, ও তাহার ফলে কিছু পারা নলের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন নলটিকে তুলিয়া উল্টাইলে সেই পারাটুকু গোলকের মধ্যে চলিয়া যায়। এই ভাবে কয়েকবার চেষ্টা করিলে প্রয়োজন মত পারা নলের মধ্যে ঢুকিয়া যাইবে। যন্ত্রের ভিতর এতটা পারার আবশ্যক যে গোলকটি সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া নলের মধ্যে কিছুদূর অবধি উঠে। ইহার পর গোলকের মধ্যের পারাকে গরম করিয়া ফুটাইতে হইবে। তাহা হইলে নলের রন্ধ্রে যত বাতাস আছে, সব বাহির হইয়া যাইবে ও রন্ধ্রপথ পারদবাষ্পে ভরিয়া যাইবে। এই অবস্থাতেই নলের খোলা মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপে যন্ত্র নির্ম্মিত হইলে পর তাহার উপর দাগ কাটিতে হইবে। নলটিকে প্রথম গলন্ত বরফে ডুবাইয়া পারদ যেখানে নামিল, সেখানে কাচের গায়ে একটি দাগ কাট। পরে ফুটন্ত জলের উপরিস্থ বাষ্পে কিয়ৎকাল রাখিয়া দ্বিতীয় দাগ কাট। প্রথম দাগটিকে শূন্য ও দ্বিতীয়টিকে একশত ধরিয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানকে একশত ভাগ কর। এইভাবে থার্ম্মোমিটার প্রস্তুত হইল।

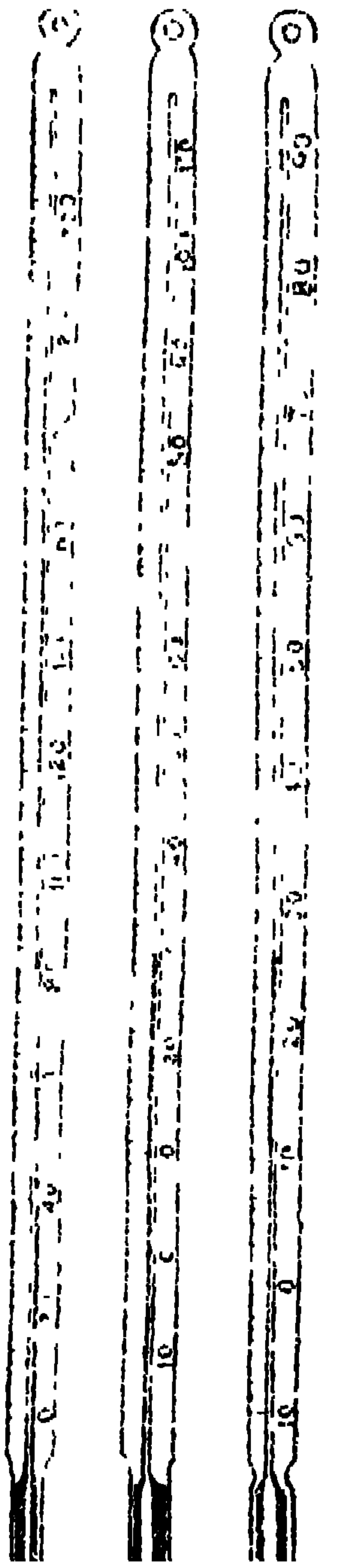

২৬। ত্রিবিধ পদ্ধতির থার্ম্মোমিটার

উষ্ণতার মাপ—কঠিন পদার্থের বিস্তৃতি এত কম যে, উহার দ্বারা উষ্ণতা মাপা অসুবিধাজনক। বায়বীয় পদার্থের বিস্তৃতি এত বেশী যে, খুব বড় আধার না হইলে তাহা মাপা যায় না। সেকারণ সাধারণতঃ তরল পদার্থের বিস্তৃতির দ্বারা উষ্ণতা মাপা হয়। এই উদ্দেশ্যে পারদ ব্যবহার করা হয়। জল ১০০° সেন্টিগ্রেডে বাষ্প হইয়া যায়, কিন্তু

পারদ ১০০° সেণ্টিগ্রেডের অনেক উচ্চেও তরল থাকে। সেকারণ থার্ম্মোমিটারে জল ব্যবহার না করিয়া পারদ ব্যবহার করা হয়।

উষ্ণতা পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতি—তিনটি পদ্ধতি আছে। উপরে এক শত ভাগ করিয়া দাগ কাটিবার পদ্ধতি যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহার নাম (১) **সেণ্টিগ্রেড** (Centigrade)। গলন্ত বরফের উষ্ণতা শূন্য ও ফুটন্ত জলের উপরিস্থ বাষ্পের উষ্ণতা আশী ধরিয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আশী ভাগ করা হয়। ইহার নাম (২) **রেমার** (Reaumur) পদ্ধতি। তৃতীয় পদ্ধতি ইংলণ্ডে ও ইংরেজের রাজ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহা একটু অদ্ভুত রকমের। গলন্ত বরফের উষ্ণতা বত্রিশ ও ফুটন্ত জলের উপরিস্থ বাষ্পের উষ্ণতা দুই শত বারো ধরিয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানকে এক শত আশী ডিগ্রীতে ভাগ করা হয়। এই পদ্ধতির নাম (৩) **ফারেনহাইট** (Fahrenheit)। আমাদের দেহের উষ্ণতা ৯৮·৪ ডিগ্রী যে আগে বলিয়াছি, তাহা এই পদ্ধতি অনুযায়ী মাপ। দেহের উষ্ণতা পরিমাপক থার্ম্মোমিটারকে clinical thermometer বলে।

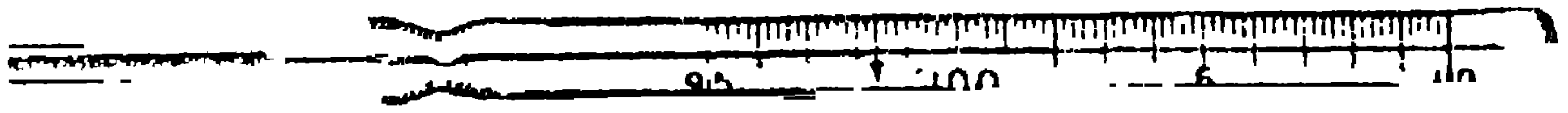

২৭। ক্লিনিকাল থার্ম্মোমিটার

সেণ্টিগ্রেড এক ডিগ্রী তাহা হইলে $=\frac{১৮০}{১০০}=\frac{৯}{৫}$ ডিগ্রী ফাঃর সমান।

সেঃ এক ডিগ্রী $=\frac{৮০}{১০০}=\frac{৪}{৫}$ ডিগ্রী রেঃ-র সমান।

কোন পদার্থের উষ্ণতা ৩০° সেঃ হইলে, ফাঃ কত হইবে, রেঃ কত হইবে?

৩০° সেঃ $=(৩০\times\frac{৯}{৫})+৩২°$ ডিগ্রী ফাঃ $=৮৬°$ ফাঃ।

৩০° সেঃ $=৩০\times\frac{৪}{৫}$ রেঃ $=২৪°$ রেঃ।

পদ্ধতি	গলন্ত বরফের উষ্ণতা বা জলের হিমাঙ্ক	ফুটন্ত জলের উপরিস্থ বাষ্পের উষ্ণতা বা জলের ফুটনাঙ্ক	মধ্যবর্ত্তী স্থান কত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে
সেণ্টিগ্রেড	০	১০০	১০০
রেমার	০	৮০	৮০
ফারেনহাইট	৩২	২১২	১৮০

Questions

1. Explain the difference between heat and temperature.
2. Describe the preparation of a thermometer. What are the different ways of graduating a thermometer?
3. Describe a clinical thermometer. What is the reason that mercury is used and not, say, water? (C. U. 1942)

তাপসঞ্চালন

(Transference of heat)

তাপের পরিবহন—(Conduction of heat)—একটি লম্বা লৌহদণ্ডের এক দিক ধরিয়া অন্য দিক আগুনে ঢুকাইয়া দাও। আগুনের তাপ ধীরে ধীরে আগা হইতে হাত পর্য্যন্ত চলিয়া আসিবে। বাহির করিয়া দণ্ডটি রাখিয়া দাও, সমস্তটা এক সমান গরম হইয়া যাইবে। এইভাবে তাপসঞ্চালনকে বলা হয় পরিবহন। পরিবহনের সময় লৌহদণ্ডের কোন ভাগই স্থানচ্যুত হয় না।

সকল পদার্থের পরিবহন-ক্ষমতা সমান নয়। তাম্র ও রৌপ্যের বেশী, লৌহ ও সীসকের কম। কাঠ, কাচ ইত্যাদির আরও অনেক কম। সাধারণতঃ ধাতব পদার্থের এই ক্ষমতা বেশী। চীনামাটির

পেয়ালায় গরম চা বেশ খাওয়া যায়, কিন্তু ধাতুনির্মিত পেয়ালায় চুমুক দিলে ঠোঁট পুড়িয়া যায়; কাচের এক দিক গরম করিলে ফাটিয়া যায় কেন, লোহা যায় না কেন। কাচের পরিবাহিতা কম বলিয়া উহার একস্থানে গরম লাগিলে সে স্থান আয়তনে বাড়ে। অন্য স্থানে সে তাপ শীঘ্র পরিবাহিত হয় না, তাহাতেই ফাটিয়া যায়। পাখীর পালক বা পশুর লোম অত্যন্ত কম তাপ-পরিবাহক, সেজন্য অত্যন্ত শীতেও উহাদের কষ্ট হয় না। আমরাও শীতকালে পশমের জামা গায়ে দিয়া শীত নিবারণ করি। দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ দেহেই থাকে বাহিরের ঠাণ্ডা দেহকে স্পর্শ করে না। সেজন্য পশমের জামাকে গরম জামা বলি, বস্তুত উহাদের উষ্ণতা বাহিরের জিনিসের উষ্ণতার সমান।

জলের ও অধিকাংশ তরল পদার্থের তাপ-পরিবহনের ক্ষমতা খুবই কম। একটি পরীক্ষা-নলের খানিকটা জলপূর্ণ কর। জলের উপরিস্তরের কিঞ্চিৎ নিম্নে তাপ দাও। দেখিবে সেই স্থানের জল গরম হইবে। পরীক্ষা-নলের তলার দিকের জল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকিবে। নীচের দিকে যেটুকু তাপ গিয়া সে স্থানের জল অল্প গরম করে তাহা পরীক্ষা-নলের কাচ দিয়া সামান্য একটু তাপ পরিবাহিত হইতেছে বলিয়া।

তাপের পরিচলন (Convection of heat)—তাপপরিবহনের সময় কঠিন পদার্থের অংশ স্থানচ্যুত হয় না। তরল পদার্থের অবস্থা অন্যরূপ। তাপ লাগিবামাত্র তপ্ত অংশ উপরে ভাসিয়া উঠে, অন্য অংশ তাহার স্থান লয়। আবার সে অংশ তপ্ত হইয়া উপরে উঠে, আর এক অপেক্ষাকৃত শীতল অংশ সেখানে আসে। এইভাবে তরল পদার্থে তাপ সঞ্চালিত হয়। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে **পরিচলন।** বাষ্পীয় পদার্থেও তাপসঞ্চালন এইরূপেই হয়।

তাপ পরিচলন সম্বন্ধে পরীক্ষা—একটি কাচপাত্রে খানিকটা জল লও। সেই জলে খুব সরু সরু কাগজ-কুচি ফেলিয়া দাও। তারপর পাত্রটিকে স্পিরিট চুল্লীর বা বুন্‌সেন দীপের উপর চড়াইয়া দাও। জলের মধ্যে কাগজ-কুচির গতিবিধি লক্ষ্য করিলে ঠিক বুঝিতে পারিবে তাপপরিচলন কাহাকে বলে।

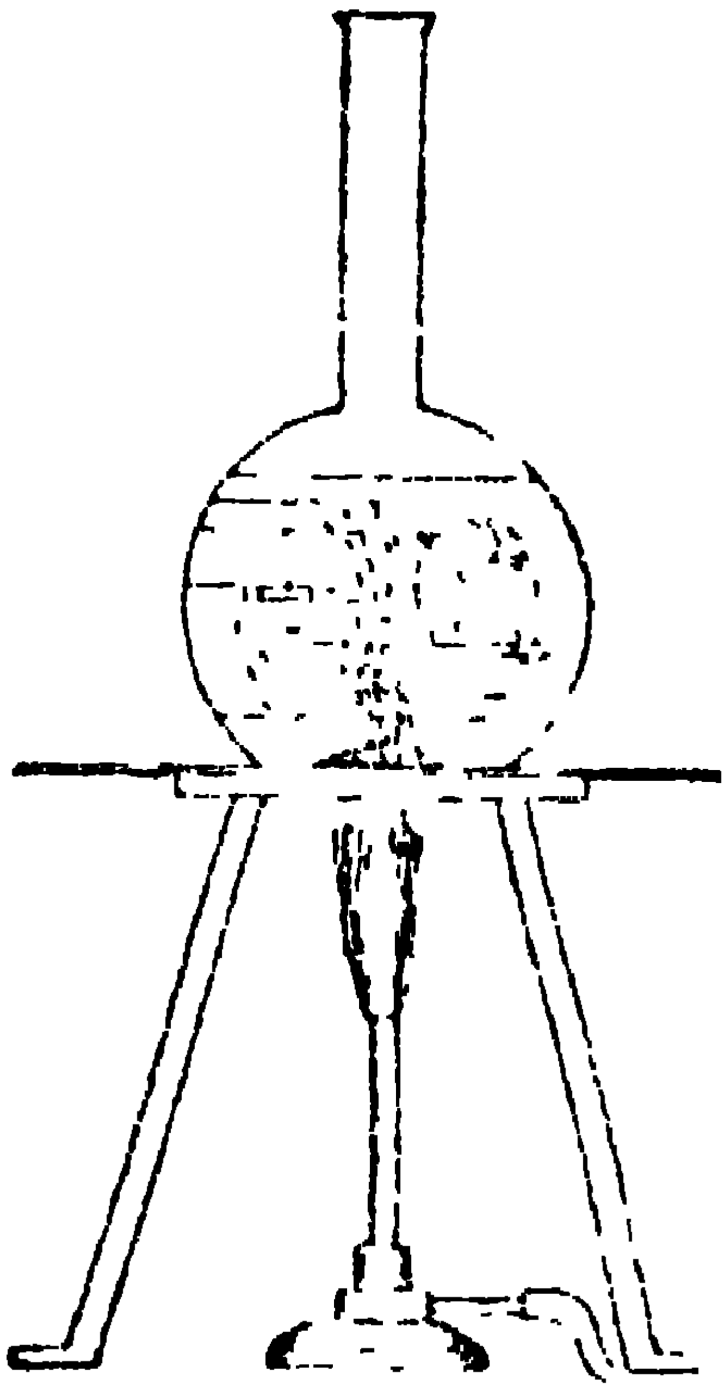

২৮। তাপ পরিচলন পরীক্ষা

তাপের বিকিরণ (Radiation of heat)—তাপপরিবহন ও পরিচলন পদার্থকণার মধ্য দিয়াই ঘটে, শূন্যস্থানের মধ্য দিয়া ঘটে না। **বিকিরণ** শূন্য স্থানের মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে ঘটিতে পারে ও নিয়ত ঘটিতেছে। সূর্য্যকিরণ (আলোক কিরণ ও তাপ কিরণ, দুইই) পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থিত মহাশূন্যের ভিতর দিয়া অনায়াসে আসিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, যে সকল পদার্থে ও যে স্থানে বায়ু পর্য্যন্ত নাই, সেই মহাশূন্য মধ্যেও এমন একটা কিছু আছে যাহার সাহায্যে বিকিরণ ঘটে। তাঁহারা ইহার নাম দিলেন **ইথার** (ether)। এই ইথার দেখা, স্পর্শ করা বা তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা কিছুই সম্ভব নয়। ইথারের ঢেউ তুলিয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া এই বিকীর্ণ তাপ আসিতেছে। কিন্তু বিকিরণের ফলে পরবর্ত্তী বায়ুকণাগুলি তপ্ত হইয়া উঠিতেছে না। বিকিরণের ইহাই বিশেষত্ব।

পরিচলন ও বিকিরণ প্রণালীর প্রভেদ—পরিচালিত তাপ কেবল ঊর্দ্ধদিকেই যায়, বিকিরণ প্রণালীতে তাপ চারিদিকেই সরল রেখায় সঞ্চালিত হয়। আগুনের

নিকট দাঁড়াইলে যে তাপ অনুভব কর তাহা বিকীর্ণ তাপ, পরিচালন করিবার জন্য অবশ্য বায়ু আছে কিন্তু তাহা ঊর্দ্ধদিকেই যায়। পর্দ্দা দিয়া আগুনকে আড়াল কর তাপ বোধ করিবে না।

সূর্য্যের তাপবিকিরণের ফলে দিনের বেলা গরম ও রাত্রে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বোধ হয়।

কালো বা অন্য রঙ্গীন পদার্থ প্রচুর পরিমাণে তাপ বিকিরণ করে। সেজন্য গরম দেশে সাদা পোষাক পরা ভাল। চায়ের কাপের রং সাদা হইলে তাহাতে শীঘ্র চা জুড়াইয়া যায় না। কঠিন পদার্থ শীঘ্র গরম বা ঠাণ্ডা হয়।

থার্ম্মস্-ফ্লাস্ক (Thermos flask)—তিনটি প্রক্রিয়ায় তাপ চলাচল হইতে পারে—(১) পরিবহন (২) পরিচলন ও (৩) বিকিরণ। থার্ম্মস্-ফ্লাস্কে এই তিন প্রক্রিয়াই যাহাতে কার্য্যকরী না হয় তাহার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যবস্থা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। তাপ পরিচলন যাহাতে না হয় তাহার জন্য কাচের পাত্রটির দুইটি স্তর আছে (ক, খ,) ও মাঝখানের বাতাস বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। বাতাস না থাকায় পরিচলন বন্ধ। পাত্রটি কাচের, ও উহা কর্কের উপর রাখা হইয়াছে। কাচ ও কর্ক তাপপরিবহনে বাধা দেয়। পাত্রটি সাদা চকচকে বলিয়া

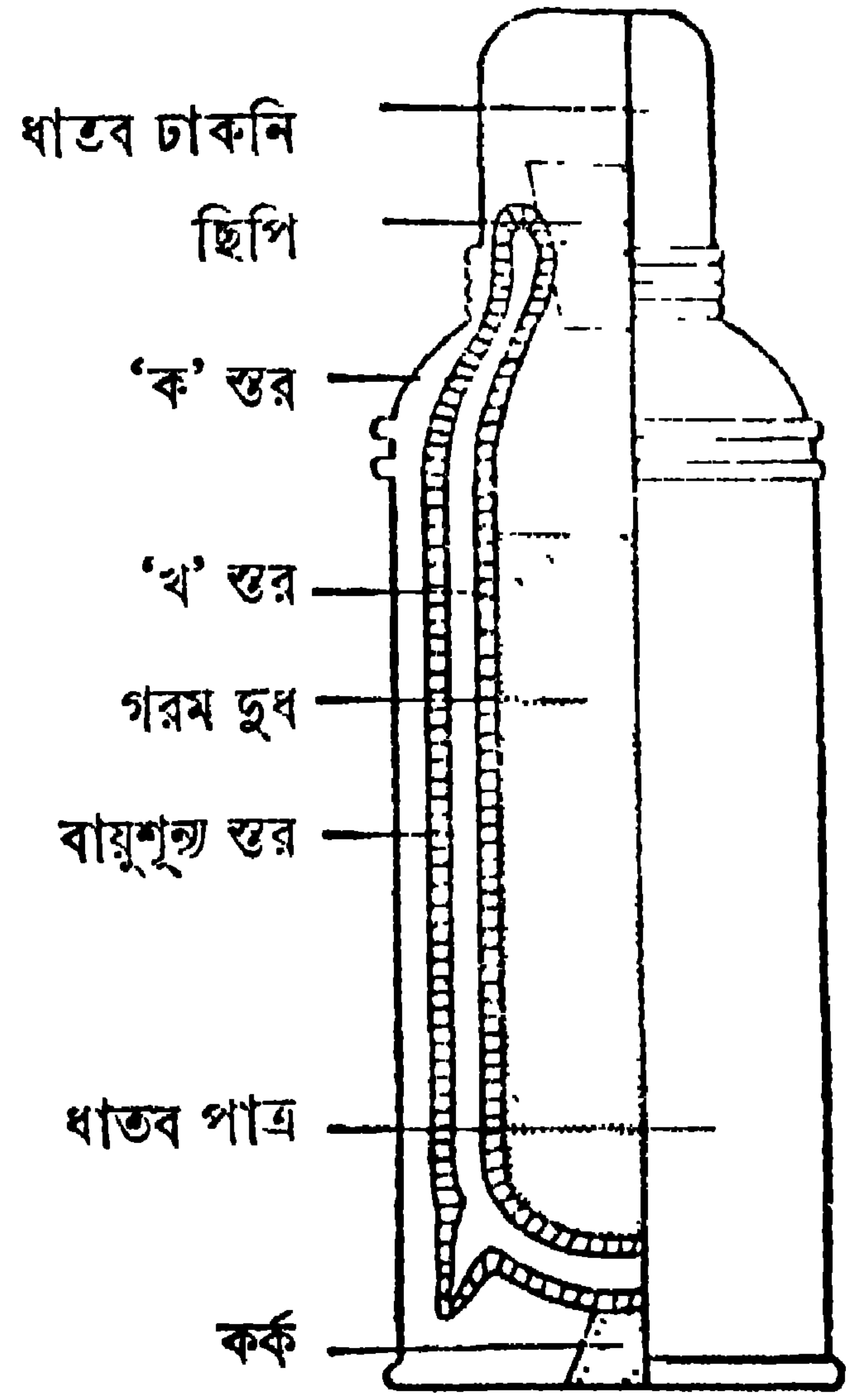

২৯। থার্ম্মস্-ফ্লাস্ক

তাপবিকিরণেও বাধা দেয়। এখন এইরূপ পাত্রে গরম দুধ রাখিয়া ছিপি

বন্ধ করিলে বহুক্ষণ গরম থাকিবে। বাহিরের ধাতুনির্ম্মিত পাত্রটি কাচপাত্রের আধারের কাজ করে।

Questions

1. State and illustrate the various modes of propagation of heat.
2. What do you understand by conduction, convection and radiation of heat?
3. Why does hot milk remain hot for a long time in a thermos flask?

চতুর্থ অধ্যায়

দোলক (Pendulum)

দোলক—একটি অপেক্ষাকৃত ভারী বস্তুকে সূতা বা তার দিয়া ঝুলাইলে দোলক প্রস্তুত হইল। ভারী বস্তুটিকে **দোলকপিণ্ড** বলে। সকলেই দেয়ালঘড়িতে দোলক বা পেণ্ডুলাম দেখিয়াছ। দোলকের আবিষ্কর্ত্তা গ্যালিলিও (Galileo)। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে হায়গেনস্ (Huygens) প্রথম ঘড়িতে দোলক ব্যবহার করেন।

দোলক আবিষ্কারের গল্প—১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে একদিন সন্ধ্যায় গ্যালিলিও লক্ষ্য করিলেন যে, গির্জ্জার ছাদ হইতে ঝুলান একটি প্রদীপ তালে তালে দুলিতেছে, অর্থাৎ যে স্থান হইতে দোলন আরম্ভ হইতেছে একবার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসিতে প্রদীপটির প্রত্যেকবার ঠিক সমান সময় লাগিতেছে। গ্যালিলিও নিজের নাড়ীর গতির সহিত প্রদীপের দোলন মিলাইতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন যে, প্রদীপের প্রত্যেক দোলনে তাঁহার নাড়ীও ঠিক সমান উঠানামা করিতেছে। গ্যালিলিও নানা প্রকার জল্পনা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিলেন। ফলে দোলকের তথ্য আবিষ্কৃত হইল।

দোলক সম্বন্ধে পরীক্ষা—দোলক-পিণ্ড 'খ' হইতে 'গ', আবার 'গ' হইতে 'খ' এইরূপে দুলিতেছে। দুলিতে আরম্ভ হওয়ার

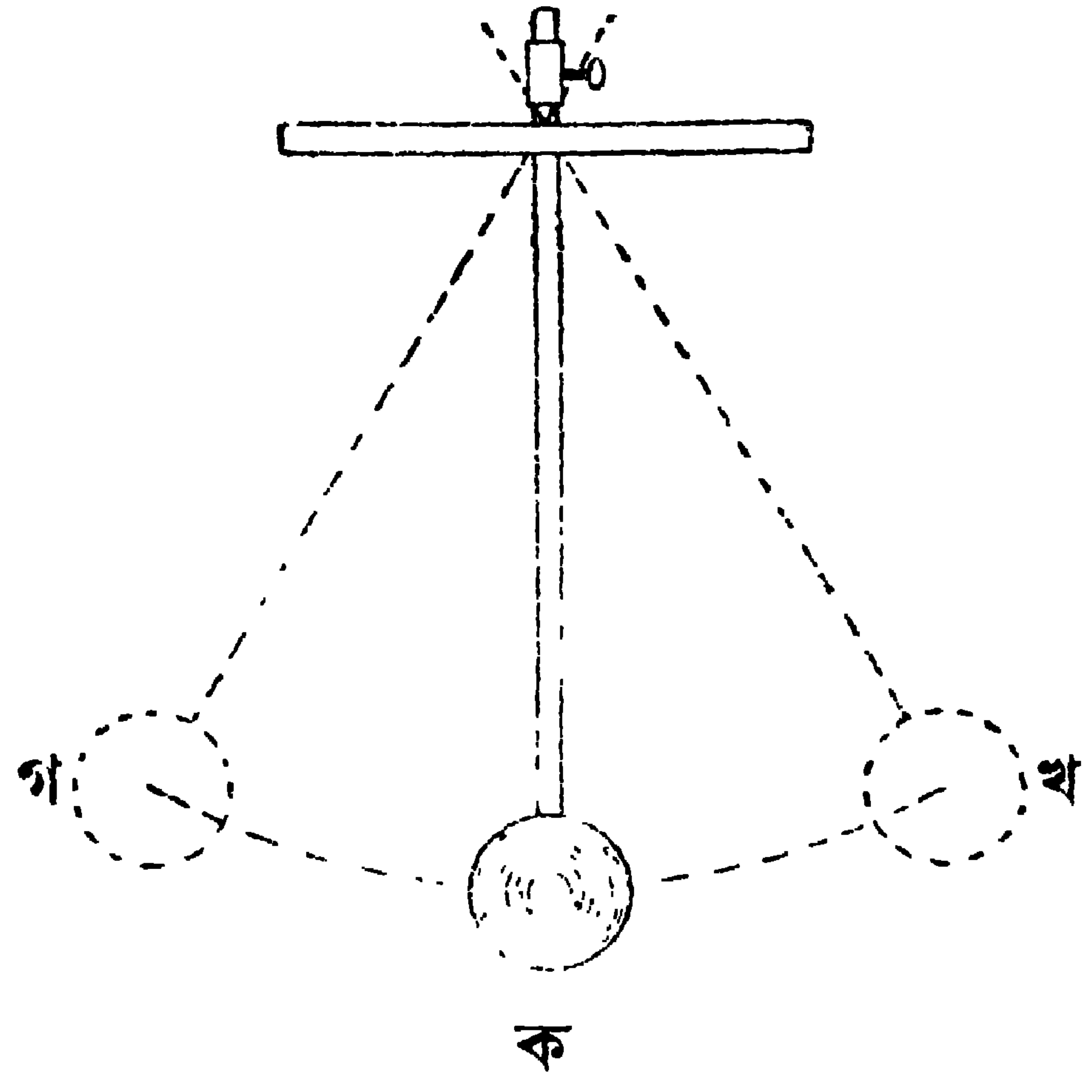

৩০। দোলক

আগে দোলকের পিণ্ড 'ক'তে ছিল। 'ক খ' বা 'ক গ' এই অন্তরকে **দোলকের বিস্তার** (amplitude) কহে। 'খ' হইতে 'গ'তে যাইয়া আবার 'গ' হইতে 'খ'তে ফিরিয়া আসিতে মোট যে সময় লাগে তাহাকে **দোলকের কাল** (period) বলা হয়।

গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত তথ্য—(১) **বিস্তার সামান্য হইলে দোলকটি সমান সময়ে প্রত্যেক দোলন শেষ করিবে; (২) দোলকের সূত্রের দৈর্ঘ্যের সহিত দোলকের**

কালের একটি সম্বন্ধ আছে। দৈর্ঘ্য চার গুণ বাড়াইলে কাল দুই গুণ বাড়িবে। দৈর্ঘ্য নয় গুণ বাড়াইলে কাল বাড়িবে তিন গুণ। দৈর্ঘ্য ষোল গুণ বাড়াইলে কাল বাড়ে চার গুণ, ইহাই বাড়িবার নিয়ম। ঘড়ির দোলকপিণ্ড উপর নীচে করিয়া ঘড়িকে ফাষ্ট স্লো করা হয়। (৩) **মহাকর্ষ শক্তির সহিতও দোলকের কালের সম্বন্ধ অতি নিকট।** মহাকর্ষ চতুর্গুণ হইলে কাল হইবে অর্দ্ধেক, মহাকর্ষ ষোল গুণ হইলে কাল হইবে সিকি, এইরূপ। (৪) **পিণ্ডের আয়তন বা ওজনের সহিত দোলকের কালের কোন সম্বন্ধ নাই।** পিণ্ড কাঠের, লোহার, বা মোমের—যে পদার্থেরই নির্ম্মিত হউক, যত বড় বা যত ভারীই হউক, দোলকের কাল একই থাকিবে।

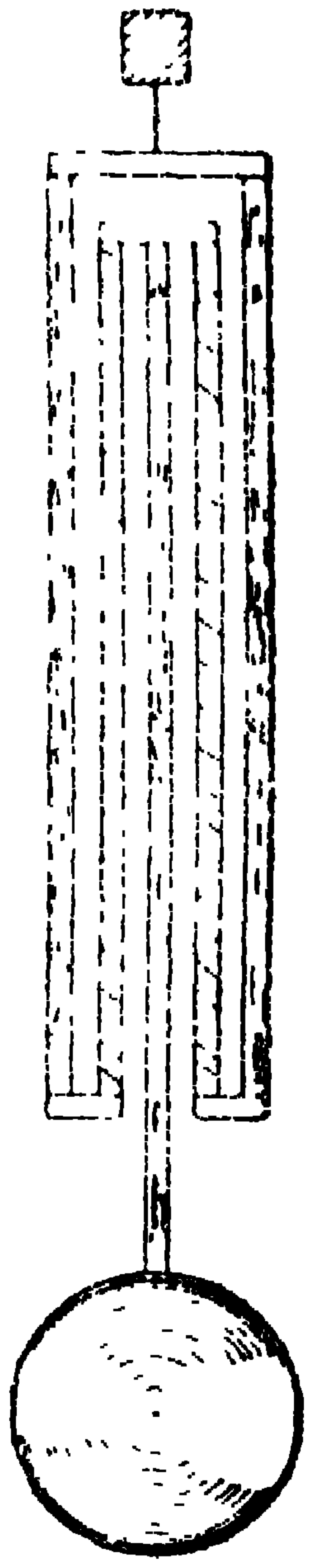

৩১। প্রতিবিহিত দোলক

প্রতিবিহিত দোলক (Compensated pendulum)—দোলকের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হইলে দোলনকাল বাড়ে। এজন্য সাধারণ দোলকবিশিষ্ট ঘড়ি শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে "স্লো" হইয়া যায়। এইজন্য প্রতিবিহিত দোলক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে দুইটি বিভিন্ন ধাতুতে গঠিত যথাক্রমে তিনটি ও দুইটি ধাতুখণ্ড এইরূপে সন্নিবিষ্ট আছে যে উহাদের তিনটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে দোলকটির দৈর্ঘ্য যতটুকু বাড়ে অপর দুইটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে দোলকটির দৈর্ঘ্য ঠিক ততটুকু কমিয়া যায়। এজন্য মোট দৈর্ঘ্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়া এই দোলকগুলির দোলনকাল সব ঋতুতেই সমান থাকে

Questions

1. How would you show that a solid substance increases in volume when heated? Give examples from everyday life.
2. What is a pendulum? Explain the terms amplitude and period of a pendulum.
3. Describe a compensated pendulum.
4. Describe an experimental arrangement for demonstrating the expansion of a solid. Discuss how clocks are made to keep correct time. (T. T. 1939)

পঞ্চম অধ্যায়

আলোক (Light)

আলোকের স্বরূপ

আলোকের তরঙ্গ (Light wave)—বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে আলো জ্বালিলে তাহার চতুষ্পার্শে একপ্রকার তরঙ্গ উঠে। সেই তরঙ্গ চক্ষুর্দ্বয়ে প্রবেশ করিয়া চক্ষুর পশ্চাতে যে পর্দ্দা আছে তাহাতে প্রতিভাত হইলেই আমরা দেখিতে পাই। আমরা আলোক পাইয়া থাকি সূর্য্য হইতে। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে মহাশূন্য। এই মহাশূন্য ইথার (ether) দ্বারা পরিপূর্ণ। এই ইথার সর্ব্বব্যাপী—জলে, স্থলে, আকাশে, প্রস্তরে, মৃত্তিকায় সর্ব্বত্র আছে। জড়পরমাণুর ফাঁকে ফাঁকে ইথার অনুপ্রবিষ্ট। এই সর্ব্বব্যাপী ইথার আলোকতরঙ্গের পরিবাহক, বিকীর্ণ তাপের পরিবাহক ও পরে দেখা যাইবে যে, বিদ্যুৎ তরঙ্গেরও পরিবাহক।

আলোকের তরঙ্গ অদৃশ্য, আমরা শুধু দেখিতে পাই সেই তরঙ্গের দ্বারা উদ্ভাসিত পদার্থ। একটি অন্ধকার ঘরে জানালার ছিদ্র দিয়া রৌদ্রের একটি রশ্মি প্রবেশ করিয়া দেয়ালে বা মেঝেতে পড়িয়াছে; যে স্থানে পড়িয়াছে সেই স্থান আলোকিত ও দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু ছিদ্র হইতে সেই আলোকিত স্থান পর্য্যন্ত বাতাসে রশ্মির যে পথ, ধূলিকণামাত্র শূন্য হইলে তাহা অদৃশ্য থাকিবে। আলোকের দ্বারা সমুজ্জ্বল পদার্থই চক্ষুগোচর হয়; মধ্যবর্ত্তী তরঙ্গ নহে।

আলোক সম্পর্কে পদার্থের শ্রেণীবিভাগ— আলোক সম্পর্কে পদার্থ সমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) **স্বচ্ছ** (transparent)—যথা কাচ, জল, বায়ু, অভ্র, স্ফটিক ইত্যাদি। (২) **ঈষদচ্ছ** (translucent)—ঘষা কাচ, তৈলাক্ত কাগজ, কুয়াসা ইত্যাদি। (৩) **অস্বচ্ছ** (opaque)—কাঠ, লোহা, পাথর ইত্যাদি।

একেবারে অস্বচ্ছ পদার্থ পৃথিবীতে নাই। যে কোনও পদার্থকে খুব পাতলা করিয়া কাটিলে তাহার মধ্য দিয়া অল্পবিস্তর আলোক যাইবেই। আলোক বলিলে যাহা বুঝায় তাহার মধ্যে এমন কিরণও আছে যাহা কাষ্ঠ, চর্ম্ম ইত্যাদি ভেদ করিয়া যাইতে পারে। X-ray কিরণের সাহায্যে চিকিৎসকেরা অসুস্থ দেহমধ্যস্থ অস্থির ও যন্ত্রাদির ফটোগ্রাফ লইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন।

আলোকের সরল রেখায় গমন
(Rectilinear propagation of light)

আলোক-কিরণ সর্ব্বদা সরল রেখায় চালিত হয়, আঁকাবাঁকা পথে চলে না। কোন কারণে আলোক-রশ্মি যদি পথ-পরিবর্ত্তন করে, নূতন পথেও সে সরল রেখাতেই চলিবে।

আলোকের সরল গতি প্রমাণের পরীক্ষা— একটি জলন্ত মোমবাতির সম্মুখে পর পর দুইটি কার্ডবোর্ড খাড়া করিয়া বসাও। বাতির শিখাটি এখন সম্পূর্ণরূপে বোর্ড দুইটির আড়ালে রহিয়াছে। এইবার দুইখানি বোর্ডেরই মাঝখানে এমনভাবে এক একটি ছিদ্র করিয়া দাও যাহাতে দীপশিখা ও ছিদ্র দুইটি এক সরল রেখায় পড়ে। এখন

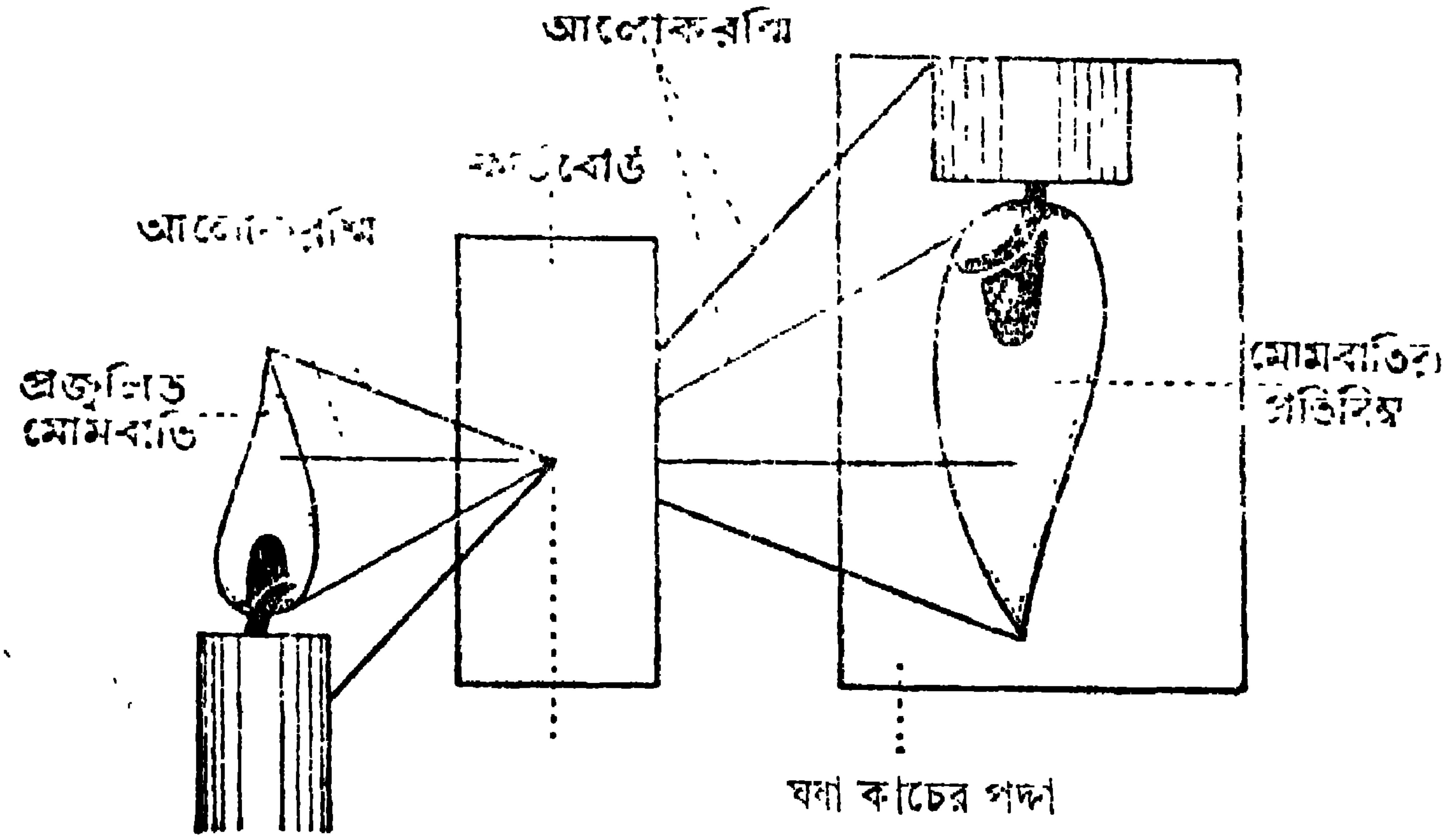

৩২। আলোক-কিরণ সর্ব্বদা সরলরেখায় চালিত হয়

ছিদ্রের মধ্য দিয়া লক্ষ্য করিলে শিখাটি স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। দূরবর্ত্তী বোর্ডখানির স্থানে একটি ঘষা কাচের পর্দা বসাইলে দেখিবে পর্দার উপর দীপশিখার একটি উল্টা প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীপশিখার কোন এক স্থান হইতে নিঃসৃত আলোকরশ্মি প্রথম পর্দার ছিদ্রের মধ্য দিয়া সরল পথে চলিয়া দ্বিতীয় পর্দার উপর পতিত হইয়া উহার অল্পপরিসর অংশ আলোকিত করে। এইরূপ দীপশিখার প্রত্যেক স্থান হইতে নিঃসৃত আলোক-রেখার দ্বারা পর্দার উপর এক নির্দ্দিষ্ট সামান্য অংশ আলোকিত হওয়ায় দীপশিখার উল্টা প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। আলোক যদি বক্রপথে

চলিতে পারিত, তাহা হইলে ঐরূপ দীপশিখার প্রতিবিম্ব গঠিত না হইয়া পর্দ্দার অনেকাংশ সাধারণভাবে আলোকিত হইত।

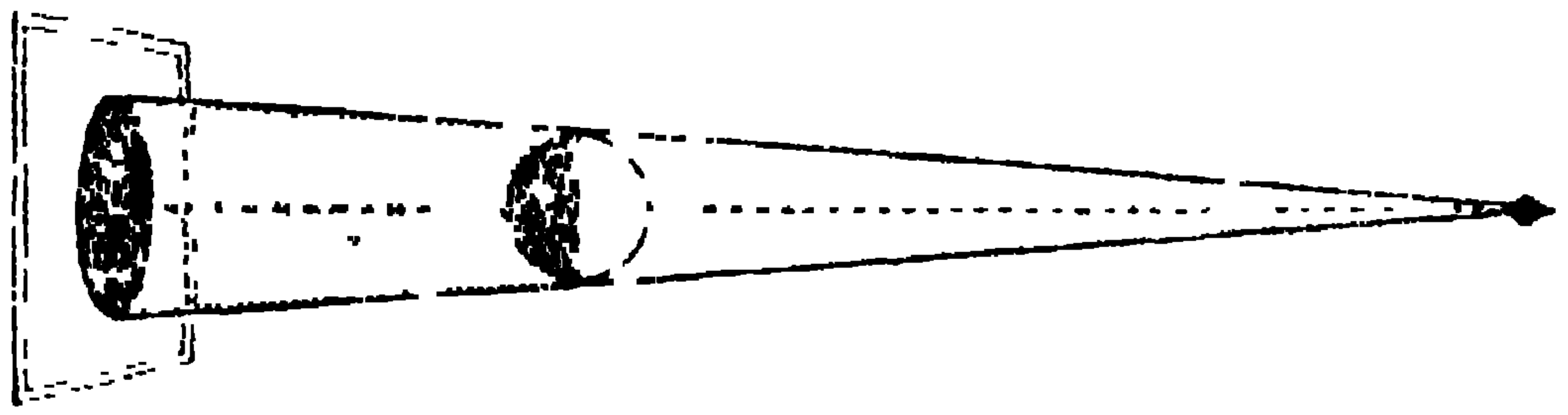

৩৩। ছায়া

ছায়া (Shadow)—আলোকের গতিপথে কোন অস্বচ্ছ পদার্থ থাকিলে আলোক-রশ্মি সেই অস্বচ্ছ পদার্থকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। অস্বচ্ছ পদার্থের পিছনের স্থানটি অন্ধকারময় হয়। এই অন্ধকারময় স্থানটিকে ঐ অস্বচ্ছ পদার্থের ছায়া কহে।

প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া (Umbra and penumbra)—আলোকের উৎস দীপটি যদি ক্ষুদ্র এবং অস্বচ্ছ পদার্থ টি আকারে অতি বড়

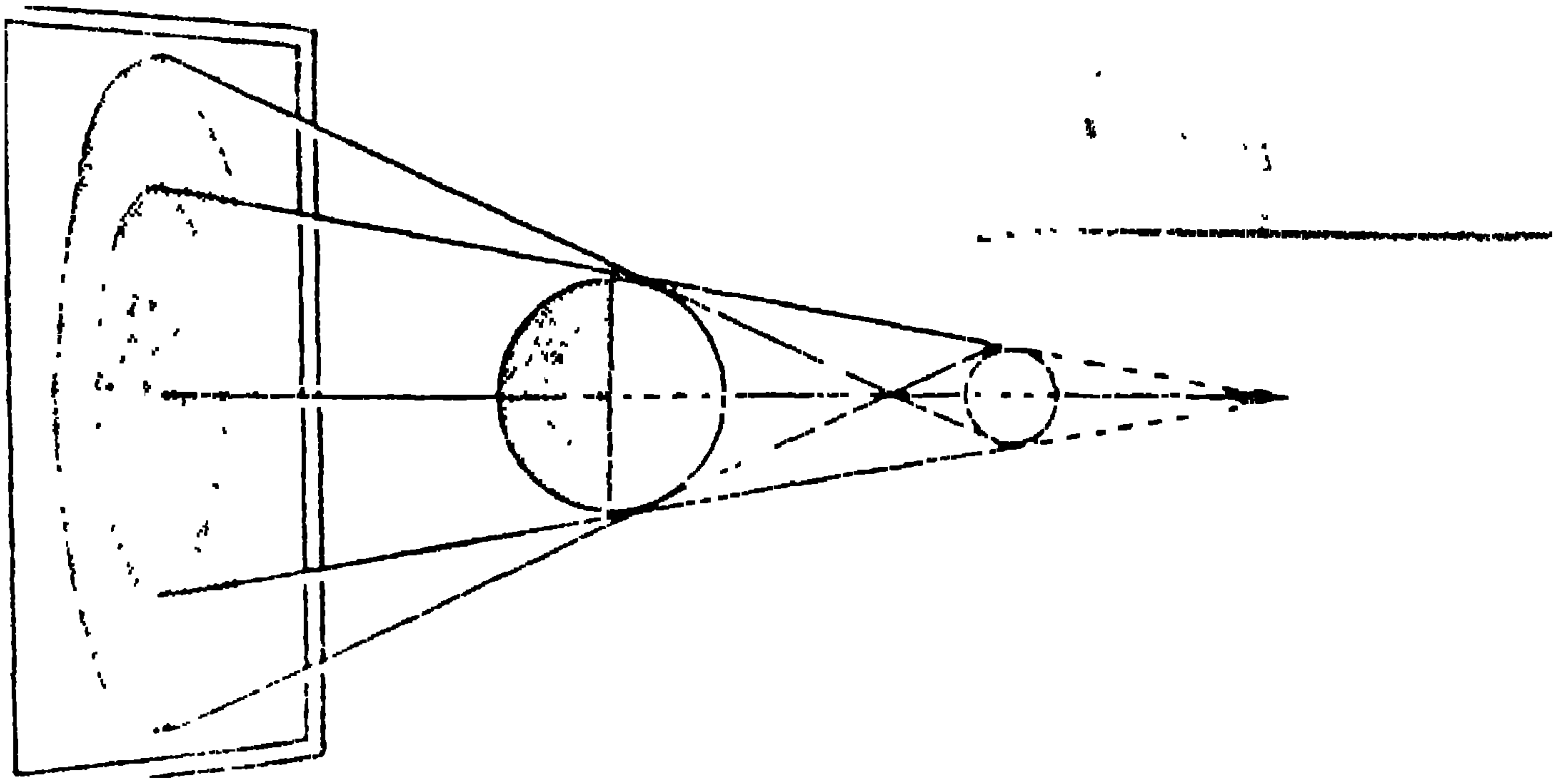

৩৪। প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া

হয়, তাহা হইলে সে ছায়া পড়ে তাহা ঘন কাল হয়। এরূপ ছায়াকে

প্রচ্ছায়া কহে। যদি দীপটি আকারে বড়, ও অস্বচ্ছ পদার্থটি দীপ অপেক্ষা খুব বড় না হয় তাহা হইলে দুই প্রকার ছায়া পড়ে। মধ্যে ঘন কাল প্রচ্ছায়া,—আর তাহার চারিদিকে যে পাতলা ছায়া পড়ে তাহাকে **উপচ্ছায়া** কহে। উপচ্ছায়ার মধ্যে কিছু আলোক আসে বলিয়া উহাকে পাতলা দেখায়।

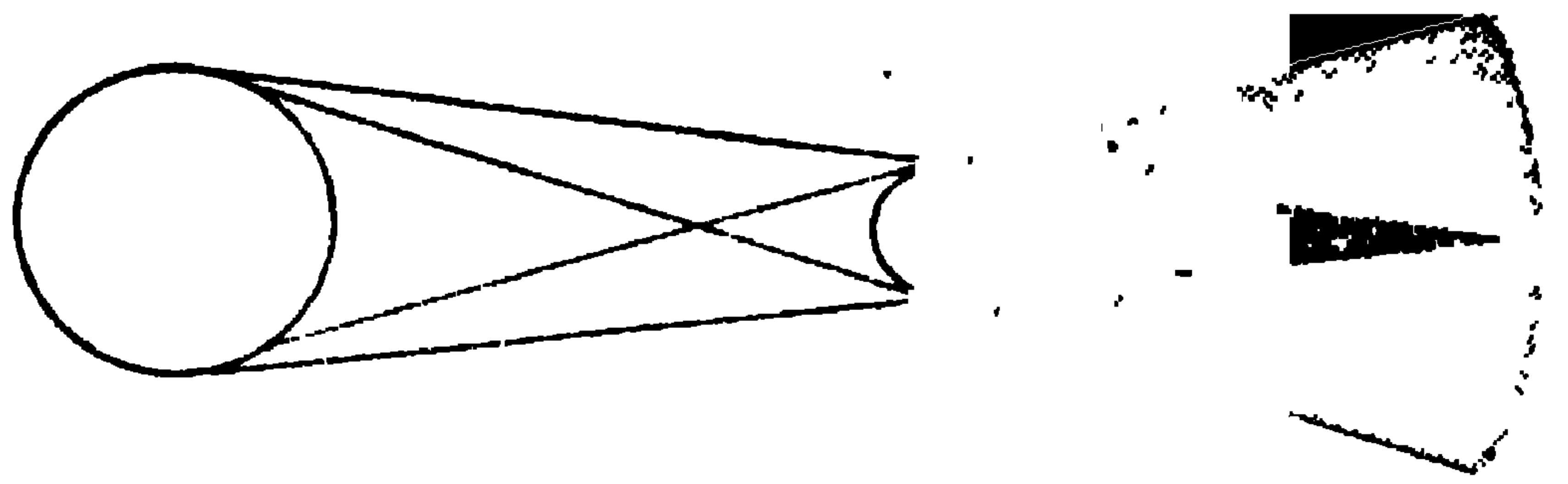

৩৫। আলোকের উৎস অতি বড় ও পদার্থটি ছোট

আলোকের উৎস প্রকাণ্ড এবং অস্বচ্ছ পদার্থটি ছোট হইলে পর্দ্দার উপর যে ছায়া পড়ে তাহার বিস্তার পর্দ্দার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। পর্দ্দা অস্বচ্ছ পদার্থের নিকটে আনিলে ছায়া বড়, দূরে ক্রমশঃ ছোট, ও শেষে বিন্দুতে পরিণত হয়; আরও দূরে গেলে তাহার উপর আর কোনও ছায়া পড়ে না।

পাখী যখন সামান্য উঁচুতে উড়ে, তখন তাহার ছায়া দেখা যায়। যখন বহু উঁচুতে উড়ে, তখন আর তাহার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে সূর্য্য হইল আলোকের প্রকাণ্ড উৎস, পাখী ক্ষুদ্র অস্বচ্ছ পদার্থ, মাটি হইল পর্দ্দা।

আলোকের প্রতিফলন (Reflection of light)

আলোকরশ্মি সরল রেখায় চলিবার পথে যদি ঐ রশ্মি কোন মসৃণ অস্বচ্ছ পদার্থ কর্ত্তৃক বাধা পায়, তবে উহার গতিপথের পরিবর্ত্তন ঘটে।

এই পরিবর্ত্তিত গতিপথটিও সরল। ইহাকে আলোকের **প্রতিফলন** (reflection) বলে। যে রশ্মিটি আলোক-উৎস হইতে আসিয়া মসৃণ পদার্থের উপর পড়ে তাহার নাম **আপতিত-রশ্মি** (incident ray) এবং যে রশ্মিটি মসৃণ পদার্থের উপর হইতে ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়, তাহার নাম **প্রতিফলিত-রশ্মি** (reflected ray)। মসৃণ অস্বচ্ছ পদার্থকে **প্রতিফলক** (reflector) বলে।

প্রতিফলনের উপর যেখানে আলোকরশ্মি আপতিত হয়, উহার নাম **পাতনবিন্দু** (point of incidence)। ঐ বিন্দু হইতে প্রতিফলকে

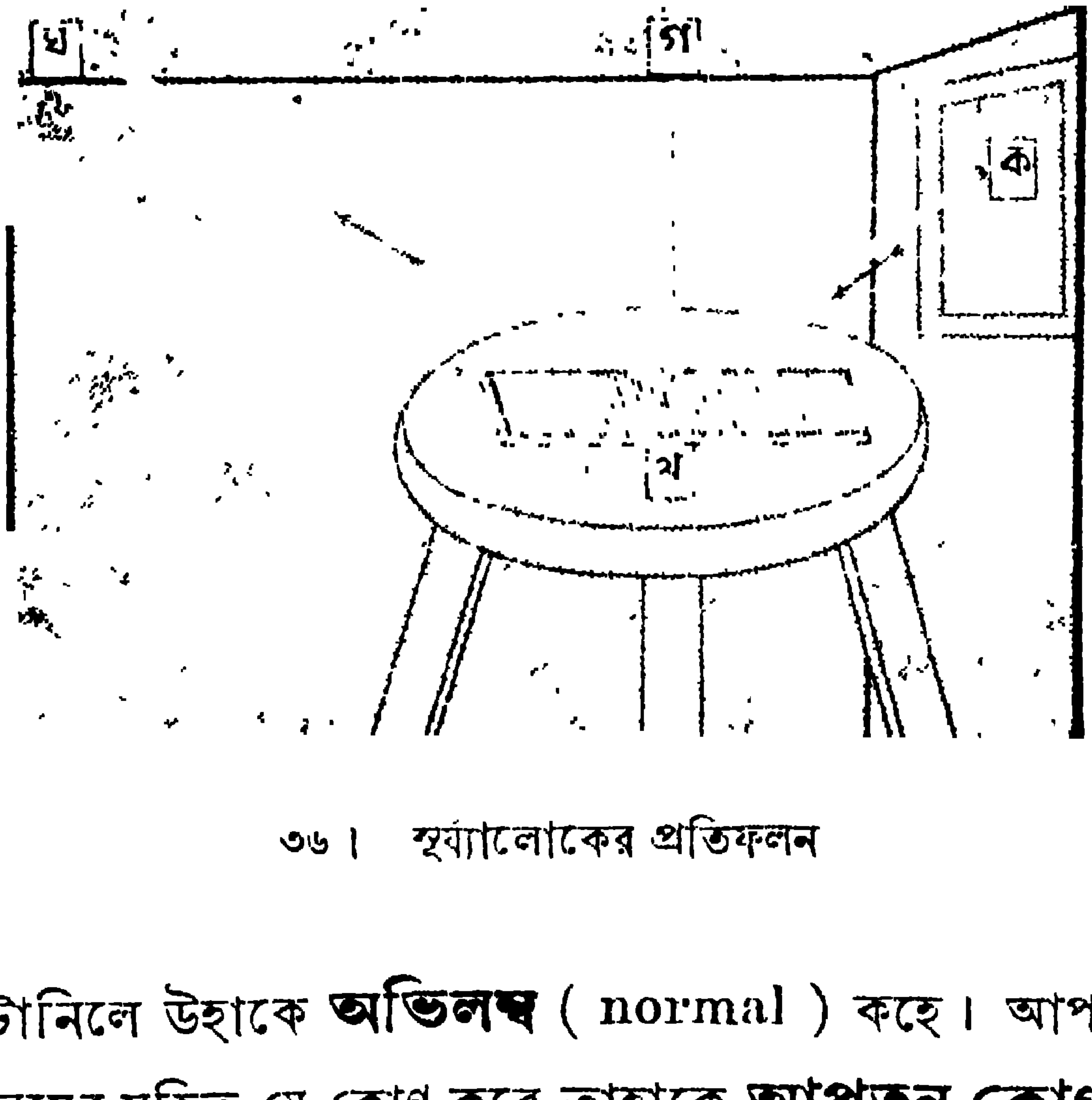

৩৬। সূর্য্যালোকের প্রতিফলন

লম্বরেখা টানিলে উহাকে **অভিলম্ব** (normal) কহে। আপতিত রশ্মি এই অভিলম্বের সহিত যে কোণ করে তাহাকে **আপতন কোণ** (angle of incidence) এবং প্রতিফলিত রশ্মি ঐ অভিলম্বের সহিত যে কোণ করে, তাহাকে **প্রতিফলন কোণ** (angle of reflection) বলে।

নির্দ্দিষ্ট দুইটি নিয়মানুসারে আলোকের প্রতিফলন ঘটিয়া থাকে।—

(১) **আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।**

(২) **আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান।** আলোক-রশ্মি যদি লম্বভাবে আয়নার উপর আপতিত হয় তবে উহা লম্বের বিপরীত দিকে প্রতিফলিত হয়। আপতিত রশ্মি সমস্তটাই প্রতিফলিত হয় না। উহার কতকটা প্রতিফলক শোষণ করিয়া থাকে।

ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া অন্ধকার কর। জানালার ছিদ্র দিয়া যে আলোক-রশ্মি আসিতেছে তাহা আয়নার উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়াছে (৩৬নং চিত্র)। এখানে 'কখ' আপতিত-রশ্মি, 'খঘ' প্রতিফলিত রশ্মি ও 'খগ' অভিলম্ব। বিশেষ যন্ত্র সাহায্যে দেখান যায় যে আপতন কোণ কখগ এবং প্রতিফলন কোণ গখঘ সমান।

বিভিন্নমুখী রশ্মি (divergent ray) **ও প্রতিবিম্ব** (image)—আলোক-রশ্মি যখন কোন পদার্থ হইতে সরল পথে বরাবর আসিয়া আমাদের চোখে পড়ে তখন পদার্থটি যে স্থানে আছে সেইস্থানেই দেখিতে পাই। কিন্তু প্রতিফলিত-রশ্মি যেদিক হইতে আসিতেছে তাহার বিপরীত দিকে সরল রেখা টানিলে ঐ রেখার উপর একস্থানে পদার্থটিকে দেখা যায়। যে পদার্থটিকে দেখা যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে ঐ পদার্থ নহে, তাহা ঐ পদার্থের প্রতিবিম্ব (image)। প্রতিফলক হইতে পদার্থের দূরত্ব যত প্রতিফলকের পশ্চাতে ঠিক ততদূরে

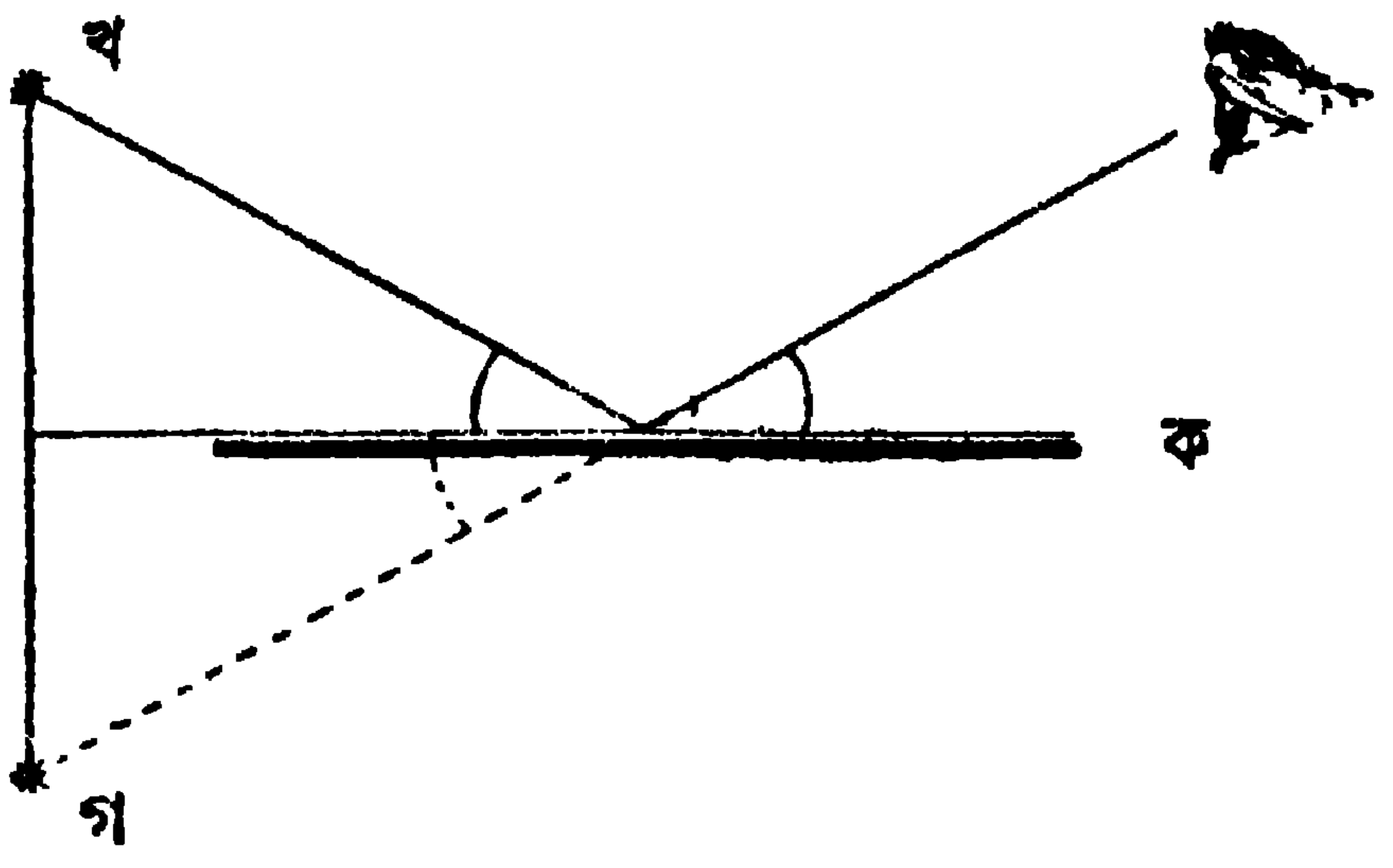

৩৭। প্রতিবিম্ব

তাহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। আয়নায় এইরূপ প্রতিবিম্ব দেখা যায়। 'ক' একটি প্রতিফলক, 'খ' একটি পদার্থ। উহা হইতে আপতিত-রশ্মি প্রতিফলকের উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রতিফলিত রশ্মি চোখে পৌঁছিতেছে। এখন পদার্থটিকে 'গ' চিহ্নিত স্থানে দেখা যাইবে। এই 'গ' 'খ'র প্রতিবিম্ব। পুকুরে এইজন্যই ধারের গাছপালার প্রতিবিম্ব জলের মধ্যে দেখা যায়।

ফ্রেমওয়ালা আয়না কতটা মোটা জানিতে হইলে তাহার উপরে আঙ্গুল রাখিলে আঙ্গুলের প্রতিবিম্ব যদি খুব কাছে পড়ে ত বুঝিবে আয়নার কাচখানা অতি পাতলা। কাচ পুরু হইলে প্রতিবিম্বও দূরে পড়িবে। কাচের ঘনত্ব কত ঠিক জানিতে হইলে আঙ্গুল ও তাহার প্রতিবিম্বের দূরত্বের অর্দ্ধেক করিলেই ঠিক জানা যায়। আয়নায় আমাদের ডানদিক প্রতিবিম্বের বামদিক, আমাদের বামদিক প্রতিবিম্বের ডানদিক। সেজন্য সোজাভাবে কাগজে উ লিখিয়া আয়নার উপর খাড়াভাবে ধরিলে উহার উল্টা প্রতিবিম্ব পড়ে।

এক প্রতিফলিত রশ্মিকে অনেক আয়নার সাহায্যে বার বার প্রতিফলিত করিতে পারা যায়। ফলে একই পদার্থের নানা প্রতিবিম্ব পাওয়ার সম্ভাবনা।

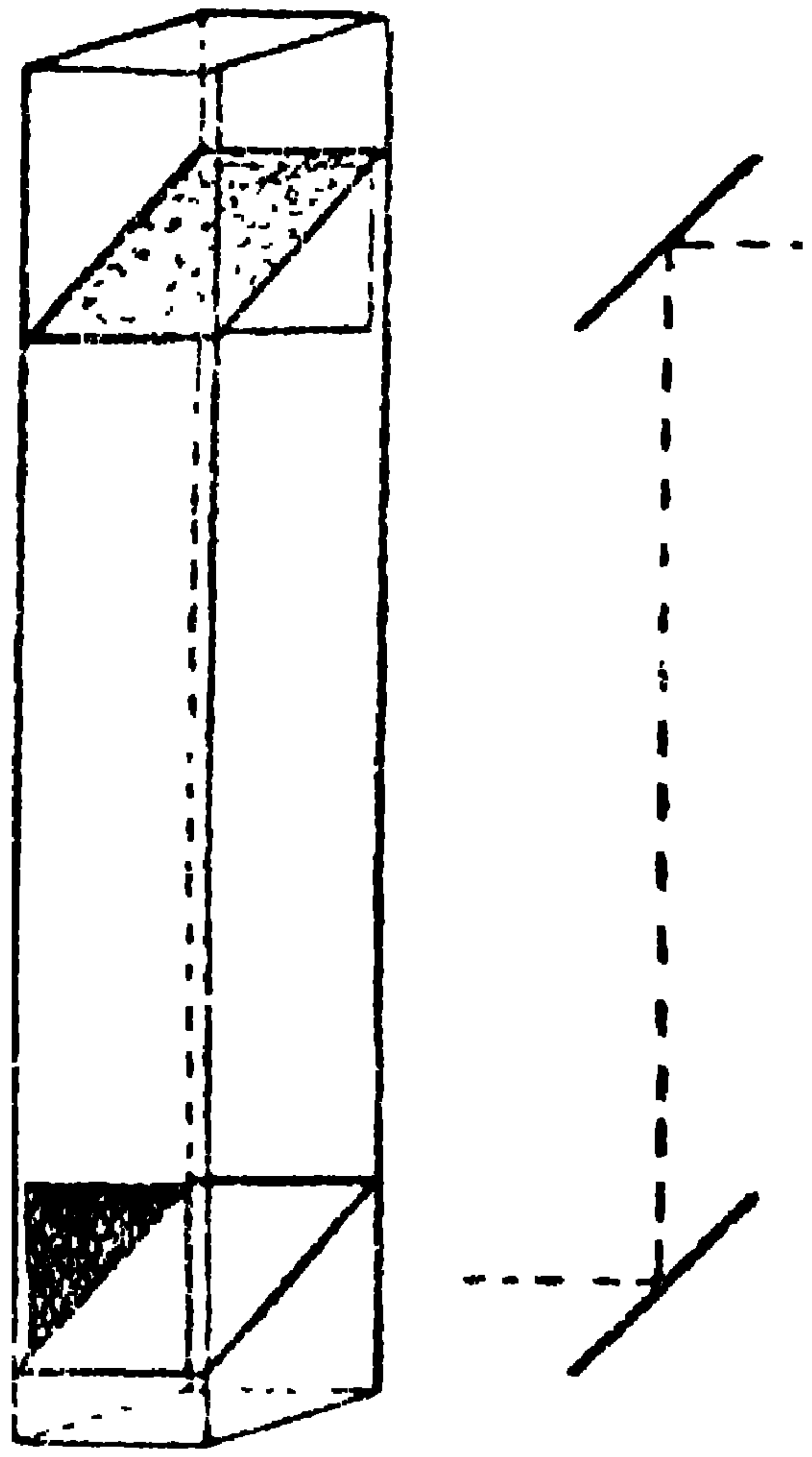

৩৮। পেরিস্কোপ

ফুটবলের মাঠে ভিড়ের পিছন হইতে দেখিবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র উঁচু করিয়া ধরা হয় যাহার সাহায্যে সামনে মানুষের ভিড়ের বাধা থাকা সত্ত্বেও মাঠের খেলা দেখা সম্ভব হয়। এই যন্ত্রকে **পেরিস্কোপ**

(Periscope) বলে। পেরিস্কোপে দুইটি দর্পণ ভূমিতলের সহিত ৪৫° কোণ করিয়া এমনভাবে লাগান থাকে যে উপরের দর্পণে নীচের দিকে ও নীচের দর্পণে উপর দিকে মুখ দেখা যায়। আমরা যখন কোনও পদার্থ দেখি তখন উহা হইতে আলোক-রশ্মি আসিয়া চোখে পড়ে, পদার্থটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। মাঠ হইতে আগত আলোক-রশ্মি উপরের আয়নার নীচের দিকে প্রতিফলিত হয়। আবার নীচের আয়নার উপর দ্বিতীয় বার প্রতিফলিত হইয়া চোখে আসাতে লোকে মাঠের ফুটবল খেলা ভিড়ের পিছন হইতেও দেখিতে পারে।

ডুবোজাহাজে (submarine) এই পেরিস্কোপের সাহায্যে জলের ভিতর থাকিয়াও বাহিরের অবস্থা সব দেখা যায়।

বিক্ষিপ্ত রশ্মি (Diffused light)—প্রতিফলক মসৃণ না হইলে আপতিত-রশ্মি নানাদিকে এলোমেলো ভাবে প্রতিফলিত হয়। এই প্রকার প্রতিফলিত রশ্মিকে বিক্ষিপ্ত রশ্মি কহে। এখানে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, কিন্তু প্রতিফলকটিকে দেখা যায়। যেখানে সূর্য্যরশ্মি পড়ে না সেখানে বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মি পড়িতে পারে। এইরূপ বিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারা আমরা সচরাচর ঘরের আসবাবপত্র দেখিতে পাই।

আলোকের প্রতিসরণ (Refraction of Light)

স্বচ্ছ সমসত্ব মাধ্যমের (homogeneous medium) মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি সরল পথে চলে। বাতাস, জল, কাচ সবই স্বচ্ছ পদার্থ। আলো ইহাদের মধ্য দিয়া সরল পথে যায় বটে, কিন্তু যায় বিভিন্ন বেগে।

যখন আলোকরশ্মি কোন স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর সোজা চলিতে চলিতে অপর আর এক স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর চলিতে আরম্ভ করে, তখন দ্বিতীয় পদার্থের প্রবেশ-পথে একটু বাঁকিয়া আবার সরল পথে চলিতে থাকে। আলোকের গতিপথের এই পরিবর্ত্তনের নাম আলোকের **প্রতিসরণ** (refraction)। আপতিত-রশ্মি **যখন এক মাধ্যম হইতে অপর মাধ্যমের উপর খাড়া ভাবে পড়ে তখন প্রতিসরণ হয় না।** উহা ঋজু পথেই গমন করিয়া থাকে।

প্রতিসরণ-পরীক্ষা (Experiment on the refraction of light)—(১) একটি কাচপাত্রে জল আছে। তাহার উপর আপতন রশ্মি বাঁকাভাবে আসিয়া পড়িল। যদিও স্বচ্ছ বাতাসের ভিতর দিয়া আলোক-রশ্মি সরল রেখায় আসিয়া স্বচ্ছ জলের ভিতর প্রবেশ করিল; তথাপি এখন আর সরল রেখায় চলিতে পারিবে না। জলে প্রবেশের পথে একটু বাঁকিয়া যাত্রা করিবে। যেখানে আলোক-রশ্মি জলে প্রবেশ করিয়াছে সেই পাতন-বিন্দুতে জলের সমতলের উপর একটি লম্ব টানিলে দেখা যাইবে যে আলোক-রশ্মি জলের মধ্যে ঐ লম্বের দিকে হেলিয়া গিয়াছে।

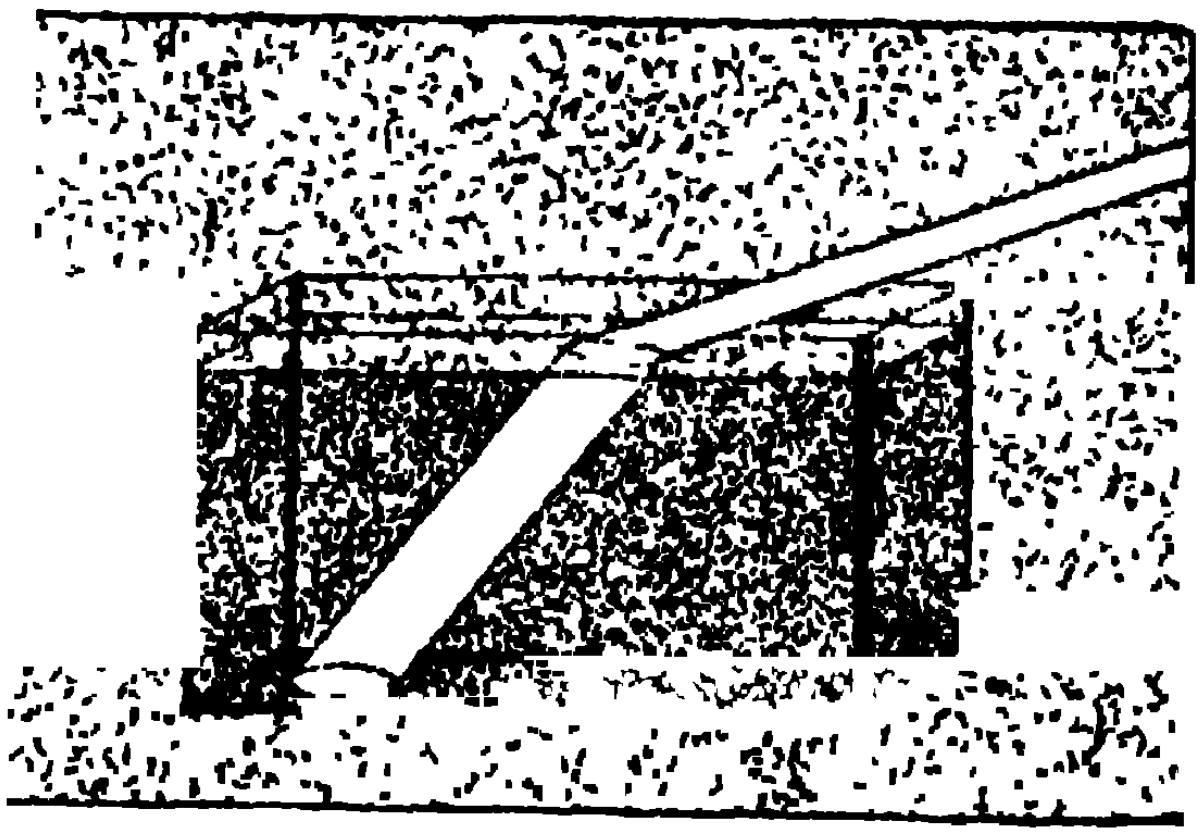

৩৯। আলোক জলে প্রবেশমাত্র বাঁকিয়া গেল

(২) একখানি সমচতুষ্কোণ ঈষতুচ্চ কাচ-ফলক সাদা কাগজের উপর রাখিয়া তাহার চতুঃসীমায় পেন্সিল দিয়া ক খ গ ঘ রেখা টান। ফলকের কিছু দূরে চ বিন্দুতে এবং ফলকের গায়ে ছ বিন্দুতে এক একটি

আলপিন পোঁত। কাচ ফলকের গ ঘ দিক হইতে দেখিয়া ফলকের গায়ে জ বিন্দুতে এবং উহা হইতে কিছু দূরে ঝ বিন্দুতে দুইটি আলপিন এমন ভাবে পোত যে চ ছ জ ঝ এক সরলরেখায় দেখা যায়। এখন কাচ ফলক খানি তুলিয়া লও। ক খ এবং গ ঘ এর উপর যথাক্রমে ট ঠ ও ড ঢ অভিলম্ব টান। চ ছ, ছ জ এবং জ ঝ যোগ কর। বায়ু হইতে কাচে প্রবেশ করিবার সময় চ ছ হইল আপতিত রশ্মি, ছ জ হইল প্রতিসরণ রশ্মি। অপতিত রশ্মি চ ছ ও অভিলম্ব ট ঠ র মধ্যে যে

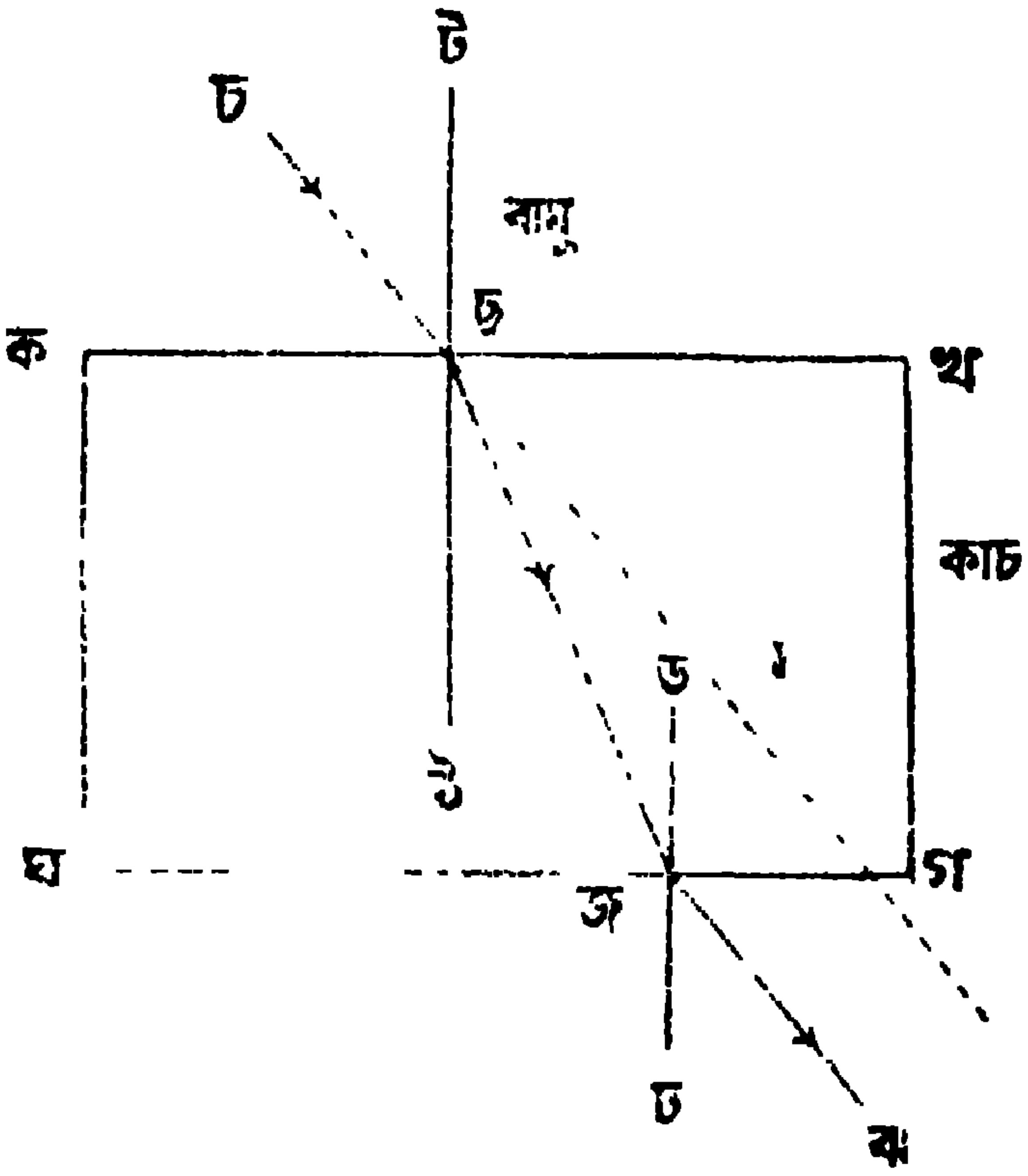

৪০। আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণ

চ ছ ট কোণ তাহাকে আপতন কোণ, (angle of incidence) এবং প্রতিসরণ রশ্মি ছ জ ও অভিলম্ব ট ঠ মধ্যে যে ঠ ছ জ কোণ তাহাকে প্রতিসরণ কোণ (angle of refraction) বলে। আবার কাচ হইতে বায়ুতে প্রবেশ করিবার সময় ছ জ ড কোণ হইল আপতন কোণ এবং ঢ জ ঝ হইল প্রতিসরণ কোণ।

(৩) একটি পাত্রে জল রাখিলে দেখা যায়, আপতন-রশ্মি খাড়াভাবে পড়িলে আর বাঁকিবে না, জলের মধ্যে খাড়া ভাবে দেখা যাইবে। একটি লাঠি ঐ ভাবে ডুবাইলে ঠিক সোজাই দেখা যাইবে। বাঁকা দেখা যাইবে না।

(৪) পাত্রস্থিত জলের মধ্যে একটি টাকা রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমরা যখনই কোন পদার্থ দেখি, তখন সেই পদার্থ হইতে আলোক-রশ্মি আমাদের চোখে পড়াতে তবে সেই পদার্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। টাকার নিজস্ব দীপ্তি নাই কিন্তু বাহিরের আলোকে

আলোকিত হইয়া আলোক-রশ্মি নির্গত হয়। জলের মধ্যস্থিত টাকা হইতে আলোক-রশ্মি জলের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া বাতাসে প্রবেশ করিল। বায়ু জল অপেক্ষা হালকা, সেজন্য জল হইতে বায়ুতে আসিবামাত্র

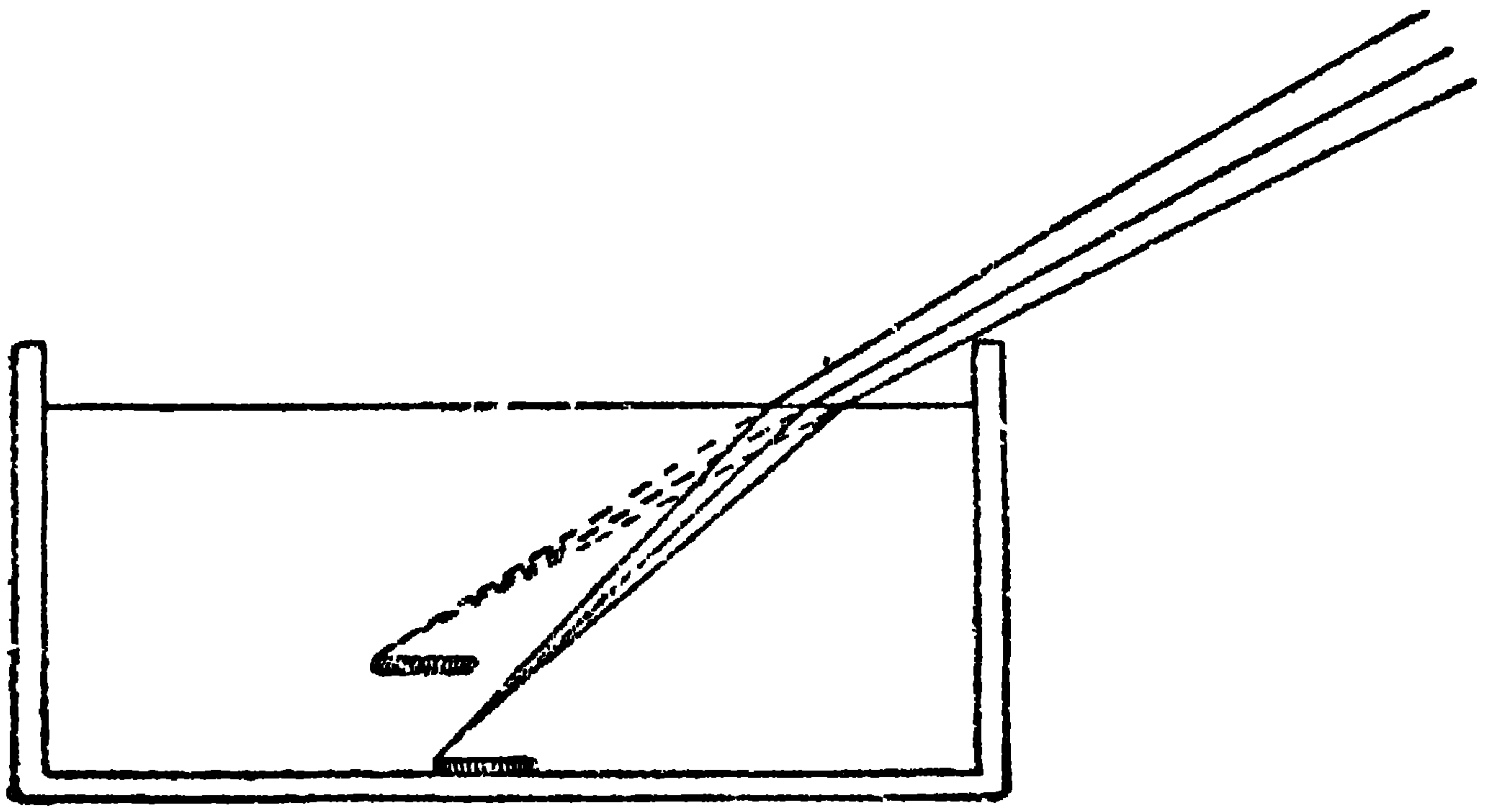

৪১। জলমগ্ন টাকাটি উঁচুতে দেখা যাইতেছে

আলোক-রশ্মি, পাতন-বিন্দুতে জলের সমতলের উপর লম্ব টানিয়া জলের মধ্যে বাড়াইয়া দিলে যে অভিলম্ব হয়, তাহা হইতে দূরে হেলিয়া পড়ে। আমাদের চোখে এই পরিবর্ত্তিত আলোক-রশ্মি আসে। সেজন্য টাকাটা যথাস্থানে না দেখিয়া আমরা তাহা কিঞ্চিৎ উপরে দেখিতে পাই।

এই একই কারণে একগাছা লাঠি খানিকটা জলে বাঁকাভাবে ডুবাইলে যে স্থানে লাঠিটা জলে প্রবেশ করিয়াছে সেখানে উহা দুমড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

নির্দ্দিষ্ট দুইটি নিয়মানুসারে আলোকের প্রতিসরণ ঘটিয়া থাকে।

(১) **আপতন রশ্মি, প্রতিসরণ রশ্মি এবং অভিলম্ব এক সমতলে থাকে।**

(২) **আপতন কোণ ছোট বড় হইলে নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে প্রতিসরণ কোণও ছোট বড় হইবে।**

সঙ্কট কোণ (Critical angle) এবং **সম্পূর্ণ প্রতিফলন** (Total reflection)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আলোক-রশ্মি ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করিলে উহা লম্ব হইতে দূরে হেলিবে। ক খ গ ঘ হইল একটি সমচতুষ্কোণ কাচ-ফলক। ইহার চারিদিকে বায়ু রহিয়াছে। ঢ ছ হইল একটি আলোক-রশ্মি এবং ট ছ ঠ হইল পাতনবিন্দু ছ তে ক খ র উপর অভিলম্ব। উক্ত নিয়মানুসারে ঢ ছ রশ্মি বায়ুতে বাহির হইয়া সরলভাবে ছ জ র দিকে না গিয়া ছ ঝ র দিকে যাইবে অর্থাৎ অভিলম্ব হইতে দূরে হেলিবে। আপতন কোণ ঢ ছ ঠ যত বাড়ান হইবে প্রতিসরণ কোণ ট ছ ঝ তত বাড়িতে থাকিবে। মনে কর ঢ ছ ঠ কোণ বাড়িয়া এমন একটি কোণে (ড ছ ঠ তে) পরিণত হইল যে ড ছ রশ্মিটি বায়ুতে বাহির হইবার সময় কাচ-ফলকের ক খ পৃষ্ঠ ঘেঁষিয়া ছ খ র দিকে চলিয়া গেল অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ হইল ট ছ খ (= ৯০° ডিগ্রী)। উক্ত ড ছ ঠ আপতন কোণকে সঙ্কট কোণ বলা হয়। অর্থাৎ **আলোক রশ্মি ঘনতর হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করিবার সময় পাতন বিন্দুতে লম্বের সহিত যে আপতন কোণ সৃষ্টি করিলে প্রতিসরণ রশ্মি লম্বের সহিত সমকোণ সৃষ্টি করে সেই আপতন কোণকে সঙ্কট কোণ** বলা হয়।

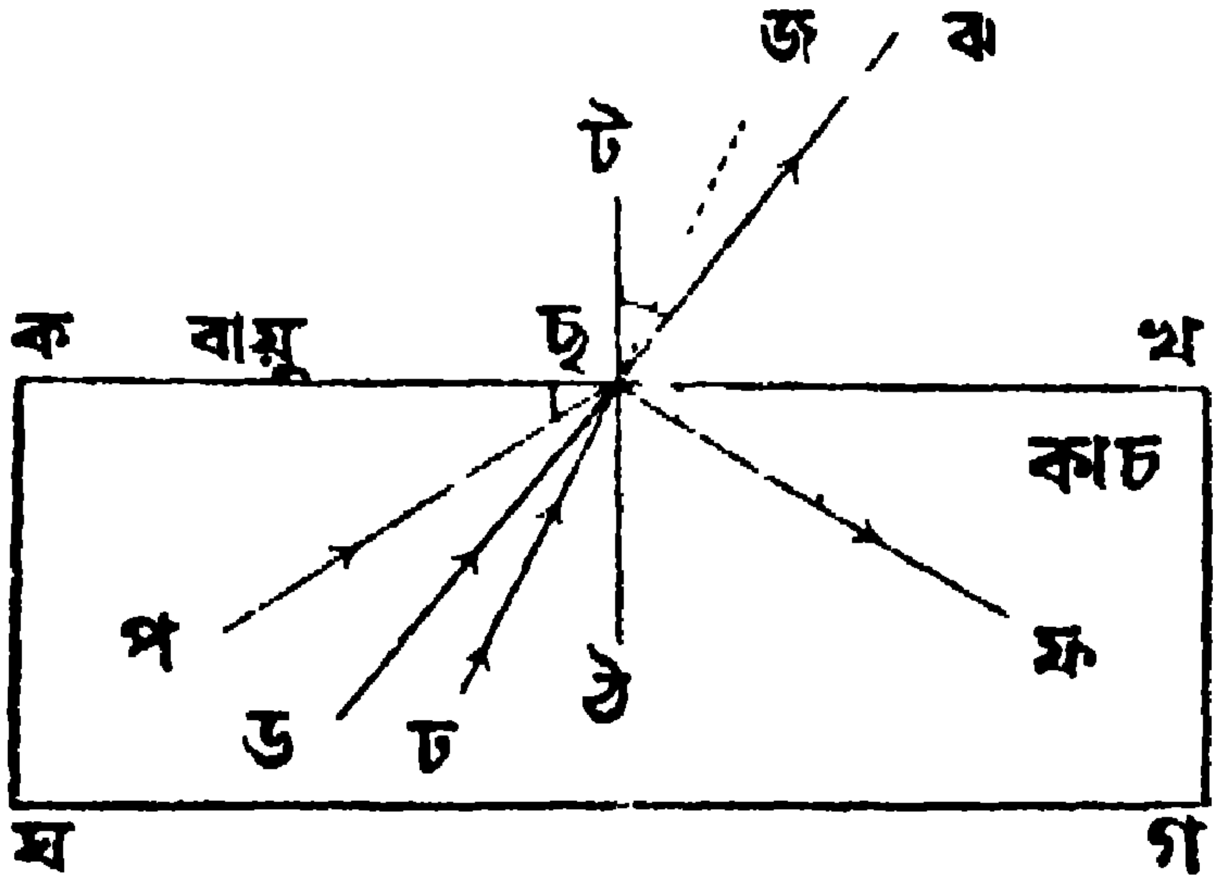

৪২। সঙ্কট কোণ ও অসম্পূর্ণ প্রতিফলন

আপতন কোণ ইহার অধিক হইলে আর প্রতিসরণ হয় না, তখন আলোক-রশ্মির **সম্পূর্ণ প্রতিফলন** হয়। চিত্রে পছ রশ্মি সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া ছফ'র দিকে যাইতেছে।

মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকা (Mirage)—মরুভূমির বালুকারাশি সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইলে তাহার উপরিস্থ বায়ুস্তর হাল্কা হয় এবং তাহারও উপরিস্থ বায়ুস্তরের সহিত ঘনত্বের প্রভেদ ঘটে। বস্তুতঃ উত্তপ্ত বালুকারাশির সংস্পর্শে আসিয়া বায়ুর নিম্নস্তরগুলি লঘুতাপ্রাপ্ত হয় ও উচ্চতর স্তরগুলি ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত ঘনতাপন্ন থাকে। ফলে মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকা নামক কৌতূহলপ্রদ প্রাকৃতিক ঘটনা অনেক সময় ঘটিয়া থাকে।

বায়ুমণ্ডলের স্তর নিম্ন হইতে উর্দ্ধ দিকে ক্রমশঃ ঘন হইতে থাকে। সুতরাং সূর্য্যরশ্মি যখন উপর হইতে নীচের দিকে আসে তখন উহা ক্রমশঃ ঘন হইতে পাতলা স্তরে প্রবেশ করে। অতএব যতই নীচের দিকে আসে, আপতন বিন্দুতে উত্তোলিত অভিলম্ব হইতে ততই দূরে সরিয়া যায় অর্থাৎ আপতন কোণ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। অবশেষে আপতন কোণ যখন সঙ্কট কোণ অতিক্রম করে তখন ঐ রশ্মি প্রতিসৃত না হইয়া সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া আবার উর্দ্ধদিকে চলিতে থাকে।

মনে কর কখ আলোকরশ্মি একটি বৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে পুনঃ পুনঃ প্রতিসৃত হইয়া ক্রমে ঘ বিন্দুতে আসিয়া সম্পূর্ণ

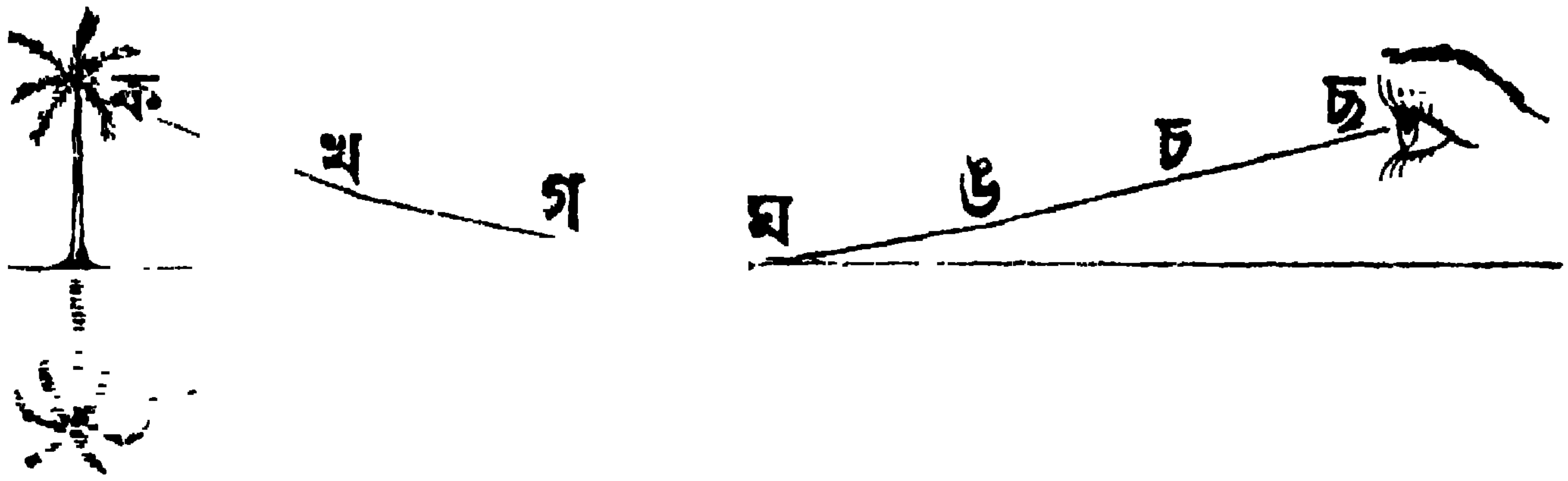

৪৩। মরীচিকা

প্রতিফলিত হইল। এই প্রতিফলিত রশ্মি এখন পাতলা হইতে ক্রমেই অধিক ঘনস্তরের মধ্য দিয়া চলিতেছে। অতএব উহা যত উপরে যাইতেছে

ততই অভিলম্বের দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। চ ছ রশ্মি কোন দর্শকের চোখে পড়িলে সে ক'র প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে।

মরুভূমির অন্তর্গত **মরূদ্যান** (oasis) এর গাছপালা হইতে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি এইরূপে বায়ুস্তরের মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিসৃত এবং অবশেষে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়। পরে পুনরায় প্রতিসৃত হইয়া যখন দর্শকের চোখে পড়ে তখন সে গাছের তলায় গাছের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। গাছ ও গাছের প্রতিবিম্ব একসঙ্গে দেখাতে মনে হয় নিশ্চয়ই ঐ স্থানে জলাশয় আছে। ইহাকে **মৃগতৃষ্ণিকা** বলে।

নাবিকেরা সময় সময় সমুদ্রমধ্যে জাহাজে থাকিয়া সমুদ্রতীরস্থ নগরের প্রতিবিম্ব আকাশের গায়ে দেখিতে পায়। তাহারও কারণ আলোক-রশ্মির প্রতিসরণ।

বর্ণ ও রামধনু

বর্ণ-বৈচিত্র্য ও আলোক—সকল পদার্থেরই একটা নিজস্ব বর্ণ আছে। এই বর্ণভেদের সহিত আলোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আলোক-শক্তি ইথারের মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, আর সেই তরঙ্গ চক্ষুতে প্রবেশ করিলে আমরা আলোকোদ্ভাসিত পদার্থ দেখিতে পাই। আলোকদ্বারা যতগুলি তরঙ্গের সৃষ্টি হয় সবগুলির **তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য** (wave-length) সমান নহে। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ হইতে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়। লোহিতবর্ণের তরঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বেগনি বর্ণের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। অন্ততঃ, যে তরঙ্গগুলি আমরা চক্ষে ধরিতে পারি, তাহার এই দুই সীমা। **অবলোহিত** (infra-red) বা **অতি-বেগনি** (ultra-violet) বলিয়া যে কিরণ আছে তাহা বিজ্ঞান-জগতে পরিচিত হইলেও আমাদের দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত। যে বর্ণগুলি আমরা দেখিতে পাই

তাহারা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ক্রম অনুসারে সাত ভাগে বিভক্ত—বেগনি, গাঢ়নীল, নীল, হরিৎ, পীত, নারঙ্গ ও লোহিত (violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red)। রামধনুতে এই সাতটি বর্ণই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যের সাদা আলোতে এই সাতটি বর্ণই আছে। ইহাদের সংমিশ্রণেই সাদা বর্ণ উৎপন্ন হয়।

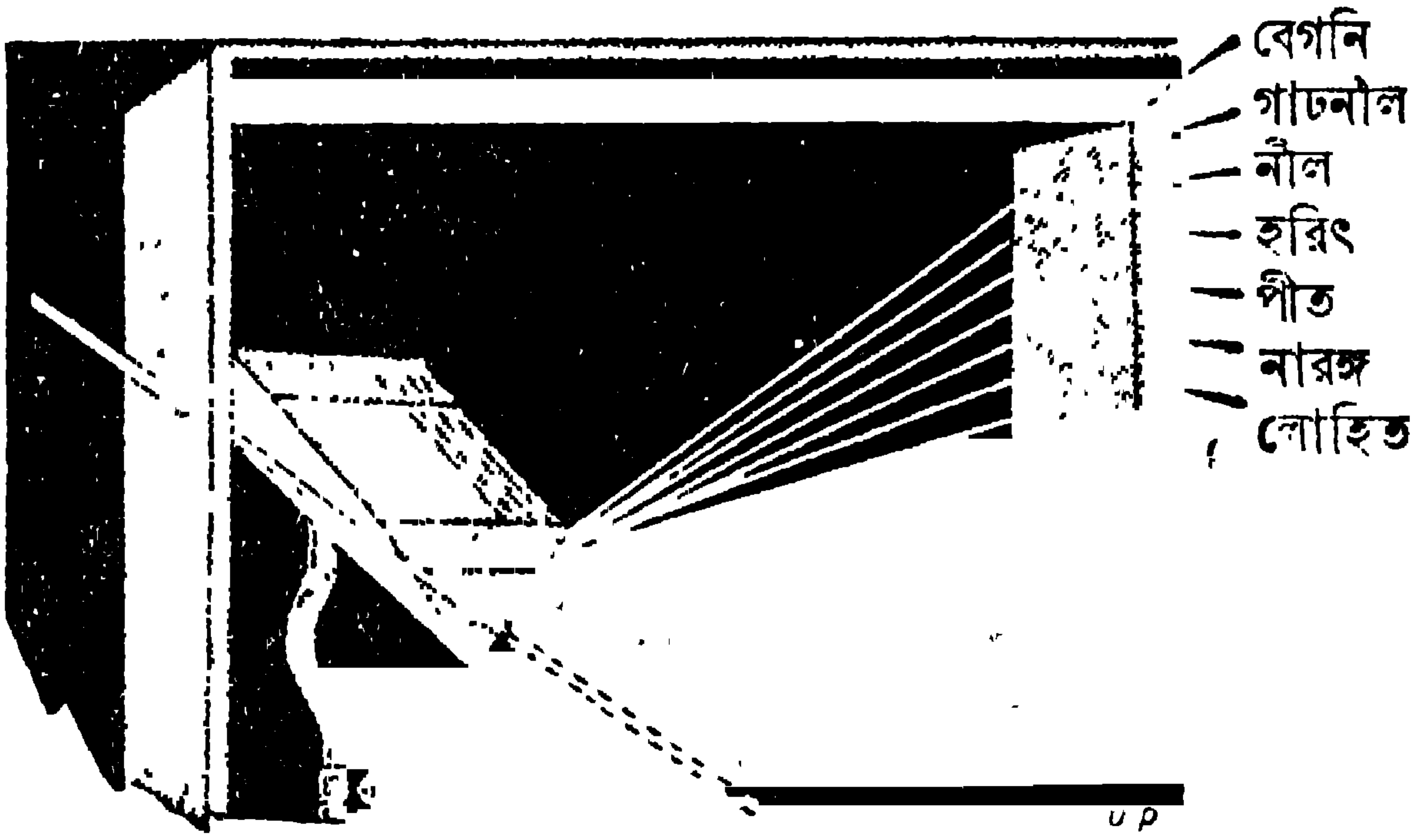

৪৪। আলোক বিচ্ছুরণ

আলোক বিচ্ছুরণ (Dispersion of light)—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্যার আইজাক নিউটন (Newton) সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পান **সূর্য্যের আলোক-রশ্মি কাচের ত্রিফলকের বা প্রিজমের (Prism) মধ্য দিয়া যাইবার সময় বাতাস হইতে কাচ ও কাচ হইতে বাতাস এই দুই প্রকার মাধ্যমের দ্বারা দুইবার প্রতিস্থত হইয়া অপরদিকে বাঁকিয়া বাহির হয়।** ছবিতে দেখ বামদিক হইতে আলোকরশ্মি ত্রিফলকে প্রবেশ করিয়া সরল রেখায় না গিয়া একটু বাঁকিয়া ত্রিফলকের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া আবার দ্বিতীয়বার বাঁকিয়া পূর্ব্বোক্ত ৭টি উপাদানে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই

বর্ণমালাকে **বর্ণালী** (Spectrum) কহে। সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোক-রশ্মি যখন বিচ্ছুরিত হয়, তখন উহারা ভিন্ন ভিন্ন পথে বাঁকিয়া যায় ও সেকারণ উহাদিগকে বর্ণালীতে পৃথক্‌ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ণ (Colour)—জবা গাছের পাতা সবুজ কেন, জবাফুল লাল কেন ? সূর্য্যের সাদা আলো জবাফুলের উপর পড়িলে জবাফুল একপ্রকার তরঙ্গ ব্যতীত অপর সকল তরঙ্গ শোষণ করিয়া লয়। জবাফুল যে তরঙ্গ শোষণ করে না সেই তরঙ্গ প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে। তাই জবাফুল লোহিত বর্ণ দেখি। পাতা যে তরঙ্গ শোষণ করে না, তাহা সবুজের জন্মদাতা। অতএব পাতা সবুজ। সাদা কাগজ কোন তরঙ্গই শোষণ করে না, তাহাতেই সে সাদা। কাল আলপাকার কাপড় সমস্ত তরঙ্গ শোষণ করে, তাহাতে সে কাল। এই জন্যই বৈজ্ঞানিকগণ কাল বর্ণের পদার্থকে বর্ণহীন বলেন।

লাল আলোকে লাল ফুল দেখিলে ফুলের বর্ণ আরও লাল দেখায়। কারণ লাল ফুল লাল আলো ব্যতীত অন্যান্য আলো শোষণ করে। সবুজ আলোকে লাল ফুল দেখিলে উহা কাল দেখাইবে, কারণ লাল ফুল সবুজ-রশ্মি শোষণ করিবে। উহা হইতে আর কোনও আলোক প্রতিফলিত হইবে না।

মিশ্রবর্ণ—পৃথিবীতে উপরি উক্ত সাত বর্ণ ছাড়া আরও অনেক বর্ণ আছে। তাহারা সকলেই মিশ্রবর্ণ। রামধনুর সাত বর্ণের মধ্যেও মিশ্রবর্ণ আছে। যথা, সবুজ = নীল + পীত, ইত্যাদি। সময় সময় মাত্র দুইটি বর্ণ মিশ্রিত হইয়া শ্বেতবর্ণ উৎপন্ন হয়। যথা—হরিৎ ও লোহিত, নারঙ্গ ও নীল ইত্যাদি। ইহাদের একটি বর্ণকে অন্যটির পরিপূরক বর্ণ কহে।

রামধনু (Rainbow)—বায়ুমণ্ডলে জলকণা সর্ব্বদা ভাসে। এই জলকণাগুলি যখন বড় হয় তখন প্রিজ্‌মের কাজ করে। সূর্য্যরশ্মি ঐ সকল জলকণা দ্বারা বিচ্ছুরিত হইয়া সূর্য্যের বিপরীত দিকে আকাশের গায় যে

বর্ণালীর সৃষ্টি করে তাহাই রামধনু। জলকণা যদি সাধারণ প্রিজ্‌মের মত সূর্য্য-রশ্মিকে বাঁকাইয়া দিত তবে চিত্রের সূর্য্যকে খশ'র দিকে দেখা যাইত। কেন না সব আলোক-রশ্মি ক খ গ ঘ জলকণার মধ্যে প্রতিসৃত হইয়া জলকণার অপরদিক দিয়া খ ঙএর দিকে বাহিত হইত। এখন চক্ষু ঙ স্থানে রাখিলে সূর্য্যের বর্ণালীকে ঙ খ শ'র দিকে দেখা যাইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য-রশ্মি জলকণাতে শুধু প্রতিসৃত হয় না; কতক সূর্য্য-রশ্মি জলকণাতে

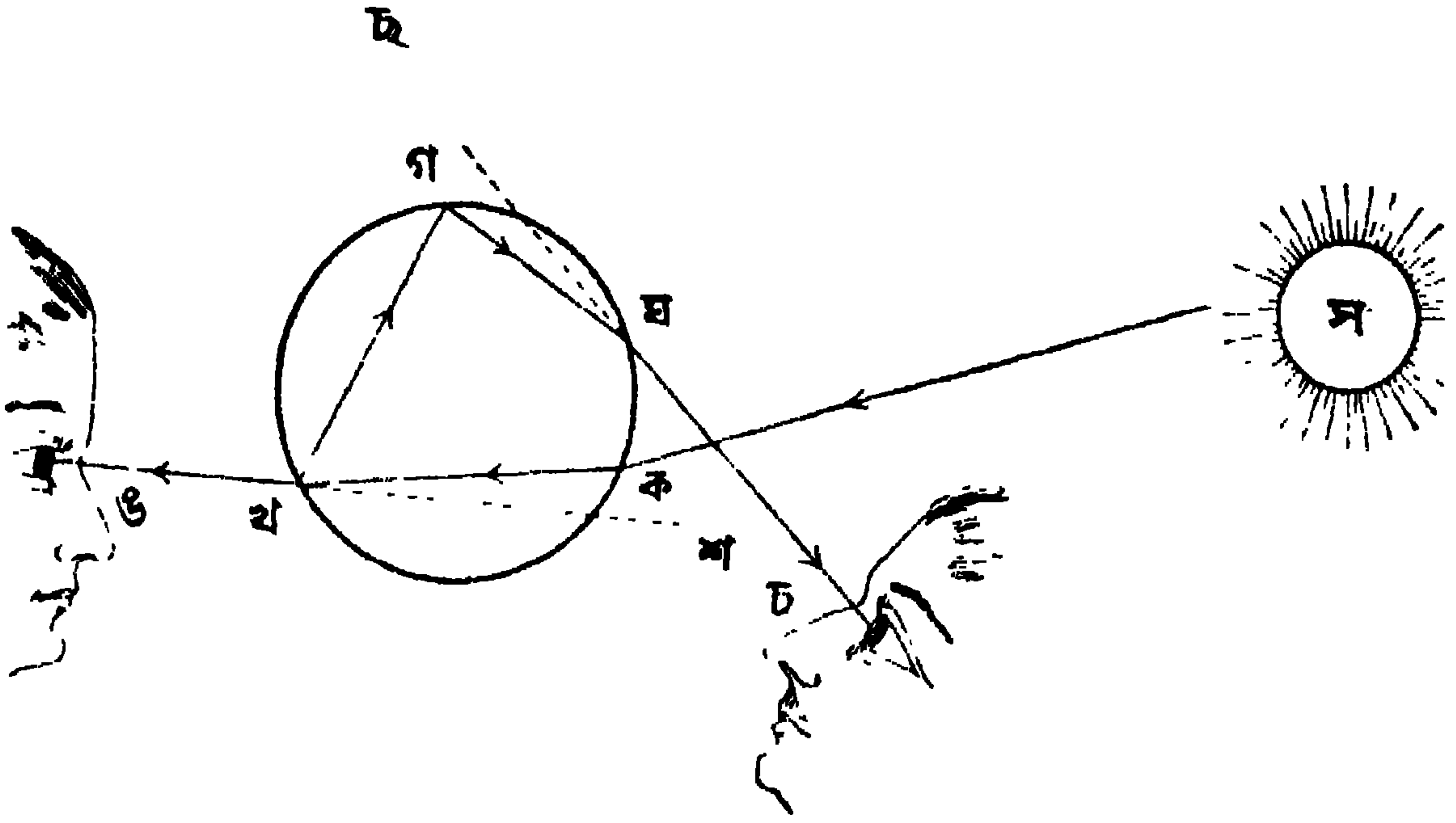

৪৫। জলকণায় বর্ণালী সৃষ্টি [ছবিতে জলকণাকে অনেক গুণ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে।]

এমন দিকে প্রবেশ করে যে, জলকণার অভ্যন্তরে উহাদের আপতন কোণ সঙ্কট কোণ ৪৯° ডিগ্রী অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী হয়। তখন ঐ রশ্মিগুলি জলকণার অভ্যন্তরেই পূর্ণ প্রতিফলিত হয়। কতক রশ্মি আবার জলকণার মধ্যে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ প্রতিফলিত হয়। চিত্রে খ ও গ বিন্দুতে একটি আলোকরশ্মি দুইবার পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে এবং অবশেষে সূর্য্য যে দিকে অবস্থিত, সেই দিকেই ঘ চ রেখারূপে বায়ুতে বাহির হইয়াছে। সুতরাং চ স্থানে স্থাপিত চক্ষুতে সূর্য্যের বর্ণালীকে ঘ ছ রেখার উপর ছ স্থানে দেখা যাইতেছে অর্থাৎ সূর্য্যের বর্ণালী সূর্য্যের বিপরীত দিকে

দেখায়। কাজেই রামধনু পূর্ব্বাহ্নে পশ্চিম আকাশের গায় ও অপরাহ্নে পূর্ব্বাকাশের গায় দেখা যায়। সূর্য্য দিগন্ত হইতে খুব উঁচুতে থাকিলে রামধনু দেখা যায় না, সেকারণ ঠিক দুপুরে রামধনু হয় না।

বৃষ্টির ঠিক আগে বা পরে জলকণাগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হয় এবং তখনই তাহারা প্রিজ্‌মের কাজ করিতে পারে। এবং সেকারণ ঐ সময়ই রামধনু উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। রামধনু সর্ব্বদাই ধনুকের আকৃতি হয় এবং তাহার উপর দিকে লাল ও নীচের দিকে বেগনি বর্ণ থাকে।

কখনও কখনও একটি রামধনুর উপর আর একটি রামধনু দেখা যায়। ইহা তত স্পষ্ট নয়। জলকণা মধ্যে বিশ্লিষ্ট সূর্য্যালোকের দুইবার **প্রতিসরণের** ও **প্রতিফলনের** জন্য ঐরূপ দেখা যায়।

রামধনু যে কেবল আকাশের জলকণাতেই দেখায় তাহা নহে, ঝরণার জলে সূর্য্যের দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইলে বৃত্তাকার বর্ণালী দেখা যায়। এমন কি মুখে করিয়া জল লইয়া ফুঁ দিয়া বিক্ষিপ্ত করিলে জলকণাগুলির মধ্যেও সূর্য্যের বর্ণালী দৃষ্ট হয়।

Questions

1. How would you prove that light travels in a straight line?
2. What are the laws of reflection of light? Explain how the periscope of a submarine works. (C. U. 1942)
3. What do you mean by refraction of light? Give examples.
4. Why does a stick partly dipped in water look bent? Explain with the help of a sketch. (C. U. 1945)
5. Explain the following observations:—
   (a) The image of a right hand formed by a plane mirror looks like a left hand.
   (b) A small coin is placed at the bottom of a cup and the eye is moved until the coin is just completely hidden by the edge of the cup. When water is poured into the cup, the coin again becomes visible.
   (c) The edges of a pin, when viewed through a prism, appear coloured. (C. U. 1947)
6. Explain the formation of mirage.
7. Explain the phenomenon of the rainbow. (C. U. 1940, 1943)

ষষ্ঠ অধ্যায়

চুম্বক (Magnet)

চুম্বক পাথর (Lodestone)

এই পাথর এক লৌহঘটিত খনিজ পদার্থ। এসিয়া মাইনর, সুইডেন ও স্পেন দেশের খনিতে চুম্বক পাথর পাওয়া যায়। চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশের লোকেরা ইহার অদ্ভুত গুণাবলী প্রথম লক্ষ্য করেন। এই প্রস্তর এক খণ্ড সূতা দিয়া ঝুলাইয়া দিলে তাহা সকল অবস্থাতেই উত্তর দক্ষিণে লম্বা হইয়া ঝুলিবে, এবং তাহার সন্নিকটে লৌহখণ্ড ধরিলে সেই লৌহখণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হইবে। এই পদার্থের যে দিকটা উত্তরদিকে থাকে তাহাকে **উত্তর মেরু** (North pole) এবং তাহার যে দিকটা দক্ষিণদিকে থাকে তাহাকে **দক্ষিণ মেরু** (South pole) বলা হয়। মেরু দুইটি যোগ করিয়া যে রেখা কল্পিত হয়, উহাকে চুম্বকের **মেরুদণ্ড** (axis) বলা হয়। খানিকটা লৌহচূর্ণের মধ্যে যদি চুম্বক পাথর ঢুকান হয় ত দেখিবে যে দুই প্রান্তে অনেক লৌহচূর্ণ আটকাইয়া রহিয়াছে। মধ্যবর্ত্তী স্থানে আকর্ষণ ক্রমেই কম এবং ঠিক মাঝখানে আকর্ষণশক্তি একেবারেই নাই।

চুম্বকের আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি (Magnetic attraction and repulsion)—দুই খণ্ড চুম্বকের পরস্পর আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিবার ক্ষমতাকে চৌম্বক শক্তি বলে। দুইটি চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে একের উত্তর মেরু (উ) অন্যের উত্তর মেরুর নিকটে লইয়া গেলে উহারা পরস্পর দূরে সরিয়া যায়। অর্থাৎ উত্তর মেরু উত্তর মেরুকে বিক্ষিপ্ত করে, আকর্ষণ করে না। সেইরূপ একের দক্ষিণ

মেরু (দ) অন্যের দক্ষিণ মেরুকে বিক্ষিপ্ত করিবে, আকর্ষণ করিবে না। কিন্তু উভয় মেরুই সাধারণ লৌহকে সমান আকর্ষণ করে। এক চুম্বকের

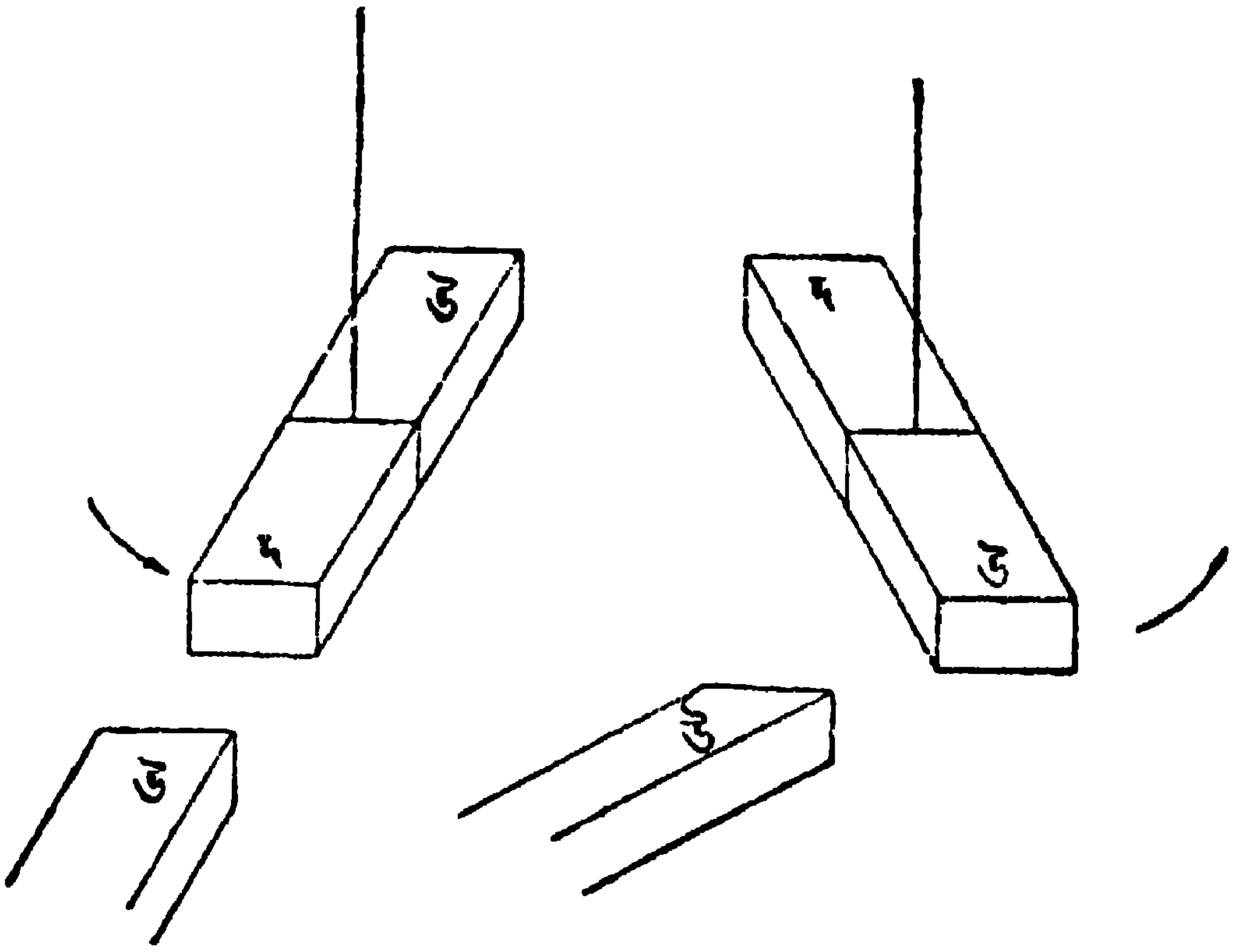

৪৬। চুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ

উত্তর মেরু অপর চুম্বকের বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ মেরুকে খুব জোরে আকর্ষণ করে। মোট কথা, **সমমেরুর মধ্যে বিকর্ষণ ও বিপরীত মেরুর মধ্যে আকর্ষণ চুম্বকের একটি স্বভাবজাত ধর্ম্ম।**

একটি চুম্বককে ২।৩ খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেল দেখিবে প্রত্যেক খণ্ড এক একটি স্বতন্ত্র চুম্বকে পরিণত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটির দুইটি মেরু আছে। ভাঙ্গার পর কোন মেরু কোন দিকে থাকিবে তাহা চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে। মনে রাখিও **প্রত্যেক চুম্বকের দুইটি করিয়া মেরু থাকিবেই। এক মেরু বিশিষ্ট চুম্বক হয় না।**

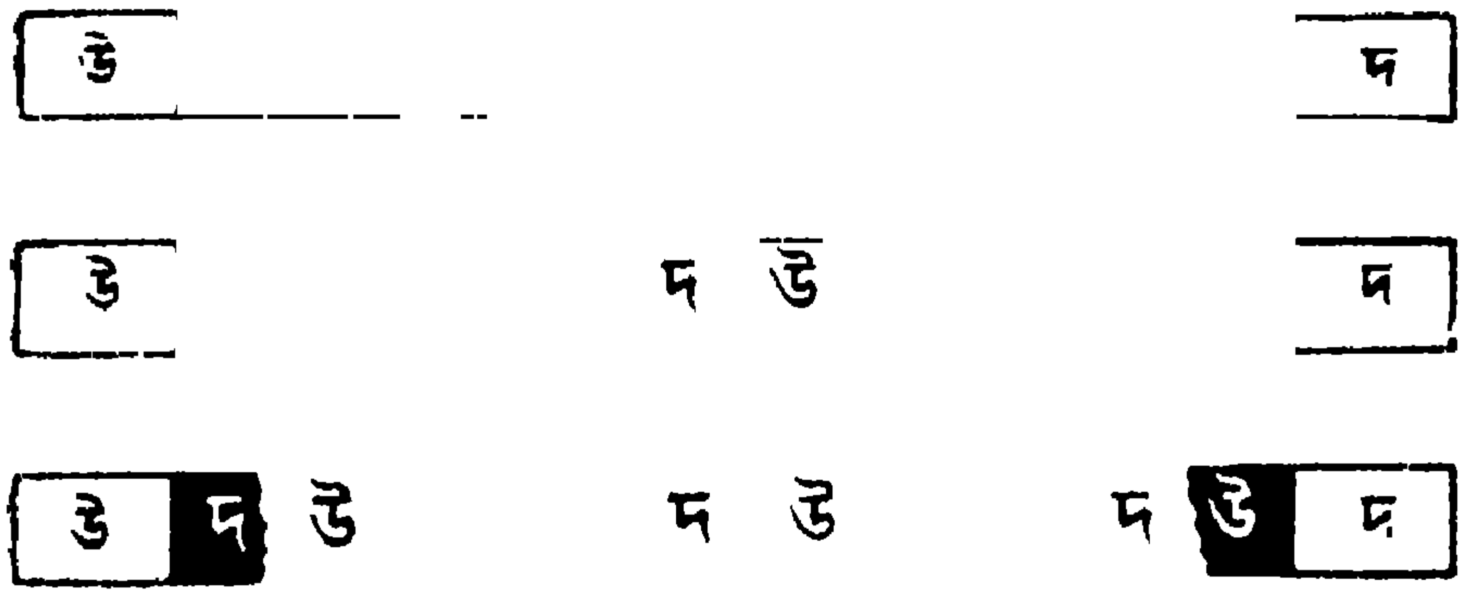

৪৭। ভাঙ্গিলে প্রত্যেক চুম্বকের দুইটি করিয়া মেরু থাকিবে

বিভিন্ন পদার্থের চুম্বকত্ব—লোহা, ইস্পাত, নিকেল, প্রভৃতি ধাতব পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং ইহাদিগকে চুম্বকে পরিণত করা যায়। কাঠ, কাগজ, কাচ, দস্তা, তামা প্রভৃতি পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না বা ইহাদিগকে চুম্বকে পরিণত করা যায় না। কিন্তু চুম্বক ও লৌহের মাঝখানে কাগজ বা কাচ প্রভৃতি রাখিলেও চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

কৃত্রিম চুম্বক—প্রাচীনেরা চুম্বক পাথরই চিনিতেন, কৃত্রিম চুম্বকের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল না। আজ পণ্ডিতেরা কৃত্রিম চুম্বকের সন্ধান পাইয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ দুই প্রণালীতে প্রস্তুত হয়—(১) ঘর্ষণ প্রণালী, (২) বৈদ্যুতিক প্রণালী।

চুম্বকন ঃ বিদ্যুৎ-চুম্বক

(Magnetisation : Electro-Magnet)

চুম্বকন (Magnetisation)—একখণ্ড সাধারণ লোহাকে চুম্বকের যে কোনও মেরু দ্বারা এক দিক হইতে অন্য দিক পর্য্যন্ত কয়েক বার ঘষিলে ঐ লোহার মধ্যে চৌম্বক শক্তির আবির্ভাব হইবে।

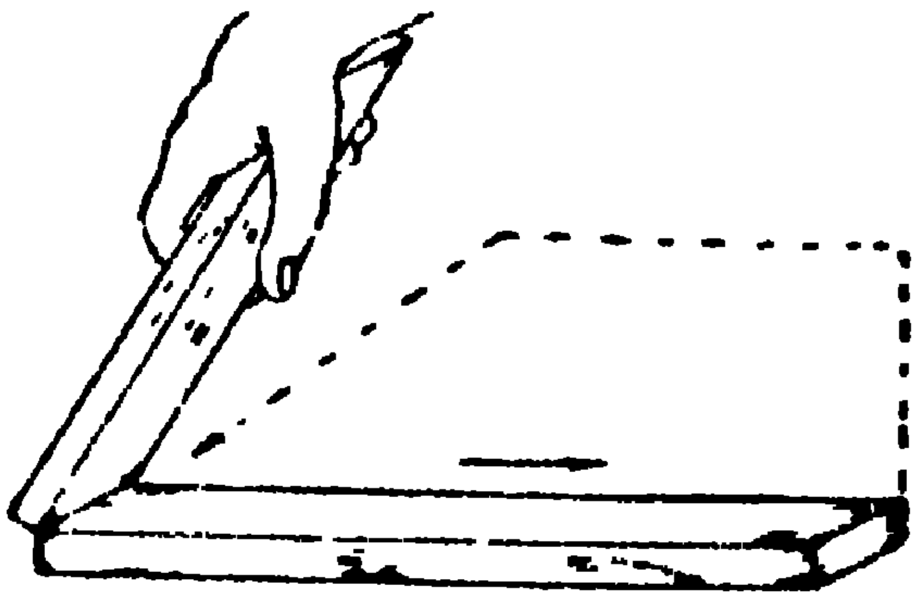

৪৮। লৌহকে চুম্বকিত করা

কিন্তু সঠিক প্রণালীতে ঘসা চাই। চুম্বকের যে মেরু দিয়া ঘসিতে আরম্ভ করিয়াছ সেই মেরু দিয়াই ঘসিতে হইবে। সাবধান, অন্য মেরু দ্বারা ঐ লৌহকে স্পর্শ করিতে নাই। বেশী শক্তিশালী চুম্বক এইভাবে পাওয়া যায় না

বিদ্যুৎ-চুম্বক—স্থায়ী শক্তিমান চুম্বক প্রস্তুতকরণে বৈদ্যুতিক শক্তি আবশ্যক। খানিকটা রেশমসূত্র পরিবেষ্টিত বিজলীর তার লইয়া একটি সোজা কিংবা ঘোড়ার ক্ষুরাকৃতি কোমল লৌহের চারিদিকে জড়াও, যেমন কাটিমে সূতা জড়ান থাকে। বাহিরের বিজলীর তারে কিছুক্ষণ বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাও। তারপর সোজা বা বাঁকা লৌহটি পরীক্ষা

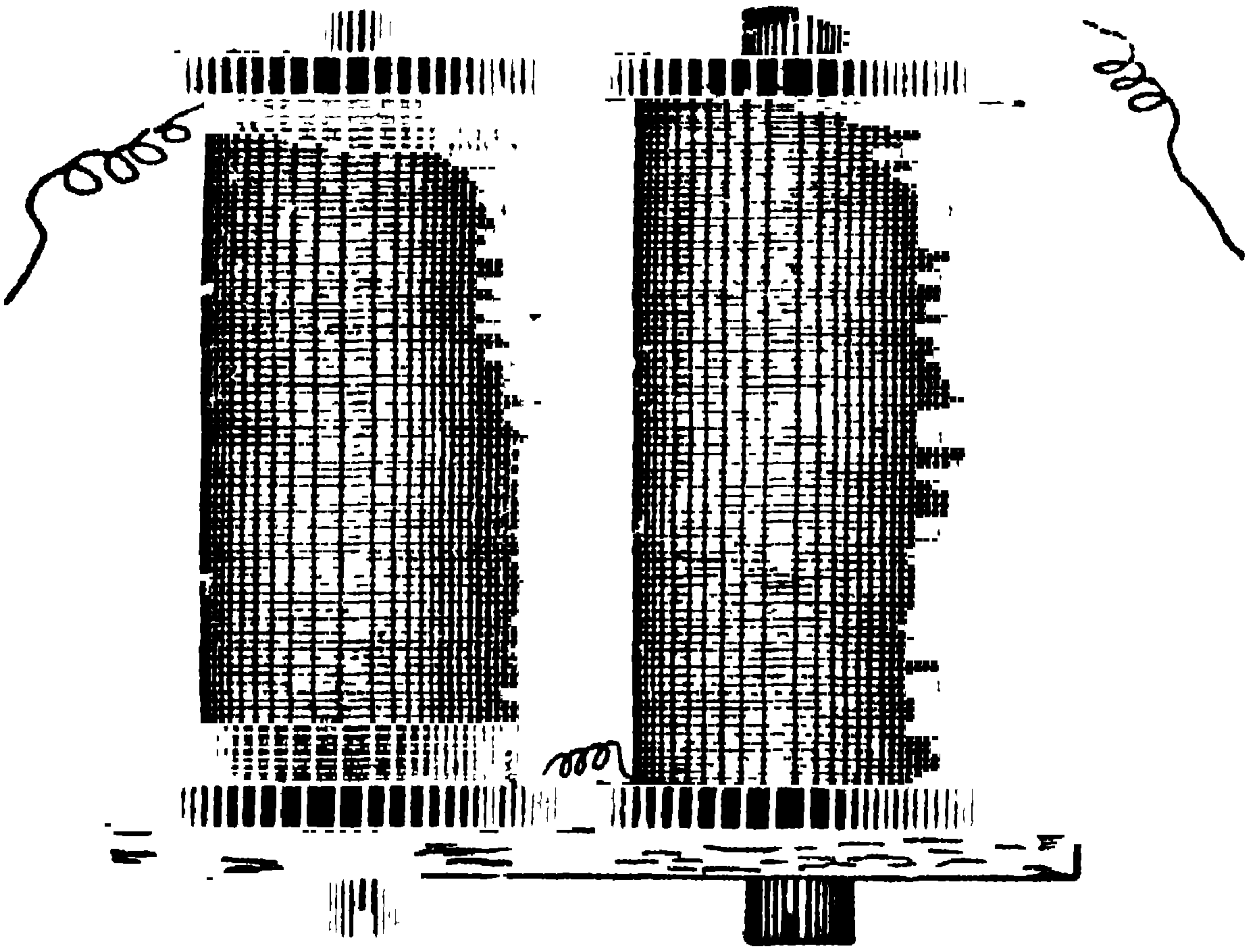

৪৯। বিদ্যুৎ-চুম্বক

করিলে দেখিবে উহা চুম্বক হইয়া গিয়াছে। ইহাকে **বিদ্যুৎ-চুম্বক** (electro-magnet) কহে। লৌহ যদি অঙ্গারবিহীন (soft iron) হয় ত বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইবার পর চুম্বকশক্তি থাকিবে না; কিন্তু যদি অঙ্গারমিশ্রিত লৌহ অথবা ইস্পাত হয়, তবে তাহার চুম্বকশক্তি একরকম স্থায়ী হইয়া যাইবে। এই বিদ্যুৎ-চুম্বকের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (electric bell) ও টেলিগ্রামের যন্ত্র কাজ করে।

চৌম্বক শক্তি নষ্টের উপায়—কৃত্রিম উপায়ে যেমন চুম্বক তৈয়ার করা যায়, তেমনই কৃত্রিম উপায়ে চৌম্বক শক্তি নষ্টও করা যায়। একখণ্ড চুম্বক লইয়া আগুনে দাও, কিছুক্ষণ পরে দেখিবে উহা সাধারণ লোহা হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাপশক্তির প্রভাবে চৌম্বক শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে। যদি আগুনে না দিয়াও কয়েকবার জোরে আছড়াইয়া ফেল বা নাড়া দেও তাহা হইলেও চৌম্বক শক্তি নষ্ট হইবে।

ভূচুম্বকত্ব ও দিগ্‌দর্শী
(Terrestrial Magnetism and Compass)

ভূচুম্বকত্ব (Terrestrial magnetism)—চুম্বককে ঝুলাইলে উত্তর-দক্ষিণ মুখ করিয়া দাঁড়ায় কেন? কারণ তাহার এক প্রান্ত পৃথিবীর উত্তর মেরুর দ্বারা এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণ মেরুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আমাদের **পৃথিবী নিজে একটি প্রকাণ্ড চুম্বক**। তাই সে চুম্বক পাথরকে বা চুম্বক লোহকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করিয়া রাখে, কিন্তু পৃথিবী লৌহ কি চুম্বক দ্বারা প্রস্তুত নয়। কেহ মনে করিতে পারে যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে একটি বিরাট চুম্বক রহিয়াছে; কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তর এত উত্তপ্ত যে ঐ উষ্ণতায় কোন চুম্বকেরই চুম্বকত্ব থাকিতে পারে না। কারণ চুম্বককে খুব উত্তপ্ত করিলে উহার চুম্বকত্ব নষ্ট হয়। সেজন্য মনে করিতে হইবে যে, পৃথিবীর বহিরাবরণের শুধু একটি পাতলা অংশ মাত্র চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার সঠিক কারণ আজও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

পৃথিবীর চুম্বকত্বের দৈনিক সামান্য পরিবর্ত্তন হয়। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, বিবিধ কারণে উচ্চাকাশে বিদ্যুৎ-প্রবাহ জন্মে এবং ইহার জন্যই পৃথিবীর চুম্বকত্বের দৈনিক পরিবর্ত্তন ঘটে।

দিগ্‌দর্শী (Compass)—সমুদ্রে চলাচলের সময় দিগ্‌ভ্রম হইলে নানারূপ বিপদের সম্ভাবনা। এই যন্ত্র নির্ম্মিত হওয়ার পূর্ব্বে নাবিকগণ ধ্রুবতারা দেখিয়া জাহাজ চালাইতেন। কিন্তু তাহাতেও বিপদ ছিল অনেক। একে ত দিনের বেলায় তারা দেখা যায় না, তার উপর ঝড়বাদলের সময় যখন দিক্ নির্ণয়ের বেশী প্রয়োজন তখন ধ্রুবতারা মেঘের আড়ালে লুকাইয়া থাকে।

জাহাজের দিগ্‌দর্শী এমন স্থানে রাখা হয় যে নিকটে কোন লোহার জিনিস না থাকে। যন্ত্রটি দেখিতে ঘড়ির মত। উপরে কাচের ঢাকন, তাহার নীচে গোল কাগজের চাকতি। চাকতির পরিধির উপর ৩৬০° ডিগ্রী আঁকা ও চাকতিটি ৩২ ভাগে বিভক্ত। নীচে একটি পাতলা অথচ জোরাল চুম্বক এমন ভাবে আঁটা আছে যে ইহা সহজেই ঘুরিতে ফিরিতে পারে। চুম্বক ও চাকতি এক **অ্যাগেট পাথরের** (agate) কীলকের উপর আলগা ভাবে রহিয়াছে। অ্যাগেট দেওয়া এই জন্য যে, উহা ঘষায় সহজে ক্ষয় হইবে না। জাহাজ যে মুখে ঘুরুক ফিরুক, চুম্বক উত্তর-দক্ষিণে মুখ করিয়াই থাকিবে। কাপ্তেন ইহার সাহায্যে যখন ইচ্ছা দিক্ নির্ণয় করিতে পারেন।

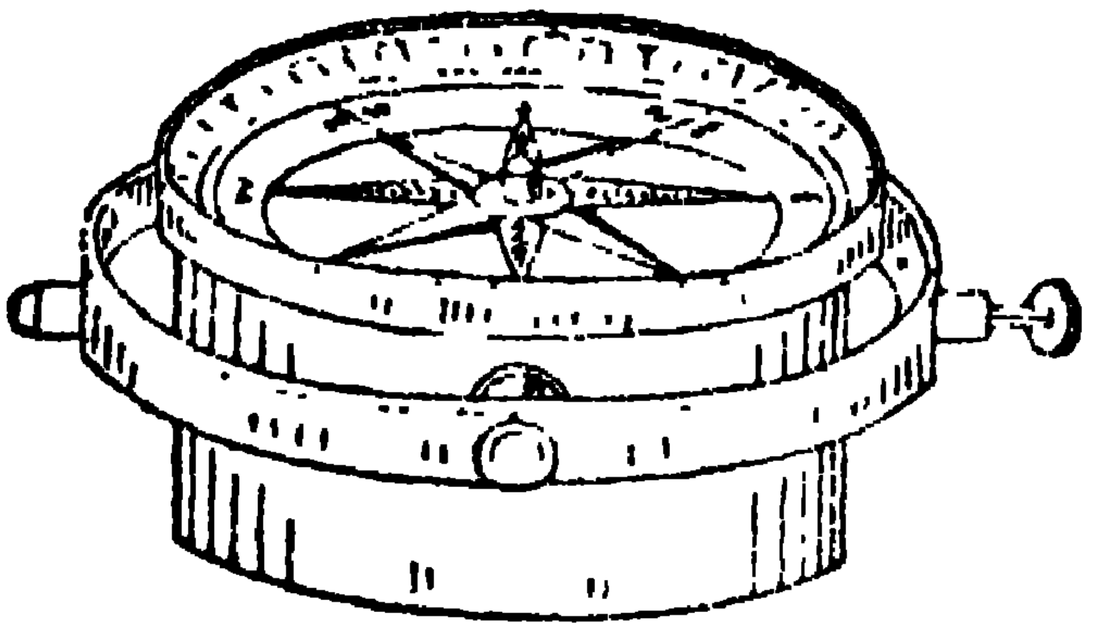

৫০। দিগ্‌দর্শী

Questions

1. What is lodestone?
2. What is an electro-magnet? Describe an instrument in which an electro-magnet is used. (C. U. 1947)
3. What is an electro-magnet? Mention some important uses to which it has been put. (C. U. 1943)
4. What is a compass? What is it used for?
5. "The earth is a magnet." Explain. (C. U. 1941)

সপ্তম অধ্যায়

বিদ্যুৎ (Electricity)

বিদ্যুৎ—তাপ, শব্দ ও আলোক যেমন শক্তি, বিদ্যুৎও তেমনই এক শক্তি। এই শক্তি সহজেই তাপ, শব্দ ও আলোকে পরিণত হইতে পারে। মেঘের ভারী জলকণা যখন বেগে নীচের দিকে পড়ে, তখন এই জলকণা-সমষ্টির মধ্যে ও উপরের স্তরের মেঘের মধ্যে বিপরীত ধর্ম্মী (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়। এই দুই বিপরীত ধর্ম্মী বিদ্যুতের মোক্ষণ (discharge) ঘটিলে তাহাকে বিদ্যুৎ চমকান বলে। আওয়াজটাকে মেঘের গর্জ্জন বলা হয়। গাছ কি বাড়ীর উপর বিজলী পড়িয়া যখন গাছ ও বাড়ী জ্বালাইয়া দেয়, তখন ইহার তাপ বা দাহিকা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষ এই বিদ্যুৎকে নানা কাজে লাগাইয়াছে। ট্রেণ বিদ্যুতের জোরে চলে। কত বড় বড় কারখানা চালায় এই বিদ্যুৎশক্তি। ইহারই জোরে ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে। ইহারই সাহায্যে টেলিফোন টেলিগ্রাফ কত দূরে দূরে সংবাদ বহন করিতেছে। ক্ষুদ্র টর্চ্চ বাতিটি পর্য্যন্ত জ্বলিতেছে বিজলীর শক্তিতে

বিদ্যুৎপ্রবাহ ও বেতার বার্ত্তা—বিদ্যুৎ যখন তার দিয়া বহিয়া যায় তখন তাহাকে **বিদ্যুৎ-প্রবাহ** কহে। তোমরা যে রেডিও শোন, তাহা আলোকজাতীয় একপ্রকার বিকিরণের সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হয়। এই বৈদ্যুতিক বিকিরণ দেশবিদেশ হইতে যে সংবাদ লইয়া আসে তাহার নাম **বেতার বার্ত্তা**।

বিদ্যুৎশক্তির আবির্ভাব পরীক্ষা—(১) একটা গালার কাঠিকে পশমী কাপড় দিয়া ঘস, বিদ্যুৎশক্তির আবির্ভাব হইবে। কিন্তু এই বিদ্যুৎ এত অল্প যে ইহার **স্ফুলিঙ্গ** (spark) দেখিতে পাইবে না, তবে গালার কাঠিটা অক্লেশে ছোট ছোট কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করিবে।

(২) শীতকালে শুক্‌না চলে গাটাপার্চা চিরুণী দিয়া মাথা আচড়াইবার সময় পট্‌ পট্‌ শব্দ হয়। সেই সময় চিরুণীটি লইয়া সূক্ষ্ম কাগজকুচির নিকট ধরিলে কুচিগুলি ছুটিয়া আসিয়া চিরুণীর গায়ে লাগিয়া যায়। এই পরীক্ষার মূলেও আছে ঘর্ষণ দ্বারা বিদ্যুৎসৃষ্টি।

পশমী কাপড়ের যেখানটা দিয়া গালা ঘসিয়াছ, সেখানটা কাগজের টুকরার কাছে লইয়া যাও, দেখিবে কাপড়েও আকর্ষণী শক্তির আবিভাব হইয়াছে। কিন্তু কাপড় ও গালা একসঙ্গে কাগজখণ্ডের কাছে লইয়া গেলে দেখিবে যে, কোন আকর্ষণী শক্তি নাই। গালাতে যে বিদ্যুৎশক্তি আসিয়াছে ও কাপড়ে যে বিদ্যুৎশক্তি আসিয়াছে দু'টি দুই আলাদা রকমের। বৈজ্ঞানিক ডুফে (Dufay) পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন যে প্রথমটি **ধনাত্মক** (positive), দ্বিতীয়টি **ঋণাত্মক** (negative)। চুম্বকের মেরুদ্বয়ের পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণের ন্যায় এই ধনাত্মক বিদ্যুৎবিশিষ্ট একটি পদার্থ অন্য একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎবিশিষ্ট পদার্থকে বিকর্ষণ করে ও অপর একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎবিশিষ্ট পদার্থকে আকর্ষণ করে। চিরুণীর সূক্ষ্ম কাগজ আকর্ষণের মূলেও এইরূপ দুই জাতীয় বিদ্যুতের পরস্পর আকর্ষণ নিহিত আছে। কারণ বিদ্যুৎবিশিষ্ট চিরুণী নিকটে আনিবামাত্র কাগজের যে অংশ চিরুণীর নিকটবর্ত্তী, ঐ অংশে বিপরীত জাতীয় বিদ্যুতের সঞ্চার হয়। যদি সমপরিমাণে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ একই স্থানে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের প্রভাব বিপরীত হওয়ায় দূরবর্ত্তী পদার্থের

উপর কোন প্রভাব দেখা যায় না। তাহাতেই গালা ও কাপড় একত্র করিলে কাগজ টানে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই দুই বিজয়শক্তি একত্র রহিয়াছে, সেজন্য ধরা পড়ে না। অন্য শক্তির প্রয়োগ দ্বারা যখন দুইটিকে আলাদা করা যায়, তখন দুইটিই ধরা পড়ে।

বিদ্যুৎশক্তির প্রকার-ভেদ—উপরে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে উহার একটিকে (১) **ঘর্ষ-বিদ্যুৎ** (frictional electricity) বলে, ও অপরটিকে (২) **চল-বিদ্যুৎ** (current electricity) বলে।

চল-বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ যখন গতিশীল হয়, তখন উহা কোন পদার্থের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহিত বিদ্যুৎকে চল-বিদ্যুৎ কহে।

চল-বিদ্যুতের আকস্মিক আবিষ্কার—গাল্‌ভানি (Galvani) পরীক্ষার নিমিত্ত ব্যাঙের একখণ্ড মাংসপেশীকে লবণজলে ভিজাইয়া বারান্দার রেলিংয়ের উপর তামার তারে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িল যে বাতাসে মাংসপেশী যখনই বারান্দার লোহার রেলিংয়ে ঠেকিতেছে তখনই পেশীর সঙ্কোচ ঘটিতেছে। গাল্‌ভানি ইহা লক্ষ্য করিলেন মাত্র। ভল্টা (Volta) ইহা হইতে নির্ণয় করেন যে, তামার তার লোহার রেলিং ও লবণ জলের সংস্পর্শে আসায়, বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছে এবং পেশীর সঙ্কোচন ঘটিয়াছে।

চল-বিদ্যুতের পরীক্ষা—একটি টাকা ও একটি পুরাতন ডবল পয়সা লও। প্রথমটিকে জিহ্বাগ্রের উপরে, দ্বিতীয়টিকে নীচে, এমন ভাবে ধর, যেন তাহারা জিহ্বার বাহিরে পরস্পরকে ছুঁইয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ জিহ্বা চিন্ চিন্ করিতে আরম্ভ করিবে। ইহাতেই বুঝিতে পারিবে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে।

বিভব-প্রভেদ—যখনই বিদ্যুৎ-প্রবাহ এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে সঞ্চালিত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে পদার্থ দুইটির বিদ্যুৎ-শক্তির

একটা তারতম্য আছে। এই তারতম্যকে বলে **বিভব-প্রভেদ** (Potential difference)। যে পদার্থের **বিভব** (potential) উচ্চ, তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন-বিভবযুক্ত পদার্থে বিদ্যুৎ-স্রোত বহিয়া যায় ; এইজন্য বিদ্যুতাধার প্রস্তুত করিতেও সকল সময়ই দুইটি দণ্ড প্রয়োজন।

বিদ্যুতাধার (Electric cell)

নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা যায় ; যে পাত্রে এরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বিদ্যুৎসৃষ্টির ব্যবস্থা থাকে, তাহাকে **বিদ্যুতাধার** (electric cell) কহে।

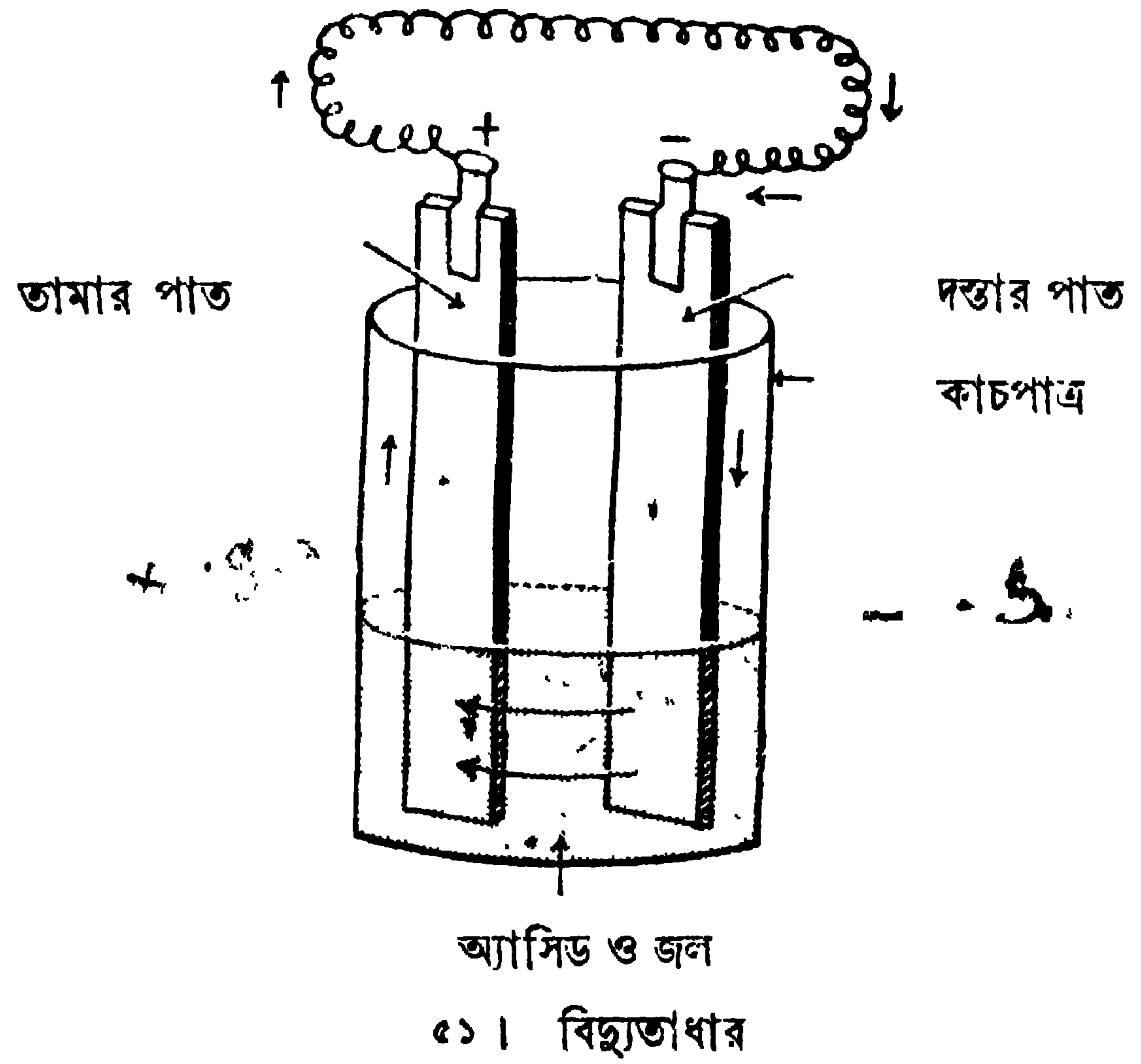

৫১। বিদ্যুতাধার

বিদ্যুতাধার প্রস্তুতকরণ—একটি কাচ বা চীনামাটির পাত্রে জল মিশান সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড (জল ৮ ভাগ অ্যাসিড ১ ভাগ) ঢালিয়া তাহার মধ্যে এক খণ্ড দস্তার পাত ডুবাইয়া রাখ। পরে ঐ দস্তার

পাতে না ঠেকে এমন করিয়া একটি তামার পাতও অ্যাসিডে ডুবাও। এখন দুই পাতকে একখণ্ড তারের দ্বারা বাহিরে সংযুক্ত করিয়া দাও। তৎক্ষণাৎ তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ আরম্ভ হইবে।

বিদ্যুৎপ্রবাহ তামার পাত হইতে তারের মধ্য দিয়া দস্তার পাতের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকিবে আবার দস্তার পাত হইতে প্রবাহ অ্যাসিডের ভিতর দিয়া তামার পাতের দিকে ধাবিত হইবে। এই যে বিদ্যুতের একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন এবং পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন—এই সম্পূর্ণ যাতায়াতকে একটি **বর্ত্তনী** (circuit) কহে। অ্যাসিড-জলের বাহিরে তামার বা দস্তার প্রান্তের নাম **মেরু** (pole)। তামার প্রান্তকে **ধনাত্মক** (positive) মেরু ও দস্তার প্রান্তকে **ঋণাত্মক** (negative) মেরু কহে। কিন্তু মনে রাখিও, পাত দু'টি অ্যাসিডের মধ্যে যেন পরস্পরকে স্পর্শ না করে বাহিরে তার দ্বারা সংযোগ না হইলে বিদ্যুৎস্রোত বহিবে না। দস্তার উপর অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য যে শক্তির উদ্ভব হয় তাহাই বিদ্যুৎশক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। একবার এইরূপে সেল প্রস্তুত করিলে তাহা কিন্তু চিরদিন চলিবে না। অনবরত ব্যবহারের ফলে ইহার জোর ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে।

বিদ্যুৎ পরিবাহী ও বিদ্যুৎ অন্তরক
(Conductors and Insulators)

বিদ্যুৎ পরিবাহী ও অপরিবাহী—বিদ্যুতাধারের সংযোগ তার কিসের দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া উচিত ? কাঠ, কাচ, রবার দ্বারা পাত দুইটিকে জুড়িলে দেখিবে বিদ্যুৎ চলিবে না। অথচ ধাতব পদার্থ

দ্বারা জুড়িলে বিদ্যুৎ বেশ প্রবাহিত হইবে। কাঠ, কাচ, রবারের মত দ্রব্যকে **অপরিবাহী** (non-conductor) বলা হয়। রূপা তামা, লোহা, ইত্যাদিকে **পরিবাহী** (conductor) বলা হয়। আধারের তার তাহা হইলে বিদ্যুৎ-পরিচালক পদার্থ দ্বারা নির্মিত হওয়া চাই। ধাতুর মধ্যে রৌপ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচালক, তাহার পরেই তাম্র। রৌপ্য দুর্ম্মূল্য বলিয়া তামার তারই বিজলীর কাজে ব্যবহৃত হয়। তারের উপর রবার ঢাকা থাকে বা রেশম-সূত্র জড়ান থাকে। এই রবার ও রেশমকে **অন্তরক** (insulator) বলা হয়। তাহা হইলে বিদ্যুৎপ্রবাহ নষ্টও হয় না, বিদ্যুৎ লাগিয়া লোকের অনিষ্টও হইতে পারে না।

বিদ্যুৎপ্রবাহ যখন কোন তারের ভিতর দিয়া চলে, তখন সেই তারকে live wire বলে। এরূপ তার স্পর্শ করিলে শরীরে শক্ (shock) লাগে। কারণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ অংশত শরীরের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। আমাদের দেহ অপেক্ষাকৃত অপরিবাহী হইলেও সম্পূর্ণ অপরিবাহী নহে। হাতে রবারের দস্তানা বা পায়ে মোটা রবারের জুতা থাকিলে অথবা শুষ্ক কাঠের চৌকির উপর দাড়াইয়া live wire স্পর্শ করিলে কোন অনিষ্ট হয় না। কারণ রবার, শুষ্ক কাষ্ঠ ইত্যাদি অপরিবাহী।

ভল্টার সেল প্রস্তুত-করণ ও ভল্টা-প্রবাহ—বৈজ্ঞানিক ভল্টা (Volta) একখণ্ড কাগজকে ভিনিগারে ভিজাইয়া টিনের চাকতি ও রূপার চাকতির মধ্যে স্থাপন করিয়া, তার দ্বারা উভয় চাকতিকে সংযুক্ত করিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাই হইল প্রথম সেল এবং নাম হইল **ভল্টার সেল** (Voltaic cell)। বিদ্যুৎ-প্রবাহের নাম হইল **ভল্টার-প্রবাহ** (Voltaic current)।

সেল প্রস্তুত-করণ—বিভিন্ন প্রণালীতে সেল (cell) প্রস্তুত করা হয়। তুঁতে জলে গলাইয়া একটি তাম্রনির্মিত আধারে

ঢালিয়া দেওয়া হয়; এবং ঐ আধারের দুই পাশে দুইটি তাকের উপর কয়েক খণ্ড তুঁতে রাখা হয়। এখন উহার ভিতর অপর একটি স্বল্পপরিসর ও **সচ্ছিদ্র** (porous) চীনামাটির পাত্রে একটি দস্তার দণ্ড জলমিশ্রিত সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডে ডুবাইয়া রাখা হয়। বাহিরের পাত্রটিই দ্বিতীয় দণ্ডের কার্য্য করে। এই সেলের নাম **ডানিয়েল সেল**।

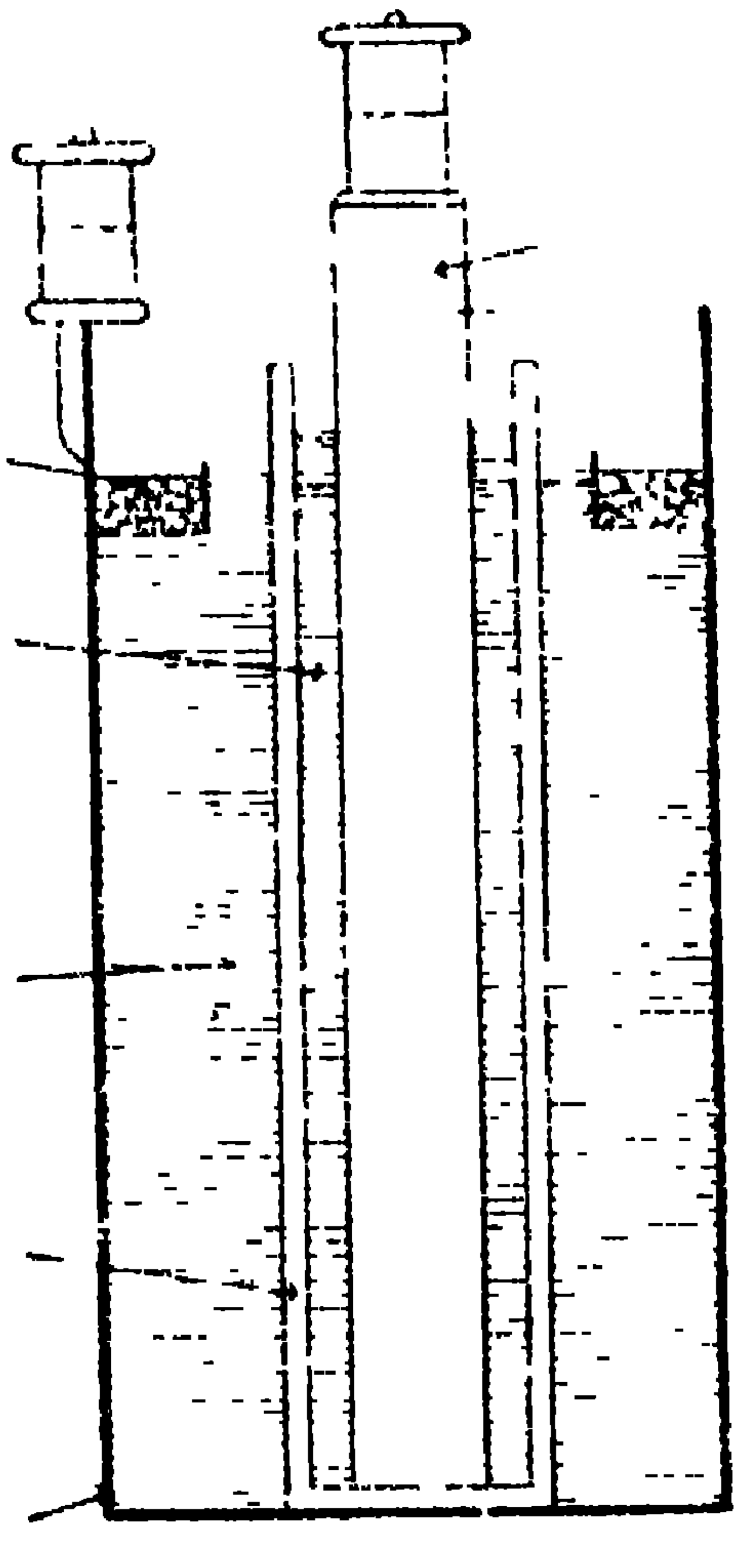

৫২। ডানিয়েল সেল

অন্য একপ্রকার সেল টেলিগ্রাম অফিসে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। একটি চীনামাটির পাত্রে নিশাদল জলে গুলিয়া উহাতে একটি দস্তার দণ্ড ডুবাইয়া রাখা হয়। এই পাত্রের মধ্যে আর একটি অল্পপরিসর সচ্ছিদ্র চীনামাটির পাত্রে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড

(manganese dioxide) পরিবেষ্টিত অঙ্গারদণ্ড থাকে। ইহাকে **লেক্লান্সি সেল** বলে।

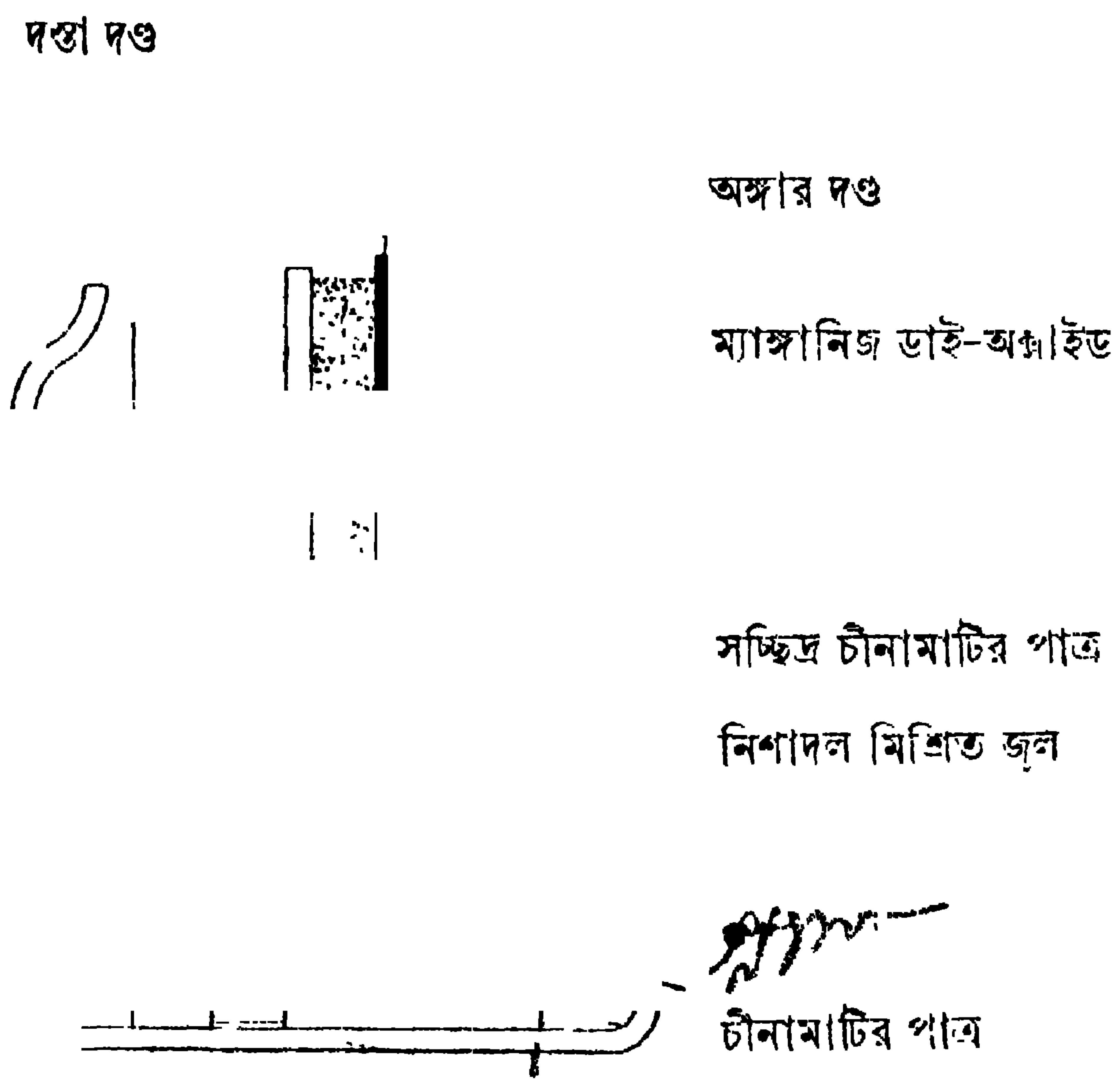

৫৩। লেক্লান্সি সেল

বিদ্যুৎপ্রবাহের ক্রিয়া (Effects of Current)

১। **বিদ্যুৎপ্রবাহে তাপের উদ্ভব** (Heating effect of electric current)—**সেল হইতে পরিবাহী তার দ্বারা বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে ঐ পরিবাহী তারটি গরম হইয়া পড়ে।** ব্যাটারী হইতে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হইলে ঐ তার এত গরম হয় যে হাত দেওয়া যায় না। এইভাবে বিদ্যুৎশক্তি হইতে তাপ পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক ষ্টোভে বা ইস্ত্রীতে একটি দীর্ঘ সরু তারের কুণ্ডলী

থাকে। তাহার ভিতর দিয়া যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন উহা গরম হইয়া উঠে। সেই উত্তাপে রান্না বা জামা ইস্ত্রী হয়।

২। **বিদ্যুৎ প্রবাহে আলোকের উৎপত্তি** (Production of light by electric current)—**ধাতুর সরু তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠে, পরিশেষে ঐ উত্তপ্ত তার আলোক বিকিরণ করে।** যে সমস্ত ধাতুর তার অধিক উত্তপ্ত হইলে বায়ুর সংস্পর্শে পুড়িয়া ভস্মীভূত হয় সেগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে ব্যবহৃত হইলে সূক্ষ্ম তারটি বায়ুশূন্য একটি কাচপাত্রের (bulb) মধ্যে রাখা হয়।

৩। **বিদ্যুৎপ্রবাহের রাসায়নিক ক্রিয়া** (Chemical effect of electric current)—জলের দুই উপাদান—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। এক গেলাস জলে একটু সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া তাহাতে বিদ্যুতাধারের তারের দুইটি মুখ একটু দূরে দূরে ডুবাইয়া দাও। তার দুইটির গা দিয়া বুদ্‌বুদ্‌ উঠিবে। উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে যে এক দিকে হাইড্রোজেন উঠিতেছে, অপর দিকে অক্সিজেন। **বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করার নাম বিদ্যুদ্‌বিশ্লেষণ** (electrolysis)। শুধু জল কেন, বহু পদার্থের এইরূপ বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে। তুঁতের একটি উপাদান হইল তামা। তুঁতের জল বিদ্যুৎপ্রবাহে বিশ্লেষণ করিলে একদিকে উহার উপাদান তামা জমা হয়। এই প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা চামচ, ছুরি, কাঁচিকে নিকেল করা হয়।

৪। **বিদ্যুৎ প্রবাহের চুম্বক ক্রিয়া** (Magnetic effect of electric current)—**তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করায় উহার চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্তি ঘটে।** এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া

ট্রাম চলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, বড় বড় কল-কারখানা ও মটর প্রভৃতি চলিতেছে। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ সবই ইহার উপর নির্ভর করে।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (Electric bell)—বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক ও তাহার উপর একখানি স্প্রিং-সংযুক্ত কোমল লোহার

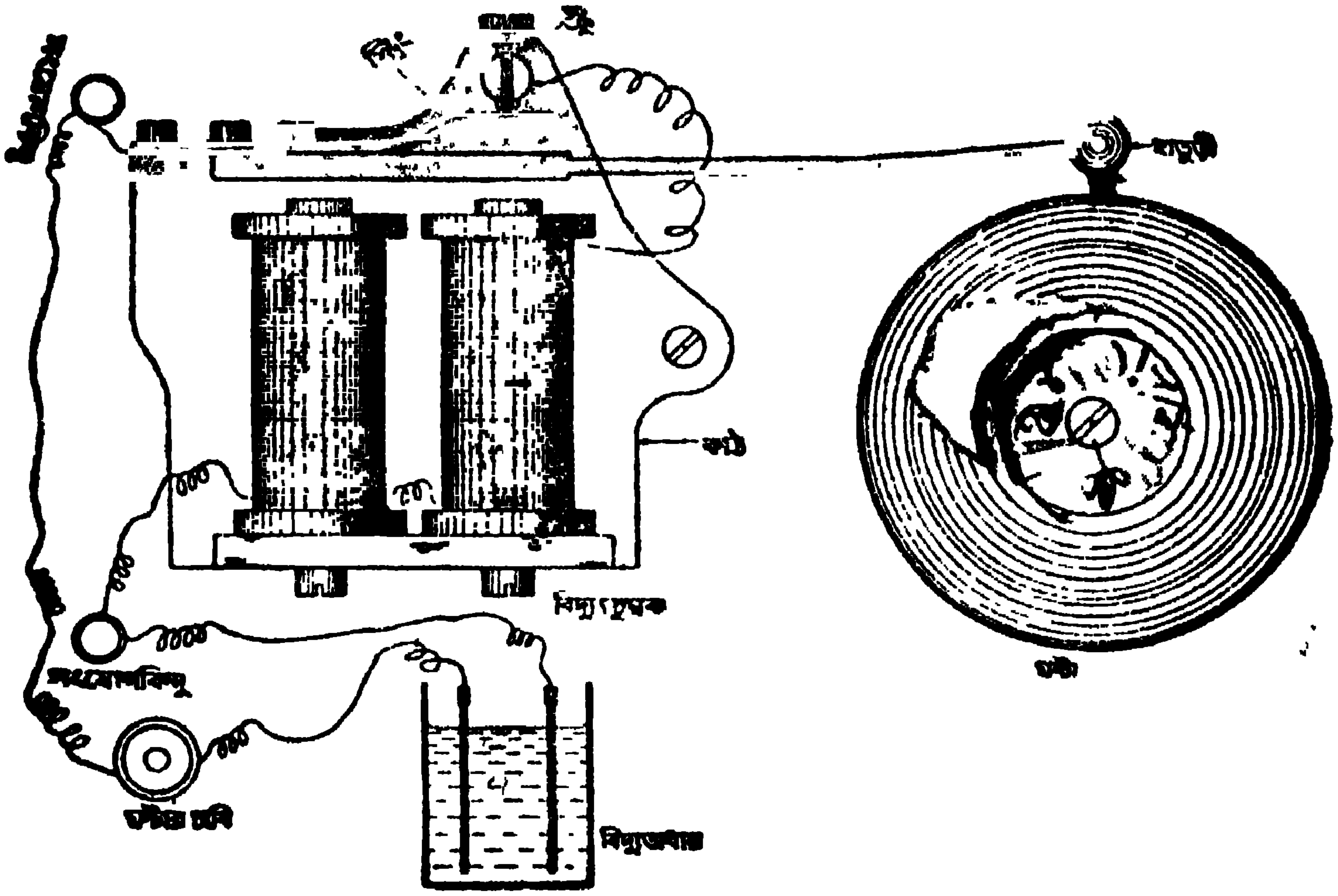

৫৪। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বিভিন্ন অংশ

হাতুড়ি বসান থাকে। বিদ্যুতাধারের এক মেরুর সহিত স্প্রিং সংযুক্ত হাতুড়িটিকে তার দিয়া যোগ কর। এখন হাতুড়ির সংলগ্ন স্ক্রুর সহিত তার দিয়া বিদ্যুৎচুম্বকের যোগ কর। এইবার তার দিয়া বিদ্যুৎচুম্বকের সহিত বিদ্যুতাধারের অপর মেরু সংযুক্ত কর। বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রথমে হাতুড়িসংলগ্ন স্প্রিংএর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। তারপর ধাতুনির্ম্মিত স্ক্রুর ভিতর দিয়া বহিয়া বৈদ্যুতিক চুম্বকের উপর জড়ান তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়।

এই বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে বিদ্যুৎচুম্বকটি চুম্বকশক্তি সম্পন্ন হয় ও হাতুড়ির বাঁটটি অকর্ষণ করে। ইহার ফলে হাতুড়িটি নীচের দিকে অগ্রসর হইয়া তলায় যে ঘণ্টাটি আছে তাহাতে একবার আঘাত করে ও উহা বাজিয়া উঠে। কিন্তু যেই হাতুড়ির বাঁটটি নীচের দিকে আসে অমনি হাতুড়ি-সংলগ্ন স্প্রিংটি স্ক্রু হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়িটিও উপরে উঠিয়া যায়। প্রবাহ বন্ধ হইলেই স্প্রিংটি নিজ শক্তিতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে অর্থাৎ স্ক্রুর গায় সংলগ্ন হয় এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিতে থাকে। এইরূপে একবার বিদ্যুৎপ্রবাহ আরম্ভ ও মুহূর্ত্তমধ্যে পুনরায় বন্ধ হওয়াতে হাতুড়িটি ক্রমাগত উপরনীচে নড়িতে থাকে। তাহাতে ঘণ্টার গায় হাতুড়ি লাগাতে টুং টুং করিয়া শব্দ হয়। ইহাই **বৈদ্যুতিক ঘণ্টা**। বিদ্যুতাধারের সহিত প্রত্যেক বার যোগ না করিয়া মধ্যে একটা ঘণ্টার চাবি রাখা হয়, যাহা টিপিলে বিদ্যুতাধারের সহিত সংযোগ ঘটে। ফলে মুহূর্ত্তে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। এই ঘণ্টার দ্বারা চীৎকার না করিয়া চাকর-বাকর ডাকা চলে।

টেলিগ্রাফ যন্ত্র (Telegraph apparatus)—ইহার দ্বারা অতি নগণ্য গ্রাম হইতে পৃথিবীর দূর-দূরান্ত পর্য্যন্ত যে কোন বার্ত্তার অতি সত্বর আদান-প্রদান হয়।

ইহাতে **প্রেরক** (sender) ও **গ্রাহক** (receiver) এই দুইটি প্রধান যন্ত্র থাকে। প্রেরক যন্ত্রটি বিদ্যুৎপ্রবাহ ইচ্ছামত আরম্ভ ও বন্ধ করার একটি চাবি মাত্র। বিদ্যুতাধার হইতে বিদ্যুৎ প্রেরকযন্ত্র বহিয়া লাইন তারের মধ্য দিয়া গ্রাহকযন্ত্রে যায় ও সেখান হইতে মাটির মধ্য দিয়া মাটির সহিত যুক্ত প্রেরকযন্ত্রের মধ্যে ফিরিতে পারে। পূর্ব্বে একটি দ্বিতীয় তার গ্রাহক ও বিদ্যুতাধারের মধ্যে যুক্ত থাকিত। এখন দ্বিতীয় তারের পরিবর্ত্তে বিদ্যুতাধার ও গ্রাহক যন্ত্রটি হইতে এক একটি তার মাটিতে পুঁতিয়া

রাখা হয়। ইহাতে দ্বিতীয় তারের খরচ বাঁচিয়া যায় ও মাটি উৎকৃষ্ট বিদ্যুৎ পরিচালক বলিয়া কাজের কোনও ক্ষতি হয় না। গ্রাহক যন্ত্রটিতে একটি বিদ্যুৎ-চুম্বক ও উহার উপরে একখানি কোমল লোহার স্প্রিং-যুক্ত দণ্ড লিভারের (lever) মত যুক্ত আছে। বিদ্যুৎ-চুম্বকের মধ্য দিয়া যখন কোনও

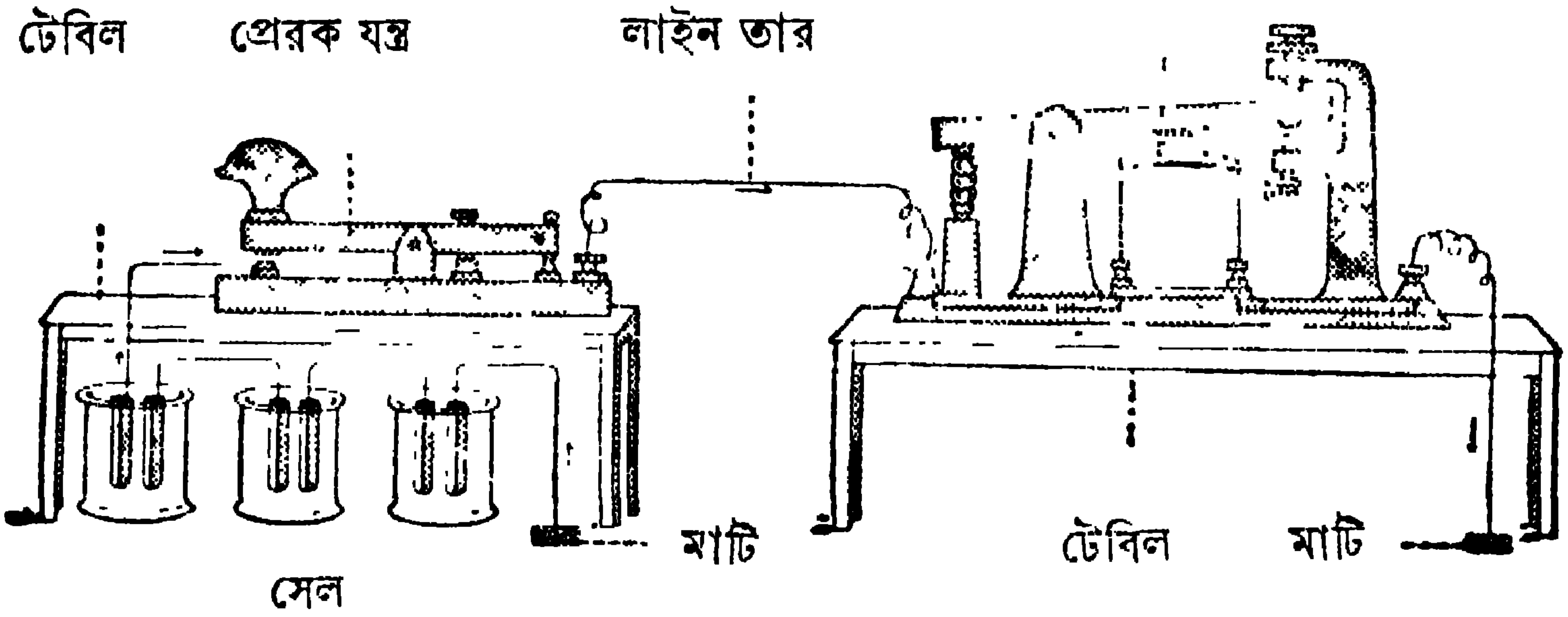

৫৫। টেলিগ্রাফ যন্ত্র

বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে না তখন দণ্ডের ডানদিকের শেষ প্রান্ত উপরের স্ক্রুর গায় ঠেকিয়া থাকে। বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করিলেই বিদ্যুৎ-চুম্বকটি চুম্বক-শক্তি সম্পন্ন হয় ও দণ্ডটি জোরে আকর্ষণ করে। ফলে দণ্ডটি নীচে নামিয়া নীচের স্ক্রুর উপর ঠেকে ও টক্ করিয়া একটা আওয়াজ হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইলে দণ্ডটি আবার উপরে উঠিয়া যায়। সুতরাং প্রেরকযন্ত্রের চাবি টিপিতে যেমন টক্ করিয়া আওয়াজ হয় গ্রাহকযন্ত্রে দণ্ডের আঘাতের তেমনি টক্ করিয়া আওয়াজ হয়। প্রেরকযন্ত্রে বিলম্বে আওয়াজ করিলে গ্রাহকযন্ত্রেও বিলম্বে আওয়াজ হইবে। তাড়াতাড়ি আওয়াজ করিলে তাহাকে **টেরে** ও বিলম্বে আওয়াজ করিলে তাহাকে **টক্কা** বলে। এই দুই শব্দের সমাবেশে ইংরেজী বর্ণমালার সমস্ত অক্ষর ও ০ হইতে ৯ পর্য্যন্ত সংখ্যার সঙ্কেত তৈয়ার করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে এক স্থান হইতে অপর স্থানে

যে কোনও বার্ত্তা পাঠান সম্ভব হয়। একটি ঘুরন্ত কাগজের রোলারের উপর হ্রস্ব ও দীর্ঘ দাগ দ্বারাও বর্ণমালার অক্ষরগুলির সঙ্কেত নির্দ্দেশ করা যায়।

Questions

1. What are the different forms of electricity?
2. What do you mean by conductor and non-conductor of electricity? Give examples.
3. What is meant by a "live wire"? Why do we get a shock when we touch it? Suggest how the shock can be prevented. (C. U. 1942)
4. Describe a simple voltaic cell.
5. Give examples to illustrate the (a) heating, (b) lighting, and (c) chemical effects of an electric current. (C. U. 1944)
6. State some practical applications of electricity with regard to its magnetic effects.
7. How does an electric bell work? (C. U. 1940)
8. Explain the action involved in (a) Electric Telegraph; (b) Electric bell. (T. T. 1939)
9. Describe a simple electro-magnetic instrument with the help of which you can send and receive messages from a long distance. (T. T. 1940)
10. Describe the electro-magnet together with two instruments in which electro-magnets are being daily used. (T. T. 1938)

রসায়ন-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ তত্ত্ব

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ

(Elements and Compounds)

রসায়ন-বিদ্যা (Chemistry)—যে বিজ্ঞান সাহায্যে পদার্থের নানারূপ স্থায়ী পরিবর্ত্তন, পরিণতি এবং বিভিন্ন পদার্থের প্রস্তুতকরণপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাকে রসায়ন-বিদ্যা কহে।

রসায়নশাস্ত্র মতে পদার্থের শ্রেণীবিভাগ—যে সকল পদার্থ আমাদের চতুর্দ্দিকে নিয়ত দেখিতেছি, রসায়নশাস্ত্রমতে তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—**মৌলিক** (elements) অর্থাৎ মূল বা আদি পদার্থ, যাহাতে দ্বিতীয় কোন পদার্থের লেশমাত্র নাই, এবং **যৌগিক** (compounds) অর্থাৎ যাহা দুই বা ততোধিক পদার্থের যোগদ্বারা গঠিত, যাহা বিশ্লেষণ করিলে এই বিভিন্ন পদার্থগুলি পৃথক্‌ভাবে পাওয়া যায়।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ (Elements and Compounds)—মৌলিক পদার্থ আজ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে

তাহাদের সংখ্যা বিরানব্বই। গন্ধক, অঙ্গার, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পারদ, এলুমিনিয়ম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ। লৌহ বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে তাহার উপর যে মরিচা পড়ে, তাহা যৌগিক পদার্থের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। ইহা লৌহ ও বাতাসের অক্সিজেন যোগে গঠিত। এই মরিচার মধ্যে লৌহ আর লৌহ অবস্থায় নাই। দুইয়ের মিলনে এক নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

যৌগিক পদার্থের পরীক্ষা—(১) লোহিতবর্ণ অক্সাইড অব মার্কারি **পরীক্ষানল** (test tube) মধ্যে গরম করিলে **অক্সিজেন** বাহির হইবে। গরম করিবার সময় ইহার মধ্যস্থ পারদও বাষ্পাকারে বাহির হইয়া আসিবে ও টিউবের উপরভাগে কাচের গায়ে লাগিয়া যাইবে। কি করিয়া জানিবে অক্সিজেন বাহির হইতেছে? একখণ্ড উত্তপ্ত লোহার তার টিউবের মধ্যে ঢুকাও, চারিদিকে আগুনের ফিনকি উড়িবে। ছোট এক টুকরা জলন্ত অঙ্গার চিমটা দিয়া ঢুকাইলেও দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

(২) খানিকটা জল লইয়া একটি কাচ-কুপীতে ফুটাও। জলটা ফুটিবে ও ধীরে ধীরে বাষ্পাকারে বাহির হইতে থাকিবে। কিন্তু যে বাষ্প বাহির হইতেছে তাহা জলের বায়বীয় অবস্থা। একটি ঠাণ্ডা বাটি মুখের কাছে ধরিলে ঐ বাষ্প তাহাতে লাগিয়া আবার ফোঁটা ফোঁটা জলে পরিণত হইবে। একটি লোহার নল আগুনে তাতাইয়া লাল করিয়া লও। জলীয় বাষ্প এইবার একটি কাচের নলের সাহায্যে এই তপ্ত লোহার নলের মধ্য দিয়া চালাও। তাহার অপর মুখ দিয়া একটি বর্ণহীন বায়বীয় পদার্থ বাহিরে আসিতে থাকিবে বটে, কিন্তু তাহা আর জলীয় বাষ্প নয়। ঠাণ্ডা বাটি সামনে ধর, জল জমিবে না। এই বায়বীয় পদার্থটি কি? ইহার নাম **হাইড্রোজেন**। ইহা একটি বর্ণহীন, লঘু, সহজদাহ্য,

বায়বীয় পদার্থ, জলের অন্যতম উপাদান। বিদ্যুতাধারের তারের দুই মুখ জলে ডুবাইলে দুই মুখে বুড়বুড়ি ওঠে আগে বলিয়াছি। এক দিকে বুড়বুড়ি এই হাইড্রোজেনের, অপর দিকে অক্সিজেনের। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুই মৌলিক পদার্থ মিলিয়া সৃষ্টির প্রাক্কালে জল নামক যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছিল। ইচ্ছা করিলে দুই শিশি হাইড্রোজেন (H) ও এক শিশি অক্সিজেন (O) মিশ্রিত করিয়া তাহাতে বিজলীর স্ফুলিঙ্গ চালাইয়া জলের সৃষ্টি করিতে পারা যায়। জলের রাসায়নিক সঙ্কেত H_2O, অর্থাৎ যে পদার্থের প্রত্যেক অণুকণায় দুই পরমাণু H ও এক পরমাণু O আছে।

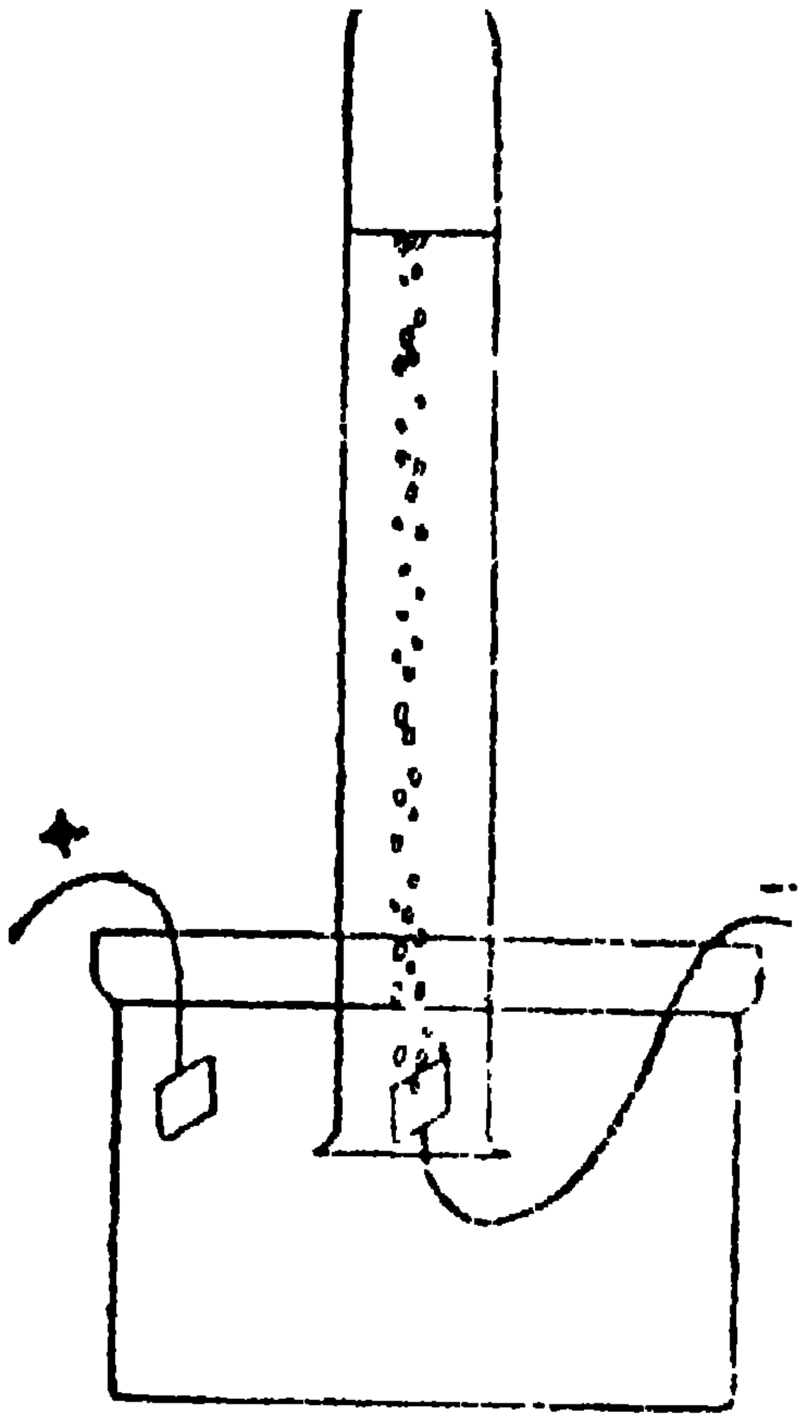

[illegible]। বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত-করণ

পদার্থের সাধারণ মিশ্রণ ও রাসায়নিক যোগ

(Mechanical mixture and Chemical compound)

সাধারণ মিশ্রণ—একটি পাত্রে খানিকটা লোহাচুর ও খানিকটা গন্ধকগুঁড়া রাখিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া দাও। যখন বেশ মিশিয়া গেল, তখন শুধু চোখে দেখাইবে যেন তাহার চেহারা ও রং সমস্তই অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, ঐ মিশ্র দ্রব্যটির মধ্যে গন্ধককণা ও লৌহকণা পাশাপাশি রহিয়াছে, মিশিয়া এক হয় নাই, অনায়াসে পৃথক্ করা যায়। একটি জোরালো চুম্বক লইয়া পাত্রটির মধ্যে

বার বার ঘুরাও, দেখিবে সমস্ত লোহাচুর পৃথক্ হইয়া চুম্বককে আঁকড়াইয়া ধরিবে, গুঁড়া গন্ধক পড়িয়া থাকিবে. ইহা হইতেই ঠিক বুঝা গেল যে দুই পদার্থের কোন রাসায়নিক যোগ ঘটে নাই। এই প্রকার মিশ্রণকেই **সাধারণ মিশ্রণ** (mechanical mixture) বলা হয়।

যৌগিক পদার্থ—কিন্তু মিশ্র দ্রব্যটি পরীক্ষানলে রাখিয়া গরম করিলে এক সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইবে যাহার উপর চুম্বকের কোন প্রভাবই দেখা যাইবে না। এবার যাহা ঘটিল তাহা মিশ্রণ নয়, রাসায়নিক যোগ। নূতন পদার্থটি **যৌগিক** (chemical compound)। ইহার নাম—ফেরাস্ সাল্‌ফাইড (ferrous sulphide)।

যৌগিক পদার্থের বিশেষ লক্ষণ—ইহার উপাদানগুলি একেবারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে থাকে। কিছুতেই অন্যথা হয় না। লোহাচুর ও গন্ধকের সহজ মিশ্রণে কতটুকু লোহা ও কতটুকু গন্ধক থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই। প্রত্যেক দ্রব্যের যতটুকু ইচ্ছা লইয়া মিশাইতে পার। কিন্তু যেই রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা এই দুই দ্রব্যের মিলন ঘটিল অর্থাৎ ফেরাস্ সালফাইড উৎপন্ন হইল, অমনই তাহার মধ্যের লোহা ও গন্ধকের ভাগ একেবারে বাঁধা, নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। প্রতি এগার ভাগ ফেরাস্ সাল্‌ফাইডে সাত ভাগ লোহা ও চারি ভাগ গন্ধক থাকিতেই হইবে। ইহাই রসায়নের নিয়ম। পাত্রে যদি আট ভাগ লোহাচুর ও চারি ভাগ গন্ধক থাকে তবে লোহাচুরের সাত ভাগ মাত্র গন্ধকের সহিত মিলিত হইবে, বাকী একভাগ অপরিবর্ত্তিত লোহারূপেই পড়িয়া থাকিবে।

তেমনি জলের (H_2O) মধ্যে কত হাইড্রোজেন (H), কত অক্সিজেন (O) থাকিবে তাহা একেবারে নির্দ্দিষ্ট। অক্সিজেনের ওজন হাইড্রোজেনের ষোল গুণ। আঠার ভাগ (ওজন) জল লইলে তাহার মধ্যে সর্ব্বদা দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও ষোল ভাগ অক্সিজেন থাকিবেই।

সাধারণ মিশ্রণ ও যৌগিক পদার্থের তুলনা

সাধারণ মিশ্রণ	যৌগিক পদার্থ
১। উপাদানগুলি মিশিয়া এক হয় না, পাশাপাশি বর্ত্তমান থাকে।	১। উপাদানগুলি মিশিয়া এক হইয়া যায়।
২। যান্ত্রিক উপায়ে উপাদান-গুলিকে পৃথক্ করা যায়।	২। যান্ত্রিক উপায়ে উপাদান-গুলিকে পৃথক্ করা যায় না।
৩। উপাদানের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নয়।	৩। উপাদানের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট।
৪। উপাদানগুলির প্রত্যেকটির নিজস্বগুণ মিশ্রিত অবস্থাতেও বর্ত্তমান থাকে।	৪। যৌগিক পদার্থের গুণ ও উহার উপাদানগুলির গুণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।
৫। উপাদানগুলি মিশ্রিত হইবার কালে তাপের পরিবর্ত্তন হয় না।	৫। উপাদানগুলি যৌগিকে পরিণত হইবার কালে তাপের পরিবর্ত্তন হয়।

Questions

1. What is an element? Give examples.
2 How would you distinguish between a mechanical mixture and a chemical compound? To which of these two types does air belong? Give reasons for your answer. (T. T. 1939)

সাধারণ মিশ্রণের পৃথক্ করণ

(Separation of Mixtures)

১। **দ্রবণ** (Solution)—অনেক মিশ্রণ আছে যাহাদের উপাদানগুলি দ্রবণ ক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক্ করা যায়। এক গেলাস জলে একমুষ্টি বালি ফেলিয়া দিলে এক রকমের মিশ্রণ হইবে, আর এক মুষ্টি নুন বা চিনি ফেলিয়া দিলে এক রকমের মিশ্রণ হইবে। বালি জলে গলিবে না, যেমনকার তেমনই রহিবে। কিন্তু চিনি গলিবে, অর্থাৎ চিনির কণা জলের কণার মধ্যে এরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইবে যে, অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দু জল লইয়া জিহ্বায় দিলে সে জলও মিষ্ট লাগিবে ; বালি মিশ্রিত জল পরীক্ষা করিলে বালি স্পষ্ট দেখা যাইবে, কিন্তু সরবতে চিনির অস্তিত্ব ধরা পড়িবে না। সকল কঠিন পদার্থই দ্রবণীয় নহে এবং যাহাতে গলে তাহাও সকল দ্রব্যের পক্ষে এক নহে। কোন পদার্থ জলে গলে, কোন পদার্থ স্পিরিটে গলে, কোন পদার্থ বা আর কোনও পদার্থে গলে। কোন পদার্থকে তরল পদার্থে গলাইলে মিশ্র পদার্থটিকে **দ্রবণ** (solution), যে পদার্থটি দ্রবীভূত হইয়াছে তাহাকে **দ্রাব্য** (solute), আর যাহাতে দ্রব হয় তাহাকে **দ্রাবক** (solvent) বলা হয়।

এক গ্লাস জলে একটু একটু করিয়া চিনি ফেলিতে থাক। চিনি গলিতে গলিতে এমন অবস্থায় আসিবে যে, দেখিবে আর চিনি তাহাতে গলিতেছে না। ইহাকে **সম্পৃক্ত দ্রবণ** (saturated solution) কহে। উত্তপ্ত কর, দেখিবে যে গরম হইলে উহাতে সহজেই আরও চিনি গলিতেছে। তাহা হইলে কোন তরল পদার্থ কতটুকু দ্রব্য গলাইতে পারে, তাহা নির্ভর করিতেছে তাহার উষ্ণতার উপর।

২। **থিতাইবার পর কাত করিয়া ঢালা** (Decantation)—আগে বলিয়াছি যে একত্র মিশ্রিত গন্ধক ও লৌহচূর্ণ হইতে চুম্বক সাহায্যে কিরূপে লৌহচূর্ণ পৃথক্ করা যায়। আর এক উপায়, মিশ্রিত দ্রব্যের উপর খানিকটা কার্ব্বন ডাই-সালফাইড ঢালিয়া বেশ করিয়া নাড়। সমস্ত গন্ধকটা ডাই-সালফাইডে গলিয়া যাইবে, লোহাচূর নীচে থিতাইয়া পড়িবে। দ্রব্যটি অন্য এক পাত্রে ঢালিয়া শুকাইয়া লও। গন্ধকের দানা পড়িয়া থাকিবে।

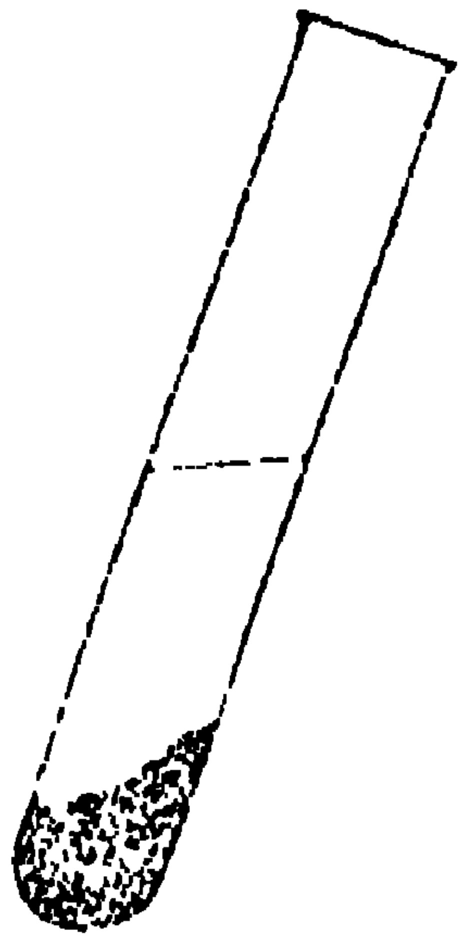

৫৭। গন্ধকমিশ্রিত লৌহচূর্ণের উপর কার্ব্বন ডাই-সালফাইডের ক্রিয়া

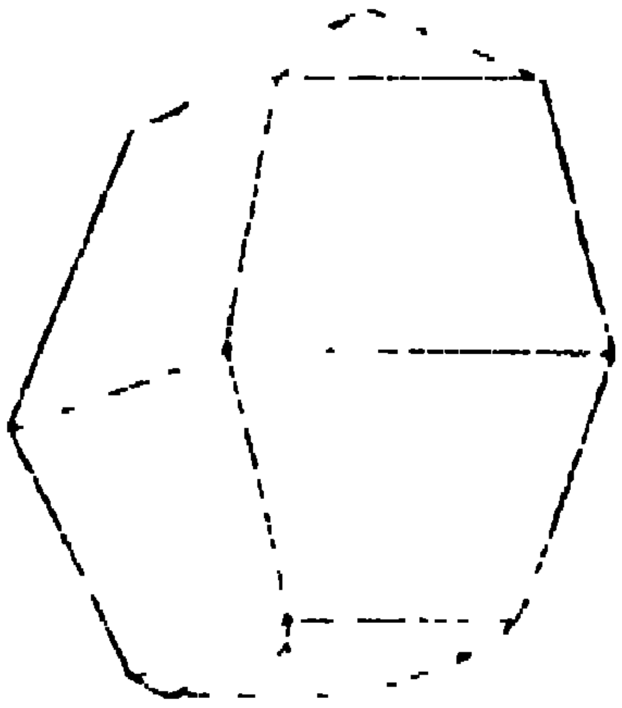

৫৮। গন্ধকের দানা

৩। **পরিস্রাবণ বা ছাঁকন** (Filtration)—বালি মিশ্রিত জল ফিল্টার কাগজ দিয়া ছাঁকিয়া লইলে বালির ভাগ কাগজে আটকাইয়া থাকিবে, জল নীচে পড়িয়া যাইবে। ফিল্টার কাগজটিকে গোল করিয়া কাটিয়া কাচের ফানেলে লাগাইতে হয়। এই ফানেলের সাহায্যে বালি মিশ্রিত জল হইতে জল ও বালি পৃথক্ করা যায়।

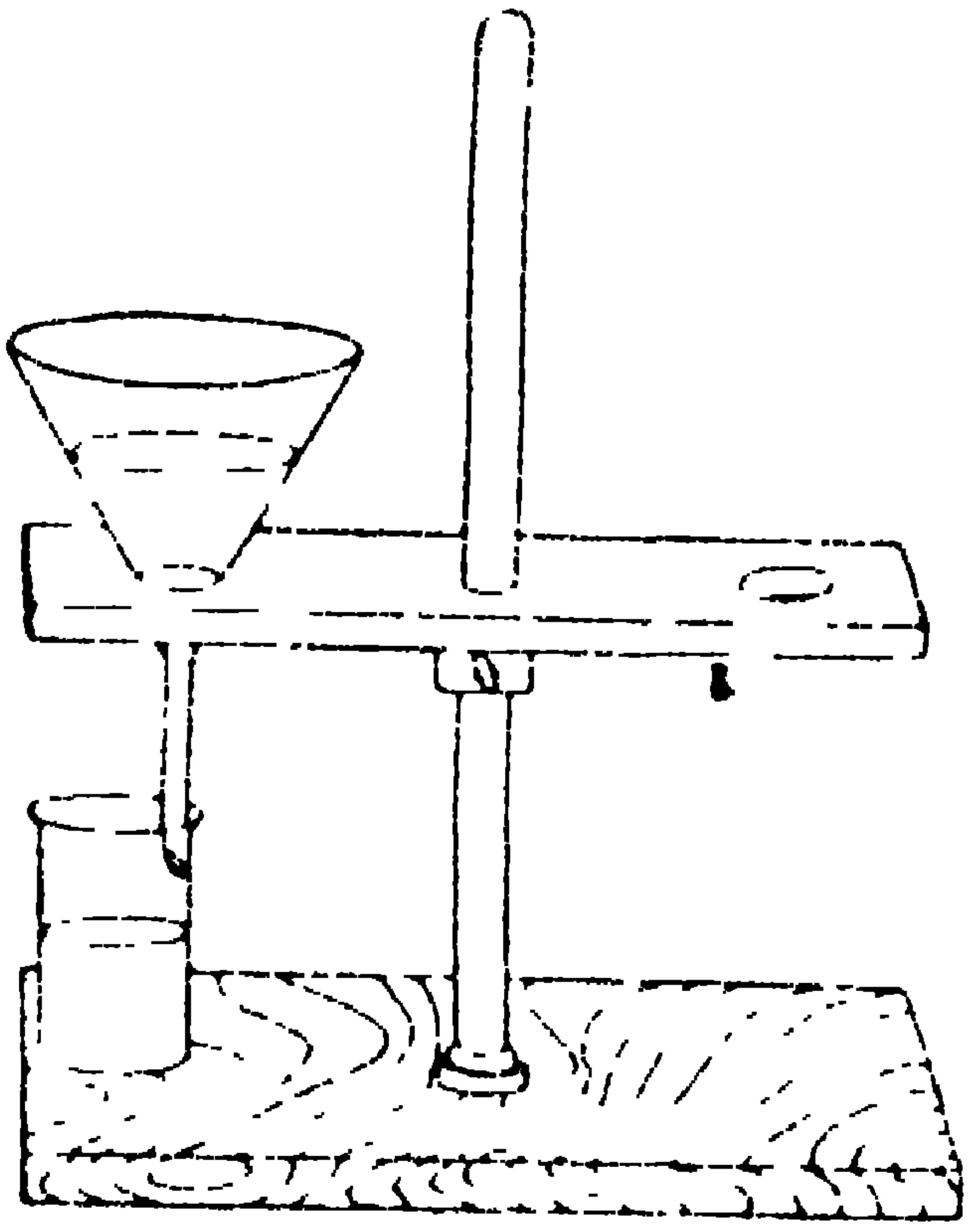

৫৯। ছাঁকন

একত্র মিশ্রিত বালি ও লবণের উপর জল ঢালিয়া সমস্তটা উত্তমরূপে ঝাঁকাইয়া এইরূপ ফিল্টারকাগজযুক্ত ফানেলে ঢালিয়া দিলে বালি ফানেলে থাকিবে, লবণাক্ত জল নীচে চলিয়া যাইবে।

৪। **কেলাসন** (Crystallisation)—মিশ্রণ হইতে পদার্থবিশেষ বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করিবার কেলাসন একটি উৎকৃষ্ট উপায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দ্রাবকের উষ্ণতা বাড়িলে দ্রাব্য পদার্থের দ্রবণীয়তা বাড়ে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে চূণ প্রভৃতি দুই একটি জিনিস সম্বন্ধে উল্টা নিয়ম, ইহারা শীতল জল অপেক্ষা উষ্ণ জলে কম গলে। জল গরম করিয়া

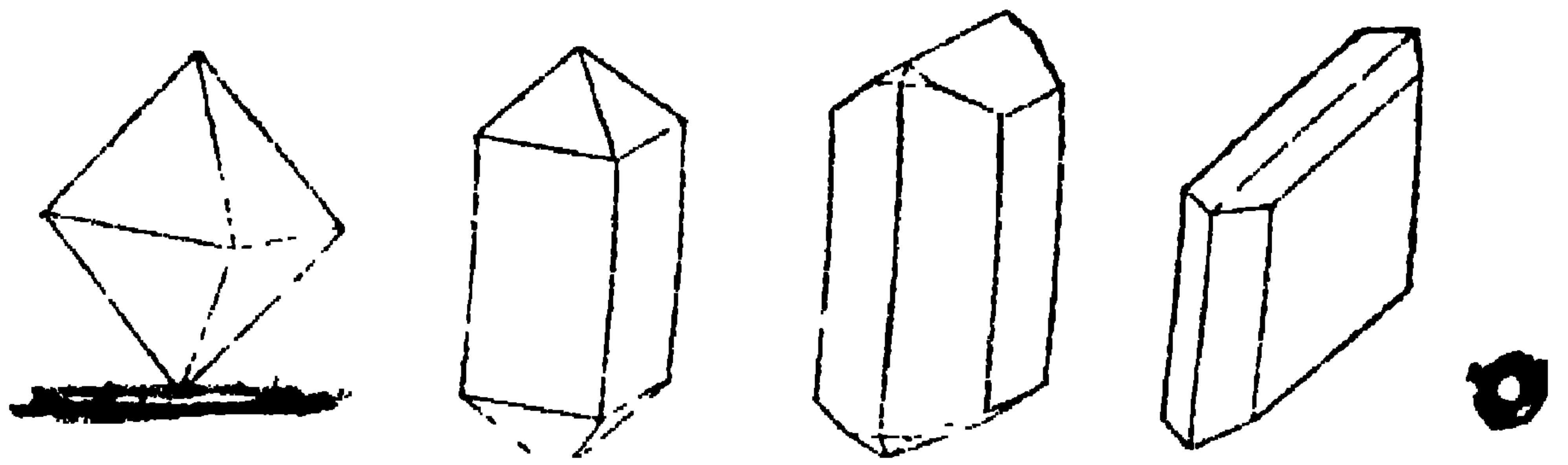

৬০। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দানা

তাহাতে যতটা পারিলে তুঁতে (copper sulphate) গলাইলে। এখন উষ্ণতা কমিলে সেই দ্রবণের অনেকটা তুঁতে দানা বাঁধিয়া নীচে পড়িয়া যাইবে। এই প্রক্রিয়াকে **কেলাসন** (crystallisation) বলে। শুধু তুঁতে কেন, এইরূপে নানা পদার্থকে দানা বাঁধা বা **কেলাসিত** (crystaline) অবস্থায় আনা যায়।

৫। **বাষ্পীভবন** (Evaporation)—চিনি গোলা বা লবণ গোলা জল একটি পাত্রে লইয়া তাহা জ্বাল দিতে থাক। ক্রমশঃ জল বাষ্প হইয়া চলিয়া যাইবে ও পাত্রে চিনি বা লবণ পড়িয়া থাকিবে। এই প্রক্রিয়াতে চিনি বা লবণ আলাদা হইবে বটে, কিন্তু জলকে আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

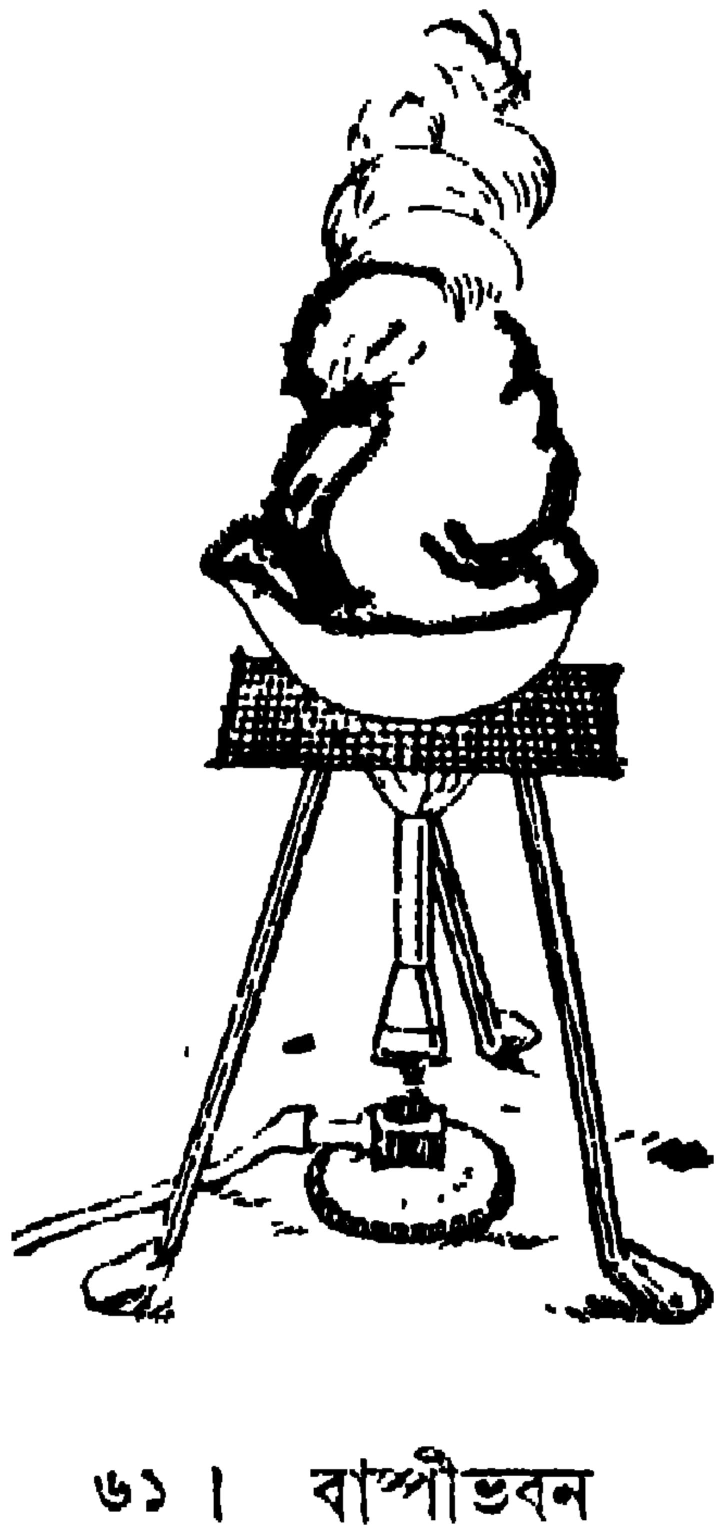

৬১। বাষ্পীভবন

৬। **পাতন** (Distillation)—লবণাক্ত জলের দুই উপাদান লবণ ও জল কিরূপে পৃথক্ করা যায়? ফুটাইলে কিংবা রৌদ্রে শুকাইলে লবণ ভাগ সমস্ত পাওয়া যাইবে সত্য, কিন্তু জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। যে যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত জলকে পৃথক্ করিয়া ধরা যায়, তাহার নাম **পাতন যন্ত্র** এবং এই প্রক্রিয়ার নাম **চুয়ান** বা **পাতন** (distillation)। জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে উহা জলে পরিণত হয়, একথা পদার্থ-বিদ্যায়

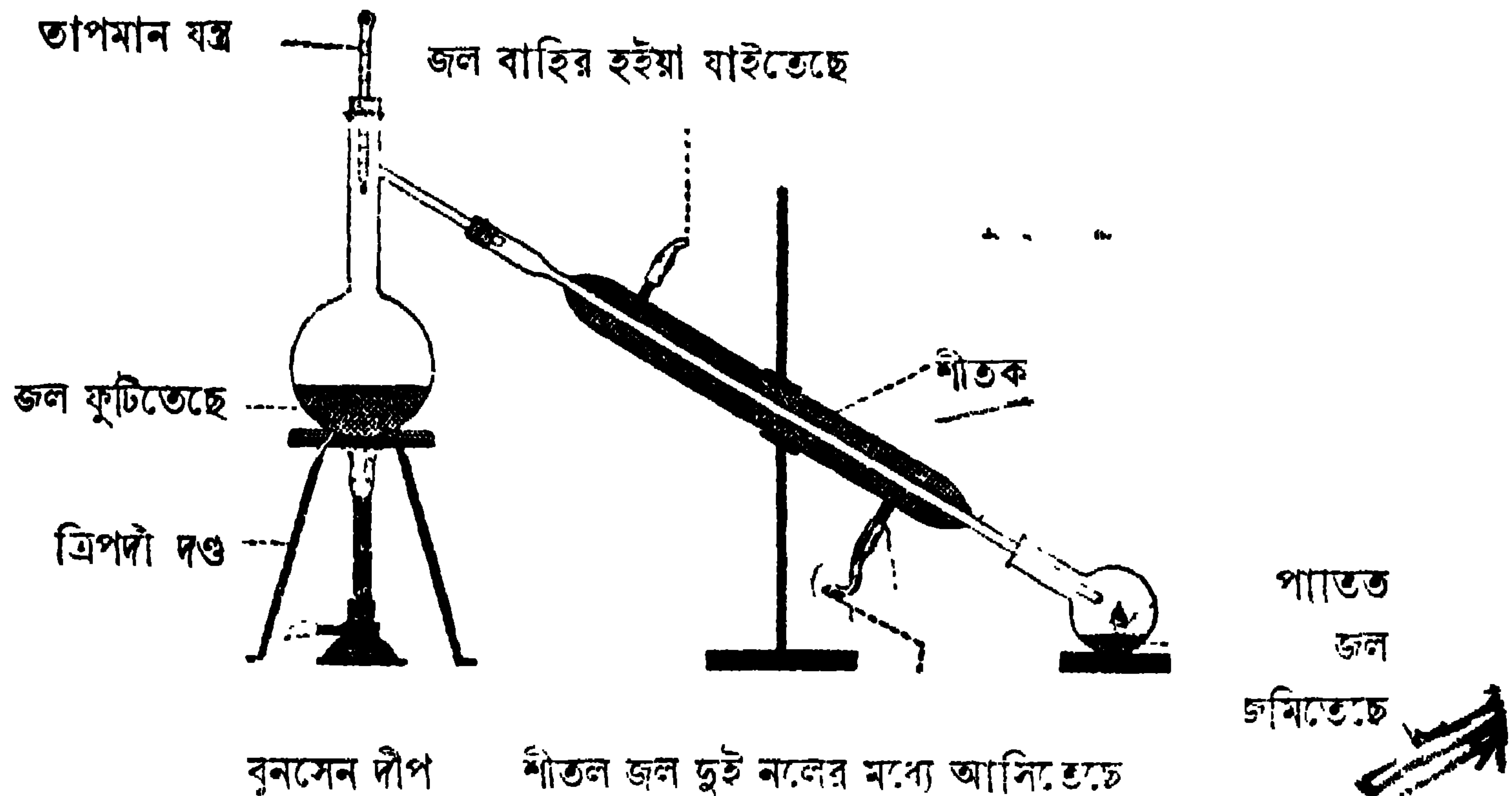

৬২। পাতন যন্ত্র

পড়িয়াছ। পাতন প্রক্রিয়ার অর্থ এই যে বাষ্পকে উড়িয়া যাইতে না দিয়া **শীতক** (condenser) নামক এক নলের মধ্য দিয়া চালাইতে হয়। শীতকের ভিতরের নলটি ঠাণ্ডা জলের দ্বারা বেষ্টিত থাকায় তাহার মধ্যস্থ বাষ্প জমিয়া জল হইতে থাকে। সে জল ধীরে ধীরে অপর প্রান্তস্থ পাত্রে পড়ে।

খুব সাবধানে এই পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে যতটুকু জল লবণের সহিত মিশান হইয়াছিল, তাহার সমস্তটাই ফেরত পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই বড় বড় জাহাজের উপর সমুদ্রের লোনা জল হইতে বিশুদ্ধ পানীয় জল বাহির করা হইয়া থাকে।

৭। **ঊর্দ্ধপাতন** (Sublimation)—তাপের ফলে কঠিন পদার্থ তরল ও তরল পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়। কিন্তু এমনও অনেক কঠিন পদার্থ আছে যাহারা তপ্ত হইলে একেবারে গ্যাস হইয়া যায়, তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এইরূপ পদার্থের গ্যাস ঠাণ্ডা করিলে তাহাও একেবারে কঠিন হয়, তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। ইহার উদাহরণ কর্পূর (camphor) ও আয়োডিন (iodine)। একটি পোর্সিলেন বেসিনের (porcelain basin) উপর কর্পূর রাখিয়া কাচের ঢাকনি দ্বারা ঢাকিয়া দাও। এখন বেসিনের নীচে সাবধানে তাপ দিলে দেখিবে যে কর্পূর উবিয়া গিয়া ঢাকনির তলায় জমিয়া গিয়াছে। উবিয়া যাওয়ার পর পুনরায় ঘনীভূত করার বৈজ্ঞানিক নাম **ঊর্দ্ধপাতন** (sublimation)।

কর্পূর, বালি, লবণ বা সোরা (Nitre) ও লোহাচুর একত্র মিশাইয়া দেওয়া হইল। কি করিয়া উপাদানগুলিকে পৃথক্ করিবে? সর্ব্বাগ্রে ঊর্দ্ধপাতন দ্বারা কর্পূরভাগকে সংগ্রহ করিবে। তাহার পর চুম্বকসাহায্যে লৌহচূর্ণ বাহির করিয়া লইবে। বাকী রহিল লবণ বা সোরা ও বালি, উহার উপর যথেষ্ট পরিমাণে গরম জল ঢাল। পরে সমস্তটাকে উত্তমরূপে ঝাঁকাইয়া ফিল্টারকাগজযুক্ত ফানেলে ঢাল। বালি ফিল্টার কাগজের উপর থাকিবে, লবণাক্ত বা সোরাযুক্ত জল নীচের পাত্রের মধ্যে চলিয়া যাইবে। এখন বাষ্পীভবন ক্রিয়ার দ্বারা জল ও লবণ বা সোরা পৃথক্ করিলে সব পদার্থ ই ফিরিয়া পাইবে।

Questions

1. What is a solution? What do you understand by a saturated solution?
2. Describe the different methods of separating the constituents of a mixture.

3. Illustrate the use of the following methods of purification of chemical compounds:—(i) filtration; (ii) distillation; (iii) crystallisation and (iv) sublimation. (T. T. 1939)
4. Describe how you would separate the constituents of the following mixtures—(a) Nitre, sulphur and charcoal; (b) Nitre, common salt and sand; (c) camphor, copper sulphate and powdered glass. (T. T. 1940)
5. How will you prepare a sample of (a) clear water, and (b) very pure water from river-water? (C. U. 1940)
6. What is meant by sublimation? Illustrate your answer with examples. (C. U. 1942)
7. How would you proceed to separate a mixture of
   (a) sand, salt and camphor? (C. U. 1943)
   (b) salt, sand and iodine? (C. U. 1945)

দ্বিতীয় অধ্যায়

দহন

(Combustion)

দহন ক্রিয়া (Combustion)—বাতাসের কম বেশী এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন। দহনক্রিয়া বা পোড়ানর অর্থ কোন পদার্থের সহিত অক্সিজেন গ্যাসের সংযোগ। দহন দুই প্রকার—**মৃদু দহন** ও **দ্রুত দহন**। দ্রুত দহনকেই সাধারণ কথায় পোড়ান বলে। মৃদু দহনে অগ্নিশিখা দেখা যায় না। একটা লোহার পেরেক বাহিরে পড়িয়া থাকিলে যে প্রক্রিয়ার ফলে মরিচা দ্বারা আবৃত হইয়া যায়, তাহাকেই বলা যাইতে পারে মৃদু দহন। একখণ্ড কাঠ পোড়াইলে দেখা যায় যে সামান্য একটু ছাই ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। মোমবাতির মোম পুড়িলে ছাইও থাকে না। দেওয়ালির সময় বাজির দোকানে যে "ইলেক্‌ট্রিক তার"

পাওয়া যায় তাহা ম্যাগনেসিয়ম ধাতুর নির্ম্মিত। আগুন ধরাইলে ইহা উজ্জ্বল সাদা আলো দিতে দিতে শীঘ্র পুড়িয়া যায়, একটু সাদা গুঁড়া পড়িয়া থাকে মাত্র। এইগুলি সবই দ্রুত দহনের ফল।

অক্সিজেন না থাকিলে দহনকার্য্য চলে না—বায়ুতে অক্সিজেনের ভাগ প্রায় এক-পঞ্চমাংশ, ইহা ছাড়া যে অন্য একটি বায়বীয় পদার্থ ইহার প্রায় চারি-পঞ্চমাংশ ভাগ জুড়িয়া থাকে, তাহার নাম **নাইট্রোজেন গ্যাস**। অক্সিজেন গ্যাস দহনকার্য্যে সাহায্য করে, কিন্তু নাইট্রোজেন গ্যাস দহনের কোনও সাহায্য করে না।

লোহা, মোমবাতি, ম্যাগনেসিয়ম ও গন্ধকের দহন

পরীক্ষা—১। একটি দাগকাটা পরীক্ষানলে জল ঢালিয়া আবার ফেলিয়া দাও। ভিতরটা ভিজা থাকিতে থাকিতে উহার মধ্যে খানিকটা লোহাচুর দিয়া নাড়িয়া উপুড় কর। কিছু লোহাচুর নলের গায়ে আটকাইয়া থাকিবে, বাকীটা পড়িয়া যাইবে। এখন এই উপুড় করা নলটির মুখ জলে ডুবাইয়া দুই এক দিন রাখিলে দেখিবে যে ধীরে ধীরে কাল লোহাচুর লাল হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ লোহাতে মরিচা ধরিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জলও নলের

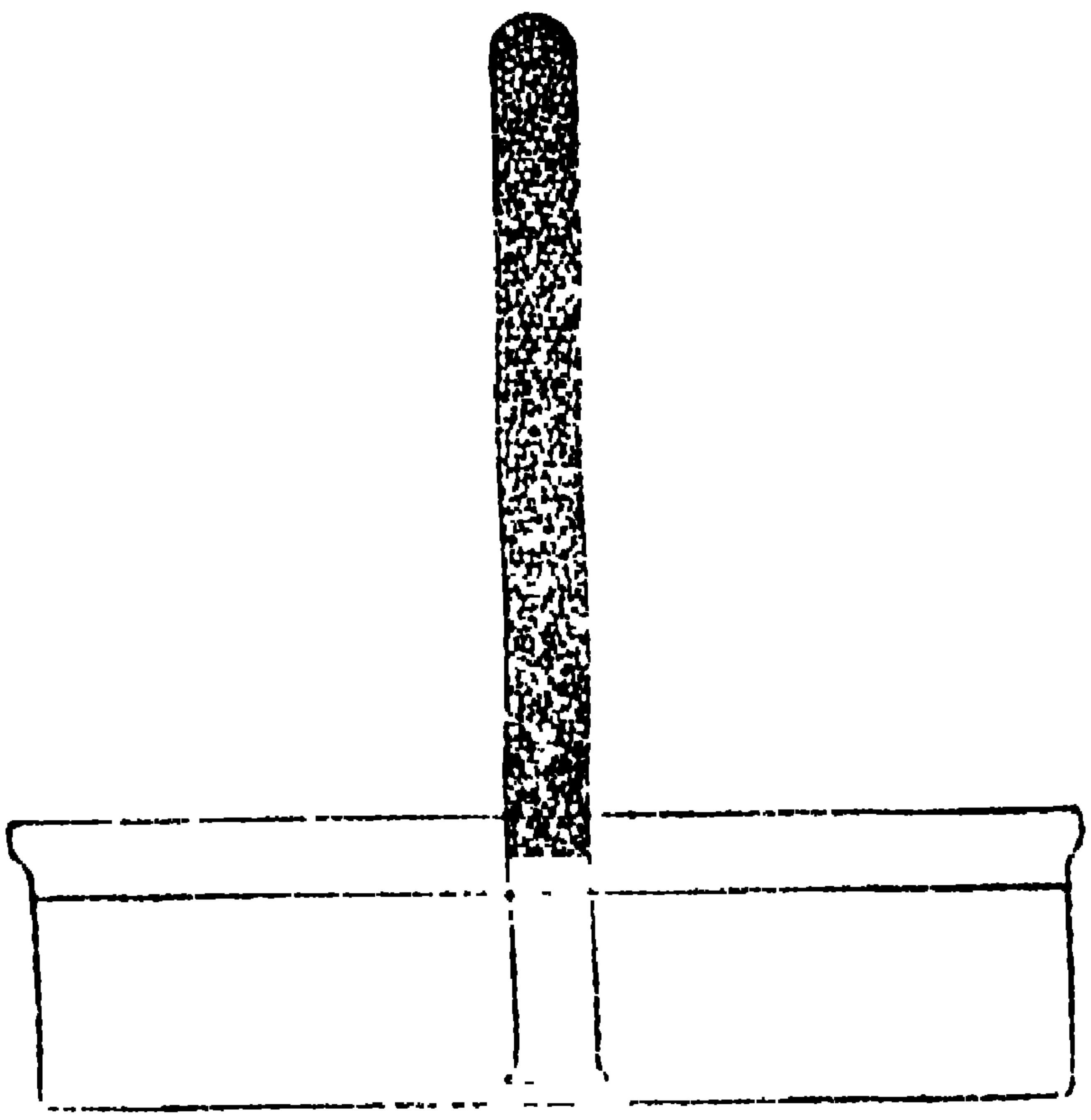

৬৩। লোহাচুরের মৃদু দহন

মধ্যে উপর দিকে উঠিতেছে। কেন এইরূপ হইল? পরীক্ষানলে যে বাতাস ছিল তাহার অক্সিজেনের সহিত লোহাচুরের রাসায়নিক মিলনফলে অর্থাৎ

মৃদুদহনে মরিচা দেখা দিল এবং অক্সিজেনের শূন্যস্থান অধিকার করিতে বাহিরের বায়ুর চাপে পরীক্ষানলে জল উঠিল। জল যখন নলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ স্থান পূর্ণ করিবে, অর্থাৎ সব অক্সিজেন ফুরাইয়া যাইবে, তখন আর লোহাচুরের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে না এবং জলও আর উপরে উঠিবে না। অক্সিজেন শেষ হওয়ায় মৃদুদহনও শেষ হইবে।

২। একটি কাচপাত্রে কিছু জল লইয়া সেই জলের উপর একটি প্রজ্বলিত মোমবাতি বসাও। বাতিটি একটি বেল-জার দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে একটু পরেই দেখিবে মোমবাতির শিখাটি কমিয়া ক্রমে নিভিয়া যাইবে। কারণ মোমবাতির কার্ব্বন ও হাইড্রোজেনের সহিত বাতাসের অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটায় বেল-জারের মধ্যে অক্সিজেনের অভাব হইল।

৩। একটি বেল-জার জলের উপর রাখিয়া উহার মধ্যে ম্যাগনেসিয়ম বা গন্ধক পোড়াইলে দেখা যায় যতক্ষণ সেই আবদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন ভাগ শেষ না হইবে ততক্ষণ দহনক্রিয়া চলিবে। দহনক্রিয়া শেষ হইলে দেখিবে জারের এক-পঞ্চমাংশ জলে ভরিয়াছে ও বাকী চারি-পঞ্চমাংশ খালি আছে। ঐ চারি-পঞ্চমাংশে জ্বলন্ত কাঠি প্রবিষ্ট করাইলে তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে। উহার মধ্যে একটি জীবন্ত ইঁদুর ঢুকাইয়া দিলে সে অল্পক্ষণেই মরিয়া যাইবে। কেননা, অক্সিজেনের অভাবে দীপও জ্বলিবে না, জীবও বাঁচিবে না।

এই তিন পরীক্ষার প্রত্যেকটিতে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত অন্য পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ সাধিত হইয়াছে। ইহার ফলে লোহা আয়রন অক্সাইড, মোমবাতির কার্ব্বন কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়ম ম্যাগনেসিয়ম অক্সাইড, ও গন্ধক সালফার ডাই-অক্সাইডে পরিণত হইয়াছে। সালফার ডাই-অক্সাইড বায়বীয় পদার্থ। গন্ধক জ্বালাইলে উহার সবটাই ঐ গ্যাসরূপে পরিণত হয় বলিয়া, আর ছাই পড়িয়া থাকে না।

দহন ও শ্বাসকার্য্য—শ্বাসকার্য্যের সময়ও দেহের মধ্যে মৃদু দহনকার্য্য চলে। শ্বাস লইবার কালে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে ও রক্তমধ্যস্থিত অঙ্গারঘটিত পদার্থবিশেষের কার্ব্বনের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। শ্বাসত্যাগ কালে এই গ্যাস দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটি কাচপাত্রে খানিকটা পরিষ্কার সদ্যপ্রস্তুত ছাঁকা চূণের জল লইয়া উহাতে হাত হাপর (hand bellow) দিয়া হাওয়া প্রবেশ করাও। দেখিবে চূণের জল পরিষ্কার রহিয়াছে। কারণ বায়ুতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড অতি কম। এখন একটি নলের সাহায্যে মুখ দিয়া ঐ পাত্রস্থিত পরিষ্কার চূণের জলে ফুঁ দাও। দেখিবে চূণের জল ঘোলা হইয়া গিয়াছে। শ্বাসত্যাগ কালে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড খুব বেশী পরিত্যক্ত হয়। এই কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের ক্রিয়ায় পরিষ্কার চূণের জল ঘোলা হইয়া যায়।

দহনের ফলে পদার্থের ওজন বৃদ্ধি হয়। কোন কোন স্থলে ওজন-বৃদ্ধি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়—ম্যাগনেসিয়মের তার বা তামার তার যদি আগে ওজন করিয়া লওয়া হয়, ও পুড়িবার পরে দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থটাকে ওজন করা যায়, তবে দেখিবে সে ওজন বেশী হইয়াছে। যেটুকু ওজন বাড়িয়াছে তাহা যুক্ত অক্সিজেনের, অর্থাৎ বায়ু হইতে যে অক্সিজেন ইহারা দহনের সময় আত্মসাৎ করিয়াছে তাহারই ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়র (Lavoisier) এইরূপ পরীক্ষার ফলে অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। গন্ধক, বিশুদ্ধ কয়লা বা মোম পোড়াইলে কিছু কঠিন পদার্থ অবশিষ্ট থাকে না। কারণ মোম, অঙ্গার বা গন্ধক অক্সিজেন-যুক্ত হইয়া বায়বীয় পদার্থ হওয়ায় বাতাসে মিশিয়া যায়। কাঠের মধ্যে যে

অঙ্গারভাগ আছে তাহা জ্বলিয়া বাতাসে মিলাইয়া যায়, কিন্তু যে ধাতব ভাগ আছে তাহা ভস্মরূপে পড়িয়া থাকে।

মোমবাতি জ্বালানোর ফল—একটি লম্বা কাচের চিমনির তলার মুখ এক ছিদ্রযুক্ত ছিপি দিয়া বন্ধ কর। উপর মুখও আর একটি ছিপি দিয়া বন্ধ কর, ও সেই ছিপির মধ্যে একটি বাঁকা কাচের নল পরাইয়া কাচের নলের বাহিরের মুখের সহিত একটি U-নল জুড়িয়া দাও। U-নলের এক বাহুতে কষ্টিক-পটাশ, অন্য বাহুতে ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড আছে। এইবার চিমনির মধ্যে মোমবাতি ঢুকাইয়া সর্ব্বসমেত ওজন করিয়া সেটা সাবধানে জ্বালাও।

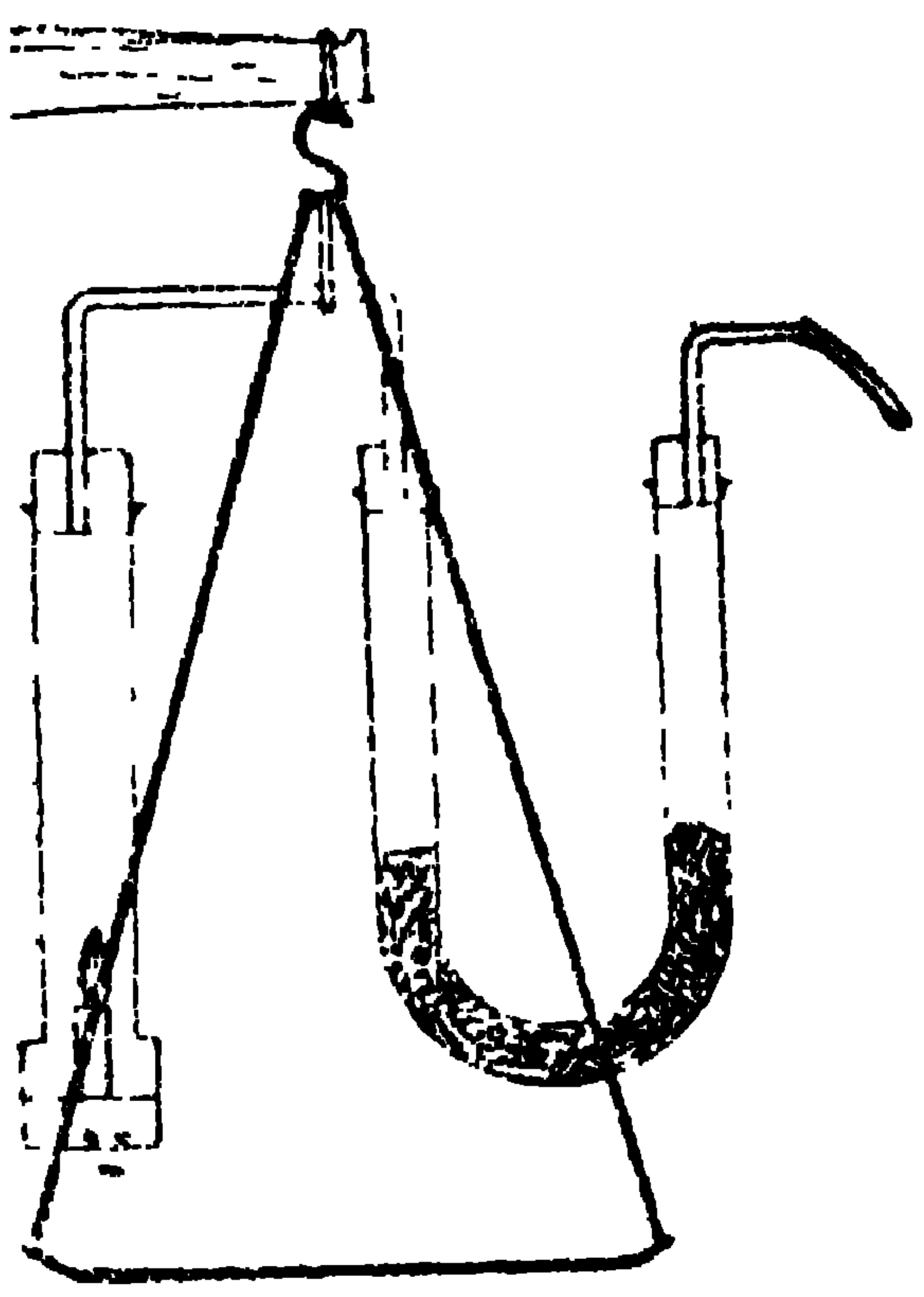

৬৪। মোমবাতি জ্বালাইলে উহার ওজন বৃদ্ধি হয়

এখন U-নলটির সহিত এক বায়ু-শোষক যন্ত্র জুড়িয়া আস্তে আস্তে টানিলে দেখিবে যে, চিমনির নীচের ছিদ্র দিয়া বায়ু ঢুকিয়া চিমনির মধ্য দিয়া U-নলের পথে সেই বায়ু পাম্পে চলিয়া আসিবে। মোমবাতি নিভিবে না, ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে জ্বলিতে থাকিবে। U-নলে ঢুকিবামাত্র দহনের ফলে উৎপন্ন কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প যথাক্রমে কষ্টিক-পটাশ ও ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড দ্বারা শোষিত হইবে। মোমবাতিটি সমস্ত পুড়িয়া গেলে পর আবার ওজন কর, দেখিবে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ওজন বেশী হইয়াছে। যেটুকু বাড়িয়াছে সেইটুকু অক্সিজেনের ওজন। উপরে যে জলীয় বাষ্পের কথা বলিয়াছি, তাহা আসিল কোথা হইতে? মোমবাতির একটি উপাদান হাইড্রোজেন। এই

হাইড্রোজেন পোড়াইলে যে যৌগিক পদার্থ হয় তাহা হাইড্রোজেনের অক্সাইড, অর্থাৎ H_2O বা জল।

মোমবাতি জ্বলিবার সময় আমরা যে শিখাটি দেখিতে পাই তাহা কি প্রকারে উদ্ভূত হয়—প্রথমে জলন্ত সলিতাটির উত্তাপে মোম গলিয়া দ্রব হয়, পরে ঐ দ্রবীভূত মোম **কৈশিক আকর্ষণে** (capillary attraction) সলিতা দ্বারা উপরে উঠিতে থাকে। তপ্ত স্থানে পৌঁছিবামাত্র এই গলিত মোম গ্যাসে পরিণত হয়। এই গ্যাসের সহিত বায়ুস্থ অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে তাপ ও আলোকের সৃষ্টি হয়। যে স্থানে ইহা ঘটে সেইটি দীপশিখা।

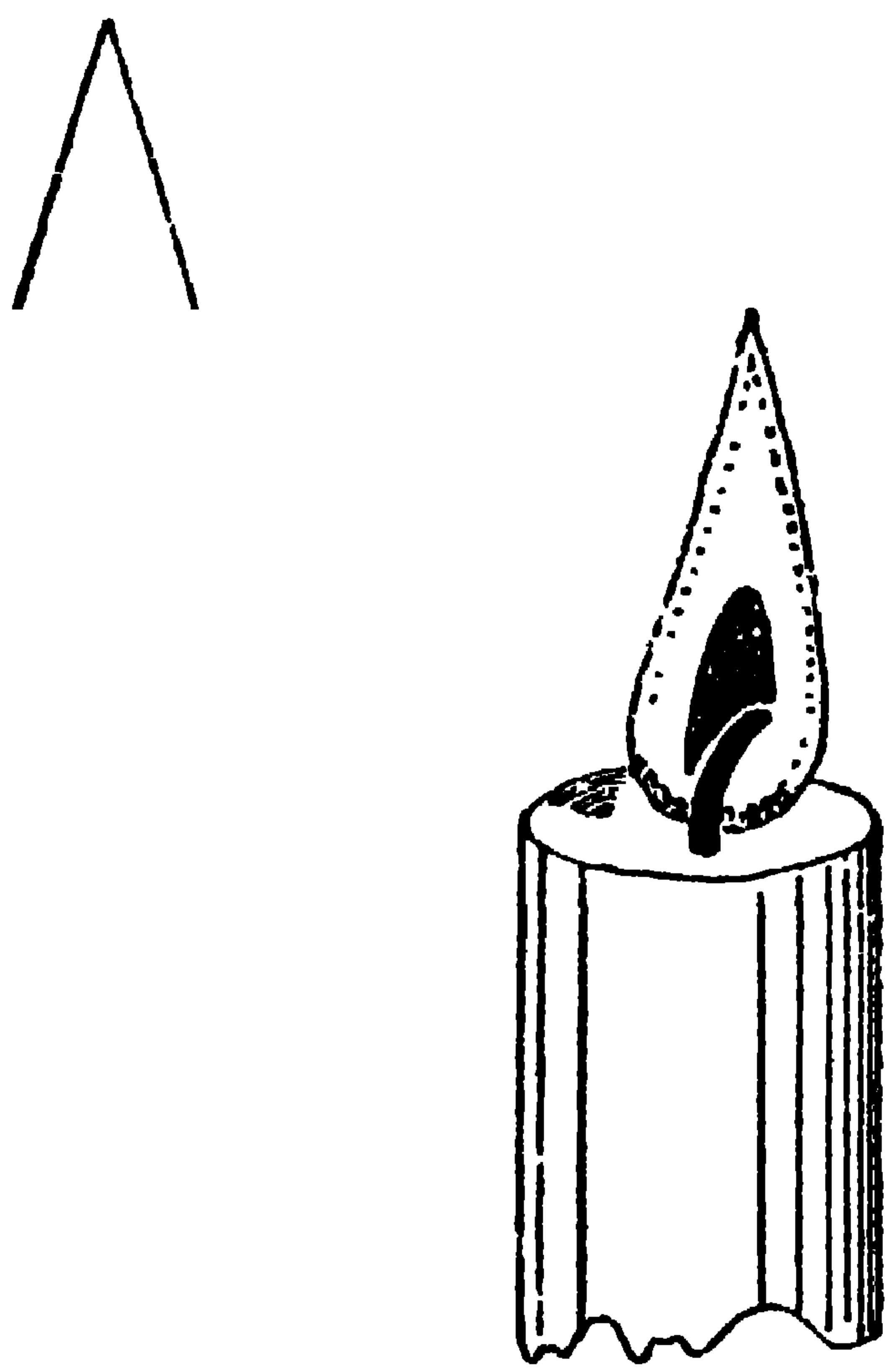

৬৫। বুনসেন দীপ ও মোমবাতি

দীপশিখার মধ্যে এমন একটি স্থান আছে যাহা অপেক্ষাকৃত শীতল, যেখানে দহন নাই। **বুনসেন দীপ** (Bunsen burner) জ্বালিলেও শিখার মধ্যে এইরূপ দহনশূন্য স্থানের অস্তিত্ব বেশ বুঝা যায়।

দ্রুত দহনে অগ্নিশিখা দেখা দেয়, মৃদু দহনে দেয় না। কিন্তু মৃদু দহনে তাপ বৃদ্ধি পায় কি? যদি তাহা না পাইত, তবে মানবদেহের ৯৮·৪° ডিগ্রী উষ্ণতা কোথা হইতে আসিত? আসল কথা দহন যতই মৃদু হউক, তাপ উৎপন্ন হইবেই। লোহাতে মরিচা পড়িবার সময়েও তাপ বৃদ্ধি হয়, তবে সে বৃদ্ধির পরিমাণ এত অল্প যে তাহা সাধারণতঃ ধরা যায় না।

দহন	শ্বাসকার্য্য
১। দহনকালে দাহ্যবস্তুর সহিত অক্সিজেনের প্রায়ই খুব দ্রুত রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে।	১। শ্বাসকার্য্যে দেহ ও রক্ত মধ্যস্থিত কার্ব্বনের সহিত অক্সিজেনের মৃদু রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে।
২। তাপ ও আলোর সৃষ্টি হয়।	২। তাপের সৃষ্টি হয়।
৩। অগ্নি সংযোগের প্রয়োজন।	৩। অগ্নি সংযোগের প্রয়োজন নাই।

Questions

1. What is combustion?
2. What is rust? Why does an iron utensil become heavy on rusting?
3. What happens when a candle burns?
4. How would you prove that the products of combustion of a candle are heavier than the candle itself?
5. Compare the processes of combustion and respiration. (C. U. 1940)
6. Explain chemically what happens when (a) a piece of iron is exposed to moist air; (b) a kerosene lamp burns. (C. U. 1941)
7. What happens when (a) candle burns; (b) a piece of iron rusts; (c) hydrogen burns; (d) coal burns? (C. U. 1944)

তৃতীয় অধ্যায়

বায়ু
(Air)

বায়ুর উপাদান

বায়ু মিশ্রপদার্থ (Air is a mechanical mixture)—বায়ু যৌগিক পদার্থ নহে, বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ মাত্র। বায়ুর মধ্যে আয়তনে নাইট্রোজেন ৪ ভাগ ও অক্সিজেন ১ ভাগ থাকে। রাসায়নিক মিলনে প্রায়ই তাপের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই হিসাবে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিশাইলে উহার তাপ বা আয়তনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। উপরোক্ত কৃত্রিম বায়ু ও সাধারণ বায়ুর ধর্ম্ম এক। বায়ুর উপাদানগুলি যে পরিমাণে ইহার মধ্যে মিশ্রিত রহিয়াছে, তাহা মোটামুটি স্থির থাকিলেও একেবারে নির্দ্দিষ্ট নয়। রাসায়নিক যোগ ঘটিলে উপাদানগুলির ওজনের অনুপাত সর্ব্বসময়ে এক থাকিত। কিন্তু বায়ুতে উপাদানগুলির অনুপাত সকল স্থানে ও সর্ব্বসময়ে এক নয়।

বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত—

অক্সিজেন	শতকরা	২০.৬০ ভাগ
নাইট্রোজেন	”	৭৭.১৬ ”
জলীয় বাষ্প	”	১.৪০ ”
কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড	”	০.০৪ ”
আর্গন প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য বায়বীয় পদার্থ	”	০.৮০ ”
	মোট	১০০.০০ ”

ইহা ছাড়া বায়ুতে অতি সামান্য নাইট্রিক অ্যাসিড বাষ্প আছে, এবং অতি সূক্ষ্ম বহু ধূলিকণা সর্ব্বদা ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অক্সিজেন

অক্সিজেনের স্বাভাবিক উৎপত্তি (Occurrence)—যৌগিক পদার্থ হিসাবে মাটি ও জলে এবং মৌলিক পদার্থ হিসাবে বায়ুতে পাওয়া যায়। বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন।

পরীক্ষাগারে অক্সিজেন প্রস্তুত-করণ (Preparation of oxygen)—পটাসিয়ম ক্লোরেট গরম করিয়া

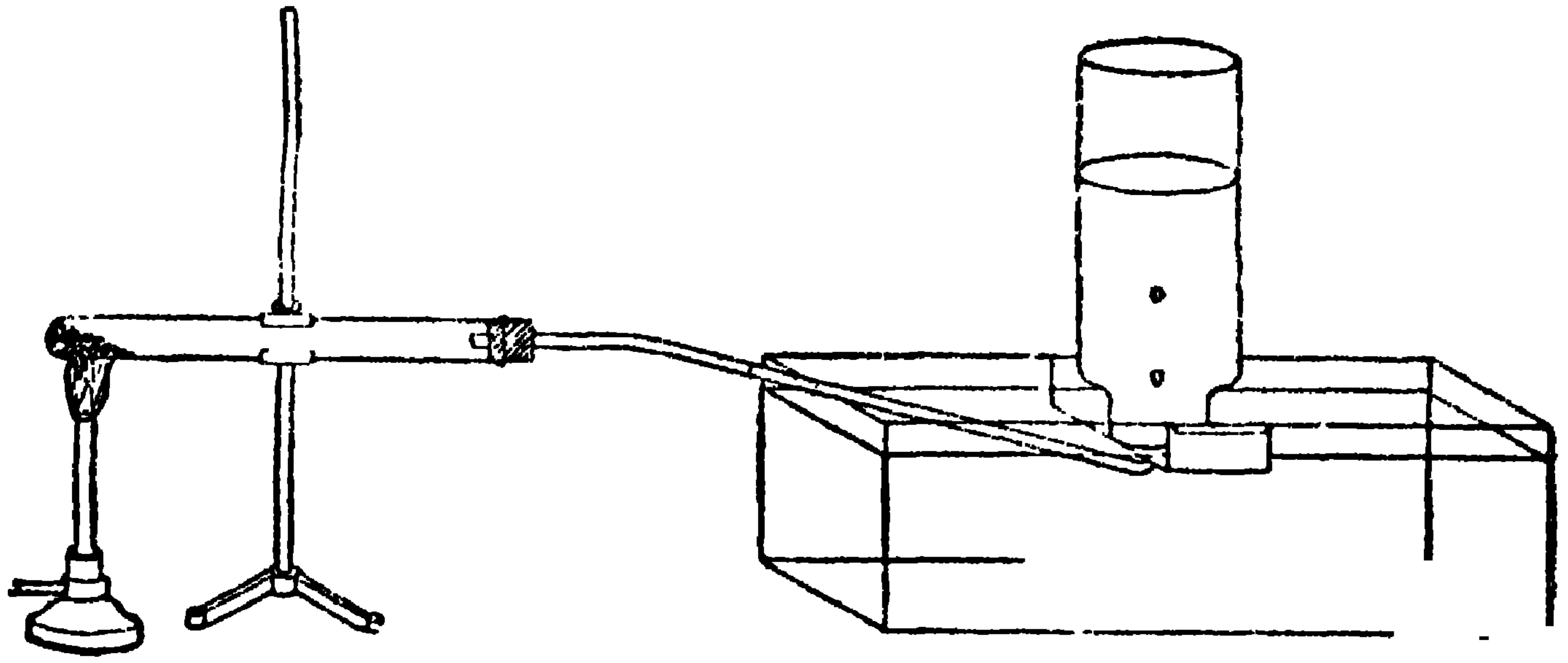

৬৬। পটাসিয়ম ক্লোরেট হইতে অক্সিজেন প্রস্তুত-করণ

অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয়। পটাসিয়ম ক্লোরেটের সহিত একটু ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন আরও সহজে বাহির হয়। এই মিশ্রিত পদার্থ একটি পরীক্ষানলে (test tube) লইয়া উহার মুখে একটি কর্ক পরাও, ও সেই কর্কে ছিদ্র করিয়া একটি বাঁকা নল প্রবেশ করাইয়া দাও। এখন একটি পাত্রে জল রাখিয়া নলের অপর দিকটি উহাতে ডুবাও। তারপর স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন দীপ জ্বালিয়া পরীক্ষানলটি উত্তপ্ত করিলে জলের মধ্য দিয়া অক্সিজেন গ্যাস বুদ্‌বুদ্

আকারে বাহির হইবে। যেখানে বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে ঐ স্থানে একটি জলপূর্ণ বোতল উপুড় করিয়া ধর; বোতলের মধ্যে গ্যাস জমিবে ও বোতলের জল বাহির হইয়া আসিবে। এখন গ্যাসপূর্ণ বোতলটির মুখ ঢাকনি দিয়া বন্ধ করিয়া সোজাভাবে বসাও।

পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেটের উপর ফোঁটা ফোঁটা হাইড্রোজেন পারক্সাইড ঢালিয়াও অক্সিজেন প্রস্তুত করা যায়।

অক্সিজেনের স্বরূপ (Properties of oxygen)—অক্সিজেন বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন, স্বচ্ছ, বায়বীয় পদার্থ। ইহা দহনীয় নহে, কিন্তু **সকল দহনক্রিয়াই ইহার সাহায্যে সম্পন্ন হয়।** দহনের অর্থই অক্সিজেন-সংযোগ। **অক্সিজেন ছাড়া কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌ বাঁচিতে পারে না**; অর্থাৎ ইহাদের **শ্বাসকার্য্য চলিতে পারে না।**

এই গ্যাস অতি সহজেই অপর মৌলিক পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়, ও সেই যৌগিক পদার্থকে **অক্সাইড** (oxide) কহে। অক্সিজেন জলে সামান্য দ্রবণীয় এবং বায়ু হইতে ভারী।

অক্সিজেনের পরীক্ষা (Test for oxygen)—একটি জলন্ত কাঠি নিভাইয়া অগ্নিকণা থাকিতে থাকিতে অক্সিজেন গ্যাস পূর্ণ জারের (jar) মুখে ঢুকাইয়া দাও, কঠিটি দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠিবে।

জীবজগতে অক্সিজেনের আবশ্যকতা—জীবমাত্রেরই অক্সিজেন আবশ্যক। এমন কি জলের মাছও অক্সিজেন না হইলে বাঁচিবে না। বায়ু কিয়ৎপরিমাণে জলে দ্রবীভূত হইতে পারে। কিন্তু নাইট্রোজেন অপেক্ষা অক্সিজেন অধিক দ্রবণীয় হওয়ার দরুণ জলে দ্রবীভূত বায়ুতে অক্সিজেনের মাত্রা বেশী। ইহাতে মাছের শ্বাসগ্রহণের সুবিধাই হয়।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীরা শ্বাসকার্য্যে অক্সিজেন লয় ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। উদ্ভিদেরা কার্ব্বন-আত্মকরণ ক্রিয়ার দ্বারা কার্ব্বন ডাই অক্সাইডের কার্ব্বন লইয়া অক্সিজেন ত্যাগ করে। এই ব্যবস্থা না থাকিলে অক্সিজেন কবে ফুরাইয়া যাইত ও আকাশমণ্ডল কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড বাষ্পে ভরিয়া যাইত! জীবজগৎ ধ্বংস হইয়া যাইত। সুতরাং উদ্ভিদ্‌জগৎই বায়ুর অক্সিজেন ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের সমতা রক্ষা করে।

অক্সিজেনের ব্যবহার—কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনার জন্য এবং অক্সি-হাইড্রোজেন অগ্নিশিখা আলোর জন্য এবং ঐ অগ্নিশিখাদ্বারা নানা ধাতু গলাইবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়।

Questions

1. How does oxygen occur in nature?
2. How would you demonstrate the fact that air contains approximately 20 per cent of oxygen? Enumerate the other constituents of air and state in what proportions they exist. (C. U. 1947)
3. Explain chemically what happens when a mouse is put in a closed jar. (C. U. 1941)
4. Describe how oxygen can be prepared. Why is oxygen considered to be such an important gas? (C. U. 1945)

নাইট্রোজেন

নাইট্রোজেনের স্বাভাবিক উৎপত্তি (Occurrence)—বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে।

পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেন প্রস্তুত-করণ (Laboratory process)—পরীক্ষাগারে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন প্রস্তুত করিতে হইলে উহা ফস্‌ফরসের মৃদুদহনের সাহায্যে সহজে হইতে পারে। এক টুকরা ফস্‌ফরস ঈষৎ ভিজাইয়া সমভাবে দাগকাটা জারের (jar)

ভিতর জলের উপর আবদ্ধ বায়ুতে রাখিয়া দিলে জারের মধ্যে ধীরে ধীরে জল উঠিয়া এক-পঞ্চমাংশ ভরিয়া ফেলিবে এবং বায়ুর অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক সংযোগের দরুণ ফস্‌ফরসের চেহারাও বদলাইয়া যাইবে। যে চারি-পঞ্চমাংশ বায়বীয় পদার্থ অবশিষ্ট রহিল তাহা মূলতঃ নাইট্রোজেন।

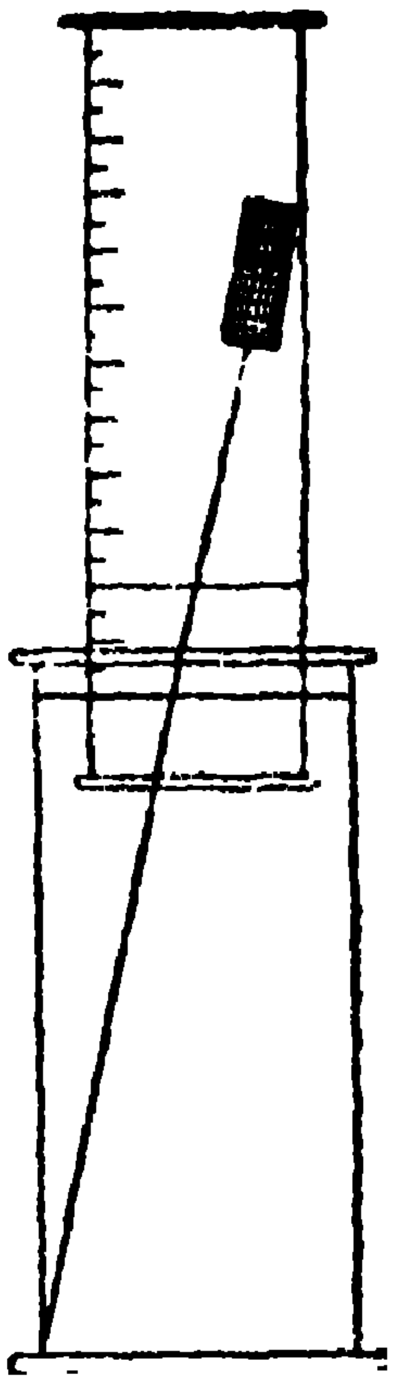

৬৭। নাইট্রোজেন প্রস্তুতকরণ

নাইট্রোজেনের স্বরূপ (Properties of nitrogen)—নাইট্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ, বায়বীয় পদার্থ। ইহা বিষাক্ত নহে। নাইট্রোজেন, মূলতঃ নিষ্ক্রিয় পদার্থ; সহজে অন্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহে না। ম্যাগ্‌নেসিয়ম আদি গুটিকয়েক মৌলিক পদার্থ আছে, যাহারা অতিশয় উত্তপ্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন টানিয়া লইয়া যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। ইহা জলে সামান্য দ্রবণীয় এবং বায়ু হইতে সামান্য হালকা।

অত্যধিক চাপ ও শৈত্য প্রয়োগে বায়ু তরলীভূত করা যায়। এই তরলীভূত বায়ুকে সাবধানে উবিয়া যাইতে দিলে প্রথমে যে গ্যাস বাহির হয় তাহার প্রায় সবটাই নাইট্রোজেন। ব্যবসায়ের জন্য অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন এই প্রক্রিয়া দ্বারাই প্রস্তুত হয়।

নাইট্রোজেনের পরীক্ষা (Test for nitrogen)—ইহা জলন্ত দীপশিখাকে নিভাইবে, কিন্তু ইহা চূণের জল ঘোলা করিবে না।

জীবের জন্য বায়ুতে নাইট্রোজেনের আবশ্যকতা—বাতাসের নাইট্রোজেন জীবের দেহগঠনে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোন সহায়তা করে না, তবে কিরূপে এই পদার্থটি জীবনযাত্রার উপযোগী? এমন সব তীব্র ঔষধ আছে যাহাতে জল না মিশাইয়া শুধু শুধু

খাইতে চেষ্টা করিলে মুখ, গলা পুড়িয়া যাইবে। অক্সিজেনের ব্যাপারটাও কতকটা সেইরূপ। ইহার দহিকাশক্তি এত প্রবল যে, সুস্থ শরীরে ইহার শ্বাসগ্রহণ করিলে দেহের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য প্রকৃতিদেবী ইহাতে নাইট্রোজেন মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে অক্সিজেনের তেজ কতকটা সংযত হয়। কিন্তু শ্বাসকষ্ট হইলে রোগীকে চিকিৎসকেরা বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্রয়োগ দ্বারা বাঁচাইয়া রাখেন।

নাইট্রোজেনের ব্যবহার (Uses of nitrogen) —বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন গ্যাসের ব্যবহার অতি অল্প। তবে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ আমাদের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রোটিনের অঙ্গীভূত। জমিতে দিবার কোন কোন কৃত্রিম সার নাইট্রোজেন গ্যাস সাহায্যে প্রস্তুত করা যায়।

Questions

1. How does nitrogen occur in nature? State its properties and uses.
2. How would you obtain nitrogen from air?
3. Is air a chemical compound or a mechanical mixture? Give reasons for your answer.

জলীয় বাষ্প

(Water Vapour)

জলীয় বাষ্পের স্বাভাবিক উৎপত্তি (Occurrence)—এক গেলাস বরফ-জল রাখিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ গেলাসের বাহিরের দিকে জল জমিয়া গেলাসের গা বহিয়া জল গড়াইয়া

পড়িতেছে, দেখা যায়। এই জল কোথা হইতে আসে? বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প আছে তাহা গ্লাসের গায়ে লাগিয়া ঠাণ্ডা হওয়ায় জলে পরিণত হয়। বায়ুমণ্ডলের এই জলীয় বাষ্পই শিশির-কুয়াসাদিতে পরিণত হয়। পৃথিবীতে সমুদ্র-নদী-হ্রদাদি হইতে জলীয় বাষ্প ক্রমাগত উপরে উঠিতেছে ও আকাশে ছড়াইয়া যাইতেছে। আবার সেই বাষ্পই শীতল হইয়া বৃষ্টিতুষারাদি রূপে ভূমিতলে পড়িতেছে।

কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড (বা অঙ্গারাম্ল বাষ্প)

কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের স্বাভাবিক উৎপত্তি—বায়ুতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়; দশ হাজার ভাগ বায়ুতে মাত্র চারি ভাগ। জীবমাত্রই শ্বাসত্যাগকালে ইহা পরিত্যাগ করে। কাঠ, কয়লা ইত্যাদি পোড়াইলে যে গ্যাস নির্গত হয় তাহা প্রধানতঃ কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস।

বায়ুতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্বের প্রমাণ—চূণের জল কাচের বাটিতে কয়েকদিন রাখিলে উহার উপরে সাদা সর পড়ে। এই সরটা চা-খড়ি,—চূণ ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড মিশিয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

পরীক্ষাগারে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত-করণ (Laboratory process)—চা-খড়ি বা মার্ব্বেল পাথরের টুকরার উপর লবণাম্ল (hydrochloric acid) ঢালিয়া এই গ্যাস উৎপাদন করা হয়।

কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের স্বরূপ (Properties of carbon dioxide)—কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড বর্ণহীন, কিন্তু ইহার ঈষৎ গন্ধ ও অম্লস্বাদ আছে। ইহা দাহ্য পদার্থ নহে, দহনেরও সাহায্য করে না।

অব্যবহৃত কূপমধ্যে বা গুহাতে এই গ্যাস জমিয়া আছে কি না দেখিবার জন্য তাহাতে অগ্রে দীপশিখা নামাইয়া দেওয়া হয়। জ্বলন্ত দীপ ইহার মধ্যে ডুবাইলে নিভিয়া যায়। ইহা তরল পদার্থের মত এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা যায়। এই গ্যাস বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ ভারী এবং জলে দ্রবণীয়। ম্যাগনেসিয়ম, সোডিয়ম ও পটাসিয়ম এই তিন ধাতু এই গ্যাসে জ্বলিতে পারে। ইহারা অঙ্গারাম্ল হইতে অক্সিজেন টানিয়া লইয়া অঙ্গারভাগকে মুক্ত করিয়া দেয়।

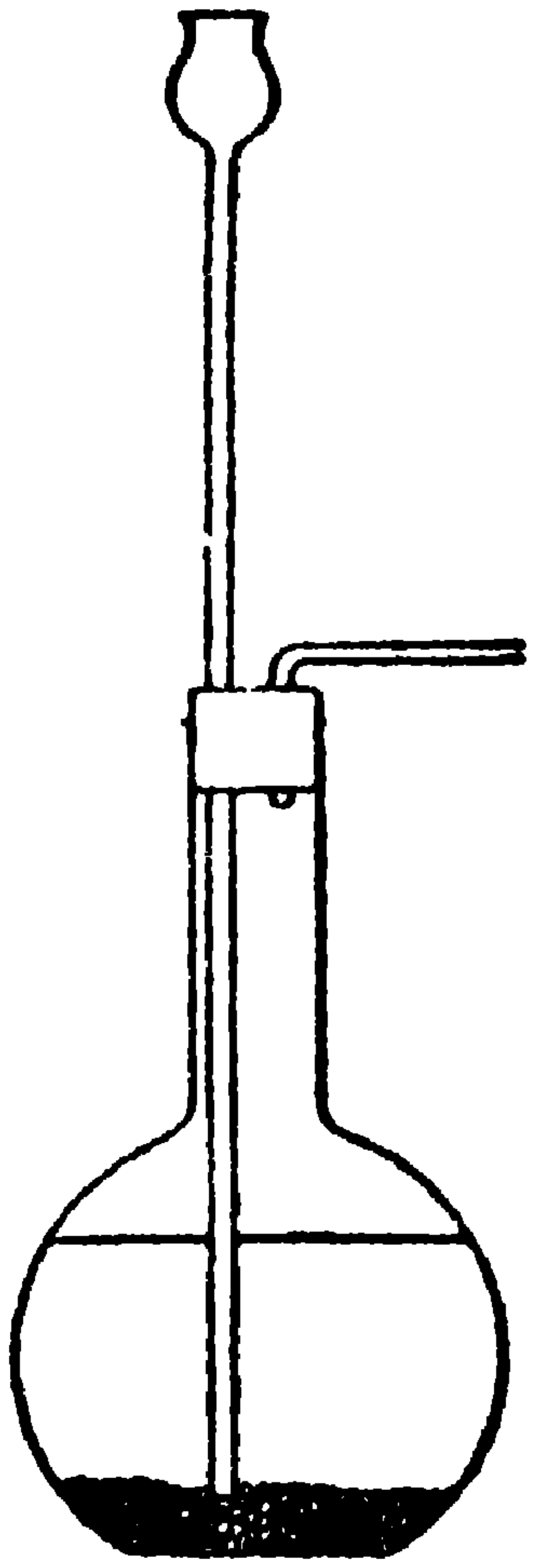

১৮। চাখড়ি হইতে অঙ্গারাম্ল প্রস্তুত করিবার কাচকূপী

কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরীক্ষা (Test for carbon dioxide)—একটি গেলাসে পরিষ্কার চূণের জল লইয়া তাহার মধ্যে কাচের নল দ্বারা ফুঁ দাও। চূণের জল ঘোলা হইয়া যাইবে ও ক্রমশঃ একটি সাদা পদার্থ নীচে থিতাইয়া পড়িবে। এই থিতাইয়া পড়া পদার্থটি চা-খড়ি। চা-খড়িকে ভাটিতে পোড়াইলে তাহা হইতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হইয়া যায়; যাহা পড়িয়া থাকে তাহা চূণ।

$CaCO_3$	CaO	CO_2
চা-খড়ি	চূণ	কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড

কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যবহার (Uses of carbon dioxide)—থিয়েটার বায়স্কোপের বাড়ীতে লাল রঙের লোহার নল দেখিয়া থাকিবে। প্রয়োজন মত ঐ নলের ভিতর প্রভূত

অঙ্গারায় উৎপন্ন হইবার ব্যবস্থা আছে। এই গ্যাসে আগুন নিভিয়া যায়। এই গ্যাসের সাহায্যে কাপড় কাচা সোডা প্রস্তুত করা যায়। ইহা জমিয়া কঠিন হইলে যে পদার্থ হয় তাহার নাম ড্রাই আইস (dry ice)।

বাতান্বিত জল (Aerated water)—কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুর সহিত বেশী পরিমাণে নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিলে শরীরের পক্ষে অপকারক, কিন্তু জলের সঙ্গে গ্রহণ করিলে হজমের পক্ষে খুব উপকারী। এই জন্য যন্ত্র-সাহায্যে খুব বেশী চাপ প্রয়োগ করিয়া পানীয় জলে বহুল পরিমাণে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রবেশ করান হয়। ইহাই বাতান্বিত জল। বোতলে ভরা এই পানীয় সোডার জল বলিয়া কথিত হয়। গ্যাস ভরিবার সময়েই যন্ত্র-সাহায্যে ছিপি আটকান হয়। ছিপি খুলিলেই বোতল হইতে গ্যাস বাহির হইতে থাকে। সে কারণ ছিপি খুলিবার অব্যবহিত পরেই এই জল পান করা উচিত।

কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের উপকারিতা—উদ্ভিদ্-জগৎ কার্ব্বন বা অঙ্গার বাতাসের কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড হইতে সংগ্রহ করে। বস্তুতঃ উদ্ভিদের পক্ষে ইহাই কার্ব্বন সংগ্রহের একমাত্র উপাদান।

Questions

1. How would you prove that air contains carbon dioxide and moisture?
2. How would you demonstrate that the air we breathe out contains carbon dioxide?
3. Give an account of the properties of carbon dioxide and describe experiments to illustrate them. To what extent does it usually occur in atmospheric air? Explain clearly the part it plays in the economy of plant and animal life? (T. T. 1938)
4. Write all you know about carbon dioxide. What is dry ice? (C. U. 1941)

চতুর্থ অধ্যায়

জল

(Water)

জলের উপাদান

জল যৌগিক পদার্থ—পুরাকালে লোকে জলকে মৌলিক পদার্থ মনে করিত। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিশ (Cavedish) প্রমাণ করেন যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি মৌলিক পদার্থ মিলিত হইয়া জল নামক যৌগিক পদার্থ গঠিত হইয়াছে। মিশ্র পদার্থের উপাদানের পরিমাণ একেবারে নির্দ্দিষ্ট নহে, কিন্তু যৌগিক পদার্থের উপাদানের পরিমাণ একেবারে নির্দ্দিষ্ট। জলকে বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা বিশ্লেষণ (electrolysis) করিলে উহা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট হয়।

জলকে বিদ্যুৎপ্রবাহের দ্বারা বিশ্লিষ্টকরণ (Electrolysis of water)—এমন একটি কাচের পাত্র লও যাহার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা আছে। বিজলী তারের দুই প্রান্তে দুইটি প্লাটিনাম পাত আটকাইয়া রাখ। পাত্রটিতে সামান্য সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড মিশান পাতিত জল ঢাল। পরে দুইটি দাগকাটা পরীক্ষানল জলে ভরিয়া লও ও ধীরে ধীরে সেই দুইটিকে পাত্রস্থ জলে এরূপ সাবধানে উল্টাইয়া দাও যে একটু বায়ু না ঢোকে। প্লাটিনাম পাত দুইটির এক একটি এক এক নলের নীচে থাকিবে। এইবার বিদ্যুৎপ্রবাহ

চালাও। দেখিবে যে নলদুইটির মধ্যে বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে ও নলমধ্যস্থ জল নামিয়া যাইতেছে। একটি নলে **অক্সিজেন** উঠিবে, অন্যটিতে **হাইড্রোজেন** উঠিবে। হাইড্রোজেনের আয়তন অক্সিজেনের দ্বিগুণ হইবে। এই পরীক্ষা হইতে দেখা যায় যে **আয়তন হিসাবে জলের উপাদান দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন।** একটি জ্বলন্ত কাঠি নিভাইয়া অগ্নিকণা থাকিতে থাকিতে অক্সিজেন গ্যাস রক্ষিত নলে ঢুকাইলে দপ্ করিয়া কাঠিটা জ্বলিয়া উঠিবে, কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস রক্ষিত নলে ঐরূপ হইবে না।

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দ্বারা জল প্রস্তুত-করণ—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে জল প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

জলের গুণ
(Properties of water)

বিশুদ্ধ জলের স্বরূপ—বিশুদ্ধ জল স্বাদহীন, গন্ধহীন, স্বচ্ছ, তরল পদার্থ। অল্প পরিমাণ জল লইলে তাহা বর্ণহীন বোধ হয়; বিশাল সমুদ্র কিন্তু ঈষৎ নীলাভ। ১০০° সেণ্টিগ্রেডে জল ফুটিয়া বাষ্প হইতে থাকে, ও ০° সেণ্টিগ্রেডে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। সাধারণ উত্তাপে সোডিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া হাইড্রোজেন বাহির করিয়া দেয়। লৌহ, এলুমিনিয়ম প্রভৃতি ধাতু কেবল উত্তপ্ত অবস্থায় এই বিশ্লেষণকার্য্য করিতে পারে। সকল অবস্থাতেই জল একটু একটু করিয়া বাষ্পে পরিণত হইতে থাকে। ফুটাইলে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর সম্পন্ন হয়। জলে চিনি বা নিশাদল গলাইলে জল ঠাণ্ডা হয়।

চূণ জাতীয় পদার্থ জলে দিলে, জল গরম হইয়া উঠে। জলে স্পিরিট দিলে উহা গুলিয়া যায় ও উত্তাপ ঈষৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কোন তরল পদার্থ জল কিনা তাহার পরীক্ষা—(১) উহার স্ফুটনাঙ্ক ১০০° এবং হিমাঙ্ক ০° হইবে।

(২) তুঁতে গরম করিলে উহার নীল রং সাদা হয়। এই সাদা তুঁতেতে দুই এক ফোঁটা জল দিলে উহার রং ফিরিয়া আসিবে।

(৩) পাথর চূণে জল দিলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়।

(৪) জলে পটাসিয়ম ধাতু দিলে বেগনি আলোকশিখা দেখা দিবে।

প্রাকৃতিক জল
(Natural Water)

প্রাকৃতিক জলের প্রকারভেদ—পৃথিবীতে স্থল অপেক্ষা জলের ভাগ বেশী। জলের গুণানুসারে ইহার শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যথা—লোনা জল, মিঠা জল, মৃদু জল, খর জল ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক জলের স্বরূপ (Properties of natural water)—জলে অনেক পদার্থই অতি সহজে দ্রবণীয়। এই জন্য রাসায়নিক হিসাবে বিশুদ্ধ জল প্রকৃতিতে কখনই পাওয়া যায় না। স্বাভাবিক জলের মধ্যে বৃষ্টির জল এবং শিলা বা তুষার গলান জল অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। কিন্তু পাতিত (distilled) জল ছাড়া আর কোন জলই একেবারে বিশুদ্ধ নহে। জলে যে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত থাকে তাহাদের জন্য স্বাভাবিক জলের গুণের স্বল্পাধিক ব্যতিক্রম হইতে বাধ্য।

প্রাকৃতিক জলকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) **বৃষ্টির জল**—ইহাই প্রাকৃতিক বিশুদ্ধ জল। কিন্তু ইহাতেও কিছু অক্সিজেন ও অঙ্গারাম্ল থাকে, সামান্য নাইট্রিক অ্যাসিডেরও চিহ্ন পাওয়া যায়। (২) **কূপ বা ঝরণার জল**—প্রশস্ত পানীয় জল। ইহাতে নানা ধাতুঘটিত লবণ বিদ্যমান। সোডিয়ম, পটাসিয়ম, ক্যালসিয়ম, ম্যাগ্নেসিয়ম ঘটিত লবণ থাকেই, কখন কখন লৌহঘটিত লবণও পাওয়া যায়। (৩) **নদী, খাল, বিলের জল**—ইহাতে নানা প্রকার অশুদ্ধ দ্রব্যাদি থাকিতে পারে। না ছাঁকিয়া ও ফিল্টার না করিয়া পান করা উচিত নহে। (৪) **সমুদ্রের জল**—অতিশয় লবণাক্ত ও অপেয়। নানাপ্রকার ধাতব লবণ এই জলে পাওয়া যায়।

উপকারী লবণাক্ত জল—অনেক কূপ বা ঝরণার জলের ঔষধ বলিয়া খ্যাতি আছে। ইহার অর্থ এই যে, সেই জলে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী নানাপ্রকার লবণ দ্রবীভূত থাকে। মুঙ্গেরের **সীতাকুণ্ডের জল** ও ইউরোপের **ভিসি** (Vichy), **কাল্সবাড** (Carlsbad) ইত্যাদি স্থানের জল এইরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

প্রাকৃতিক জল পরিষ্কৃত করণ—সাধারণতঃ নদী, খাল, বিলের জল ফটকিরি দিয়া পরিষ্কৃত করা হয়। ফটকিরিযুক্ত জল কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে তাহার মধ্যস্থ কাদা ইত্যাদি নীচে থিতাইয়া পড়ে। তখন উপরের পরিষ্কার জল পাত্রান্তরে ঢালিয়া লইতে হয়। জলের মধ্যে নানারূপ রোগবীজাণু থাকিতে পারে। উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে এই সমস্ত বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়।

পাতিত জলই একমাত্র বিশুদ্ধ, কিন্তু খাইতে বিস্বাদ। ইহার অর্থ এই যে, মানবের অপকারী নয় এরূপ অনেক লবণ জলে থাকে, সামান্য বায়ুও

জলে দ্রব অবস্থায় থাকে। এইগুলি থাকে বলিয়াই আমরা যাহাকে স্থপেয় জল বলি তাহা স্থস্বাদ হয়।

মৃদু ও খর জল (Hard and soft water)—সকল জলে সাবানের ফেনা সমান হয় না। যে জলে সহজেই ফেনা হয়, তাহাকে বলা হয় **মৃদু জল** (soft water) ; যাহাতে হয় না, তাহাকে বলা হয় **খর জল** (hard water)। এই দ্বিতীয় প্রকার জল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

মৃদুতা ও খরতার রাসায়নিক কারণ—পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জলে যদি ম্যাগনেসিয়ম বা ক্যাল্সিয়ম্ ঘটিত লবণ থাকে তাহা হইলে সেই জলে সহজে সাবানের ফেনা হয় না। জলের এই খরতা-গুণ স্থায়ী বা অস্থায়ী হইতে পারে। যদি উপরোক্ত দুই ধাতুর কার্ব্বনেট লবণ জলে গোলা থাকে, তবে সে জলকে সহজেই মৃদু করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু যদি উক্ত ধাতুদ্বয়ের ক্লোরাইড বা সালফেট লবণ জলে দ্রবীভূত থাকে, তবে সে জলের খরতা দূর করা বড়ই কঠিন।

খর জলকে মৃদু করিবার উপায়—(১) খর জল ফুটাইয়া বা উপযুক্ত পরিমাণে চূণের জল মিশাইয়া উহাকে উত্তমরূপে ঝাঁকাইয়া লইলে দেখিতে পাইবে যে একটা গুঁড়া পদার্থ নীচে থিতাইয়া পড়িয়াছে। এখন ছাঁকিয়া লইলেই দেখিবে জল বেশ মৃদু হইয়াছে। খরতা স্থায়ী হইলে সোডা মিশাইয়া ফুটাইলেই সেই জল মৃদু হইয়া যায়।

(২) পারমুটাইট্ নামক এক পদার্থের মধ্য দিয়া জলকে ফিল্টার করিয়া লইলে খর জল মৃদু হইয়া যায়। ইহাই সহজ উপায়।

অক্সিজেন

বায়ুর উপাদান বলিবার সময় সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে।

হাইড্রোজেন

হাইড্রোজেন প্রস্তুত-করণ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জলীয় বাষ্পকে উত্তপ্ত লোহার উপর দিয়া চালাইলে লোহা জলের অক্সিজেন টানিয়া লয় ও হাইড্রোজেন বাহির হয়। জলে সোডিয়ম, পটাসিয়ম ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর যে কোন একটি ফেলিয়া দিলেও জল হইতে হাইড্রোজেন নির্গত হয়।

পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন প্রস্তুত-করণ—দস্তার টুকরার উপর জল মিশ্রিত সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা হয়। যে পাত্রে এই পরীক্ষা হয় তাহা একটি দুই মুখবিশিষ্ট বোতল, নাম উল্‌ফ-বোতল (চিত্র ৬৯)। দুই মুখে ছিপি দুইটির মধ্যে দুইটি নল পরান হয়। একটি নলের আগায় একটি ছোট ফানেল থাকে। সে নলটি একেবারে বোতলের তলা পর্য্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয় নলটি আরম্ভ হইয়াছে বোতলের গলার নিকট হইতে এবং তাহার আগা খুব সরু। এই বোতলে প্রথমে দস্তার টুকরা রাখিয়া তাহার উপর ধীরে ধীরে ফানেল দিয়া অ্যাসিড ঢালিতে থাক। বেগে বুদ্‌বুদ্‌ উঠিবে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হইতে থাকিবে। ভিতরের সমস্ত বাতাস বাহির হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। তারপরে একটি দেশলাই জ্বালাইয়া দ্বিতীয় নলের সূচাল মুখে ধরাও, দেখিবে দিব্য নীলাভ দীপশিখা।

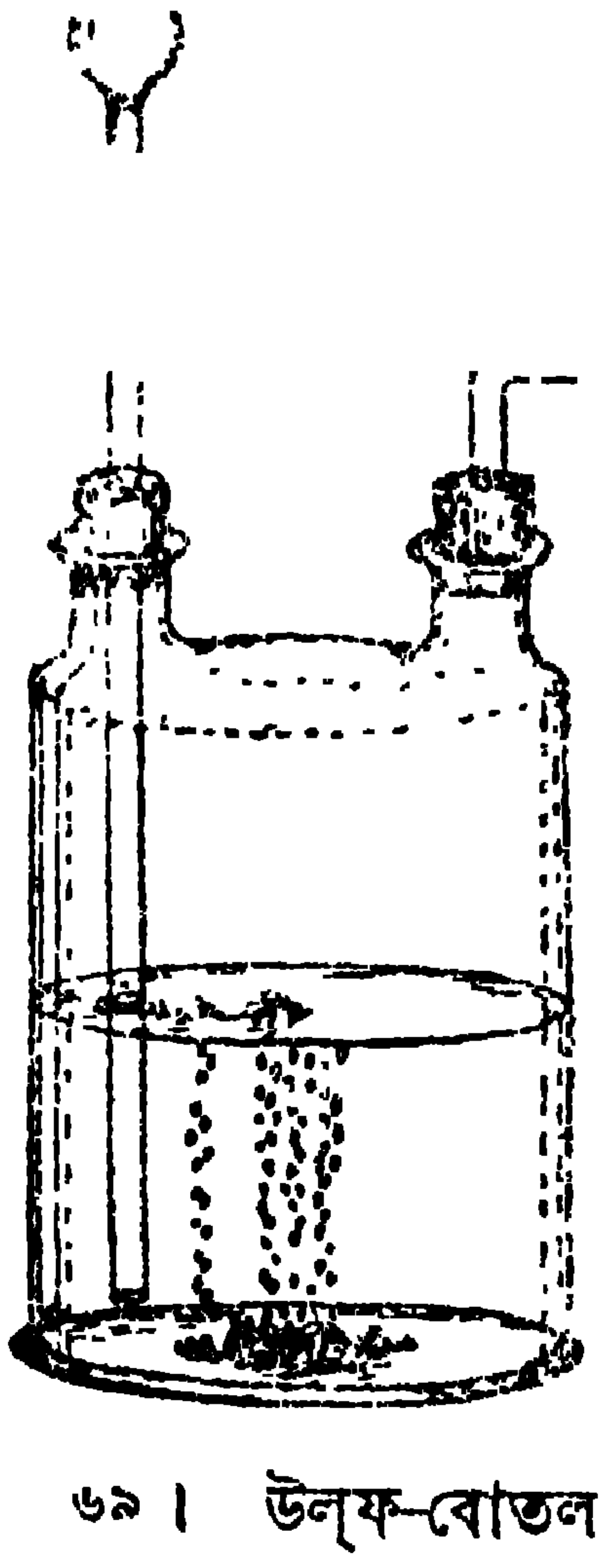

৬৯। উল্‌ফ-বোতল

শিখার একটু উপরে ঠাণ্ডা জল ভরা একটি বাটি ধর, বাটিটির গায়ে জলবিন্দু দেখা দিবে। বুঝিবে হাইড্রোজেন জ্বলিয়া জল উৎপন্ন হইতেছে।

ব্যবসায়ের জন্য হাইড্রোজেন প্রস্তুতকরণ—উত্তপ্ত লোহাচুরের উপর জলীয় বাষ্পের ক্রিয়ার দ্বারা হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা হয়।

হাইড্রোজেনের স্বরূপ—হাইড্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ গ্যাস। জলে ইহা অতি সামান্য দ্রবণীয়। ইহা পৃথিবীর মধ্যে **সর্ব্বাপেক্ষা হালকা পদার্থ।** অক্সিজেনের প্রতি ইহার বিশেষ আসক্তি আছে বলিয়া ইহা যৌগিক পদার্থের মধ্য হইতে অতি সহজে অক্সিজেন টানিয়া লইতে পারে। **ইহা নিজে দাহ্য, কিন্তু দহনে সাহায্য করে না। দহনের ফলে জল উৎপন্ন হয়।**

রবারের বেলুন হাইড্রোজেন পূর্ণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে উর্দ্ধে উঠিবে। কারণ, হাইড্রোজেন বায়ু অপেক্ষা অনেক হাল্কা।

হাইড্রোজেনের পরীক্ষা (Test for Hydrogen)—অক্সিজেন বা বায়ুতে ইহা জলিতে পারে ও সেই শিখা নীলাভ।

হাইড্রোজেনের ব্যবহার (Uses of Hydrogen)—বেলুন, উড়োজাহাজ ও ভেজিটেবল ঘৃতে ব্যবহৃত হয়।

অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড, ও হাইড্রোজেন গ্যাসের তুলনা :

	অক্সিজেন	নাইট্রোজেন	কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড	হাইড্রোজেন
১। স্বাভাবিক উৎপত্তি—	বায়ুতে ১/৫ অংশ।	বায়ুতে ৪/৫ অংশ।	বায়ুতে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।	বায়ুতে নাই।
২। প্রস্তুতকরণ—	পটাসিয়ম ক্লোরেট ও ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড উত্তপ্ত করিলে পাওয়া যায়।	ফস্ফরসের মৃদু-দহনের দ্বারা অক্সিজেন অপসারিত করিয়া বায়ু হইতে পাওয়া যায়।	মার্ব্বেল পাথরের টুকরার উপর হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড ঢালিলে পাওয়া যায়।	দস্তার টুকরায় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিলে পাওয়া যায়।
৩। স্বরূপ—				
(ক) বর্ণ	বর্ণহীন।	বর্ণহীন।	বর্ণহীন।	বর্ণহীন।
(খ) স্বাদ	স্বাদহীন।	স্বাদহীন।	ঈষৎ অম্লস্বাদযুক্ত।	স্বাদহীন।
(গ) গন্ধ-	গন্ধহীন।	গন্ধহীন।	মৃদু গন্ধযুক্ত।	গন্ধহীন।
(ঘ) জলে দ্রবণীয় কিনা	সামান্য দ্রবণীয়।	সামান্য দ্রবণীয়।	দ্রবণীয়।	সামান্য দ্রবণীয়।
(ঙ) বায়ুর তুলনায় ভার	বায়ু হইতে ভারী।	বায়ু হইতে লঘু।	বায়ু হইতে বেশ ভারী।	সর্ব্বপ্রকার গ্যাস অপেক্ষা হাল্কা।
(চ) দহনে	সকল দহনকার্য্যে	দহনকার্য্যের সহায়ক	দহনকার্য্যের সহায়ক	ইহা দাহ্য গ্যাস।

বা নিজে দাহ্য কিনা	নিজে দাহ্য নহে।	পদার্থ নহে।	পদার্থ নহে।	
(ছ) শ্বাসকার্যের সহায়ক কি না	শ্বাসকার্যের সহায়ক।	শ্বাসক র্যের গৌণ সহায়ক।	শ্বাসকার্যের সহায়ক নহে।	শ্বাসকার্যের সহায়ক নহে।
৪। পরীক্ষা				
(ক) জ্বলন্ত কাঠি সংস্পর্শের পরিণতি	দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।	একেবারে নিভিয়া যায়।	একেবারে নিভিয়া যায়।	নিজেই জ্বলিয়া উঠে।
(খ) পরিষ্কার চুণের জলের সংস্পর্শের পরিণতি	কোনও ক্রিয়া নাই।	কোনও ক্রিয়া নাই।	চুনের জল সাদা করে।	কোনও ক্রিয়া নাই।
৫। ব্যবহার	কৃত্রিম শ্বাস পরিচালনার সহায়ক। অক্সি-হাইড্রোজেন অগ্নিশিখায় নানা ধাতু গলান হয়।	ইহার সাহায্যে এমোনিয়া, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়।	সোডাওয়াটারে ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহার হয়। জমিয়া ড্রাই আইস হয়।	বেলুন, এরোপ্লেন, ভেজিটেবল ঘৃত প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

বায়ু ও জলের তুলনা :

বায়ু	জল
১। গ্যাস জাতীয়।	১। তরল।
২। মিশ্র পদার্থ।	২। যৌগিক পদার্থ।
৩। উপাদান (ক) অক্সিজেন। (খ) নাইট্রোজেন। (গ) জলীয় বাষ্প। (ঘ) কার্বন ডাই-অক্সাইড। (ঙ) অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পদার্থ।	৩। উপাদান (ক) অক্সিজেন। (খ) হাইড্রোজেন।
৪। উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়।	৪। উপাদানের পরিমাণ একেবারে নির্দিষ্ট।
৫। উপাদান অনায়াসে পৃথক্ করা যায়।	৫। উপাদানগুলি পৃথক্ করিতে হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক
৬। জীবের অত্যাবশ্যক পদার্থ অক্সিজেন ইহাতে আছে।	৬। জীবের অত্যাবশ্যক পদার্থ।

Questions

1. Compare and contrast rain water and water distilled in the laboratory. (C. U. 1942)
2. What is hard water? How can you make it soft? (C. U. 1944)
3. What is aerated water? Does soda-water contain soda?
4. How can you get Hydrogen from water? What are the important properties of Hydrogen? Which gas does a zeppelin (or airship) use and why? (C. U. 1943)
5. Describe how you could prepare hydrogen from an acid by the action of a metal. How does hydrogen differ from (a) oxygen, (b) nitrogen? (C. U. 1947)
6. There are four jars, without labels, containing hydrogen, oxygen, nitrogen and carbondioxide. How would you proceed to identify each? (C. U. 1946)

জ্যোতির্ব্বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

সূর্য্য

(The Sun)

জ্যোতির্ব্বিদ্যা—যে বিজ্ঞান সাহায্যে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতির আকার, দূরত্ব, গতিবিধির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাকে **জ্যোতির্ব্বিদ্যা** (Astronomy) কহে।

সূর্য্য—পূর্ব্বে সকলের বিশ্বাস ছিল যে, সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। কোপার্নিকস (Copernicus) প্রথম প্রচার করেন যে, পৃথিবী এবং অন্যান্য সকল গ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে। সূর্য্যের আকর্ষণের জন্যই পৃথিবী ঘোরে, সূর্য্যের আলোক পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে, এবং সূর্য্যের যেটুকু উত্তাপ পৃথিবীর উপর পড়ে তাহার তারতম্যে পৃথিবীতে ঋতু-পরিবর্ত্তন হয়।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব—সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি আটাশ লক্ষ মাইল দূরে আছে। দ্রুতগামী এরোপ্লেনের গতি ঘণ্টায় দুই শত মাইল। এরূপ একটি এরোপ্লেনে চড়িয়া সূর্য্যের নিকট যাইতে হইলে প্রায় ষাট বৎসর লাগিবে। এতদূর থাকিয়াও যাহা এরূপ উজ্জ্বল যে তাহার দিকে তাকান যায় না, গ্রীষ্মকালে যাহার উত্তাপ অসহ্য বোধ হয়, এবং এতদূর থাকিয়াও যাহা পৃথিবীকে টানিয়া রাখিয়া নিজের

চারিদিকে ঘুরাইতেছে—তাহা কত বড় এবং তাহার আলোক ও উত্তাপ কত বেশী!

সূর্য্যের আয়তন—সূর্য্যের ব্যাস (diameter) ৮৬৬৫০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১০ গুণ এবং সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ।

সূর্য্যের ওজন ও ঘনত্ব—সূর্য্যের ওজন পৃথিবীর ৩৩৩০০০ গুণ। পৃথিবীর ওজন প্রায় $১\cdot৮ \times ১০^{২৩}$ মণ। তাহা হইলে সূর্য্যের ওজন হইতেছে প্রায় ৬×১০^{২৮} মণ। কিন্তু এত ভারী হইলেও সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত নয় বলিয়া ইহার ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের প্রায় চারি ভাগের এক ভাগ।

সৌরমণ্ডল—সূর্য্যের তিনটি বিভিন্ন মণ্ডল—(১) আলোকমণ্ডল, (২) বর্ণমণ্ডল, ও (৩) ছটামণ্ডল।

(১) **আলোকমণ্ডল** (Photosphere)—সাধারণতঃ সৌর-মণ্ডলের উপরকার আবরণটিই চোখে পড়ে। এই আবরণটির নাম আলোকমণ্ডল। দূরবীনে আলোকমণ্ডলের সকল অংশ সমান উজ্জ্বল দেখা যায় না। মাঝখান অপেক্ষা ধারের দিকের উজ্জ্বলতা অনেক কম।

সূর্য্য এত উজ্জ্বল হইলেও, ভাল করিয়া দেখিলে ইহাতে কতকগুলি কাল বিন্দু দেখা যায়। এই কাল বিন্দুগুলি সকল সময় এক রূপ অবস্থায় থাকে না। ইহাদের আকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের। এ গুলিকে **সৌর কলঙ্ক** (sun spot) বলে। কলঙ্কগুলির মধ্যভাগ ঘোর কাল, কিন্তু চারিধার অপেক্ষাকৃত কম কাল। কোন কোনটির আকার এত বড় যে তাহাদের ভিতর আমাদের পৃথিবী অনায়াসে ঢুকিয়া যাইতে পারে। এগার বৎসর পর পর এগুলির সংখ্যা অত্যন্ত বাড়ে। ১৯০৬, ১৯১৭, ১৯২৮

এবং ১৯৩৯ সালে ইহাদের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। পুনরায় ১৯৫০ সালে বাড়িবার সম্ভাবনা।

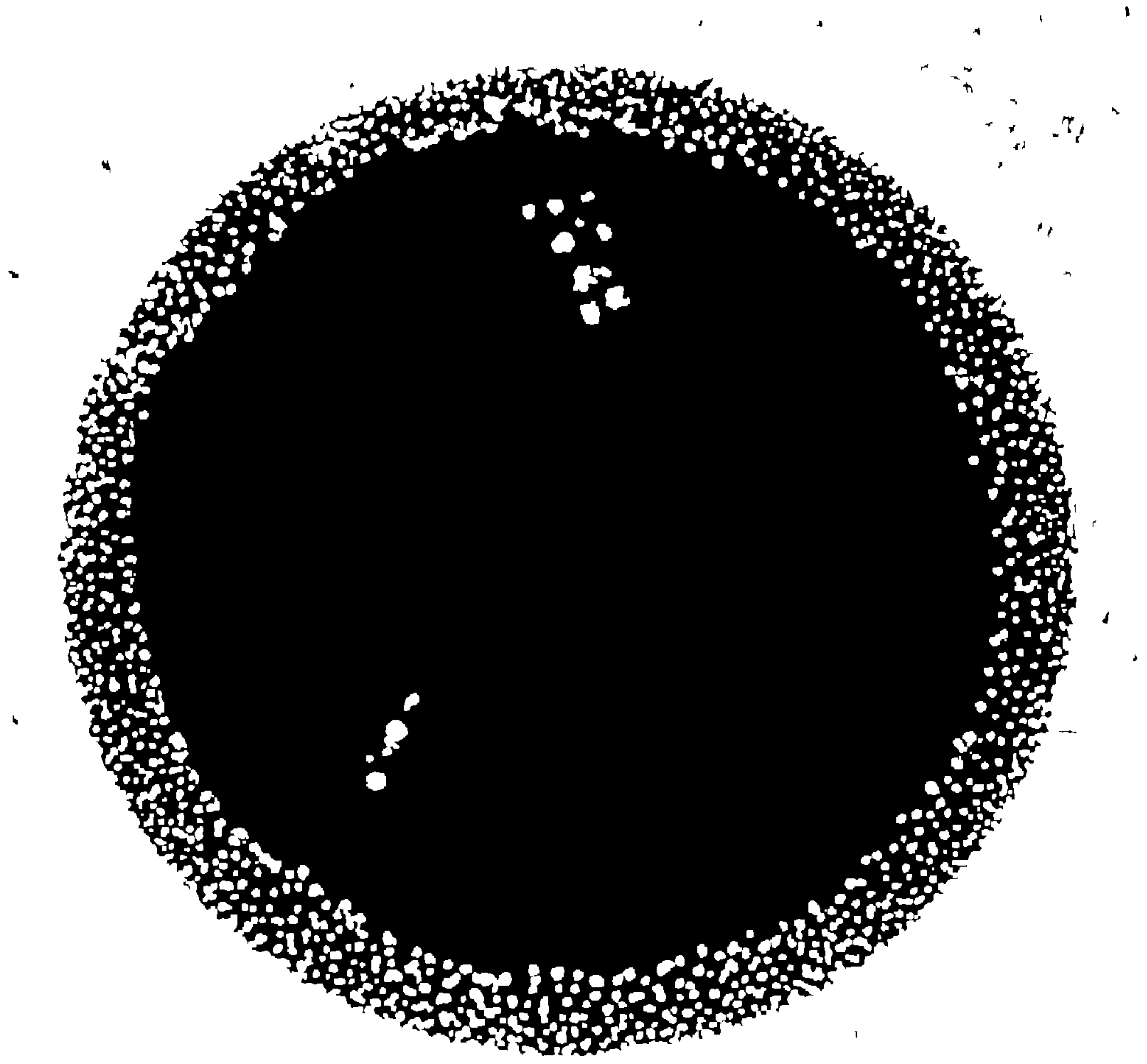

৭০। সৌরকলঙ্ক

দূরবীক্ষণ (telescope) যন্ত্রে কাল কাচ লাগাইয়া এগুলি দেখিতে হয়। বড় বড় কলঙ্কগুলি অনেক সময় কাল কাচের ভিতর দিয়া খালি চোখেও দেখা যায়। এই কলঙ্কগুলি ভাল করিয়া কয়েক দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যও তাহার অক্ষের চারিদিকে ঘোরে। কলঙ্কগুলিকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রায় সাতাশ দিনে একবার ঘুরিয়া আসিতে দেখা যায়। অতএব বলিতে পারা যায় যে, সূর্য্যও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সাতাশ দিনে একবার ঘুরিয়া আসে।

পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে অত্যধিক উত্তাপের জন্য সূর্য্যের

বাহিরের আবরণ ফুটন্ত জলের ন্যায় সর্ব্বদা টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। কলঙ্কগুলি এক একটি গর্ত্ত, উহাদের ভিতর হইতে উত্তপ্ত বাষ্প বেগের সহিত বাহির হইয়া আসিতেছে। ফুটন্ত জলের ভিতর হইতে যেরূপ বুদ্বুদ বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া যায়, সূর্য্যের ভিতর হইতেও ঐরূপ উত্তপ্ত বাষ্পের বুদ্বুদ্ বাহির হয়। বাহিরে আসিলে, ঐরূপ বুদ্বুদ্গুলির উত্তাপ কমিয়া যায়। এই কারণে সূর্য্যের ঐ সকল স্থানের উত্তাপ পার্শ্ববর্ত্তী অংশের চেয়ে কম এবং সেই জন্য ঐস্থানগুলি কাল দেখায়।

যে বাষ্প সূর্য্য হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তাহা আকাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়। পৃথিবীর বৃহৎ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইহার তুলনায় কিছুই নয়। সূর্য্যের অগ্ন্যুৎপাত অনেক সময় সৌরমণ্ডল হইতে লক্ষ লক্ষ মাইল উপরে ছিটকাইয়া পড়ে।

আলোক মণ্ডলের বাহিরে যে আবরণ আছে তাহাকে **বিশোষণ মণ্ডল** (Reversing layer) কহে। সূর্য্যের আলো এই বিশোষণ মণ্ডলের মধ্য দিয়া আসিবার কালে মণ্ডলস্থিত বাষ্পরাশি নিজ নিজ বর্ণালির আলো শোষিত করে, সেজন্য **বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র** (Spectroscope) দ্বারা সূর্য্যালোক পরীক্ষাকালে বর্ণালিতে কাল কাল রেখা দেখা যায়। ইহাদিগকে **ফ্রাউনহোফার** (Fraunhofer) রেখা বলে। ইহাদের সাহায্যে সূর্য্য কি দিয়া তৈয়ারী তাহা জানা যায়।

(২) **বর্ণ-মণ্ডল** (Chromosphere)—পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় চন্দ্র সূর্য্যকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিলে কাল চাঁদটিকে ঘিরিয়া লাল রঙের একটি বৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে বর্ণমণ্ডল বলে। সূর্য্যকে ঘিরিয়া যে বাষ্প অনবরত জ্বলিতেছে, বর্ণমণ্ডল সেই আগুনের শিখা। এক একটি শিখা হাজার হাজার মাইল উচ্চ হয়। কোন কোন সময় দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ মাইল উচ্চ শিখাও দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) **ছটা-মণ্ডল** (Corona)—সূর্য্যগ্রহণের সময় বর্ণমণ্ডলকে ঘিরিয়া তীব্র আলোকের ছটা বাহির হইতে দেখা যায়। ইহাকে ছটা-মণ্ডল বলে। উত্তপ্ত বাষ্প হইতেই এই আলোক বাহির হয়। ছটা-মণ্ডল দেখিলে সূর্য্যের অপরূপ সৌন্দর্য্য বেশ বুঝিতে পারা যায়।

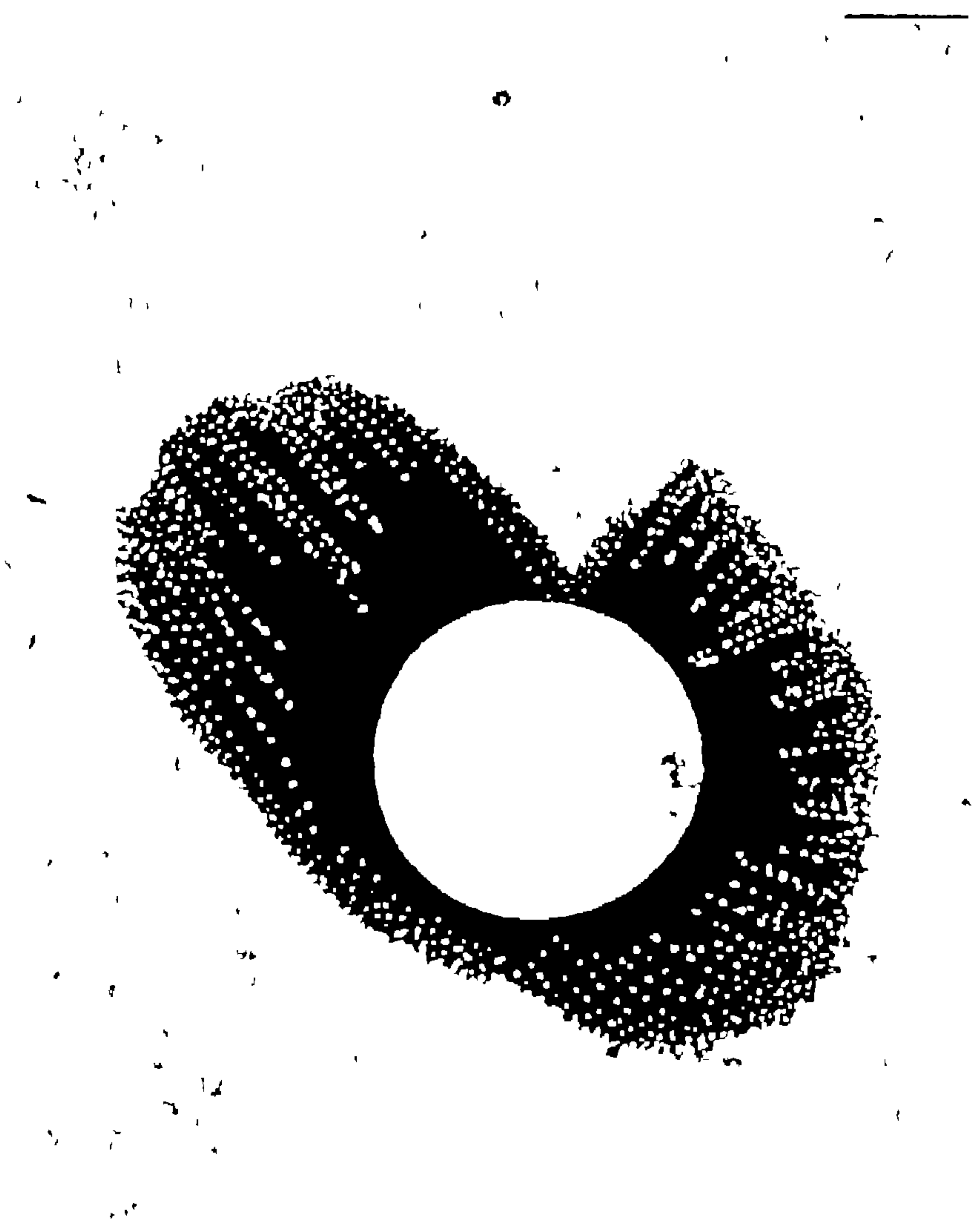

৭১। ছটা-মণ্ডল

পূর্ণ গ্রহণের সময় ছাড়া বর্ণ-মণ্ডল ও ছটা-মণ্ডল দেখা যায় না। এক একটি সূর্য্যগ্রহণের সময় দেশ বিদেশের পণ্ডিতগণ বহুমূল্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে অসংখ্য আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। ঐ সকল আলোকচিত্র হইতে পরে সৌরমণ্ডলের উপাদান, উষ্ণতা প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই অনেক কিছু অবগত হওয়া যায়।

Questions

1. Give a full description of the sun. Would life be possible on earth without the Sun? Give reasons for your answer. (C. U. 1941)
2. Give a brief description of the Sun. Is the Sun useful to us? If so, indicate how. (C. U. 1943)
3. Explain the different ways in which the Sun is useful to us. (C. U. 1945)
4. What do you know about sun-spots? Give a short account of the photosphere, chromosphere and corona of the Sun.

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রহ-উপগ্রহ

(Planets and Satellites)

সূর্য্যকে ঘিরিয়া যে কয়টি বস্তু অনবরত ঘুরিতেছে তাহাদিগকে **গ্রহ** (Planet) বলে। সূর্য্যের আকর্ষণের জন্যই ইহারা ঘোরে। পৃথিবী এইরূপ একটি গ্রহ। কোন কোন গ্রহের চারিদিকে আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্তু ঘোরে। ইহারা উপগ্রহ। চাঁদ আমাদের পৃথিবীর একটি উপগ্রহ।

গ্রহগণের নাম—সর্ব্বসমেত নয়টি গ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে—(১) **বুধ** (Mercury), (২) **শুক্র** (Venus), (৩) **পৃথিবী** (Earth), (৪) **মঙ্গল** (Mars), (৫) **বৃহস্পতি** (Jupiter), (৬) **শনি** (Saturn), (৭) **ইউরেনস্** (Uranus), (৮) **নেপচুন** (Neptune), এবং (৯) **প্লুটো** (Pluto)। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম ছয়টির কথা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল, শেষ তিনটির কথা পরে জানা গিয়াছে। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত পণ্ডিত হার্শেল

ইউরেনস্ আবিষ্কার করেন, এবং তাহার প্রায় ৬০ বৎসর পরে নেপচুনের কথা জানা যায়। গত ১৯৩০ সালে প্লুটো আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গ্রহগণের আয়তন—নীচের চিত্র হইতে গ্রহগণের আয়তনের কিরূপ তারতম্য আছে বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহারা সূর্য্যের অতি নিকটে অথবা বেশী দূরে আছে তাহারা বেশ ছোট, মাঝের কয়েকটি ইহাদের তুলনায় অনেক বড়। বৃহস্পতি সকলের চেয়ে বড়, ইহার

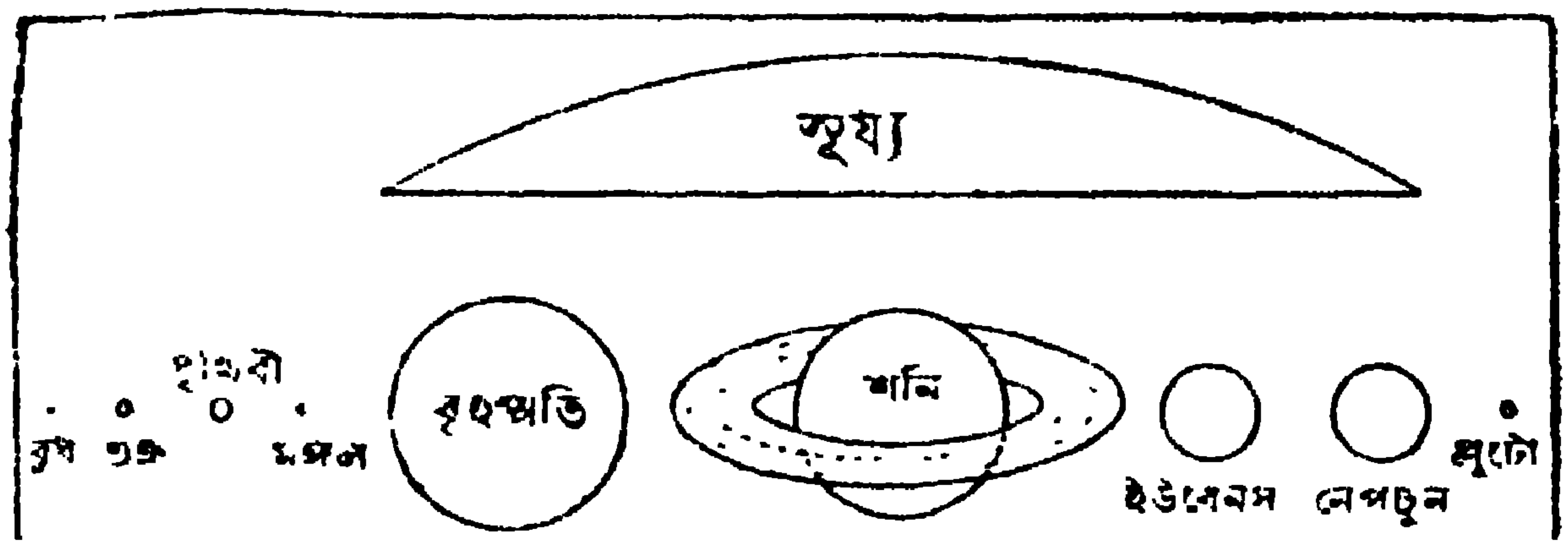

৭২। সূর্য্যের সহিত গ্রহগণের আয়তনের তুলনা

ব্যাস প্রায় ৯০,০০০ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় ১১ গুণ। আয়তনে ইহা পৃথিবীর প্রায় ১৩০০ গুণ এবং ওজনে ৩১৭ গুণ। সকল গ্রহ একত্র করিলেও তাহাদের মোট ওজন বৃহস্পতির ওজনের অর্দ্ধেকও হয় না।

গ্রহগণের আপেক্ষিক দূরত্ব

সূর্য্য হইতে দূরত্ব ও বোডের নিয়ম—নয়টি গ্রহের দূরত্ব মোটামুটি একটি নিয়ম মানিয়া চলে। ০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬ ও ১৯২ এই কয়টি সংখ্যার প্রত্যেকের সহিত ৪ যোগ করিলে ৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২, ১০০ ও ১৯৬ হয়। সূর্য্য হইতে বুধের দূরত্ব প্রায় ৪ কোটি মাইল। শুক্র প্রভৃতি গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্ব যথাক্রমে বুধের দূরত্বের ৭/৪, ১০/৪, ১৬/৪, ২৮/৪, ৫২/৪, ১০০/৪ এবং ১৯৬/৪ গুণ। এই নিয়মটিকে **বোডের নিয়ম** (Bode's law) বলে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল এই চারিটি গ্রহের প্রকৃত দূরত্ব যথাক্রমে ৩৬০ লক্ষ, ৬৭২ লক্ষ,

৯২৮ লক্ষ এবং ১৪২০ লক্ষ মাইল। বৃহস্পতি, শনি এবং ইউরেনসের দূরত্ব যথাক্রমে ৪৮৩০ লক্ষ, ৮৮৬০ লক্ষ এবং ১৭৮২০ লক্ষ মাইল। মঙ্গল

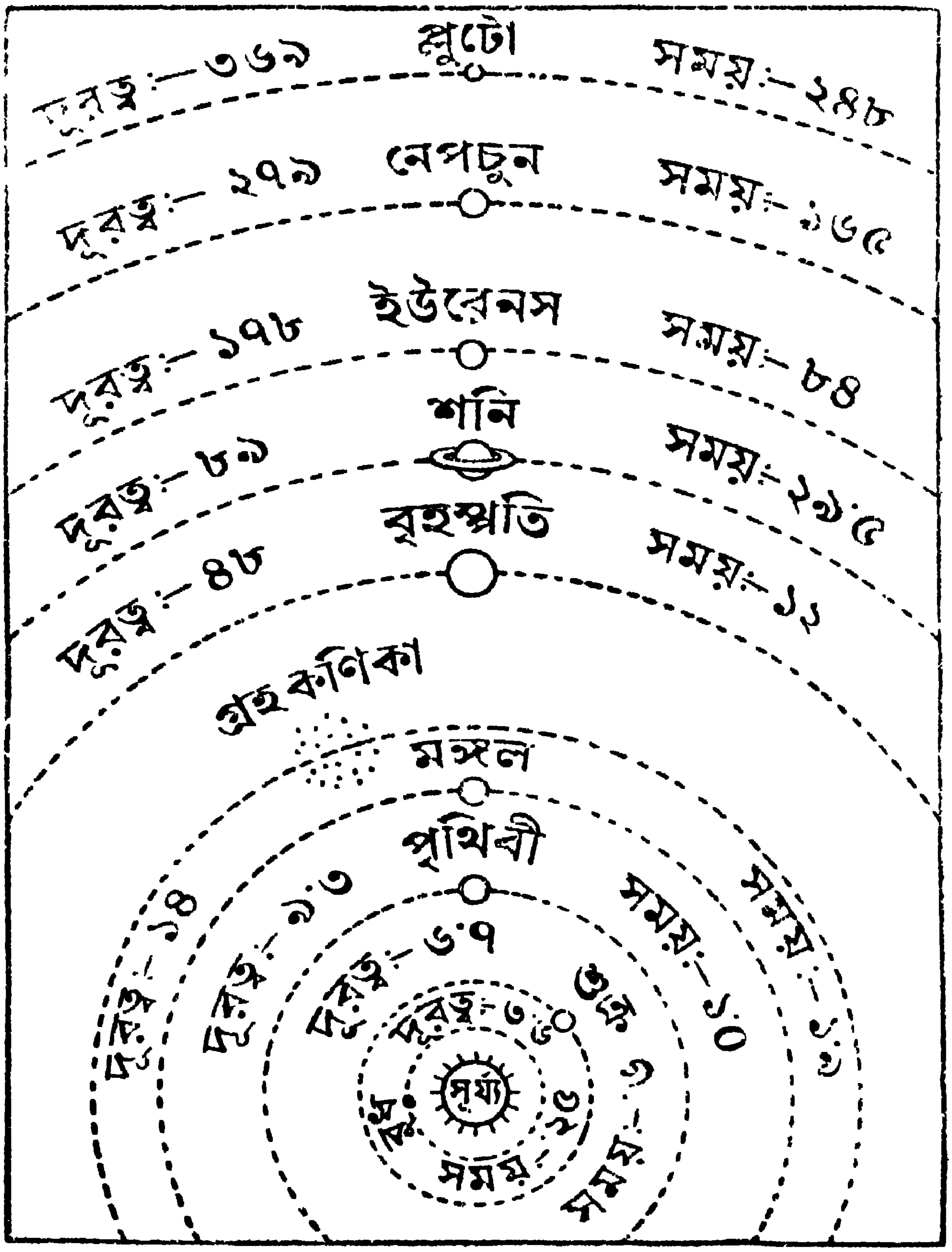

এবং বৃহস্পতির মাঝে প্রায় ১২০০ অতি ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। এইগুলিকে **গ্রহকণিকা** বা **গ্রহাণুপুঞ্জ** (asteroids) বলে। সূর্য্য হইতে ইহাদের গড়পড়তা দূরত্ব প্রায় ২৬ কোটি মাইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে

বুধ হইতে ইউরেনস পর্য্যন্ত সকল গ্রহই মোটামুটি বোডের নিয়ম মানিয়া চলে; কিন্তু সূর্য্য হইতে নেপচুন এবং প্লুটোর দূরত্ব এই নিয়মের ব্যতিক্রম। নেপচুনের দূরত্ব প্রায় ২৮০ কোটি মাইল এবং প্লুটোর দূরত্ব প্রায় ৩৭০ কোটি মাইল।

গ্রহের গতি—প্রত্যেক গ্রহের দুই প্রকার গতি আছে—(১) আবর্ত্তন (rotation), আহ্নিক বা দৈনিক গতি এবং (২) পরিক্রমণ (revolution) বা বার্ষিক গতি। গ্রহের নিজ মেরুদণ্ডের উপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে একবার ঘুরিয়া আসাকে আবর্ত্তন গতি এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসাকে পরিক্রমণ গতি কহে।

বিভিন্ন গ্রহের সূর্য্য পরিক্রমের সময়—নিকটের গ্রহগুলি অল্প সময়ে সূর্য্যের চরিদিকে ঘুরিয়া আসে, দূরের গ্রহগুলির অনেক সময় লাগে। বুধ প্রায় তিন মাসে একবার ঘোরে, শুক্রের সাড়ে সাত মাস লাগে, পৃথিবীর এক বৎসর, মঙ্গলের এক বৎসর দশ মাস, বৃহস্পতির প্রায় বার বৎসর, শনির সাড়ে উনত্রিশ বৎসর, ইউরেনসের চুরাশী বৎসর, নেপচুনের ১৬৫ বৎসর এবং প্লুটোর ২৪৮ বৎসর লাগে। সূর্য্য হইতে প্রত্যেকটি গ্রহের দূরত্বের সহিত তাহার এক বার ঘুরিয়া আসার সময়ের একটি সম্পর্ক আছে। জার্ম্মাণ জ্যোতির্ব্বিদ্ কেপলার (Kepler) এই সম্পর্ক বাহির করেন।

নয়টি গ্রহই একই দিকে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং কয়েকটি ছাড়া উপগ্রহগুলিরও গতি ঐ দিকেই। গ্রহগুলির উত্তাপের তারতম্য অত্যন্ত বেশী হইলেও কোন গ্রহেরই নিজস্ব আলোক নাই। সকলেই সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোক বিকিরণ করে।

বুধ—সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহার উত্তাপ অত্যন্ত বেশী, এবং দেখারও অসুবিধা। বুধের প্রদক্ষিণ পথ পৃথিবীর পথের ভিতরে আছে বলিয়া চন্দ্রের ন্যায় বুধেরও কলার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। দূরবীণে এই হ্রাসবৃদ্ধি

দেখা যায়। বুধের কোন উপগ্রহ নাই। বুধ আয়তনে পৃথিবীর প্রায় ষোল ভাগের এক ভাগ এবং ইহার ভর (mass) মাত্র পৃথিবীর পঁচিশ ভাগের এক ভাগ। বুধের বায়বীয় আবরণ আছে কিনা জানা নাই। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ৮৮ দিন লাগে।

শুক্র—নয়টি গ্রহের মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর নিকটতম। সন্ধ্যাকাশের "শুকতারা" অন্যান্য যে কোনও তারার চেয়ে উজ্জ্বল। বুধের ন্যায় শুক্রের প্রদক্ষিণ পথও পৃথিবীর পথের ভিতরে আছে বলিয়া কলার হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। শুক্রের উত্তাপ বুধ অপেক্ষা অনেক কম, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী। শুক্রের পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল আছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণাযুক্ত টুক্‌রা টুক্‌রা মেঘ উড়িয়া বেড়ায় শুক্রের বায়ুমণ্ডলেও সেইরূপ মেঘ ভাসিয়া বেড়ায়। মেঘের জলকণাগুলি সূর্য্যের আলোক অধিক পরিমাণে বিচ্ছুরিত করে বলিয়া শুক্র এত উজ্জ্বল দেখায়। শুক্রের কোন উপগ্রহ নাই। পৃথিবী হইতে শুক্রের দূরত্বের তারতম্য হয়, এবং সেই জন্য আয়তনের তারতম্য দেখা যায়। শুক্র ওজনে পৃথিবী অপেক্ষা কম হইলেও, আয়তনে প্রায় পৃথিবীর সমান।

পৃথিবী—শুক্রের পরবর্ত্তী গ্রহ আমাদের পৃথিবী। ইহার ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল, এবং ওজন প্রায় ১৮×১০^{২৩} মণ। পৃথিবীর আহ্নিক গতি থাকায় দিনরাত হয়; বার্ষিক গতির জন্য ঋতুভেদ হয়। অন্য গ্রহ যেমন সূর্য্যের আলোকে আলোকিত বলিয়া পৃথিবী হইতে তারার মত উজ্জ্বল দেখায়, পৃথিবীকেও অন্য গ্রহ হইতে দেখিলে তারার মত উজ্জ্বল দেখা যাইবে। পৃথিবী নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া জীবজন্তু, গাছপালার উদ্ভব এখানে সম্ভব হইয়াছে। চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ।

মঙ্গল—মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর অপর দিকে আছে। ইহা পৃথিবীর মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ, এবং ওজনে নয় ভাগের এক ভাগ। ইহার দুইটি

উপগ্রহ—(১) **ফোবস্** (Phobes), (২) **ডামস্** (Deimes)। মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রথমটির লাগে ৭½ ঘণ্টা ও দ্বিতীয়টির লাগে ৩০½ ঘণ্টা। মনে হয় মঙ্গলের রাত্রি কখনও একেবারে অন্ধকার থাকে না, কখনও একটা কখনও দুইটা চাঁদ একত্রে আকাশে থাকিয়া জ্যোৎস্না দ্বারা আলোকিত করে। মঙ্গল গ্রহের উত্তাপ পৃথিবী অপেক্ষা কম, সেখানে জীবজন্তু বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব নয়। দূরবীনে মঙ্গল গ্রহ দেখিলে, উহার উপর কতকগুলি কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়; কেহ কেহ ওগুলিকে মঙ্গল গ্রহের খাল বলেন। তাহারা বলেন ঐ গ্রহে মানুষের ন্যায় এক প্রকারের জীব বাস করে, তাহারাই ঐ খালগুলি কাটিয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় নাই।

বৃহস্পতি—ইহা নয়টি গ্রহের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। পৃথিবীর প্রায় ১৩০০ গুণ ও ওজনে ৩১৭ গুণ। অতএব ইহা খুব হাল্কা জিনিস দ্বারা তৈয়ারী। বৃহস্পতি মঙ্গলের তুলনায় অনেক বেশী ঠাণ্ডা। ঐরূপ ঠাণ্ডায় কোনরূপ জীবজন্তু বাস করিতে পারে না। শুক্রের ন্যায় বৃহস্পতির চারি দিক ঘিরিয়া বায়ুমণ্ডলের আবরণ দেখা যায়। আমাদের একটিমাত্র চাঁদ, কিন্তু বৃহস্পতির নয়টি চাঁদ আছে।

শনি—ইহা আয়তনে এবং ওজনে বৃহস্পতি অপেক্ষা ছোট, কিন্তু পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক বড়। শনি আয়তনে পৃথিবীর ৭০০ গুণ এবং ওজনে প্রায় ১০০ গুণ। শনি বৃহস্পতি অপেক্ষাও ঠাণ্ডা। সেই জন্য সেখানে কোন জীবজন্তু থাকিতে পারে না। শনিরও নয়টি চাঁদ আছে। চাকার মত আকারে একটি উজ্জ্বল আবরণ শনির চারি দিকে ঘিরিয়া আছে। এই চাকার তিনটি ভাগ এবং চাকা ও গ্রহের মধ্যে বেশ একটু ফাঁক আছে। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন চাকা মাটি বা পাথর দিয়া তৈয়ারী।

ইউরেনস ও নেপচুন—ইহারা বৃহস্পতি অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহাদের আয়তন প্রায় সমান। ইউরেনস পৃথিবীর ৬৪ গুণ বড় এবং ওজনে প্রায় ১৫ গুণ। নেপচুন আয়তনে পৃথিবীর ৬০ গুণ এবং ওজনে প্রায় ১৭ গুণ। ইউরেনসের চারিটি চাঁদ এবং নেপচুনের একটি চাঁদ আছে। আমাদের ৮৪ বৎসরে ইউরেনসের এক বৎসর হয়, এবং ১৬৫ বৎসরে নেপচুনের একটি বৎসর।

প্লুটো—সংপ্রতি এই ছোট গ্রহটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব ইউরেনসের দূরত্বের প্রায় দুই গুণ। ইহার আয়তন ও ওজন সঠিক জানা যায় নাই। তবে ইহা একটি ছোট গ্রহ।

গ্রহগণ ও তাহাদের তুলনা

গ্রহের নাম	ব্যাসের গড় মাপ (মাইলে)	সূর্য্য হইতে গড় দূরত্ব (লক্ষ মাইলে)	পরিভ্রমণ সময় (দিনে)	আবর্তন কাল (ঘণ্টা)	উপগ্রহের সংখ্যা
১। বুধ	২৯৯২	৩৯	প্রায় ৮৮	৮৮	×
২। শুক্র	৭৬৬০	৬৭০	২২৪০	×	×
৩। পৃথিবী	৭৯১৪	৯৭	৩৬৫ ৩	২৩ঘঃ ৫৬মিঃ	১
৪। মঙ্গল	৪২০০	১৪১০	৬৮৭	২৪ঘঃ ৩৭মিঃ	২
৫। বৃহস্পতি	৮৫০০০	৪৮০০	৪৩৩২	৯ঘঃ ৫৫মিঃ	৯
৬। শনি	৭১০০০	৮৮৪০	১০৭৫৯	১০ঘঃ ১০মিঃ	১০
৭। ইউরেনস	৩১৭০০	১৭০০০	৩০৬৮৭	×	৪
৮। নেপচুন	৩৪৫০০	২৭০০০	৬০১২৭	×	১
৯। প্লুটো	৪০০০	৪১৮০০	৯০০০০	×	×

চন্দ্র
(The Moon)

চন্দ্র পৃথিবীর **উপগ্রহ** (satellite)। চন্দ্র সূর্য্যের মত জ্বলন্ত নহে; ইহা গোলাকার, কঠিন ও ঠাণ্ডা। সূর্য্য হইতে ইহা খুব ছোট।

চন্দ্রের দূরত্ব—আকাশের সমস্ত বস্তুর মধ্যে চাঁদই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। পৃথিবী হইতে চাঁদের দূরত্ব প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল, অর্থাৎ দ্রুতগামী এরোপ্লেনে চড়িয়া চাঁদে পৌছিতে প্রায় দুই মাস সময় লাগিবে।

চন্দ্রের পরিক্রমকাল—চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় সওয়া সাতাইশ দিনে একবার ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু পৃথিবীর বার্ষিক গতি হেতু, পৃথিবী ও সূর্য্যের সমসূত্রে আসিতে, চন্দ্রের আরও প্রায় সওয়া দুই দিন অর্থাৎ মোটে সাড়ে উনত্রিশ দিন লাগে।

চন্দ্রের কলা ও তাহার হ্রাসবৃদ্ধি (Phases of the moon)—চাঁদের নিজস্ব আলোক নাই। সূর্য্যের আলোক চাঁদের

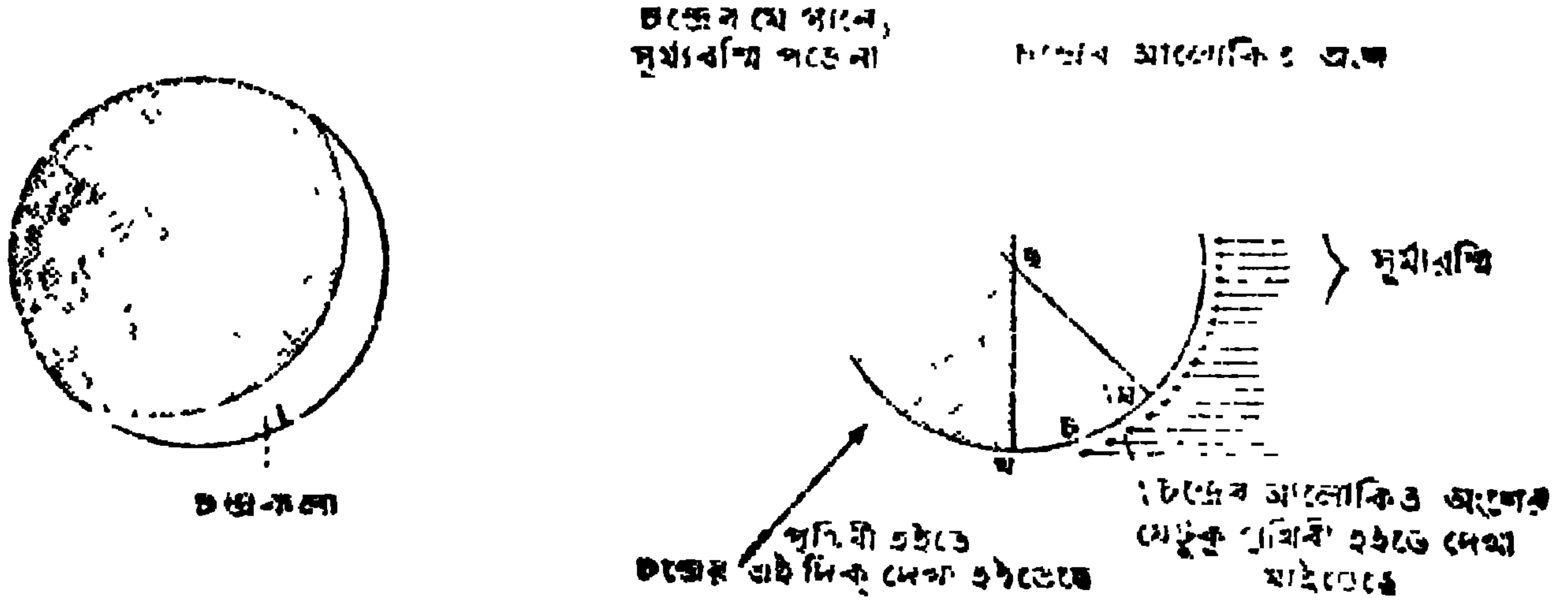

৭৪। চাঁদের কলা

উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হয় বলিয়া চাঁদকে আলোকিত দেখায়। চাঁদের যে অর্দ্ধেক অংশ সূর্য্যের সম্মুখে থাকে, তাহার উপরই সূর্য্যের আলোক

পড়ে, অপর অর্দ্ধ অন্ধকারে আবৃত থাকে। কিন্তু ঐ আলোকিত অংশটুকু সম্পূর্ণভাবে পৃথিবী হইতে সকল সময় দেখা যায় না। চাঁদের যে অর্দ্ধেক অংশ পৃথিবীর সম্মুখস্থ, তাহাই মাত্র পৃথিবী হইতে দেখা যাইতে পারে, আবার এই শেষোক্ত অর্দ্ধেক অংশের যতটুকু মাত্র সূর্য্যালোকে আলোকিত

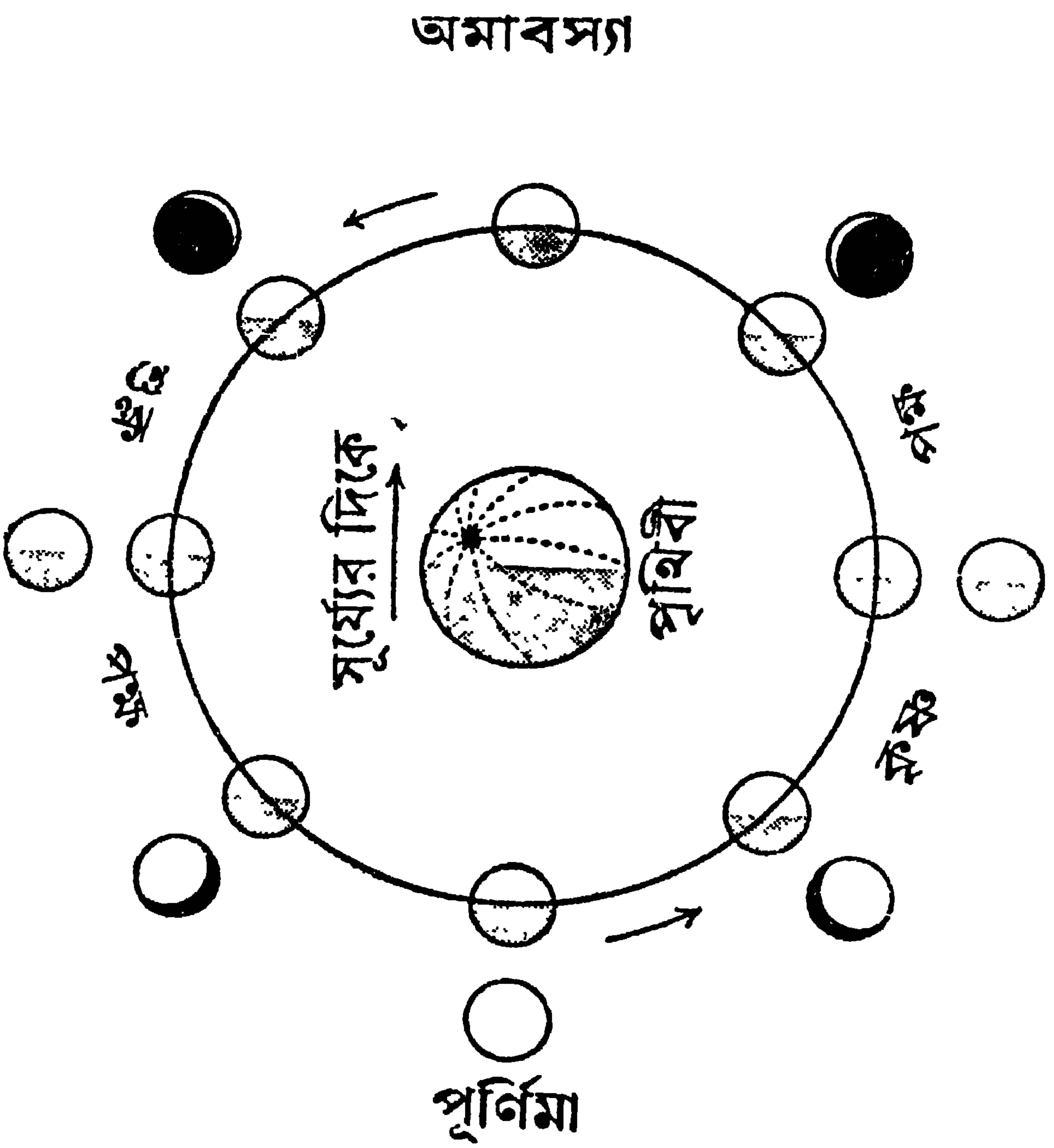

৭৫। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি

হয়, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। উপরের চিত্র হইতে ইহা বুঝা যাইবে। চন্দ্রের ক খ ঘ অংশ সূর্য্যের সম্মুখে আছে, তাহাই আলোকিত হইবে। কিন্তু পৃথিবীর সম্মুখে গ খ ঘ অর্দ্ধেক অংশ আছে। সুতরাং পৃথিবী হইতে

খ চ ঘ অংশ আলোকিত দেখা যাইবে। চন্দ্র বলের মত গোল; সেই জন্য ক খ এবং গ ঘ সরলরেখা না হইয়া দুইটি গুরুবৃত্ত (great circle)। এই দুই গুরুবৃত্তের মধ্যবর্ত্তী ছোট অংশটি একটি কমলালেবুর কোষের মত হইবে, এবং তাহার উপরিভাগকেই দূর হইতে চিত্রের কলার ন্যায় দেখাইবে। এই ক্ষেত্রে খ ছ ঘ কোন সূক্ষ্ম। এই কোণটি স্থুল হইলে চন্দ্রকলা ১ম চিত্রের অপর (বৃহত্তর) অংশের ন্যায় দেখাইবে।

৭৬। কৃষ্ণা সপ্তমীতে চন্দ্র

পূর্ণিমার সময় পৃথিবী সূর্য্য ও চন্দ্রের মাঝখানে থাকে, তখন আলোকিত অর্দ্ধেক অংশ সম্পূর্ণভাবে দেখা যায়। তাহার পর চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে স্থান পরিবর্ত্তন কালে তাহার আলোকিত অর্দ্ধেকের ক্রমশঃই কম অংশ পৃথিবী হইতে দেখা যাইবে

অমাবস্যার সময় চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে থাকে বলিয়া পৃথিবী হইতে চন্দ্রের আলোকিত অংশ কিছুমাত্র দেখা যায় না। অমাবস্যার পর হইতে আবার আলোকিত অংশ ক্রমেই বেশী দেখা যাইবে। ইহাকেই চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি (Phases of the moon) বলা হয়। অমাবস্যার পর হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত, ক্রমশঃ চাঁদের কলা বাড়িতে থাকে, সেই পনের দিন শুক্ল পক্ষ এবং পূর্ণিমার পর হইতে পরবর্ত্তী অমাবস্যা পর্য্যন্ত চাঁদের কলা কমিতে থাকে বলিয়া ঐ পনের দিন কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য্য এক সমতলক্ষেত্রে (plane) নাই, সেই জন্যই পূর্ণিমার সময় চাঁদ সূর্য্যের উল্টাদিকে থাকিলেও পৃথিবী হইতে দেখা যায়।

চন্দ্রের আয়তন ও ওজন—চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় চারিভাগের একভাগ এবং ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। চাঁদের ওজন পৃথিবীর ওজনের প্রায় আশী ভাগের এক ভাগ।

সূর্য্য পৃথিবীকে টানিয়া রাখিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরায়। পৃথিবীও সেইরূপ চাঁদকে ছোট পাইয়া নিজের চারিদিকে ঘুরাইতেছে। জড় পদার্থের একের অন্যের উপর এইরূপ টানকেই মহাকর্ষ বলে।

পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রও তাহার অক্ষের (axis) চারিদিকে ঘোরে। এক বার ঘুরিতে প্রায় সওয়া সাতাইশ দিন লাগে। এই সময়ে চন্দ্র পৃথিবীর চারিপাশেও একবার ঘুরিয়া আসে।

চাঁদের কলঙ্ক—খালি চোখে চাঁদের উপর ছায়ার মত অস্পষ্ট কাল দাগ দেখা যায়। এগুলিকে চাঁদের কলঙ্ক বলে। দূরবীনে এই কলঙ্কগুলি কি তাহা বেশ বুঝা যায়। পৃথিবীর উপরিভাগ অপেক্ষা চাঁদের উপরিভাগ অনেক বেশী অসমান। কলঙ্কগুলিকে পণ্ডিতেরা শুষ্ক সমুদ্রগর্ভ বলিয়া মনে করেন।

চাঁদে বড় বড় গর্ত্ত (crater) দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে কোন গহ্বর অপেক্ষা এগুলি অনেক বড়। চাঁদের পাহাড়গুলিও বেশ উঁচু। সকলের চেয়ে উঁচু পাহাড় প্রায় ২৬০০০ ফুট। পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে উঁচু পাহাড় মাউণ্ট এভারেষ্টের উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। চাঁদ পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। অতএব তুলনা করিলে চাঁদের পাহাড়গুলি অনেক উঁচু।

চাঁদের আবহাওয়া—যেদিকে সূর্য্যের আলো পড়ে সেদিকে অত্যন্ত গরম, এত বেশী গরম যে সেখানে জল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিবে। আবার যেদিকে সূর্য্যের আলোক পড়ে না সেদিক্ অত্যন্ত ঠাণ্ডা, এত বেশী ঠাণ্ডা যে পৃথিবীর যে কোন পদার্থ সেখানে জমিয়া কঠিন হইয়া যাইবে। পণ্ডিতেরা চাঁদকে ভাল করিয়া দেখিয়া অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে চাঁদের উপর অনেকগুলি বড় বড় **আগ্নেয়গিরি** (volcano) ছিল। সেই আগ্নেয়গিরিগুলি হইতে ভস্ম, গলিত লাভা বাহির হইয়া চাঁদকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কবি কল্পনাচোখে চাঁদের যে মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হন, বৈজ্ঞানিকদের নিকট তাহা ভস্মস্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

সূর্য্য ও চন্দ্রের তুলনা :

সূর্য্য	চন্দ্র
১। গ্রহগণ সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে।	১। সওয়া সাতাইশ দিনে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে।
২। সূর্য্যের আলোক পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে।	২। নিজের আলোক নাই। সূর্য্যের আলো চাঁদে পড়িয়া প্রতিফলিত হয়।
৩। সূর্য্যের উত্তাপের তারতম্যে পৃথিবীর ঋতুপরিবর্ত্তন হয়।	৩। ঋতুপরিবর্ত্তনের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই।

সূর্য্য	চন্দ্র
৪। পৃথিবী হইতে সূর্য্য নয় কোটি আটাশ লক্ষ মাইল দূরে আছে।	৪। পৃথিবী হইতে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরে আছে।
৫। সূর্য্যের ব্যাস ৮৬৬৫০০ মাইল।	৫। চন্দ্রের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় $\frac{১}{৪}$ ভাগ।
৬। আয়তন পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ।	৬। পৃথিবীর আয়তনের $\frac{১}{৫০}$ ভাগ।
৭। ওজন পৃথিবীর ৩৩৩০০০ গুণ।	৭। পৃথিবীর ওজনের $\frac{১}{৮০}$ ভাগ।
৮। ঘনত্ব পৃথিবীর $\frac{১}{৪}$ ভাগ।	৮। ×
৯। বিভিন্ন মণ্ডল : (ক) আলোকমণ্ডল (খ) বর্ণমণ্ডল (গ) ছটামণ্ডল	৯। ×
১০। ×	১০। পৃথিবীর উপরিভাগ অপেক্ষা চাঁদের উপরিভাগ অনেক বেশী অসমান—গর্ত্তগুলি চাঁদের কলঙ্ক।

Questions

1. State briefly what you know of the comparative sizes and distances from the Sun of Mars, Mercury and Jupiter. (C. U. 1946)
2. State the distances of the planets from the Sun and their periods of revolution round the Sun.
3. What is a satellite? Which of the planets have got satellites and how many?
4. Which is the biggest planet? What is its size as compared to that of the Earth?
5. Write what you know about the planets Mars and Saturn.
6. Give a description of the moon. Is the moon useful to us? Give reasons for your answer. (C. U. 1944)
7. How do you explain the phenomena of the full moon and the new moon? Give sketch. (C. U. 1942)

তৃতীয় অধ্যায়

সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ

(Eclpises of the Sun and the Moon)

চন্দ্র যেমন আপন পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সেইরূপ পৃথিবীও নিজের পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। মনে কর একটি বড় বৃত্তের মাঝখানে একটি আলোক রহিয়াছে। একটি বালক সূতায় একটি ঢিল বাঁধিয়া তাহার মাথার উপর ঘুরাইতেছে, এবং ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঐ বৃত্তের উপর দিয়া আলোকটিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এখানে আলোকটির সহিত সূর্য্যের, বালকটির সহিত পৃথিবীর এবং ঢিলটির সহিত চন্দ্রের তুলনা করা যাইতে পারে।

আলোকরশ্মি সব সময়ে সোজা পথে চলে বলিয়া যখন চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে আসিয়া পড়ে, তখন আমরা চাঁদের আলোক দেখিতে পাই না, কারণ তাহার অন্ধকার অংশটি আমাদের দিকে থাকে। এই চাঁদকে **অমাবস্যার চাঁদ** বলে। চাঁদ যখন সূর্য্যের ঠিক উল্টা দিকে থাকে, তখন চাঁদের আলোকিত অংশটি সম্পূর্ণ দেখা যায়। উহাই **পূর্ণিমার চাঁদ**।

চন্দ্রগ্রহণ (Lunar eclipse)—অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য একটি সরলরেখার উপর অবস্থান করে। পূর্ণিমার সময়ে চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়িলেই **চন্দ্রগ্রহণ** হয়। আমরা চাঁদকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই না। মনে হয়, তাহার উপর কে যেন একটি কাল পর্দ্দা টানিয়া দিয়াছে।

প্রত্যেক পূর্ণিমাতেই চন্দ্রগ্রহণ দেখি না কেন? যদি চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য একই সমতল ক্ষেত্রে অবস্থান করিত, তাহা হইলে প্রত্যেক পূর্ণিমাতেই পৃথিবী চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিত এবং চন্দ্রগ্রহণ হইত। কিন্তু চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য একই সমতল ক্ষেত্রে অবস্থান করে না। চাঁদের প্রদক্ষিণ ক্ষেত্র পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-ক্ষেত্রের সহিত প্রায় ৫ ডিগ্রী কোণ (angle) করিয়াছে। কাজেই পূর্ণিমার সময় যদি চন্দ্র পৃথিবীর কক্ষতলের উপর আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেই চন্দ্রগ্রহণ হইবে।

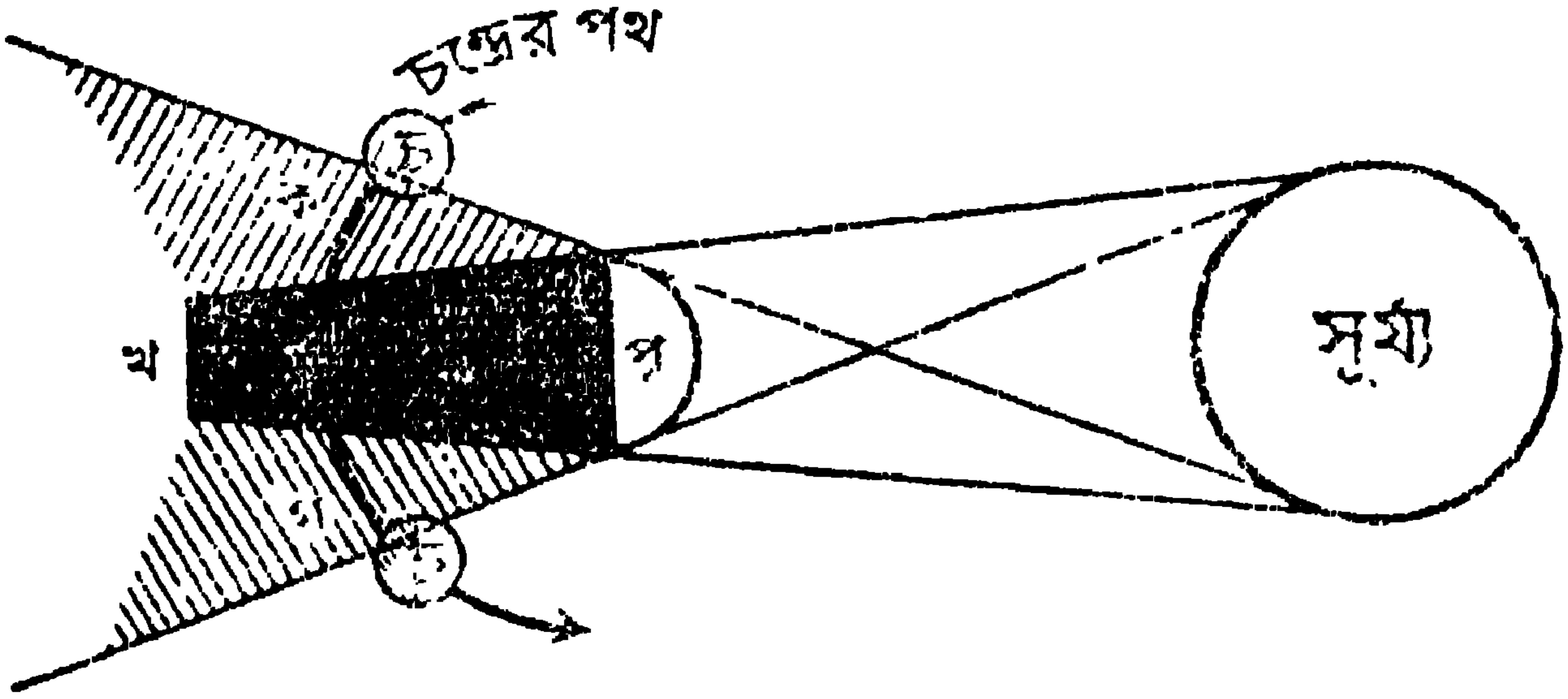

৭৭। চন্দ্রগ্রহণ

চন্দ্রগ্রহণ দুই প্রকার—**পূর্ণ গ্রহণ** এবং **আংশিক গ্রহণ**। পূর্ণ গ্রহণের সময় চন্দ্র খ চিহ্নিত প্রচ্ছায়ায় সম্পূর্ণ প্রবেশ করিলেও চন্দ্রের থালাটি দেখা যায়, এবং তাহা পিঙ্গলবর্ণ দেখায়। কিন্তু আংশিক গ্রহণ হইলে, যে অংশ প্রচ্ছায়ায় প্রবেশ করে তাহা সম্পূর্ণ কাল দেখায়।

চিত্রের যে অংশটি অপেক্ষাকৃত কাল সেই অংশে চাঁদ প্রবেশ করিলে, তাহা পৃথিবীর ছায়া দ্বারা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িবে। তখন পূর্ণগ্রহণ দেখা যাইবে। ক ও গ অংশে চন্দ্র থাকিলে উহা আংশিক ভাবে পৃথিবীর ছায়ায় পড়িবে এবং তাহাতে চন্দ্র অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল দেখাইবে, কিন্তু গ্রহণ হইবে না। যদি চন্দ্রের এক অংশ খ চিহ্নিত কাল প্রচ্ছায়ার

মধ্যে পড়ে কিন্তু বাকী অংশ তাহার বাহিরে ক বা গ চিহ্নিত উপচ্ছায়ায় থাকে, তবে আংশিক গ্রহণ হইবে।

সূর্য্যগ্রহণ (Solar eclipse)—যখন চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন সূর্য্যের আলোক পৃথিবীতে আসিবার পথে চন্দ্রের দ্বারা বাধা পায়। তখনই **সূর্য্যগ্রহণ** হয়। কাজেই সূর্য্যগ্রহণ অমাবস্যা ছাড়া হইতে পারে না। যে কারণে প্রত্যেক পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারে না, ঠিক সেই কারণেই প্রত্যেক অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ হয় না।

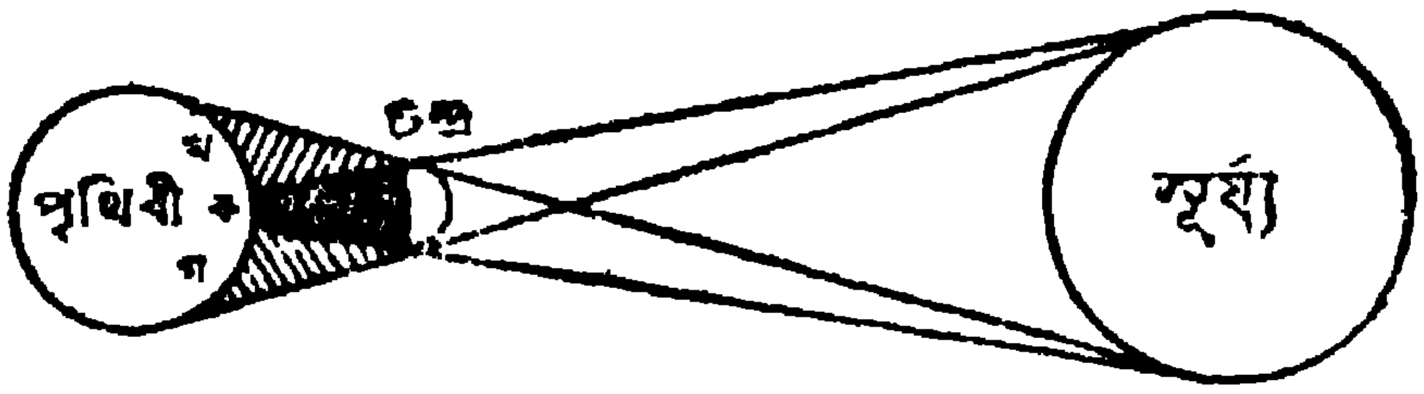

৭৮। সূর্য্যগ্রহণ (পূর্ণ ও আংশিক)

সূর্য্যগ্রহণ তিন প্রকারের—**(১) পূর্ণ গ্রহণ, (২) আংশিক গ্রহণ,** এবং **(৩) বলয় গ্রহণ।**

পৃথিবীর ক অংশে পূর্ণ গ্রহণ দেখা যাইবে এবং খ ও গ অংশ হইতে আংশিক গ্রহণ দেখা যাইবে (৭৮নং চিত্র)। বলয় গ্রহণের কারণ পরের চিত্রটির সাহায্যে বুঝা যাইবে।

একটি পয়সা চোখের খুব নিকটে ধরিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিলে সূর্য্যকে দেখা যাইবে না। ক্রমশঃ পয়সাটি দূরে লইয়া যাইলে এক সময় সূর্য্যের চারি দিক্ দেখা যাইবে। কিন্তু মাঝখান মোটেই দেখা যাইবে না। চন্দ্র যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে আসিয়া এই অবস্থার সৃষ্টি করে, তখনই সূর্য্যের বলয় গ্রহণ হয়।

চন্দ্রের ছায়ার শঙ্কুটি (cone) গ বিন্দুতে শেষ হইয়াছে। যদি উল্টাদিকে ইহাকে বাড়াইয়া দেওয়া যায় তবে আর একটি শঙ্কু গঠিত

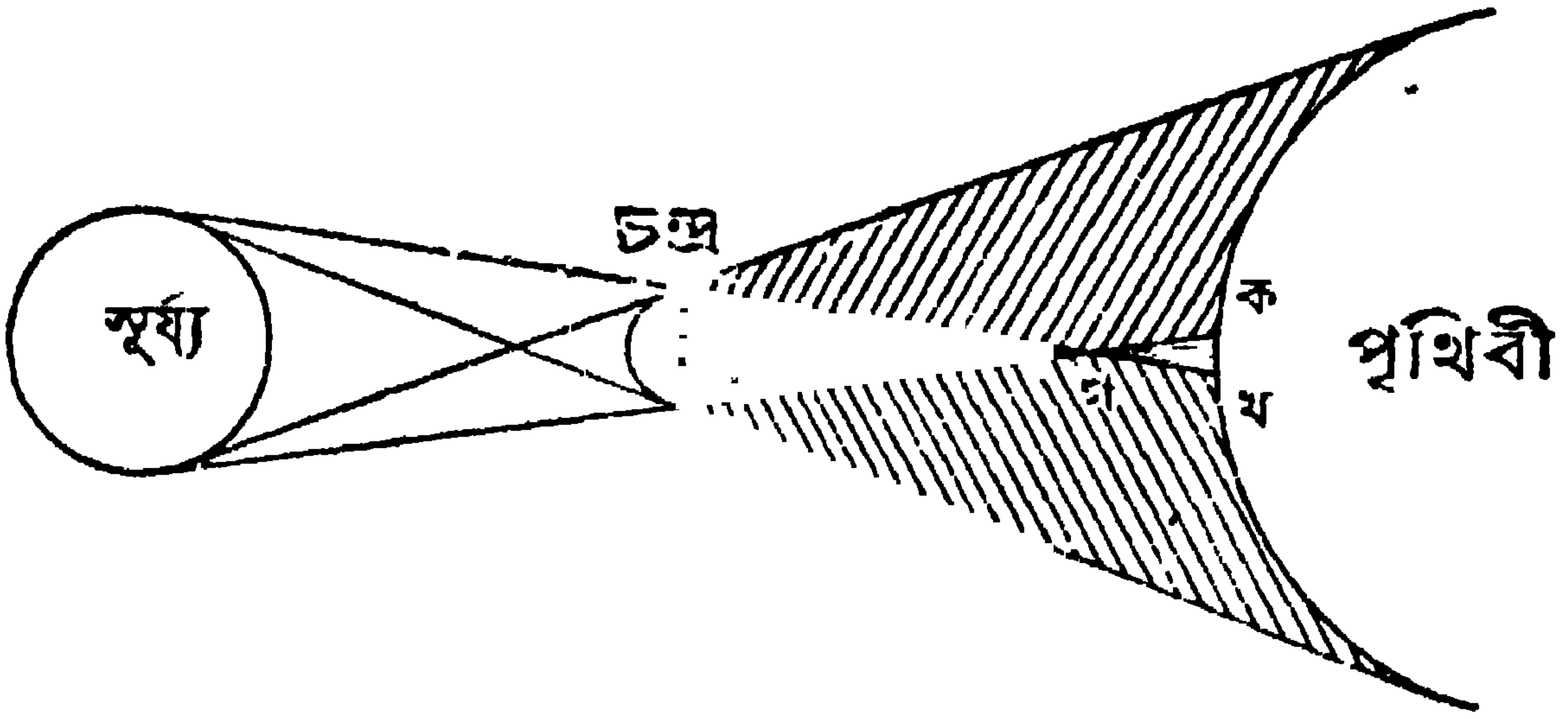

৭৯। বলয় গ্রহণ

হইবে। পৃথিবীর যে অংশ ক ও খ এর মধ্যে পড়িবে ঐ অংশ হইতে সূর্য্যের বলয় গ্রাস দেখা যাইবে। তিন প্রকার সূর্য্যগ্রহণের তিনটি ছবি দেওয়া হইল।

৮০। সূর্য্যগ্রহণের প্রকারভেদ

গ্রহণের সময়, কোন্ প্রকারের গ্রহণ হইবে, এবং পৃথিবীর কোন্ স্থান হইতে দেখা যাইবে, প্রভৃতি হিসাব করিয়া পূর্ব্বেই বলা যায়। এক বৎসরে কতকগুলি গ্রহণ দেখা যাইবে তাহাও বলা যায়। তবে কোন এক বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ও পাঁচটি সূর্য্যগ্রহণের বেশী দেখা যাইবে না। এক বৎসরে অন্ততঃ দুইটি সূর্য্যগ্রহণ হইবে ; চন্দ্রগ্রহণ কোন কোন বৎসরে একেবারে নাও হইতে পারে।

রাহু নামে একটি দৈত্য চন্দ্র-সূর্য্যকে গিলিয়া ফেলে বলিয়াই গ্রহণ হয়, ইহা উপকথা। গ্রহণ প্রাকৃতিক নিয়মেই হইয়া থাকে।

Questions

1. Show with a sketch how a lunar eclipse occurs. (C. U. 1940, 1945)
2. What are the different types of solar eclipse? Explain each case with the help of a diagram.
3. Explain fully the phenomenon of solar and lunar eclipses. Why do we not get an eclipse at every full and new moon? (T. T. 1938)
4. Explain with diagrams the different types of solar eclipses. What simple arrangement can you make to observe a solar eclipse. (C. U. 1944)

চতুর্থ অধ্যায়

সৌর বৎসর ও ঋতুসমূহ

(Solar year and the seasons)

সূর্য্যের আপাত গতি ঃ সৌর দিবস ও সৌর বৎসর—পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসে। মানব এই গতি বুঝিতে পারে না। মনে হয় যেন সূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে এবং বৎসরের পর পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য সূর্য্য সকালে পূর্ব্ব দিকে উঠিয়া ঠিক দুপুরে মাথার উপরে আসে এবং পুনরায় সন্ধ্যাবেলা ডুবিয়া যায়। এক দিন ঠিক মাথার উপরে আসিবার সময় হইতে পরের দিন ঠিক ঐখানে আসিবার সময় পর্য্যন্ত একটি **সৌর দিবস** (solar day) হয়। এই সৌর দিবসকে ২৪ ভাগে ভাগ করিয়া একটি ঘণ্টা হয় ; এইরূপ প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় এক বৎসর (**সৌর বৎসর**—solar year) হয়। কিন্তু কতকগুলি কারণে সূর্য্যের গতি সব সময় ঠিক সমান থাকে না, সেইজন্য

সৌর দিবসগুলি সকলে সমান হয় না। এই কারণে পণ্ডিতেরা একটি কাল্পনিক সূর্য্য ঠিক করিয়াছেন যাহার গতি সব সময় সমান। এই কাল্পনিক সূর্য্যের গতি হইতেই আমাদের ঘড়ির সময় ঠিক করা হইয়াছে।

একটি সৌর বৎসরে ঠিক ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিঃ ৪৫ সেঃ আছে। সুবিধার জন্য পর পর তিন বৎসর ৩৬৫ দিনে করা হইয়াছে এবং প্রতি চতুর্থ বৎসরে (যে বৎসরের সংখ্যাকে ৪ দিয়া ভাগ করা যায়, যেমন—১৯২৪, ১৯২৮ প্রভৃতি), ফেব্রুয়ারী মাসের এক দিন বাড়াইয়া দিয়া ৩৬৬ দিনে বৎসর করা হয়। এইগুলিকে **লীপ-ইয়ার** (leap-year) বলা হয়। ইহাতে দেখা গিয়াছে যে ৪০০ বৎসরে তিন দিন বেশী হইয়া যায়। সেই জন্য শতাব্দী বৎসরগুলি সকলেই leap-year নয় ; যাহাকে ৪০০ দিয়া ভাগ করা যায় সেই বৎসরটিই leap-year হইবে, (১২০০, ১৬০০ প্রভৃতি leap-year, কিন্তু ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০ নয়)।

চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বৎসর—সূর্য্যের তুলনায় ২৯½ দিনে চাঁদ একবার পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসে। উহাকেই একটি **চান্দ্র মাস** (lunar month) বলে। এক অমাবস্যা হইতে আর এক অমাবস্যা পর্য্যন্ত একটি চান্দ্র মাস। এইরূপে বারটি চান্দ্র মাসে এক **চান্দ্র বৎসর** (lunar year) হয়। পূর্ব্বে প্রায় সকল দেশেই চান্দ্র বৎসরের প্রচলন ছিল। ইহার প্রধান অসুবিধা, মাসগুলি বৎসরে ১১।১২ দিন সরিয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানদিগের মধ্যে চান্দ্র মাসের প্রচলন আছে।

বাংলা মাস গণনা—ইংরেজী ও বাংলা মাসের একটি প্রভেদ চোখে পড়ে। প্রত্যেক বৎসরেই জানুয়ারী মাস ৩১ দিনে হয়। কিন্তু বৈশাখ মাস কোন বৎসর ৩০ দিনে, আবার কোন বৎসর ৩১ দিনে হয়। ইহার কারণ ইংরেজী মাসগুলির কোন্‌টিতে কতদিন হইবে তাহা একেবারে

স্থির, বাংলা মাসগুলি সেরূপ নয়। সূর্য্য এক বৎসরে অর্থাৎ বার মাসে বারটি রাশির ভিতর দিয়া ঘুরিয়া আসে। সূর্য্যপথকে হিন্দুরা বার ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগ এক একটি রাশির জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। এক রাশি ছাড়িয়া সূর্য্য যে সময় পরবর্ত্তী রাশিতে প্রবেশ করে তাহাই **সংক্রান্তি**। এক সংক্রান্তি হইতে আর এক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত হিন্দুদের একটি **সৌর মাস**। সূর্য্য যে দিন মেষরাশিতে প্রবেশ করে সেই দিন বাংলা নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। ইহাই ১লা বৈশাখ। মেষ রাশি ছাড়িয়া যে দিন সূর্য্য বৃষ রাশিতে প্রবেশ করে তাহা ১লা জ্যৈষ্ঠ, অর্থাৎ সূর্য্য যে কয় দিন মেষ রাশিতে থাকিবে, তাহাই সেই বৎসরের বৈশাখ মাস হইবে। সূর্য্যের গতি সকল সময় সমান নয় বলিয়া মাসগুলির সামান্য পরিবর্ত্তন হয়।

সূর্য্যকে যতক্ষণ আকাশে দেখা যায় তাহাই আমাদের দিন। সূর্য্যের অস্তকাল হইতে পরের দিন উদয়কাল পর্য্যন্ত রাত্রি। দিন ও রাত্রির পরিমাণ সব সময় সমান থাকে না। যখন দিন ছোট ও রাত্রি বড় হয়, তখন আমাদের শীতকাল, এবং দিন বড় ও রাত্রি ছোট হইলে গ্রীষ্মকাল।

শীত গ্রীষ্মের উপর সূর্য্যালোকের প্রভাব— ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ কি ? সূর্য্য হইতেই পৃথিবীতে আলোক ও উত্তাপ আসে। কয়েকটি কারণে এই উত্তাপের তারতম্য হয়। সূর্য্যের আলোক-রশ্মি পৃথিবীর উপর এক বর্গ-ফুট পরিমিত ক্ষেত্রে খাড়া হইয়া পড়িলে উহা যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় হেলিয়া পড়িলে সেরূপ হয় না, কারণ উহা বেশী ছড়াইয়া পড়ে।

ক খ এর উপর যতগুলি সূর্য্যরশ্মি পড়িবে চ ছ, ক খ এর সমান হইলেও, তাহার উপর কিছু কম পড়িবে। এই জন্য ক খ যেরূপ উত্তপ্ত হইবে চ ছ সেই সময়ে ঐরূপ উত্তপ্ত হইবে না। অধিকন্তু, পৃথিবীর চারি দিক্ ঘিরিয়া বায়ুমণ্ডল আছে। উহার ভিতর দিয়া আসিবার সময়

সূর্য্যরশ্মির উত্তাপ কমিয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া যত বেশী দূর যাইতে হইবে, সূর্য্যরশ্মির উত্তাপও তত বেশী কমিয়া যাইবে। ক খ এর উপর পড়িবার পূর্ব্বে আলোকরশ্মিকে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া যতদূর যাইতে হয় চ ছ এর উপর পড়িবার পূর্ব্বে তাহা অপেক্ষা বেশী দূর যাইতে

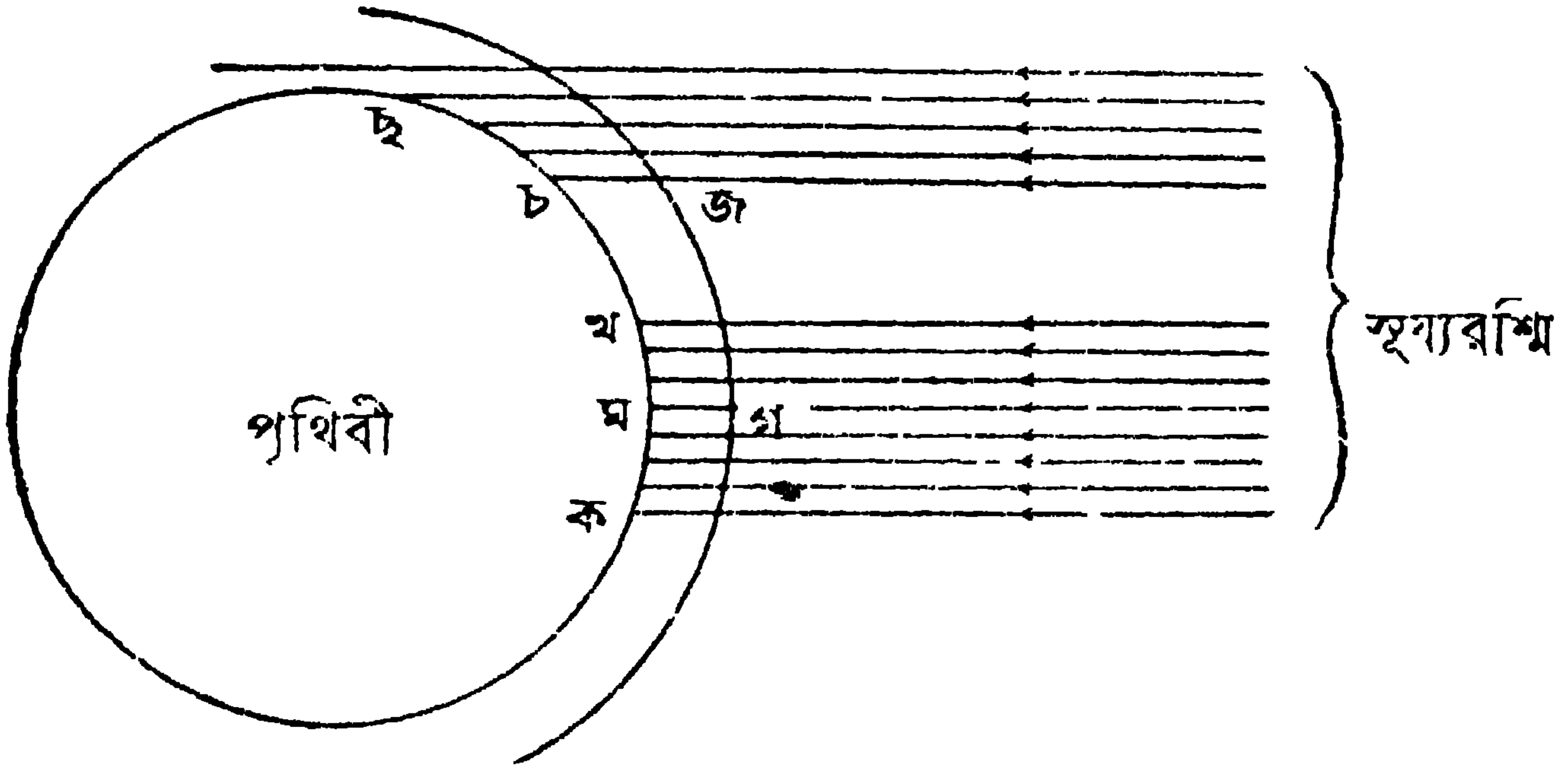

৮১। সূর্য্যরশ্মি পতনের প্রকারভেদে পৃথিবী উত্তপ্ত হওয়ার তারতম্য

হইবে, কারণ চ জ, ঘ গ অপেক্ষা বড়। এই দুইটি কারণে পৃথিবীর উপর কোনও স্থানে সূর্য্যের রশ্মি খাড়া হইয়া পড়িলে উহা বেশী উত্তপ্ত হয়।

পৃথিবীর অক্ষ হেলিয়া থাকার ফল—সূর্য্যের রশ্মি খাড়াভাবে অথবা হেলিয়া পড়িবার কারণ কি? যে পথের উপর দিয়া পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা একটি সমতলে অবস্থিত, এবং পৃথিবীর অক্ষটি এই সমতল ক্ষেত্রের এক দিকে প্রায় ৬৬½ ডিগ্রী হেলিয়া থাকে। পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কালে অক্ষটির কখনও কোনরূপ দিক্ পরিবর্ত্তন হয় না। অক্ষটি সকল সময় শূন্যে একই দিক্ নির্দ্দেশ করে। ২১শে মার্চ্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর বিষুবরেখা ও সূর্য্য একই সমতলক্ষেত্রে

থাকে। সেইজন্য সূর্য্যের আলোক বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী স্থানে ঠিক খাড়াভাবে পড়ে। কিন্তু পৃথিবী গোল বলিয়া উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর নিকটে আলোকরশ্মি অনেক হেলিয়া পড়ে। অতএব বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী স্থান উত্তপ্ত হইলেও মেরুপ্রদেশ মোটেই উত্তপ্ত হয় না। ২২শে জুন পৃথিবী এরূপ স্থানে আসিয়া পড়ে যে, উত্তর মেরু সূর্য্যের দিকে প্রায় ২৩½ ডিগ্রী হেলিয়া থাকে এবং দক্ষিণ মেরু সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া যায়। ঐ সময় দক্ষিণ গোলার্দ্ধ অপেক্ষা উত্তর গোলার্দ্ধে সূর্য্যরশ্মি অধিকতর খাড়া হইয়া পড়ে। এই কারণে ঐ সময় উত্তর গোলার্দ্ধে সূর্য্যরশ্মির প্রখরতা বেশী হয় এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে অপেক্ষাকৃত কম হয়।

সূর্য্য-পরিক্রমণ করিতে করিতে ২২শে ডিসেম্বর, পৃথিবী তাহার বৃত্তাকার পথে ২১শে জুন যেখানে ছিল, ঠিক তাহার বিপরীত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু পৃথিবীর অক্ষ শূন্যে একই দিক্ নির্দ্দেশ করার জন্য ঐ সময় পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধ সূর্য্যের বিপরীত দিকে হেলিয়া পড়ে এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধ সূর্য্যের দিকে থাকে। উত্তর গোলার্দ্ধে সূর্য্যরশ্মির প্রখরতা তখন কম হয় এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে অপেক্ষাকৃত বেশী হয়।

ইহা ছাড়া আর একটি কারণেও উত্তাপের তারতম্য হয়। দিনের বেলা সূর্য্যের প্রখর রশ্মিদ্বারা পৃথিবীর যে ভাগ উত্তপ্ত হয়, রাত্রিকালে সেই তাপ শূন্যে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠ ক্রমশঃ শীতল হইয়া যায়। এদিকে শীতকালে দিন ছোট হয় বলিয়া পৃথিবী উত্তপ্ত হইতে বেশী সময় পায় না, এবং তখন রাত্রি বড় বলিয়া ঐ উত্তাপ শীঘ্রই কমিয়া পৃথিবী শীতল হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয় বলিয়া দিনের উত্তাপ রাত্রিকালে সম্পূর্ণভাবে কমিয়া যাইতে পারে না।

দিনরাত্রি ছোটবড় হইবার কারণ—পৃথিবীর অক্ষ তাহার বৃত্তাকার পথের উপর ঠিক খাড়া নয়। **২১শে মার্চ্চ ও ২২শে**

সেপ্টেম্বর পৃথিবী এরূপ স্থানে থাকে যে, সূর্য্যের আলোক পৃথিবীর যে অর্দ্ধাংশে পড়ে তাহার সীমারেখা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ভিতর দিয়া যায়। এই কারণে, পৃথিবী অক্ষের চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিয়া আসিলে পৃথিবীর যে কোন স্থান অর্দ্ধেক সময় সূর্য্যের আলোক পায় ও বাকী অর্দ্ধেক সময় অন্ধকারে থাকে এবং পৃথিবীর সকল স্থানে দিনরাত্রি সমান হয়। দিনের বেলায় পৃথিবী উত্তপ্ত হইলেও রাত্রিকালে ঐ উত্তাপ অনেকটা কমিয়া যাইবার সময় পায়। সেই জন্য দিনের বেলায় গরম বোধ হইলেও রাত্রিকালে গরম অনেক কম হয়। জ্যোতিষমতে ঐ দুই দিনে উত্তর গোলার্দ্ধে যথাক্রমে **বসন্ত** ও **শরৎ** ঋতুর আবির্ভাব (Vernal and Autumnal Equinox) হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ২১শে জুন পৃথিবী এরূপ স্থানে আসিয়া পড়ে যে, উত্তর মেরু সূর্য্যের দিকে প্রায় ২৩½ ডিগ্রী হেলিয়া থাকে। পৃথিবী

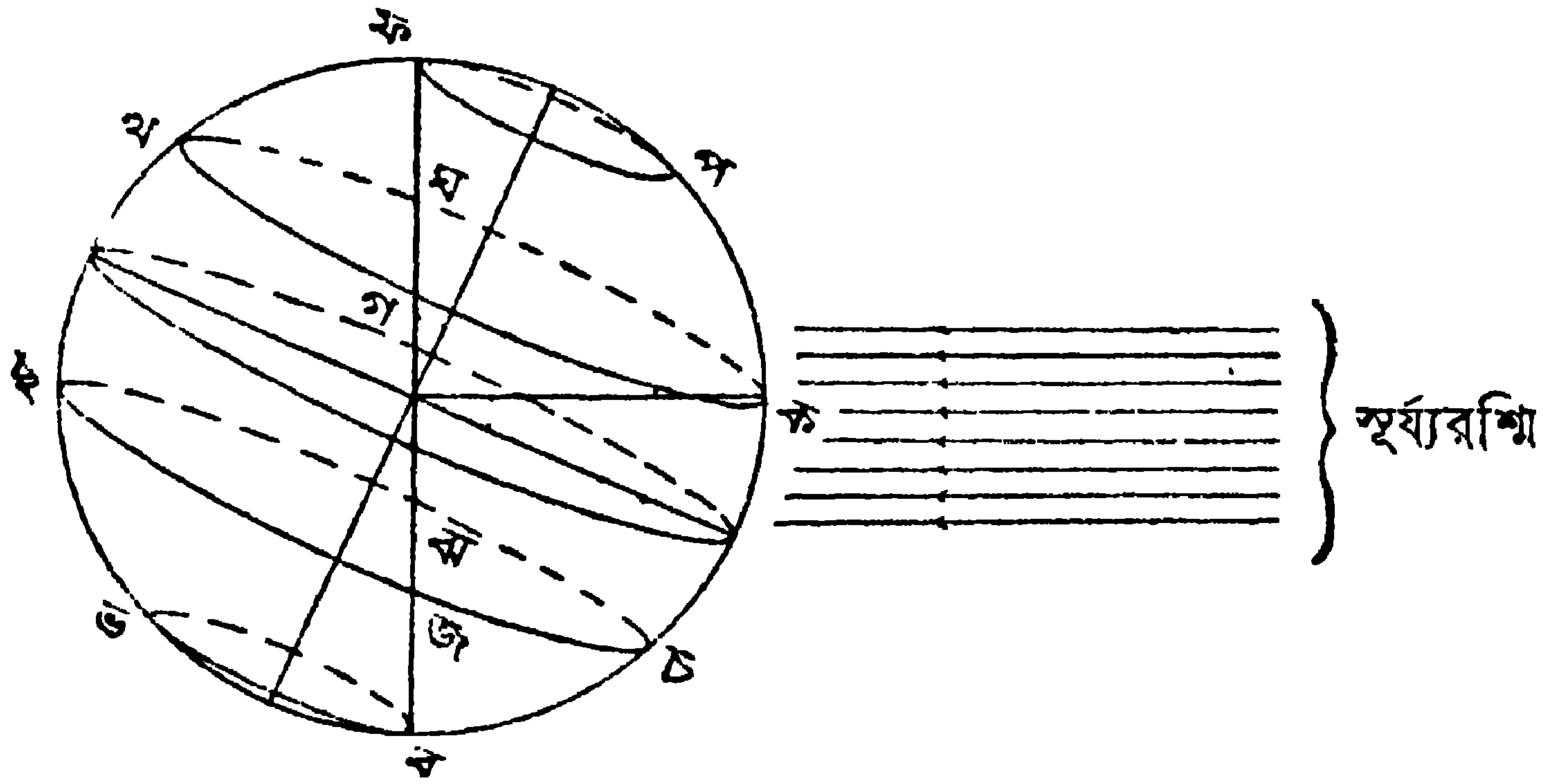

৮২। দিনরাত ছোটবড় হইবার কারণ

অক্ষের চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিয়া আসিলে উত্তর গোলার্দ্ধের ক স্থানটি ২৪ ঘণ্টায় ক গ খ ঘ এই বৃত্তটির উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিবে (৮২নং

চিত্র)। এই বৃত্তটির গ ক ঘ অংশটি সূর্য্যের আলোক পায় এবং গ খ ঘ অংশটি আলোক পায় না। সুতরাং ক ২৪ ঘণ্টার যতটুকু সময় গ ক ঘ অংশের উপর থাকিবে সেই সময়টুকু ক এর নিকট দিন এবং যে সময়টুকু গ খ ঘ অংশের উপর থাকিবে সে সময়টা রাত্রি। দেখা যাইতেছে গ ক ঘ অংশটি গ খ ঘ অংশ অপেক্ষা অনেক বড়। অতএব ক স্থানটিতে ঐ সময় দিন রাত্রি অপেক্ষা অনেক বড় হইবে। এই কারণেই দক্ষিণ গোলার্দ্ধের চ স্থানটিতে দিন ছোট ও রাত্রি বড় হইবে। উত্তর গোলার্দ্ধের প স্থানটি ২৪ ঘণ্টা সূর্য্যের আলোক পায়। কাজেই ঐ সময় প স্থানটিতে ২৪ ঘণ্টা দিন হইবে এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধের ব স্থানটিতে ২৪ ঘণ্টা রাত্রি হইবে। এই কারণেই প এর উত্তরে সকল স্থানে ২৪ ঘণ্টা দিন ও ব এর দক্ষিণে ২৪ ঘণ্টা রাত্রি হইবে।

ঋতুপরিবর্ত্তন (Change of seasons)—জ্যোতিষমতে **২১শে জুন** উত্তর গোলার্দ্ধে গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব (Summer Solstice) এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে শীত ঋতুর আবির্ভাব (Winter Solstice) হয়। এই দিনটিকে **কর্কট ক্রান্তি** বলে।

আবার **২২শে ডিসেম্বর** উত্তর মেরু সূর্য্যের উল্টাদিকে হেলিয়া থাকে বলিয়া উত্তর গোলার্দ্ধে দিন ছোট ও রাত্রি বড় এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে দিন বড়, রাত্রি ছোট হয়। জ্যোতিষমতে ঐ দিন উত্তর গোলার্দ্ধে শীত ঋতুর আবির্ভাব (Winter Solstice) এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব (Summer Solstice) হয়। এই দিনটিকে **মকর ক্রান্তি** বলে।

২২শে মার্চ্চ হইতে উত্তর গোলার্দ্ধে ধীরে ধীরে দিন বাড়িতে থাকে ও রাত্রি কমিতে আরম্ভ করে, এবং ২১শে জুন বৎসরের ভিতর সবচেয়ে বড় দিন ও ছোট রাত্রি হয়। ২১শে জুনের পর দিন ছোট হইতে আরম্ভ করে

ও রাত্রি বাড়ে এবং পুনরায় ২২শে সেপ্টেম্বর দিনরাত্রি সমান হয়। ২২শে সেপ্টেম্বরের পর দিন রাত্রির চেয়ে ক্রমশঃ ছোট হইয়া যায় এবং ২২শে ডিসেম্বর বৎসরের সবচেয়ে ছোট দিন ও বড় রাত্রি হয়। ২২শে ডিসেম্বরের পর ক্রমশঃ দিন বাড়িয়া ও রাত্রি ছোট হইয়া পুনরায় ২১শে মার্চ্চ দিনরাত্রি সমান হয়।

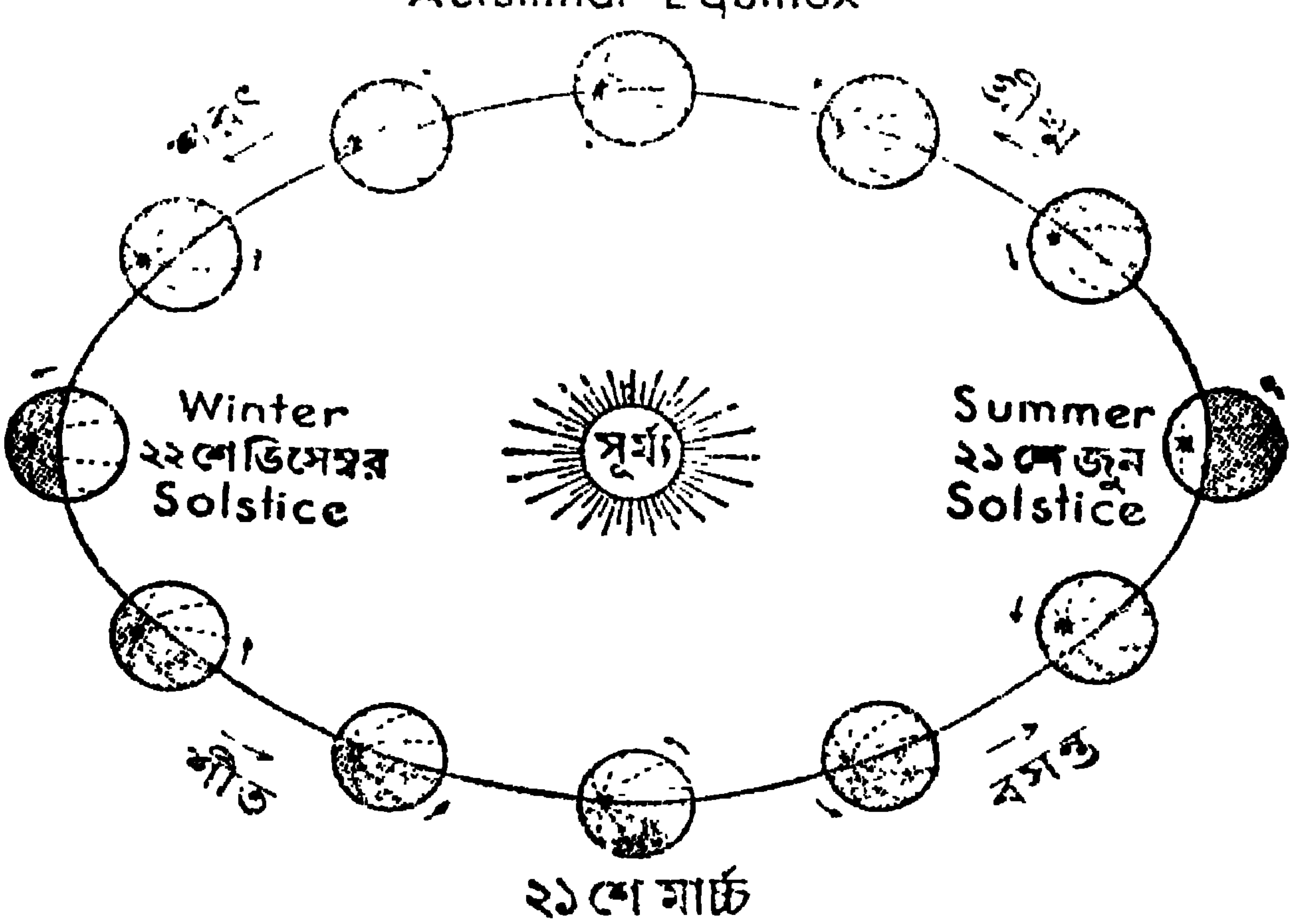

৮৩। ঋতুপরিবর্ত্তনের কারণ

পৃথিবীর পাঁচটি ভাগ—পৃথিবীর সকল স্থানে গরম ও ঠাণ্ডা সমান নহে। শীতোষ্ণতা ভেদে পৃথিবীকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। বিষুব রেখা হইতে উত্তর দক্ষিণ গোলার্দ্ধের ২৩½ ডিগ্রী পর্য্যন্ত স্থানকে **উষ্ণমণ্ডল** (Torrid Zone) বলা হয়। বৎসরের কোন না কোন সময়ে পৃথিবীর এই অংশে সূর্য্যের আলোকরশ্মি ঠিক

খাড়াভাবে পড়ে। অন্য সময় হেলিয়া পড়িলেও বেশী হেলিয়া পড়ে না। এইজন্য এই অংশে শীত অপেক্ষা গরম অনেক বেশী। যে দুইটি কাল্পনিক বৃত্তের দ্বারা এই সীমা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাদিগকে যথাক্রমে কর্কটক্রান্তি বৃত্ত বা উত্তরায়ণ বৃত্ত (Tropic of Cancer) এবং মকরক্রান্তি বৃত্ত বা দক্ষিণায়ন বৃত্ত (Tropic of Capricorn) বলা হয়।

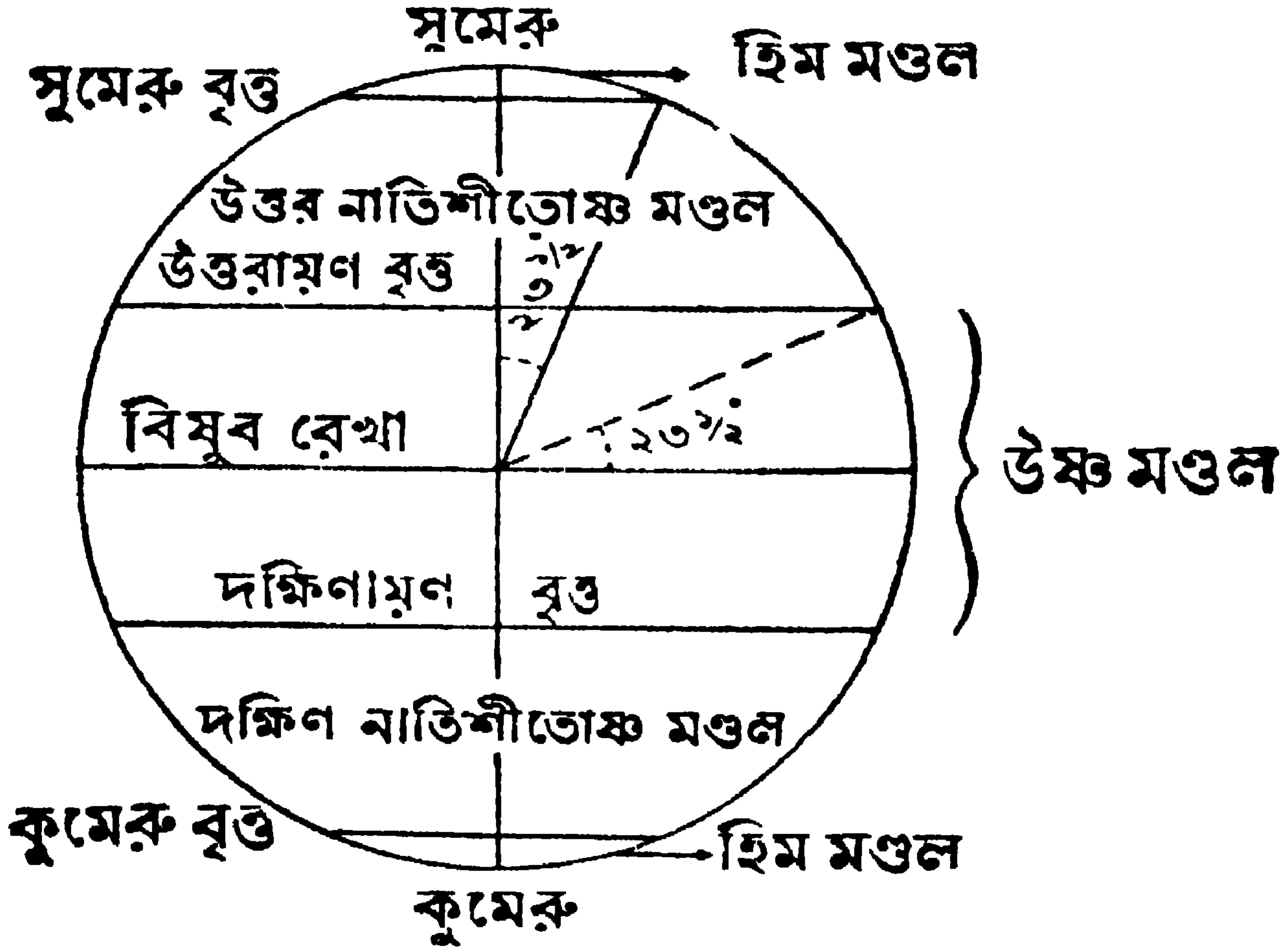

৮৪। শীতোষ্ণতা ভেদে পৃথিবীর বিভাগ

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর চারিদিকে ২৩½ ডিগ্রী পরিমিত স্থানকে **হিমমণ্ডল** (Frigid Zones) বলা হয়। এই প্রদেশে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত্রি। এই দুইটি প্রদেশে সূর্য্যরশ্মি সকল সময়েই অত্যন্ত হেলিয়া পড়ে। সেই জন্য ঠাণ্ডা খুব বেশী এবং বৎসরের কোন সময়েই গরম হয় না। সীমানির্দ্দেশক বৃত্ত দুইটিকে যথাক্রমে **সুমেরু বৃত্ত** (Arctic Circle) ও **কুমেরু বৃত্ত** (Antarctic Circle) বলা হয়।

বাকী দুইটি অংশে সূর্য্যের আলোক কোন সময়ে ঠিক খাড়াভাবে না পড়িলেও হিমপ্রধান দেশের মত ঐরূপ হেলিয়া পড়ে না। এই অংশে উষ্ণপ্রধান দেশের মত গরম না হইলেও হিমপ্রধান দেশের মত ঠাণ্ডাও হয় না। এই অংশ দুইটিকে **নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল** (Temperate Zone) বলা হয়।

কি হইলে ঋতু পরিবর্ত্তন হইত না—পৃথিবীর অক্ষ ঠিক খাড়া হইলে দিনরাত্রি ছোট বড় হইত না এবং পৃথিবীর যে-কোন স্থানে বৎসরের সকল সময় একটিমাত্র ঋতু হইত। কিন্তু তাহা হইলেও বিষুবরেখা হইতে উত্তর অথবা দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর হইলে ক্রমে গরম কমিয়া ঠাণ্ডা বেশী হইত। পৃথিবীর আকার গোল বলিয়া বিষুবরেখার নিকটে আলোকরশ্মি খাড়াভাবে পড়িলেও দূরে হেলিয়া পড়ে। পৃথিবী যদি গোল না হইয়া চোঙের (cylinder) মত হইত এবং তাহার অক্ষ ঠিক খাড়া থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল স্থানেই সূর্য্যের আলোক খাড়াভাবে পড়িত এবং পৃথিবীর সকল স্থানেই সমান গরম অথবা ঠাণ্ডা বোধ হইত।

Questions

1. What is a solar year? What is the difference between a solar year and a lunar year?
2. When does the Bengali new year commence? How are the number of days in a particular month determined according to the Bengali calendar?
3. Explain, with the help of a diagram, the cause of the seasons. (C. U. 1946)
4. Explain why day and night are not always of equal length. On which days in the year are day and night of equal length? Which is the longest day and which the longest night?
5. Why is the weather hot in June and cold in December? (C. U. 1940)
6. Why do we have long nights in winter and short in summer? Explain with the help of a sketch. (C. U. 1943)

পঞ্চম অধ্যায়

আকাশমণ্ডল (The Sky)

গ্রহ ও তারকা—রাত্রিকালে পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশে দেখা যায় অসংখ্য আলোকবিন্দু মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। ইহারা এক জাতীয় নহে। কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র আবার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, কতকগুলি মিট মিট করিতেছে আবার কতকগুলি স্থিরভাবে জ্বলিতেছে। সাধারণ লোকে সবগুলিকেই 'তারা' বলে। যেগুলি প্রায় স্থিরভাবে জ্বলে তাহাদিগকে **গ্রহ** (planets) বলে এবং বাকীগুলিকেই বিশেষভাবে **তারা** (stars) বলে। গ্রহগুলি আমাদের প্রতিবেশী, তাহাদের দূরত্ব নিকটতম তারকা হইতে অনেক কম।

গ্রহ ও তারার তুলনা

গ্রহ	তারা
১। নিজের আলো নাই, সূর্য্যালোকে আলোকিত হয়।	১। নিজের আলো থাকে।
২। স্থির আলো।	২। আলো মিট মিট করে।
৩। শুধু চোখে অনেক গ্রহকেই দেখা যায় না।	৩। অনেক তারাকেই খালি চোখে দেখা যায়।
৪। দূরবীণ সাহায্যে অনেক বড় দেখায়।	৪। দূরবীণে বড় দেখায় না।

নীহারিকা, নীহারিকাপুঞ্জ ও ছায়াপথ—তারা, গ্রহ ছাড়া পাতলা সাদা মেঘের টুকরার মত কতকগুলি জিনিস চোখে পড়ে। এগুলি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর প্রায় একই স্থানে দেখা যায়। এগুলিকে **নীহারিকা** (nebulae) বলে। নীহারিকা দুই প্রকার (১) কতকগুলি বাস্তবিকই বাষ্পীয় (gaseous) অবস্থায় আছে, (২) আর কতকগুলি বহুসংখ্যক তারকার সমষ্টি (star

clusters); তারকাগুলি অনেক দূরে থাকায় উহাদিগের পুঞ্জকে বাষ্পের মত স্পষ্ট দেখায়। পরিষ্কার আকাশে একদিক্ হইতে আর একদিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে প্রশস্ত রাজপথের মত দেখা যায় তাহা তারকাপুঞ্জের সমষ্টি। ইহাকে **ছায়াপথ** (milky way or galaxy) বলে।

উল্কা—মাঝে মাঝে দেখা যায় যেন একটি তারা দ্রুতগতিতে একদিক হইতে আর একদিকে ছুটিয়া যাইয়া কোথায় অদৃশ্য হইতেছে। এগুলিকে **উল্কা** (meteor) বলে। ইহাদের সহিত গ্রহ-তারকাদির কোন সংস্রব নাই। ইহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং হঠাৎ পৃথিবীর আকর্ষণে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া আসে, কিন্তু অধিকাংশই পুড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

ধ্রুবতারা—গ্রহ-তারকা সকল সময় একস্থানে দেখা যায় না। পৃথিবী নিজের **অক্ষের** (axis) চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিয়া আসে। গ্রহ-তারকা এই কারণে চন্দ্রসূর্য্যের মত প্রত্যহ পূর্ব্বাকাশে উদয় হয় এবং পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। ইহাকে **দৈনিক আবর্ত্তন** বলে। পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর ন্যায় আকাশেও দুইটি মেরু আছে। পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধের অধিবাসী আমরা উত্তর মেরু দেখিতে পাই, কিন্তু দক্ষিণ মেরু পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধ হইতে দেখা যায় না। উত্তর মেরুর নিকটে একটি তারকা আছে, তাহা দৈনিক আবর্ত্তনে প্রায় স্থির থাকে বলিয়া তাহাকে **ধ্রুবতারা** (Pole Star) বলে এই ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরাংশের গ্রহ-তারকা ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিয়া আসে। ধ্রুবতারাটিকে চিনিয়া রাখা সহজ

তারকাদির বিশেষ পরিচয়—আকাশের উত্তর দিকে দেখা যায় চারিটি তারা একটি চতুর্ভুজের (quadrilateral) আকারে রহিয়াছে এবং এই চতুর্ভুজের একটি কোণে পর পর আর তিনটি তারা

দেখা যায়। এই সাতটি তারা লইয়া হইল একটি তারামণ্ডল। ইহার নাম **সপ্তর্ষিমণ্ডল** (Great Bear)। সাতটি তারা সাতটি ঋষির নামে পরিচিত—**পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি**। ভাল করিয়া দেখিলে বশিষ্ঠের নিকট আর একটি তারা দেখা যায়। ইহা **অরুন্ধতী** (বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী দেবীর পতিভক্তি অসামান্য বলিয়া কথিত আছে)। সরল রেখা দ্বারা পুলহ ও ক্রতু যোগ করিয়া বাড়াইয়া দিলে উজ্জ্বল ধ্রুবতারার নিকটে যাওয়া যায়। ধ্রুবতারার নিকট আরও ছয়টি তারা আছে, চারিটি চতুর্ভুজের আকারে, এবং চতুর্ভুজের একটি কোণ হইতে ধ্রুবতারার দিকে অগ্রসর হইলে বাকী দুইটি মাঝখানে পড়ে। ইহাকে **লঘু সপ্তর্ষি** (Little Bear) বলে।

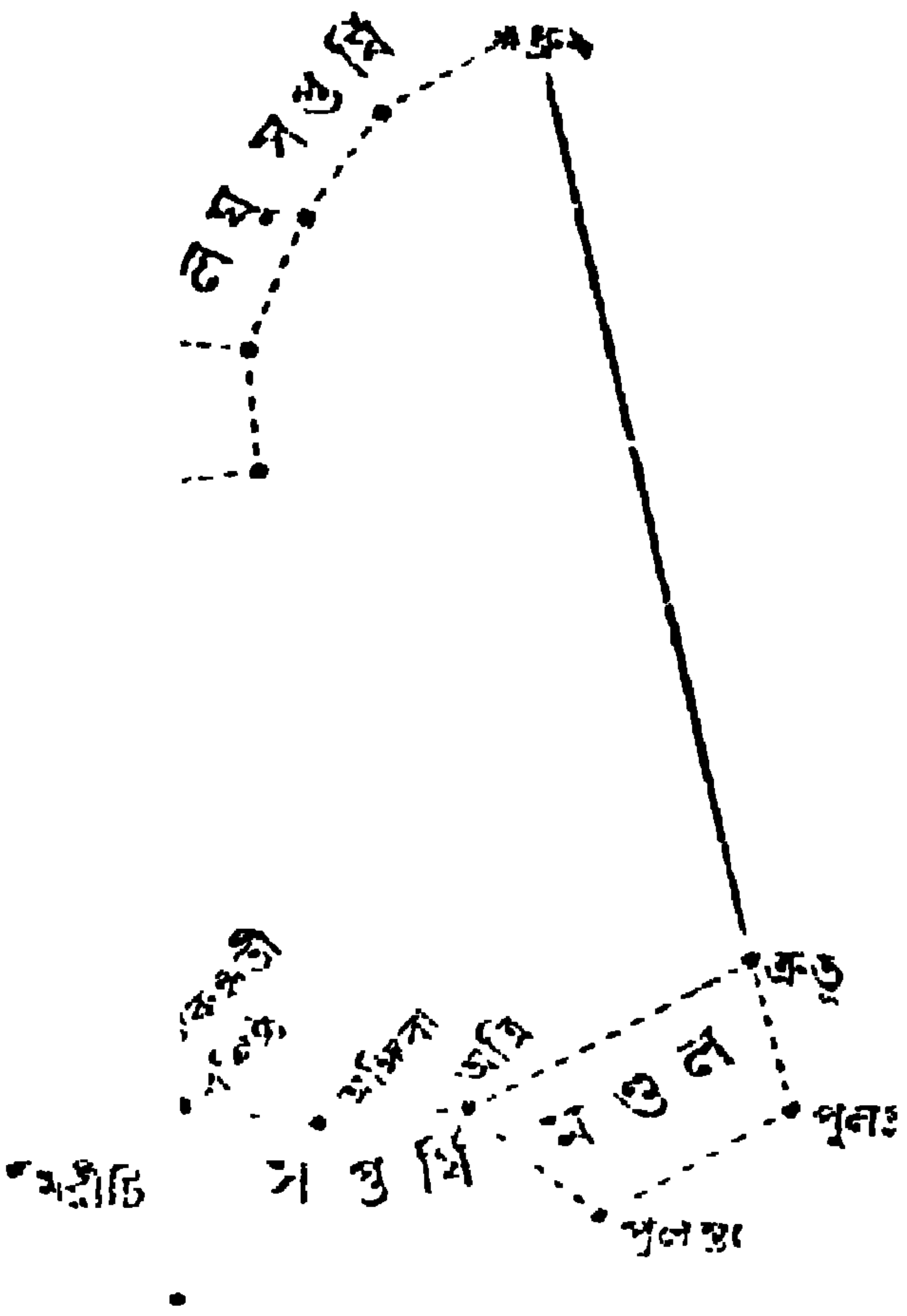

৮৫। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবতারা

সপ্তর্ষিমণ্ডল ছাড়া আরও অনেকগুলি **তারামণ্ডল** (constellations) আকাশে দেখা যায়। পঞ্জিকায় যে বারটি **রাশির** নাম পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি তারামণ্ডল। এইগুলি ছাড়া **কালপুরুষ** (Orion), **বুওটিস** (Boötes), **হারকিউলিস** (Hercules), **লাইরা** (Lyra), **আকুইলা** (Aquila), প্রভৃতি আরও অনেকগুলি বড় বড় তারামণ্ডল আছে। তারামণ্ডলগুলির বিষয়ে হিন্দু ও গ্রীস দেশীয় পুরাণে অনেক গল্প আছে।

রাশি ও রাশির প্রধান প্রধান নক্ষত্র—বৈশাখ মাসে রাত্রিতে আকাশে প্রায় মাঝখানে (১) **সিংহরাশি** (Leo) দেখা

যায়। ইহার আকৃতির সহিত সিংহের আকৃতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মাঘ মাসে সিংহ রাশিকে পূর্ব্বাকাশে দেখা যায়। সিংহের সম্মুখের দিকে যে বড় নক্ষত্রটি আছে তাহার নাম মঘা (Regulus) এবং লেজের দিকের বড় নক্ষত্রটির নাম **উত্তর-ফাল্গুনী** (Denebola)।

সিংহ রাশির এক পাশে পর পর (২) **কর্কটরাশি** (Cancer) ও (৩) **মিথুন রাশি** (Gemini) দেখা যাইবে। মিথুন রাশির মাথার উপর তুইটি উজ্জ্বল তারকা আছে। ইহাদের নাম **ক্যাষ্টর** (Castor) ও **পোলাক্স** (Pollux) বা **পুনর্ব্বসু**।

সিংহের আর এক পাশে (৪) **কন্যা রাশি** (Virgo) দেখা যায়। এই মণ্ডলের উজ্জ্বল তারাটির নাম **চিত্রা** (Spica)। **কন্যা** রাশির পাশে (৫) **তুলারাশি** (Libra)। তুলা রাশিতে কোন উজ্জ্বল তারকা নাই।

সিংহ রাশির নীচের দিকে একটি বড় তারামণ্ডল দেখা যায়। ইহার নাম **হাইড্রা** (Hydra—জলের সাপ।) এই মণ্ডলটি অনেকটা সাপের মত দেখিতে। হাইড্রা মণ্ডলে **অশ্লেষা** নামে একটি নক্ষত্র আছে।

এই মণ্ডলগুলি ছাড়া **বুওটিস** এবং **হারকিউলিস** নামে তুইটি মণ্ডল উত্তর-পূর্ব্বদিকে দেখা যায়। **স্বাতী নক্ষত্র** (Arcturus) বুওটিস মণ্ডলের প্রধান তারা।

তুলা রাশির নীচের দিকে কাঁকড়া বিছার লেজের ন্যায় একটি মণ্ডল দেখা যায়। ইহার নাম (৬) **বৃশ্চিক রাশি** (Scorpio)। বৃশ্চিক রাশি জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভালরূপে দেখা যায়। বৃশ্চিক রাশির অনেকগুলি নক্ষত্রের মধ্যে উজ্জ্বল লাল রঙের একটি নক্ষত্র চোখে পড়ে। এই নক্ষত্রটির নাম **জ্যেষ্ঠা** (Antares)।

বৃশ্চিক রাশির নীচের দিকে **সেণ্টরাস** (Centaurus) নামে একটি মণ্ডল দেখা যায়। এই মণ্ডলে তুইটি তারা আছে, **আল্‌ফা**

সেণ্টরাই এবং **বিটা সেণ্টরাই** (Alpha-Centauri and Beta-Centauri)। এই মণ্ডলের অন্যতম তারকা **প্রক্সিমা সেণ্টরাই** (Proxima Centauri) পৃথিবীর নিকটতম তারকা।

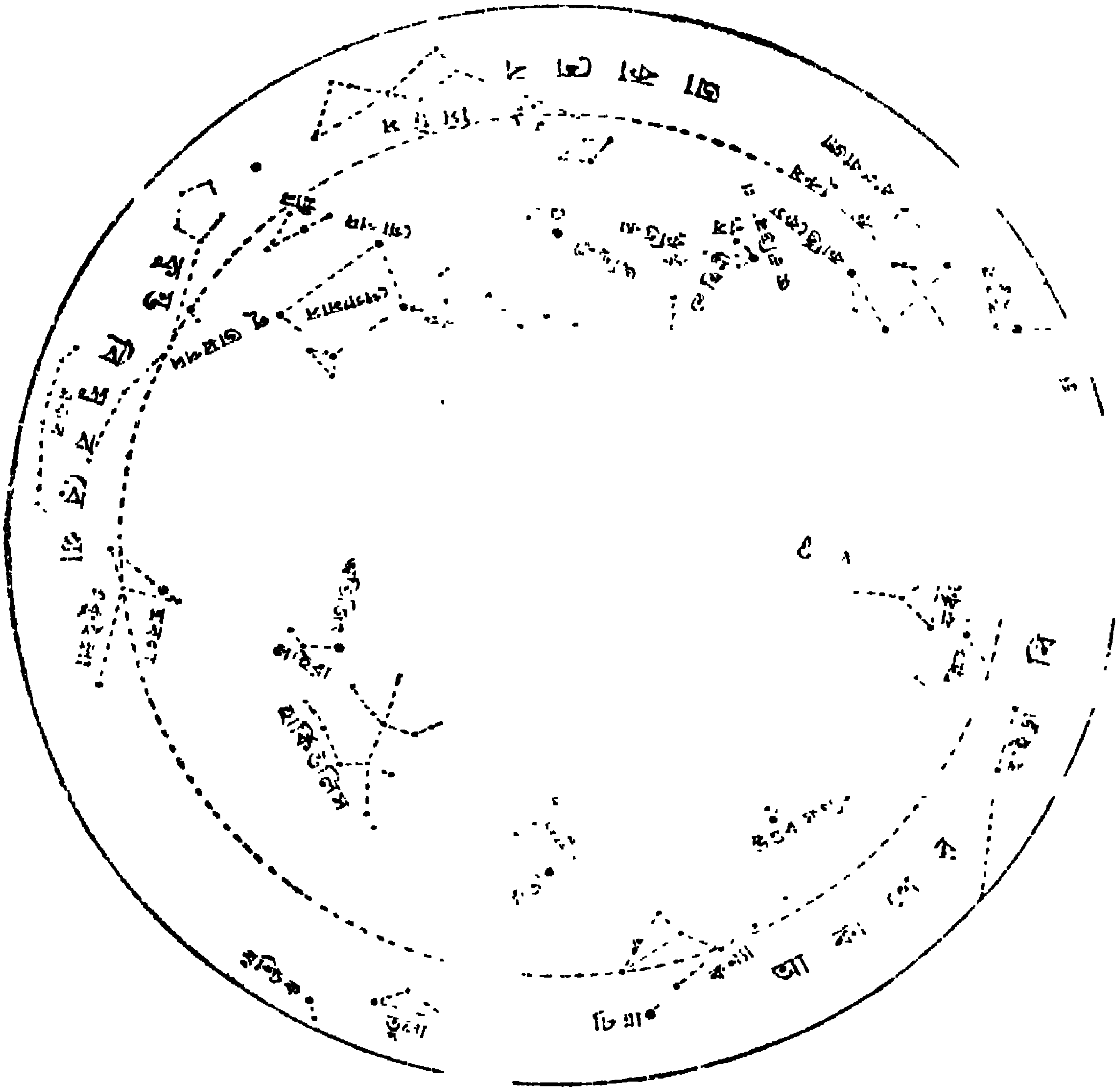

৮৬। উত্তর আকাশের মানচিত্র

বৃশ্চিক রাশির পাশে (৭) **ধনু রাশি** (Sagittarius)। ইহার উত্তরের দিকে **একুইলা মণ্ডলের** (Aquila) ভিতর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। ইহার নাম **শ্রবণা** (Altair)।

শ্রাবণ মাসে ধনু রাশির পূর্ব্বদিকে (৮) **মকর রাশি** (Capri-

cornus) এবং তাহার পাশে (৯) **কুম্ভরাশির** (Aquarius) নক্ষত্রগুলি দেখা যাইবে। এই দুইটি রাশিতে কোনও উজ্জ্বল নক্ষত্র নাই।

আকাশের উত্তর-পূর্ব্বদিকে কুম্ভের উত্তরে একটি বড় নক্ষত্রমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম **পেগাসস** (Pegasus) মণ্ডল। পেগাসসের উত্তরে **এণ্ড্রোমিডা** (Andromeda) মণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। পেগাসসের তিন কোণে তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। এই তিনটির নাম **উত্তরভাদ্রপদ** (Alpheratiz), **পূর্ব্বভাদ্রপদ** (Markab) এবং **গোপদ** (Algenib)। এণ্ড্রোমিডার পশ্চিম পার্শ্বে কতকগুলি নক্ষত্র একটি ইংরেজী W-এর আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মণ্ডলটির নাম **ক্যাসিওপিয়া** (Cassiopeia)। ধ্রুবতারা ক্যাসিওপিয়া এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে থাকে।

মকর রাশির দক্ষিণে একটি ছোট মণ্ডল দেখা যায়। তাহার নাম **পিসিস** (Piscis)। এই মণ্ডলে **ফোমালহাউট** (Fomalhaut) নামে একটি উজ্জ্বল তারা আছে।

কুম্ভ রাশির পূর্ব্বদিকে (১০) **মীন রাশি** (Pisces) দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্রমাসে সূর্য্য মীন রাশিতে থাকে বলিয়া ঐ সময় এই রাশিটি দেখা যায় না।

মীন রাশির উত্তর-পূর্ব্বদিকে (১) **মেষ রাশি** (Aries)। বারটি রাশির মধ্যে মেষ রাশিই প্রথম। বৈশাখ মাসে সূর্য্য মেষ রাশিতে থাকে বলিয়া ঐ সময়ে মেষ রাশি আকাশে দেখা যায় না। মেষ রাশির কয়েকটি তারকার মধ্যে প্রধান তারকাটির নাম **অশ্বিনী**।

মেষ রাশির পূর্ব্বদিকে (১২) **বৃষ রাশি** (Taurus)। বৃষ রাশির মধ্যে অনেকগুলি তারকা আছে। তাহার মধ্যে **রোহিণী** (Hyades) এবং **আলডিবারান** (Aldebaran) প্রধান। লাল রঙের

আলডিবারানটি দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। বৃষ রাশির পশ্চিম অংশে কয়েকটি তারা লইয়া যে মণ্ডলটি রহিয়াছে তাহার নাম **কৃত্তিকা** (Pleiades)। এই মণ্ডলটি বৃষ রাশিরই একটি অংশ।

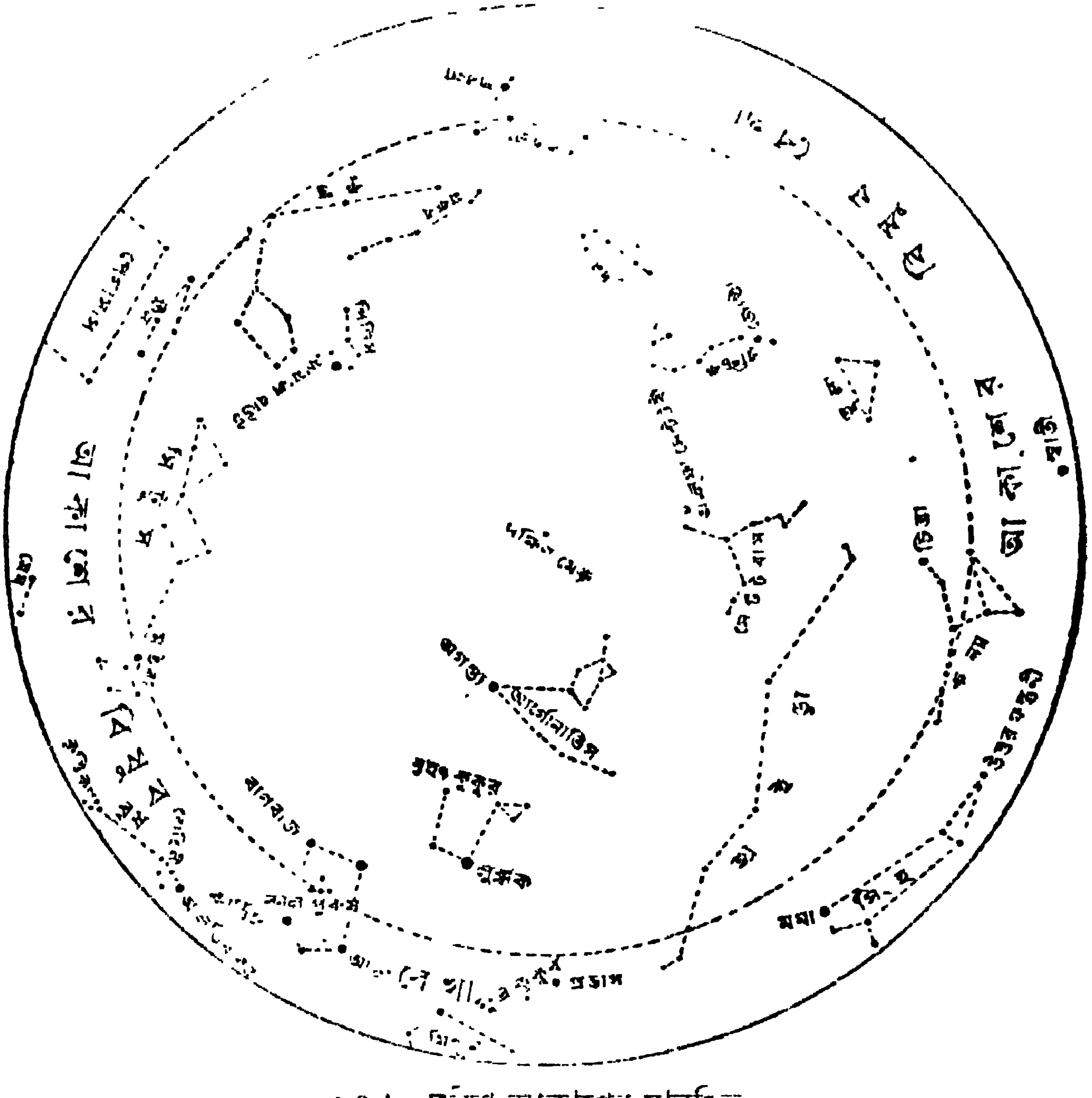

৮৭। দক্ষিণ আকাশের মানচিত্র

মীন রাশির নীচের দিকে একটি বড় মণ্ডল দেখা যাইবে। ইহার নাম **সিটাস** (Cetus)। এই মণ্ডলে **মাইরা** (Mira) নামে তারা আছে। এই তারাটির উজ্জ্বলতা প্রায় এক বৎসর পর পর কয়েকদিনের জন্য বাড়ে।

আকাশের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে **অরিগা** (Auriga) বা প্রজাপতি

মণ্ডল দেখা যাইবে। এই মণ্ডলে একটি উজ্জ্বল তারা আছে, তাহার নাম **ব্রহ্মহৃদয়** (Capella)।

বৃষ রাশির নিকটে আর একটি বড় তারামণ্ডল চোখে পড়িবে। ইহার নাম **কালপুরুষ** (Orion)। এই মণ্ডলে কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, তাহাদের মধ্যে **আর্দ্রা** (Betelgeux), **বাণরাজা** (Rigel) এবং **কার্ত্তিকেয়** (Bellatrix) প্রধান। কালপুরুষের দক্ষিণে একটি উজ্জ্বল তারকা দেখা যাইবে। আকাশে ইহার ন্যায় উজ্জ্বল তারকা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই তারকাটির নাম **লুব্ধক** (Sirius)। পৃথিবী হইতে প্রায় এক সহস্র কোটি মাইল দূরে থাকিলেও ইহাকে এত উজ্জ্বল দেখা যায়। এই তারাটি **বৃহৎ কুকুর মণ্ডলের** (Canis Major) অন্তর্গত।

কালপুরুষের পূর্ব্বদিকে আর একটি উজ্জ্বল তারা দেখা যায়। ইহার নাম **সরমা** (Procyon)। ইহা **ক্ষুদ্র কুকুর মণ্ডলের** (Canis Minor) অন্তর্গত।

ক্ষুদ্র কুকুর মণ্ডলের দক্ষিণে একটি বড় তারামণ্ডল আছে। ইহাতে একটি উজ্জ্বল তারা দেখা যাইবে। এই মণ্ডলটির নাম **আর্গোনেভিস** (Argonavis) মণ্ডল এবং উজ্জ্বল তারাটির নাম **অগস্ত্য** (Canopus)।

আকাশে সূর্য্যের পথ ঃ ক্রান্তিবৃত্ত—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই বারটি রাশিকে একটি রেখার দ্বারা যোগ করিলে এই রেখাটি একটি বৃত্তের আকারে আকাশকে ঘিরিয়া ফেলিবে। যে কোন রাত্রিকালে এই বৃত্তটির অর্দ্ধেক দেখা যাইবে। এই বৃত্তটির নাম **ক্রান্তিবৃত্ত** (ecliptic)। বৈশাখ মাসে মেষ রাশি হইতে আরম্ভ করিয়া সারা বৎসর সূর্য্যকে এই পথে সমস্ত আকাশ একবার পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে দেখা যায়। সূর্য্য যে মাসে যে রাশিতে থাকে, সেই মাস এবং তাহার পরবর্ত্তী মাসে ঐ রাশি এবং উহার

নিকটবর্ত্তী কোন রাশি অথবা তারামণ্ডল দেখা যায় না, কারণ উহারা প্রায় সূর্য্যের সহিত উদয় হইয়া পুনরায় সূর্য্যের সহিত অস্ত যায়।

আকাশে গ্রহের গতি—গ্রহগুলি ভিন্ন ভিন্ন বৎসরের একই সময় আকাশের একই স্থানে থাকে না। ইহারা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই কারণেই ইহারা প্রত্যহই স্থানপরিবর্ত্তন করে। এইজন্য চিত্র দেখিয়া গ্রহগুলি চিনিয়া রাখা কঠিন। গ্রহগুলির মধ্যে **শুক্র** (Venus) অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায় বলিয়া তাহাকে সহজেই চেনা যায়। প্রত্যেক বৎসর কিছুদিনের জন্য যে উজ্জ্বল গ্রহটি সন্ধ্যাকালে পশ্চিম আকাশে দেখা যায় তাহারই নাম শুক্র অথবা **শুকতারা**। শুক্রের নিকট আর একটি ছোট গ্রহ দেখা যায়, তাহার নাম **বুধ** (Mercury)। **মঙ্গল** (Mars), **বৃহস্পতি** (Jupiter) এবং **শনি** (Saturn) ও খালি চোখে দেখা যায়। ইহাদিগকে চিনিবার সহজ উপায় হইতেছে, পাঁজি দেখিয়া কোন্ গ্রহ কোন্ মাসে কোন্ রাশিতে থাকিবে তাহা দেখিয়া লইয়া সেই রাশিতে কয়েকদিন খোঁজ করিলেই গ্রহটিকে চিনিয়া রাখা যাইবে। রাশির নক্ষত্রগুলি দিনের পর দিন ঠিক একই রূপে সাজান থাকে, কিন্তু গ্রহগুলি প্রত্যহই অল্পবিস্তর স্থানপরিবর্ত্তন করে।

Questions

1. How do you distinguish between stars and planets? (C. U. 1946). Illustrate your answer with examples. What is the milky way? (C. U. 1942)
2. Of the planets, Mercury and Venus always appear either as a morning or an evening star. Explain this. (T. T. 1938)
3. What is a constellation? Give examples.
4. What are the signs of the Zodiac? Name some bright stars in each of them.
5. Which is the nearest star? Which is the brightest star? Name the constellations in which they are present.
6. Give a description of the Great Bear with the help of a sketch. Indicate how you can find the position of the Pole Star with the help of the above constellation. What is the special characteristic of the Pole Star? (C. U. 1944)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধূমকেতু ও উল্কা

(Comets and Meteors)

ধূমকেতুর আকার—গ্রহ-উপগ্রহ ছাড়া আর একপ্রকার বস্তু মাঝে মাঝে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে দেখা যায়। ইহাদিগকে **ধূমকেতু** (comet) বলে। গ্রহের ন্যায় ইহারা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু ইহারা যে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা অনেক বড় বলিয়া সব সময় ইহাদিগকে দেখা যায় না। এই পথের এক নাভিতে (focus) সূর্য্য থাকে বলিয়া ইহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে সূর্য্যের নিকট আসিয়া পড়ে। তখনই ইহাদিগকে খালি চোখে দেখা যায়। ইহাদিগকে দেখিতে ঝাঁটার মত। ইহারা আয়তনেও যে কোন গ্রহ অপেক্ষা অনেক বড়। বড় হইলে কি হইবে, ইহাদের ওজন অতি সামান্য এবং ইহারা কেবল হাল্কা বাষ্প দ্বারা গঠিত।

ধূমকেতু যখন প্রথম দেখিতে পাওয়া যায় তখন তাহার পুচ্ছ দেখা যায় না; কেবল একটি উজ্জ্বল গোল পদার্থ চোখে পড়ে। ক্রমশঃ সে সূর্য্যের যত নিকটবর্ত্তী হয় ততই তাহার পুচ্ছের আকার বাড়িয়া অবশেষে ঠিক ঝাঁটার মত দেখায়। একটি ধূমকেতুর পুচ্ছ লক্ষ লক্ষ মাইল লম্বা হয়। ইহাদের পুচ্ছের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, যে দিকে সূর্য্য আছে পুচ্ছটি ঠিক তাহার উল্টাদিকে থাকিবে। ধূমকেতু ধীরে ধীরে ঘুরিলে উহার পুচ্ছও উহার সহিত সমানভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়।

হ্যালির ধূমকেতু (Halley's comet)—যে কয়টি ধূমকেতু জানা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে হ্যালির ধূমকেতুই প্রধান। ইহা প্রায় ৭৫ বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। গত ১৯১০ সালে ইহাকে আকাশে দেখা গিয়াছিল। পুনরায় ১৯৮৫ সালে দেখা যাইবে।

ধূমকেতুর উপর গ্রহের প্রভাবঃ উল্কাপাত— কোন গ্রহের নিকটে পড়িলে উহার টানে ধূমকেতুটি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। ঐ টুকরাগুলিও আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে

৮৮। হ্যালির ধূমকেতু

পৃথিবী উহাকে টানিয়া লয়। পৃথিবীর আকর্ষণে যখন ঐ টুকরাগুলি বায়ুমণ্ডলের ভিতর তীব্রবেগে প্রবেশ করে, তখন বায়ুর ঘর্ষণে উহারা জলিয়া উঠে এবং পুড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাই উল্কাপাতের প্রধান কারণ। ধূমকেতু ছাড়াও কতকগুলি কঠিন পদার্থের টুকরা আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। নৈসর্গিক কারণে বহুদিন পূর্ব্বে ঐ টুকরাগুলি পৃথিবীর উপর হইতে আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পৃথিবীর টানে তাহারা এখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে পৃথিবীর টানে মাটির দিকে পড়ে এবং বায়ুমণ্ডলের সহিত ঘর্ষণে জ্বলিয়া উঠে। বড়গুলি একেবারে পুড়িয়া যায় না, পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে। এইরূপ উল্কা (meteors) অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা মিউজিয়মে এই ধরণের উল্কা আছে।

বিয়েলার ধূমকেতু (Biela's Comet)—যেদিন পৃথিবী এইরূপে এক ঝাঁক ধূমকেতুর টুকরার নিকটবর্ত্তী হয় সেদিন আকাশে

৮৯। উল্কা

অনেক উল্কাপাত দেখিতে পাওয়া যায়। বিয়েলার ধূমকেতু নামে একটি ধূমকেতু পূর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যাইত। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য ও গ্রহদের টানে উহা একেবারে গুঁড়া হইয়া যায়। গুঁড়াগুলি এখন পূর্ব্বের ভ্রমণপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ২৭শে নভেম্বর পৃথিবী ঐ গুঁড়াগুলির নিকটবর্ত্তী হয়। সেদিন আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিলে অনেক উল্কা দেখা যাইবে।

Questions

1. Write notes on (a) comets and (b) meteors. (C. U. 1941)
2. Why is a large number of meteors observed in November?

ভূতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবীর উৎপত্তি

ভূতত্ত্ব (Geology)—পৃথিবীর জন্ম, উহার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ গঠন, ভূগর্ভস্থ বিবিধ খনিজদ্রব্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান হইতে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহাকে ভূতত্ত্ব কহে।

পৃথিবীর উৎপত্তির ইতিহাস—সৌরজগতের গ্রহগুলির মধ্যে পৃথিবী অন্যতম। অন্যান্য গ্রহের ন্যায় পৃথিবী তাহার উপগ্রহ চন্দ্রকে লইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। আজিকার এই সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবীর উপর দিয়া যুগযুগান্ত ধরিয়া নানা পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে। চিরকাল ইহার অবস্থা এরূপ ছিল না। আদিম পৃথিবী মনুষ্যের বাসের অনুপযুক্ত ছিল। পৃথিবীর উৎপত্তির বিষয় বহু বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে জিন্স্ (Jeans) ও জেফ্রিসের (Jeffreys) মতবাদই এখন সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

(১) **জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক কাণ্ট (Kant) ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাপলাসের (Laplace) মত**—নীহারিকা বাদ (Nebular hypothesis)—এই মতানুসারে আমাদের সৌরজগৎ নীহারিকাবস্থায় বহুদূর বিস্তৃত ছিল। এই নীহারিকা ছিল ভীষণ গরম জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। কোটি কোটি বৎসর আকাশে ঘুরিবার কালে এই পিণ্ডের বহির্ভাগ ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। ঠাণ্ডা হইবার কারণে আকারও ছোট হইল এবং ইহাতে বেগও বাড়িয়া গেল। ঠাণ্ডা হওয়াতে পিণ্ডের বিষুবরেখার নিকট অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্থানে একটি বলয়ের সৃষ্টি হইল। ভিতরে পিণ্ডটির গতি

বেশী হওয়ায় সে বলয় হইতে পৃথক্ হইয়া গেল। বলয়টি ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে চেপ্টা হইয়া গ্রহে পরিণত হইল। এইরূপে ৯টি গ্রহের সৃষ্টির পর, পিণ্ডের যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাই এখনকার সূর্য্য।

(১) **বৈজ্ঞানিক জিনস্ (Jeans) ও জেফ্রিসের মত** (জোয়ার বাদ)—একটি বিরাট তারকা বহুকাল পূর্ব্বে সূর্য্যের খুব নিকট দিয়া যাইতেছিল। দূর হইতে নিকটে আসিবার সময় সূর্য্যের উপর ইহার মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাব দেখা গেল। চন্দ্রের আকর্ষণ প্রভাবে যেমন সমুদ্রে জোয়ার আসিয়া উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, সেইরূপ এই তারকাটির আকর্ষণ প্রভাবে সূর্য্যের জ্বলন্ত বাষ্পীয় গোলকের উপর এক জ্বলন্ত বাষ্পের পিণ্ড ঠেলিয়া বাহির হইল। তারকাটি যতই নিকটে আসিতে লাগিল, পিণ্ডটি ততই সূর্য্য হইতে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে তারকাটি সূর্য্যের এমন নিকটে আসিয়া পড়িল যে, তাহার আকর্ষণের প্রভাব পিণ্ডটির উপর সূর্য্যাপেক্ষা বেশী পড়ায় ইহা সূর্য্য হইতে বাঁকা শশার আকারে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পিণ্ডটি তারকার উপর পড়িবার পূর্ব্বে তারকাটি যেদিক হইতে আসিতেছিল, তাহার বিপরীত দিকে সূর্য্য হইতে দূরে গিয়া পড়িল। সে কারণ সূর্য্য হইতে আর বেশী বাষ্প বাহির হইল না।

এই প্রকাণ্ড বাষ্পপিণ্ডটি সূর্য্য হইতে পৃথক্ হইয়া অন্তরীক্ষে তাপ ছড়াইতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমশঃ শশাকার পিণ্ডটি ভাঙ্গিয়া কয়েকটি তরল গোলকে পরিণত হইল। সূর্য্য ও আগন্তুক তারকার আকর্ষণ-শক্তির মাঝে পড়িয়া সেই তরল গোলকগুলি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই তরল গোলকগুলি এক একটি গ্রহ, এবং পৃথিবী এই গোলকগুলির মধ্যে একটি।

পৃথিবীর বায়বীয় হইতে তরলাবস্থা প্রাপ্তি— পৃথিবীর উৎপত্তির সময় উহা জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল। সে সময় উহাতে

জলীয় বাষ্প, লৌহ, নিকেল, প্রভৃতি ধাতুর গ্যাস, লবণ জাতীয় পদার্থের গ্যাস এবং আরও নানাপ্রকার গ্যাস ছিল। হাল্কা গ্যাস উপরে ও ভারী গ্যাস নীচের দিকে থাকে। উৎপত্তির সময় পৃথিবীর বাহিরের দিকে হাল্কা গ্যাস ও তারপর লবণজাতীয় পদার্থের গ্যাস এবং একেবারে ভিতরের দিকে ভারী লৌহ জাতীয় পদার্থের গ্যাস ছিল। উত্তপ্ত বাষ্প-পিণ্ডাকার পৃথিবী অন্তরীক্ষে তাপ বিকিরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ শীতল হইতে লাগিল। গ্যাস শীতল হইলে তরল পদার্থে পরিণত হয়। তবে সকল গ্যাস একই রকম শীতলতায় তরল হয় না। জলীয় বাষ্প ১০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে জলে পরিণত হয় এবং লৌহের গ্যাস ২৫০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে তরল লৌহে পরিণত হয়। আরও শীতল করিলে এই তরল জল বা তরল লৌহ কঠিন বরফ বা কঠিন লৌহে পরিণত হয়। জল ০° সেণ্টিগ্রেডে বরফ ও তরল লৌহ ১৫০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে কঠিন লৌহে পরিণত হয়।

পৃথিবী যখন শীতল হইতে লাগিল, তখন হাল্কা গ্যাস প্রথমে তরল হইল না, কিন্তু লবণ ও ধাতব পদার্থের গ্যাস তরল হইল।

বিভিন্ন তরল পদার্থকে একই পাত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখিলে উহারা **আপেক্ষিক গুরুত্ব** (specific gravity) অনুসারে স্থান পরিবর্ত্তন করে। লৌহ প্রভৃতি ভারী ধাতুর অণু পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে একত্রিত হইতে থাকে ও সিলিকন প্রভৃতি হাল্কা পদার্থের অণুগুলি উপরে ভাসিয়া উঠে। তাপ বিকিরণের ফলে একটির পর একটি খনিজ পদার্থ দানা বাঁধিয়া তরল পদার্থ হইতে পৃথক্ হইতে থাকে। এই দানাগুলির গুরুত্ব অধিকতর বলিয়া ইহারা উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিমজ্জিত হইতে থাকে, ও আভ্যন্তরিক উষ্ণতার জন্য পুনরায় সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে দ্রবীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ায় আভ্যন্তরিক তাপ কিয়ৎপরিমাণে নিঃশেষিত হয়। এইরূপে একটির পর একটি পদার্থ বা স্তর উপরিভাগে সৃষ্ট হইয়া নীচে নামিয়া আসে

ও তথাকার তাপ হ্রাস করে। আবার অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ তরল পদার্থ পরিচালনের ফলে উপরে উঠে ও তথায় শীতল হইয়া যায়। উপরোক্ত প্রক্রিয়া বহুবার সংসাধিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপের প্রকোপ হ্রাস পাওয়ায় নিমজ্জিত পদার্থগুলি পুনরায় দ্রবীভূত হইতে পারে না এবং উপরিস্থ সমস্ত তরল পদার্থ কঠিন হইয়া আসিয়া মিলিত হয়। এইরূপে কঠিন ভূত্বকের (crust of the earth) উৎপত্তি হইয়াছে।

পৃথিবীর তরল হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্তি—পৃথিবী আরও শীতল হওয়ায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস যুক্ত হইয়া প্রথম জলীয় বাষ্প ও ক্রমে তরল জল সৃষ্টি হইল। ফলে ভূপৃষ্ঠে যত গর্ত্ত ছিল তাহা জলে ভরিয়া গিয়া সাগরের সৃষ্টি করিল; উচ্চ স্থানগুলি হইল স্থল। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস ভূপৃষ্ঠের চারিদিকে বায়ুমণ্ডলরূপে রহিয়া গেল। এইরূপে পৃথিবীর বাহিরে বায়ুমণ্ডল এবং পৃথিবীতে স্থল ও জলের সৃষ্টি হইল।

সমুদ্রের জল লবণাক্ত হওয়ার কারণ—জলীয় বাষ্প জলাকারে পরিণত হইবার সময় বাষ্পে যে সমস্ত লবণজাতীয় দ্রবণীয় পদার্থ ছিল তাহা জলে দ্রব হওয়ায় সমুদ্রের জল প্রথম হইতেই লবণাক্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জল সূর্য্যতাপে বাষ্পাকারে উঠিয়া মেঘে পরিণত হয় এবং মেঘ হইতে বৃষ্টির আকারে আবার পতিত হয়। স্থলের উপর বৃষ্টি পড়িলে উহা নদী নালা ইত্যাদি বহিয়া পুনরায় সমুদ্রে আসিয়া মিশে। আসিবার সময় কিছু লবণ পদার্থ উহাতে দ্রব হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়ে। এই কারণে সমুদ্রের জলের লবণভাগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে।

পৃথিবীর বয়স—বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন পৃথিবীর বয়স ২০০ হইতে ৩০০ কোটি বৎসর। এই অনুমান সাপক্ষে তাহারা বলেন ঃ—

(১) সৌরজগৎ ছায়াপথে জন্মলাভ করিয়া ক্রমশঃ দূরে যাইতেছে।

যে গতিতে সৌরজগৎ চলিতেছে তাহাতে ছায়াপথ হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে ২০০ হইতে ৩০০ কোটি বৎসর লাগিয়াছে। অতএব পৃথিবীর বয়সও ঐরূপ।

(২) পৃথিবী যখন তরল অবস্থায় ছিল সেই সময় পৃথিবী হইতে চন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। চন্দ্র ক্রমেই পৃথিবী হইতে দূরে সরিতেছে। আজ পর্য্যন্ত চন্দ্র যতটা গিয়াছে তাহাতে কত সময় লাগিয়াছে হিসাব করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর তরলাবস্থা ২০০ হইতে ৩০০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে ছিল।

(৩) পৃথিবীর শিলাবরণের কতকগুলি উপাদান যেমন ইউরেনিয়ম, রেডিয়ম, থোরিয়ম, প্রভৃতি আপনা আপনি এক হইতে অন্য পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় ও নূতন পদার্থ হিলিয়ম, সীসা প্রভৃতির সৃষ্টি করে। স্থানভেদে এইরূপ কয়েকটি উপাদান পরীক্ষা করিয়া তাহাদের কতখানি পরিবর্ত্তন এবং কতটা নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল অন্ততঃ ৩০০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে। এখন এই উপাদানগুলি পৃথিবী হওয়ার পর হইতে পারে, অথবা পৃথিবী যখন সূর্য্যের মধ্যে বাষ্পাকারে ছিল তখনও হইতে পারে। তাহা হইলে পৃথিবীর বয়স ন্যূনাধিক ৩০০ কোটি বৎসর হইবে।

পৃথিবীর আকার—পৃথিবীর আকার সর্ব্বতোভাবে গোল নহে, কমলালেবুর ন্যায় দুই পাশে ঈষৎ চাপা। এই সম্পর্কে তিনটি প্রমাণ সাধারণতঃ দেওয়া হইয়া থাকে। (১) সমুদ্রতীর হইতে কোন জাহাজ কূলে আসিবার সময় লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমে জাহাজের মাস্তুল অনেক দূর হইতে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পরে জাহাজ যখন নিকটে আসে, তখন ক্রমেই উহার নীচের অংশ, এবং সর্ব্বশেষে জাহাজের খোল দেখা যায়। পৃথিবী বর্ত্তুলাকৃতি না হইলে উহা সম্ভব হইত না। (২) কোন কোন নাবিক ক্রমাগত পূর্ব্ব বা পশ্চিমদিকে অর্ণবপোতে

যাত্রা করিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। (৩) চন্দ্রগ্রহণকালে যখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে তখন ঐ ছায়া সর্ব্বদাই গোলাকার দেখায়। পৃথিবীর বর্ত্তুলাকৃতির ইহা একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল, এবং পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল।

Questions

1. What are your ideas about the way that the earth was born? What might be roughly its age? (C. U. 1943)
2. Give your ideas as to how the earth was formed. (C. U. 1945)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূত্বক্ ও ভূগর্ভ

(The Earth's crust and the Earth's interior)

ভূত্বক্—আগ্নেয় ও পালল শিলা

শিলা—ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নৈসর্গিক উপায়ে উৎপন্ন **খনিজ দ্রব্যের** (mineral) সমষ্টিমাত্রকেই **শিলা** (rock) নামে অভিহিত করেন; তা উহারা কঠিনই হউক, কোমলই হউক, ঘনই হউক বা আলগাই হউক। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বালি, মাটি, কাদা ইত্যাদি সবই শিলা।

শিলাসমূহের শ্রেণীবিভাগ—শিলাসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—**আগ্নেয়** (igneous), **পালল** (sedimentary) [ও ইহার অন্তর্ভুক্ত জৈব (organically derived) এবং **পরিবর্ত্তিত** (metamorphic)]।

১। আগ্নেয় শিলা (Igneous rock or primary rock)—পৃথিবীর তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্তিকালে যে সকল তরল শিলা শীতল হইয়া কঠিন হইয়াছে, তাহাদিগকে আগ্নেয় শিলা কহে। আগ্নেয় শিলার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত **গ্রানাইট** (granite)। ইহা মূলতঃ তিনপ্রকার বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। ইহার মাংসের রঙের কিংবা লাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেলাসিত অংশ প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অংশে ইস্পাতের ছুরি দিয়া আঁচড় দিলে ইহাতে দাগ পড়ে। এই উপাদানটির নাম **ফেলস্পার** (felspar)। দ্বিতীয় উপাদান কাচের ন্যায় স্বচ্ছ এবং অত্যন্ত কঠিন। ছুরির ফলকের দ্বারা উহাতে আঁচড়ান যায় না; এই উপাদানটির নাম **কোয়ারট্‌জ** (quartz)। গ্রানাইটের তৃতীয় উপাদান রূপার পাতের ন্যায় উজ্জ্বল শুভ্র। এই উপাদানটি কখনও কখনও বা কৃষ্ণবর্ণেরও হইয়া থাকে। ছুরি দিয়া আঁচড়াইলে ইহাতে সহজেই দাগ পড়ে এবং ইহা পর্দায় পর্দায় খুলিয়া আসে। ইহা **অভ্র** (mica) ব্যতীত আর কিছুই নহে। গ্রানাইটের এই তিনটি উপাদান ওতঃপ্রোত-ভাবে মিশ্রিত থাকে। **বেসল্ট** (basalt) আগ্নেয়শিলার আর একটি উদাহরণ। এই বেসল্ট দিয়া বড় সহরের রাস্তা প্রস্তুত হয়। বোম্বাই প্রদেশে প্রায় সকল স্থানই এই শিলার দ্বারা গঠিত।

আগ্নেয় শিলায় জীবাশ্ম বা প্রস্তরীভূত জীবের দেহ (fossil) থাকে না এবং ইহা সাধারণতঃ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে না।

গলিত শিলা বা লাভা—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় গলিত শিলা বা লাভা বাহির হয়। লাভা শীতল হইলে কঠিন হইয়া যায়। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহার ভিতর স্থানে স্থানে পাউরুটির মত ফাঁপা। স্থানান্তরে আবার অপেক্ষাকৃত নিরেট এবং কেলাসিত অংশে পূর্ণ থাকে। লাভামাত্রই আগ্নেয় শিলার অন্তর্ভুক্ত।

টাফ নামক আগ্নেয় শিলা—অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে সমস্ত ধূলা, বালি, ভস্ম, পাথরের টুকরা ইত্যাদি নির্গত হয় সেগুলি অনেক সময় জমাট বাঁধিয়া টাফ (tuff) নামক আগ্নেয় শিলা উৎপন্ন করে।

সিল (Sill) ও **ডাইক** (Dyke)—ভূগর্ভস্থ গলিত পদার্থ কখন কখন ভূপৃষ্ঠে না পৌঁছিয়া ভূত্বকের মধ্যে রহিয়া যায়। এই সকল পদার্থ ভূত্বকের স্তরের মধ্যে চক্রবালের (horizontal) সহিত মোটামুটি সমান্তরালভাবে জমা হইয়া কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে অথবা খাড়াভাবে ভূত্বকের ফাটলের মধ্যে জমা হইতে পারে। স্তরের মধ্যে যাহা জমা হয় তাহাকে সিল ও খাড়াভাবে যাহা জমা হয় তাহাকে ডাইক কহে।

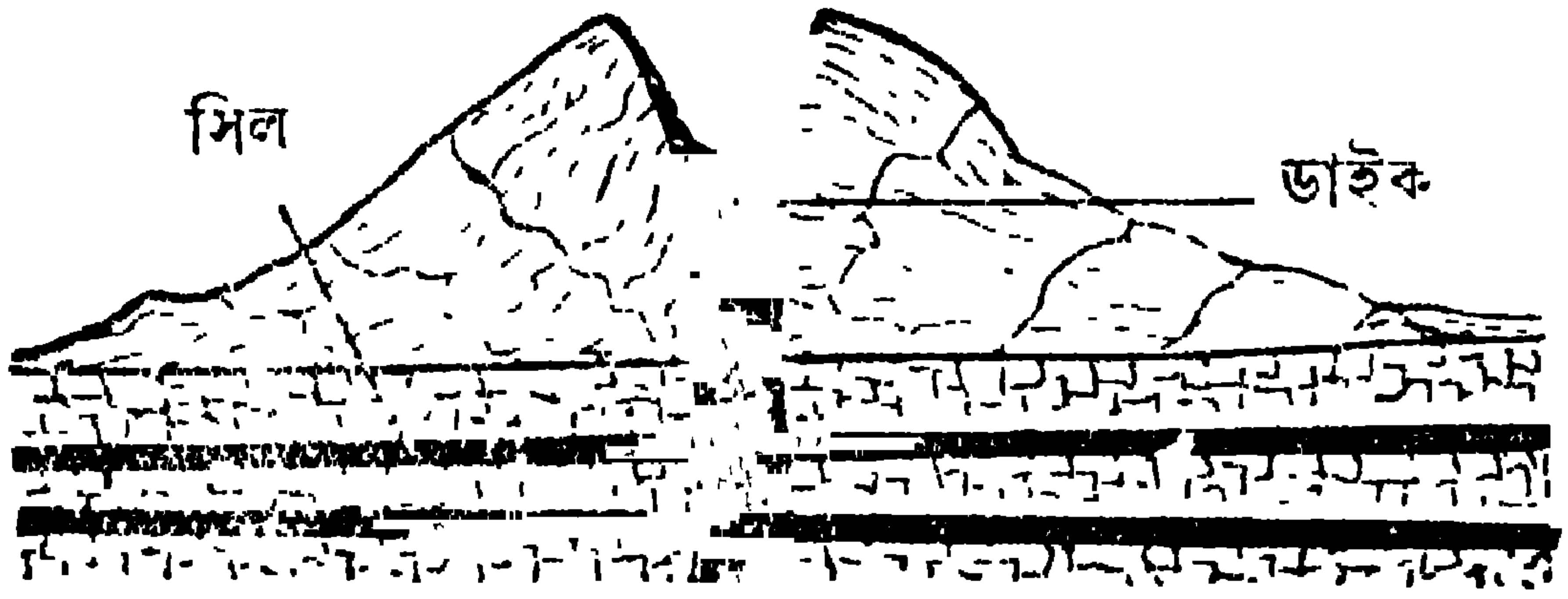

৯০। সিল ও ডাইক

২। **পালল শিলা** (Sedimentary rock)—সূর্য্যের তাপ পাইলেই শিলা উত্তপ্ত হইয়া আয়তনে বৃদ্ধি পায়। রাত্রে ঠাণ্ডায় আবার সঙ্কুচিত হয়। ক্রমাগত বৃদ্ধি ও সঙ্কোচনের ফলে শিলায় ফাট ধরে। বৃষ্টি হইলে সেই জলে, বাতাসে যে কিঞ্চিৎপরিমাণ কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকে তাহা দ্রব হয়। সেই জল শিলার ফাটলে প্রবেশ করিয়া উহার কতকগুলি উপাদানকে দ্রবীভূত করে। ইহা ছাড়া আরও নানা কারণে শিলার ফাট বড় হয়, যেমন বৃষ্টির জল বরফ হইয়া ফাটলের আয়তন বৃদ্ধি করাতে বা গাছের শিকড় ফাটলে চাড় দেওয়াতে। এইরূপে শিলার নিকটে ছোট শিলা ও উহার গুঁড়া ফাটলের আশেপাশে জমা হইতে থাকে।

পৃথিবীর জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত শিলাখণ্ড ও শিলাধূলির সাগর সঞ্চিত হইয়া পালল শিলার স্তর সৃষ্টি করিতেছে। এই **পলি** হইতেই পালল শিলার নামকরণ হইয়াছে। পালল শিলার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত **বেলে পাথর** (sandstone)। আমরা যে শিল নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা এই বেলে পাথরের। ইহার মূল উপাদান বালি। একটু অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে বালুকণাগুলি স্তরে স্তরে সমান্তরালভাবে সজ্জিত। বেলে পাথর কাটিবার সময় দেখা যায় যে উহার একটা নির্দ্দিষ্ট দিক আছে, যে দিক হইতে কাটিলে উহা পর্দ্দায় পর্দ্দায় খুলিয়া আসে।

যে সকল জীব এই সকল সঞ্চিত শিলাঞ্চলে বাস করে তাহাদের মৃতদেহ এই সকল সঞ্চিত পলির উপর পড়িয়া কালক্রমে পলি চাপা পড়ে। ফলে উহাদের দেহের কঠিনাংশ প্রস্তরীভূত হইয়া জীবাশ্মে পরিণত হয়। জীবাশ্ম থাকাই পালল শিলার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কাদা জমিয়া যে পালল শিলা গঠিত হয় তাহাকে **কর্দ্দম-প্রস্তর** এবং নুড়ি জমিয়া যে পাথর হয় তাহাকে **কনগ্লোমারেট** (conglomerate) কহে। অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর দেহের আবরণ (খোলস) ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট দ্বারা গঠিত। এইগুলি জমিয়া একপ্রকার পালল শিলার সৃষ্টি হয়; ইহাই **চুনা-পাথর** (lime stone)। **খড়িমাটি** (chalk), **পাথুরিয়া কয়লা, সৈন্ধব লবণ** প্রভৃতিও পালল শিলার অন্তর্গত।

জীবাশ্ম পরীক্ষা দ্বারা কি বুঝিতে পারা যায়—নদীর জলে যে সমস্ত মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি জীব থাকে, সেগুলি সমুদ্রের জলের মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি হইতে অনেক ভিন্ন। কোন পাললশিলার মধ্যে যদি সামুদ্রিক গাছপালা ও জীবজন্তুর কঙ্কালের জীবাশ্ম পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই পালল শিলা সমুদ্রগর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল। তেমনি আবার নদী বা হ্রদের মাছ, শামুক,

কাঁকড়া, গাছপালা ইত্যাদির জীবাশ্ম থাকিলে বুঝিতে হইবে যে সেই পালল শিলা নদী বা হ্রদের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে।

হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর স্থানে স্থানে এমন পালল শিলা পাওয়া যায় যাহাতে সামুদ্রিক গাছপালা ও জীবজন্তুর জীবাশ্ম রহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, এক সময়ে সেই স্থান সমুদ্রগর্ভে ছিল।

অতীতে ভূপৃষ্ঠের সকল স্থান আগ্নেয়শিলার দ্বারা গঠিত ছিল। পরে ইহার উপর কতকগুলি পালল শিলার স্তর জমা হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে ইহার উপর পুনরায় আগ্নেয়শিলার স্তর জমা হইয়াছে অথবা আগ্নেয় ও পালল শিলা মিশিয়া গিয়াছে। কোন্‌টা পূর্ব্বে ও কোন্‌টা পরে হইয়াছে তাহা জানিতে হইলে জীবাশ্ম পরীক্ষা করিতে হইবে। বিভিন্ন যুগের পালল শিলার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর জীবাশ্ম থাকে। জীবাশ্মবিদ্ বিশেষজ্ঞদের মত এই যে একই জাতীয় জীবের অভ্যুদয় একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘটিয়াছিল। সুতরাং বহুদূরস্থিত দুই দেশের পালল শিলার মধ্যে যদি একই প্রকার জীবাশ্ম থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এই দুই স্তর একই যুগের।

জৈব শিলা (Organically derived rock)—জৈব শিলার উত্তম দৃষ্টান্ত চা-খড়ি বা খড়িমাটি। অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহা অসংখ্য জীবাণুর আবরণের (খোলার) সমষ্টি মাত্র। জীবাণুর ন্যায় উদ্ভিজ্জাণুর অবশিষ্ট হইতেও জৈব শিলা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩। পরিবর্ত্তিত শিলা (Metamorphic rock)—আগ্নেয় বা পালল দুই প্রকারের শিলা হইতেই তাপ বা চাপ ইত্যাদি ক্রিয়ার ফলে পরিবর্ত্তিত (metamorphic) শিলা উৎপন্ন হয়। যথা, চুনা পাথর হইতে মার্ব্বেল পাথর, কর্দ্দম পাথর হইতে শ্লেট পাথর, আবার শ্লেট পাথর রূপান্তরিত হইয়া **অভ্রশিষ্টের** (mica schist) সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন প্রকারের শিলার উৎপত্তি—যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের শিলা আমরা পৃথিবীর বাহ্যস্তরে দেখিতে পাই, সেগুলি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল তাহা বুঝিতে গেলে বর্ত্তমানে এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে কিনা তাহা আমাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়।

পাহাড়ের গায়ে সকল সময়েই ছোট বড় পাথরের টুকরা যেন ছড়ান থাকে। এই টুকরাগুলি যে এক সময় পাহাড়ের অংশ ছিল সে সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহ হয় না। বস্তুতঃ পাহাড় পর্ব্বতগুলি সর্ব্বদাই ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে যাইতেছে। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি বিভিন্নভাবে এই ধ্বংসলীলায় সাহায্য করিয়া থাকে। পাহাড়ের তলদেশে ছোট বড় নদী বা নালা সব সময়েই দেখা যায়। পাথরের টুকরাগুলি তাহার মধ্যে পতিত হইলে জলস্রোতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অচিরাৎ বালুকাকণা বা মৃত্তিকাকণায় পরিণত হয়। যেমন জলবিন্দুমাত্রেরই শেষ গম্যস্থান সমুদ্র, তেমনি বালুকাকণা বা মৃত্তিকাকণা শেষ পর্য্যন্ত সমুদ্রে আসিয়া পড়ে; তবে সেটা অল্প সময়েই হউক বা হাজার হাজার বৎসরেই হউক।

ব-দ্বীপ—বর্ষার সময় নদীর জল ঘোলা হইয়া যায়। ইহাকে "ঢল" নামা বলে। ঢলে বাংলার অংশবিশেষ প্লাবিত হইয়া যায়। বর্ষান্তে জল নামিয়া গেলে যেখানে জল দাড়াইয়াছিল সেখানে পলি পড়ে। নদীর স্রোত কোন স্থানে কোন কারণে বাধা পাইলেই সেখানে এই প্রকার পলি পড়িয়া চর উৎপন্ন হয়। নদী যেখানে সমুদ্রে পড়ে সেখানেও নদীর স্রোতবেগ হঠাৎ কমিবার দরুণ একপ্রকার ত্রিকোণ চর পড়ে। ইহাকে **ব-দ্বীপ** (delta) বলে। বাংলাদেশের অনেকাংশ এইরূপ ব-দ্বীপের উপর অবস্থিত, নদীতে যেমন কাদার বা বালির চর পড়ে, সমুদ্রগর্ভেও স্থানে স্থানে এইরূপ চরের সৃষ্টি হয়।

হিমসরিৎ ও তাহার ক্রিয়া (A glacier and its action)—মেরুপ্রদেশে এবং কোন কোন শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে তুষারপাতের ফলে বিস্তীর্ণ ও উচ্চ তুষার ক্ষেত্রসমূহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ক্রমে উপরের তুষারের চাপে নীচের তুষারের মধ্য হইতে অবরুদ্ধ বাতাস নির্গত হইয়া ইহা কঠিন বরফে পরিণত হয়। এদিকে অধিক চাপে বরফের গলনাঙ্ক কমিয়া যায় অর্থাৎ 0° সেন্টিগ্রেড বা তাহার কম উষ্ণতাতেও বরফ গলিয়া জল হইয়া যায়। ফলে এই সমস্ত তুষারক্ষেত্র হইতে **হিমসরিৎ** (glacier) সৃষ্টি হইয়া, যেদিকে ঢালু থাকে সেদিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় প্রস্তরচূর্ণ এবং উপলখণ্ড অথবা বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্য্যন্ত এইরূপে হিমসরিৎ কর্তৃক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। উষ্ণ স্থানে আসিলে হিমসরিৎ গলিয়া যায় এবং ইহার দ্বারা আনীত পদার্থসমূহ সেই স্থানেই ন্যস্ত হয়।

চরের সৃষ্টি—একটি বোতলের ভিতর বালি, মাটি, ছোট ছোট পাথরের কুচি ভরিয়া তাহার উপর জল ঢালিয়া ভাল করিয়া বোতলটি ঝাঁকাইয়া রাখিয়া দিলে দেখিবে যে, কিছুক্ষণ পরে বালি, মাটি ইত্যাদি থিতাইয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে পাথরের কুচি সব নীচে রহিয়াছে; তাহার উপরে বালির স্তর এবং সর্ব্বোপরি মাটির স্তর। নদীর স্রোতবেগ কোন কারণে হ্রাস হইলে প্রথমে অপেক্ষাকৃত ভারী শিলা ন্যস্ত হয়। পরে বালুকাকণা এবং স্রোতবেগ আরও কমিলে মৃত্তিকাকণা থিতাইয়া পড়ে। এইরূপে একটি চরের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভূত্বক্—পৃথিবীর স্থলভাগে নানাপ্রকার আগ্নেয় ও পালল শিলা ও তাহার উপর একটি মাটির আস্তরণ আছে। আগ্নেয় ও পালল শিলা প্রায় সমান স্থান অধিকার করিয়া আছে। গভীর খনি বা বৃহৎ নলকূপের ভিতরকার শিলা ও ভূমির উপরকার শিলার বিন্যাস ও উহার আকার

হইতে বুঝা যায় যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠের অল্প নীচেই আর মাটি বা পালল শিলা নাই। সেখানে কেবল আগ্নেয়শিলা ও তাহা প্রধানতঃ গ্রানাইট জাতীয়। সমুদ্রতলে ও সমুদ্রমধ্যে দ্বীপসকলের শিলাময় উপাদান পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐসকল স্থান ব্যাসল্ট জাতীয় শিলাদ্বারা গঠিত। আগ্নেয়গিরি যে লাভা উদ্গীরণ করে তাহাও প্রধানতঃ ব্যাসল্ট। মৃত আগ্নেয়গিরি হইতেও দেখা যায় যে তাহারা যে লাভা উদ্গীরণ করিয়াছে তাহাও ব্যাসল্ট জাতীয়। ইহা হইতে ধারণা করা হইয়াছে যে, অতীতের ও বর্ত্তমানের আগ্নেয়গিরি হইতে যে লাভা মহাদেশের উপর সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার গ্রানাইট শিলাময় স্তরের নীচে পৃথিবী-ব্যাপী এক ব্যাসল্ট স্তর আছে, ও

তাহা হইা

স্তরগুলি প্রধানতঃ গ্রানাইট শিলায় নির্ম্মিত। সেই গ্রানাইট শিলার নীচে ও সাগরের তলদেশ দিয়া সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এক স্তর আছে। গ্রানাইট স্তর ও ব্যাসল্ট স্তরের কিছু উপরাংশ কঠিন। এই ৪০ মাইল কঠিনাংশকে **ভূত্বক্** বলে। ভূত্বক্ শিলার দ্বারা গঠিত বলিয়া ইহার নাম **শিলামণ্ডল** (Lithosphere. Lithos = শিলা)।

আগ্নেয় ও পালল শিলার তুলনা :

আগ্নেয় শিলা	পালল শিলা
১। জীবাশ্ম থাকে না।	১। জীবাশ্ম থাকে।
২। সাধারণতঃ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে না।	২। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে।
৩। কেলাসিত।	৩। কেলাসিত নহে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের অবস্থা

ভূগর্ভ—ভূত্বকের নীচে কি আছে তাহারও আভাস পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের মতে পৃথিবীর সমান আয়তনের জলের ওজন অপেক্ষা পৃথিবীর

ওজন ৫½ গুণ। পৃথিবীর উপর যে গ্রানাইট পাওয়া যায় তাহা জলের ২·৭ গুণ ভারী। আবার ব্যাসল্ট জাতীয় শিলা জলের প্রায় ২·৮ গুণ ভারী। পৃথিবীর অন্তঃস্থলের উপাদান নিশ্চয় ৮।১০ গুণ ভারী। বৈজ্ঞানিকদের মতে উল্কা ও পৃথিবীর উপাদান মূলতঃ এক। উল্কা নিকেল বা লৌহ ও নিকেল এবং অন্য শিলার মিশ্রণে নির্মিত। তাহাতেই মনে হয় যে, পৃথিবীর অন্তঃস্থলে ব্যাসল্ট স্তরের বহু নীচে লৌহ ও নিকেল জাতীয় ধাতু আছে।

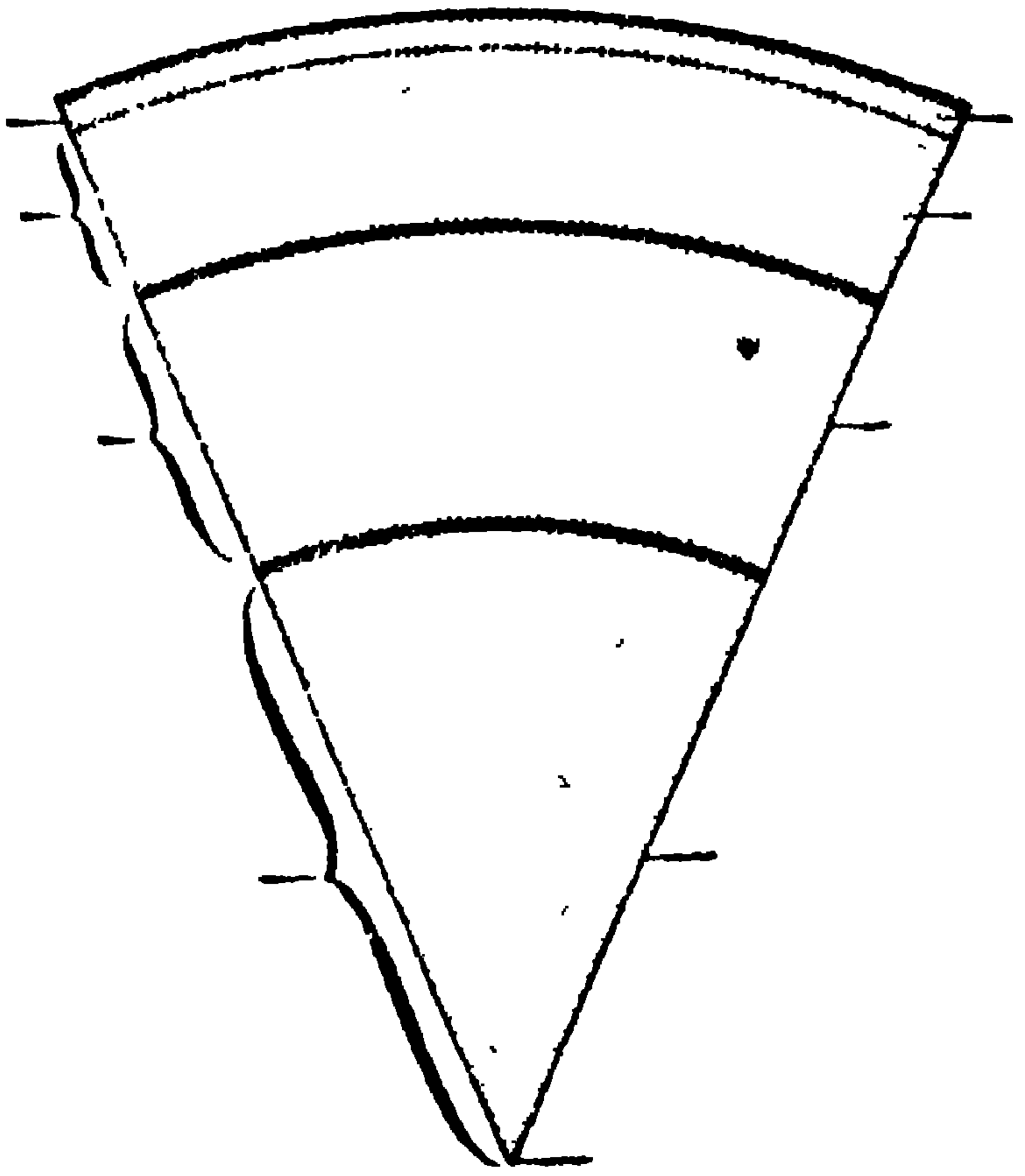

৯১। ভূত্বক্ ও ভূগর্ভ

ভূমিকম্পের কতকগুলি তরঙ্গ কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইতে পারে, আর কতকগুলি কেবল কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। এই দুই প্রকার তরঙ্গই কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়া যত দ্রুত প্রবাহিত হয়, অন্য পদার্থের মধ্য দিয়া তত দ্রুত প্রবাহিত হইতে পারে না। ভূমিকম্পের তরঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন ভূত্বক্ পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে ৪০ মাইল গভীর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহাকে **শিলামণ্ডল** (Lithosphere) কহে। মহাদেশগুলির নীচে এই ৪০ মাইলের প্রথম

২৫ মাইল লম্ব্ গ্রানাইট শিলায় গঠিত। বাকী ব্যাসল্ট শিলার স্তর এবং উহা কঠিন। তারপর ৭১০ মাইল পর্য্যন্ত একটি গুরুশিলাময় স্তর ও তাহার পর ১০৫০ মাইল পর্য্যন্ত একটি গুরু-শিলা ও লৌহ মিশ্রিত স্তর আছে। এই দুই স্তরকে **গুরুমণ্ডল** (Barysphere) কহে। ইহা অনেকটা 'পিচের' (pitch) মত। আঘাত করিলে কঠিন পদার্থের মত ব্যবহার করে। ইহার পর পৃথিবীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরও ২২০০ মাইল লৌহ, নিকেল ও অন্যান্য ধাতু দ্বারা গঠিত। বিশেষজ্ঞের মতে এই ধাতুমণ্ডল তরল, তবে সকল বিশেষজ্ঞ একমত নহেন। ইহাকে **কেন্দ্রমণ্ডল** (Centrosphere) কহে।

ভূগর্ভের তাপ ও চাপ (Temperature and pressure in the earth's interior)—কোন খনির ভিতর নামিলে অনুভব করিতে পারা যায় যে, যত নীচে যাওয়া যায় ততই ভিতরের উষ্ণতা বাড়িতে থাকে। বহু গভীর খনি ও নলকূপের ভিতর উষ্ণতা নির্ণয় করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উষ্ণতা গড়ে প্রতি ১০৮ ফুটে ১° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড বাড়ে। হিসাব করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত পৌছিলে তথাকার তাপ অত্যন্ত বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু যত নীচে যাওয়া যায় ততই তাপবৃদ্ধির হার কমিয়া আসে। তাহা হইলেও ২৫ মাইল নীচে প্রায় ৯৫০° সেণ্টিগ্রেড, ৪০ মাইল নীচে প্রায় ১২০০° ডিগ্রী এবং ৬০ মাইল নীচে ১৫০০° উষ্ণতা হইবে। সুতরাং নীচে তাপবৃদ্ধির হার ক্রমশঃ যতই কম হউক, পৃথিবীর কেন্দ্রের তাপ কল্পনাতীত! আবার পৃথিবীর যতই নীচে যাওয়া যায়, ততই ভিতরের শিলার উপর উপরের শিলার চাপ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুমণ্ডলের যে চাপ, ভূপৃষ্ঠের ৪০ মাইল নীচে শিলার উপরের চাপ তাহার প্রায় ১৭,০০০ গুণ বেশী। ইহা হইতে বুঝা যায় পৃথিবীর আরও ভিতরে চাপ কত বেশী।

পৃথিবীর ৬০।৭০ মাইল নীচে যে উষ্ণতা তাহাতে সেখানকার উপাদান

ব্যাসল্ট শিলা তরলাবস্থায় থাকার কথা, কিন্তু সেখানে চাপ এত অধিক যে উহাকে তরলাবস্থায় আনা কঠিন। এই কারণে বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পৃথিবীর ৬০।৭০ মাইল কেন তাহার আরও নীচে পৃথিবীর উপাদান এক অকঠিন অবস্থায় আছে এবং যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে ঐ পর্য্যন্ত খনন করিয়া চাপ অপসারণ করিয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে ঐ সকল উপাদান তরলাবস্থায় পৃথিবীপৃষ্ঠে ঠেলিয়া আসিত।

ভূত্বকের নীচে পৃথিবীর উপাদানের অবস্থা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কারণের জন্য অনুমান করা হয় যে, গ্রানাইট জাতীয় কঠিন শিলায় গঠিত মহাদেশগুলি নীচের অকঠিন ব্যাসল্টশিলার খানিকটা ভিতরে চাপিয়া বসিয়া আছে। ভূত্বকের গ্রানাইট অংশ ব্যাসল্ট আস্তরণের উপর এইরূপ অবস্থিত হইয়া মহাদেশ ও মহাসাগরের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের ফলে মহাদেশের অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রের জলে গিয়া পড়ায়, মহাদেশের উপরের অংশের ভার কমিয়া যাওয়ায় সেগুলি ঠেলিয়া উঠিয়াছে। পৃথিবী শীতল হওয়াতে সঙ্কোচন হইয়াছে ও তাহার ফলে ভূসংক্ষোভ ঘটিয়াছে। ইহাতে অকঠিন স্তরের শিলা আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণরূপে পৃথিবী-পৃষ্ঠে উঠিয়া পড়িয়াছে। এই সকল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন অনবরতই চলিতেছে ও ক্রমাগত ভূত্বকের পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে।

Questions

1. Explain the origin of the earth and the formation of its crust. (C. U. 1940)
2. Give an account of your ideas of the interior of the earth. (C. U. 1941)
3. What is the probable condition of the interior of the earth? (C. U. 1946)
4. What do you understand by igneous and sedimentary rocks? Give examples. (C. U. 1943)

তৃতীয় অধ্যায়

ভূচাঞ্চল্য

পৃথিবীর বহিঃস্থ আবরণের চাঞ্চল্য

(Movements in the earth's crust)

পৃথিবীর বাহ্য গঠন পরিবর্ত্তনের অধীন— পৃথিবীর উপরিভাগ সমতল নহে। কোথাও বা সু-উচ্চ পর্ব্বত, আবার কোথাও বা অতলস্পর্শী সমুদ্র। এই বাহ্য গঠন শাশ্বত নহে, দুই চারি বৎসরে কোন পরিবর্ত্তন দেখা না গেলেও হাজার হাজার বৎসরে ইহার আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন ঘটে। আজ যেখানে বিরাট পর্ব্বত, এক সময় সেখানে হয়ত মহাসমুদ্র ছিল, তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। কালে আবার তাহা সমুদ্রগর্ভে যাইবে কি না কে বলিতে পারে ?

প্রথমাবস্থায় পাললশিলার স্তরগুলি অবশ্য চক্রবালের সহিত সমান্তরাল থাকে। কিন্তু আমরা পৃথিবীর নানাস্থানে যে সমস্ত পালল শিলা দেখিতে পাই, তাহার স্তরগুলি অনেক সময় **কাৎ** (tilted), বা **ভাঁজ** (folded) অবস্থায়, এমন কি কখন কখন **খাড়া** (vertical) অবস্থায় থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পৃথিবীর বহিঃস্থ আবরণ স্থির নহে। বস্তুতঃ ইহাতে সকল সময়েই একটা মৃদু আন্দোলন (movement) রহিয়াছে।

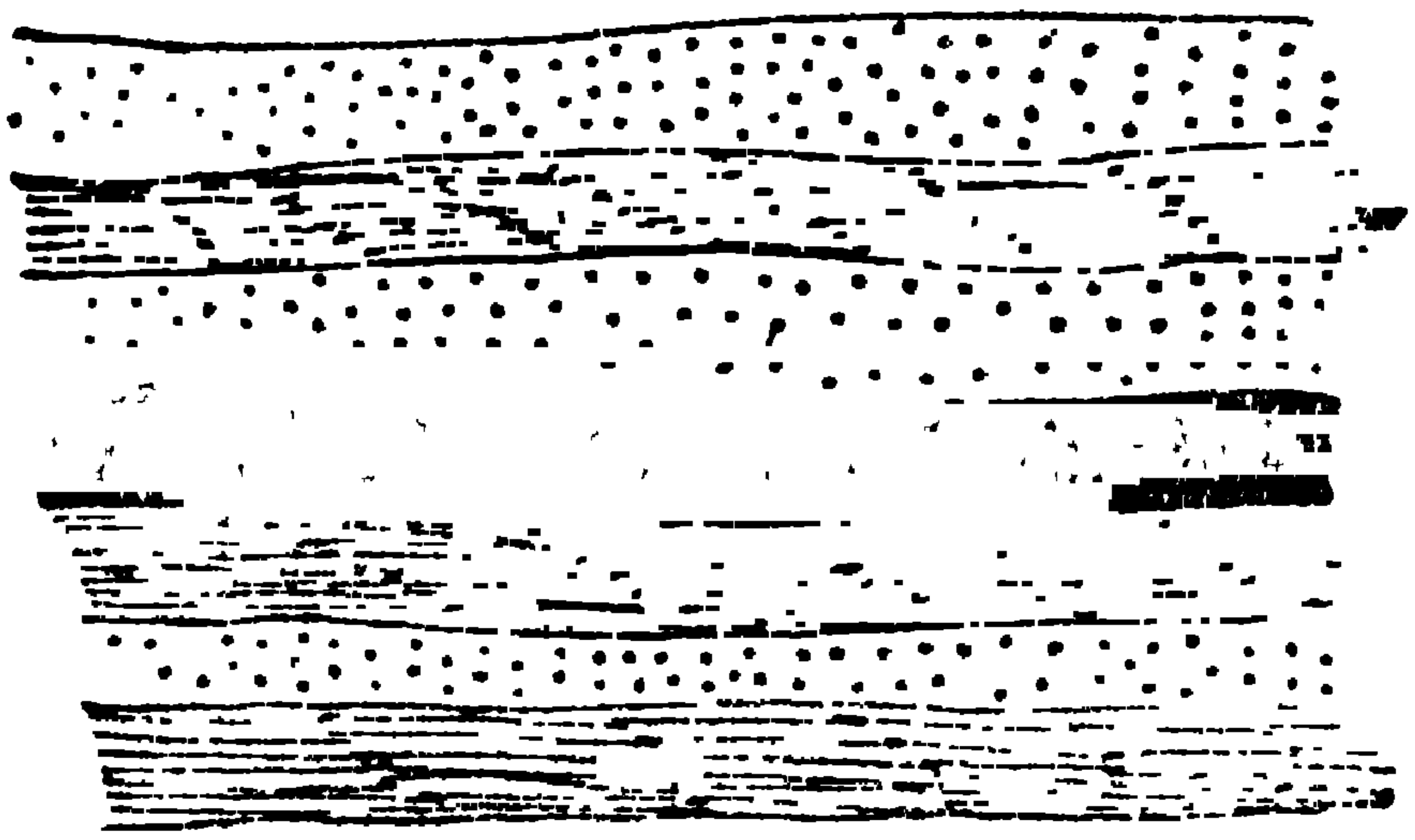

৯২। পালল শিলা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর বহির্ভাগ শীতল হইয়া গেলেও ইহার

অভ্যন্তরভাগ বিশেষ উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। অভ্যন্তরভাগের এই উত্তাপ নীচের দিকে ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর। বস্তুতঃ এই উত্তাপের ফলেই নিম্নস্থ ধাতব পদার্থগুলি অংশত গলিত অবস্থায় এবং অপরিমিত চাপের অধীন রহিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর যে অংশের সহিত আমরা পরিচিত তাহার অধিকাংশ পালল শিলা বা জীবাণু বা উদ্ভিজ্জাণু হইতে উৎপন্ন শিলা। অপেক্ষাকৃত কম অংশ আগ্নেয় শিলায় গঠিত। পালল শিলাগুলি জলে নিহিত হইবার সময় যদিও সমান্তরালভাবে স্তরে স্তরে নিহিত হইয়াছিল, তথাপি এখন আমরা

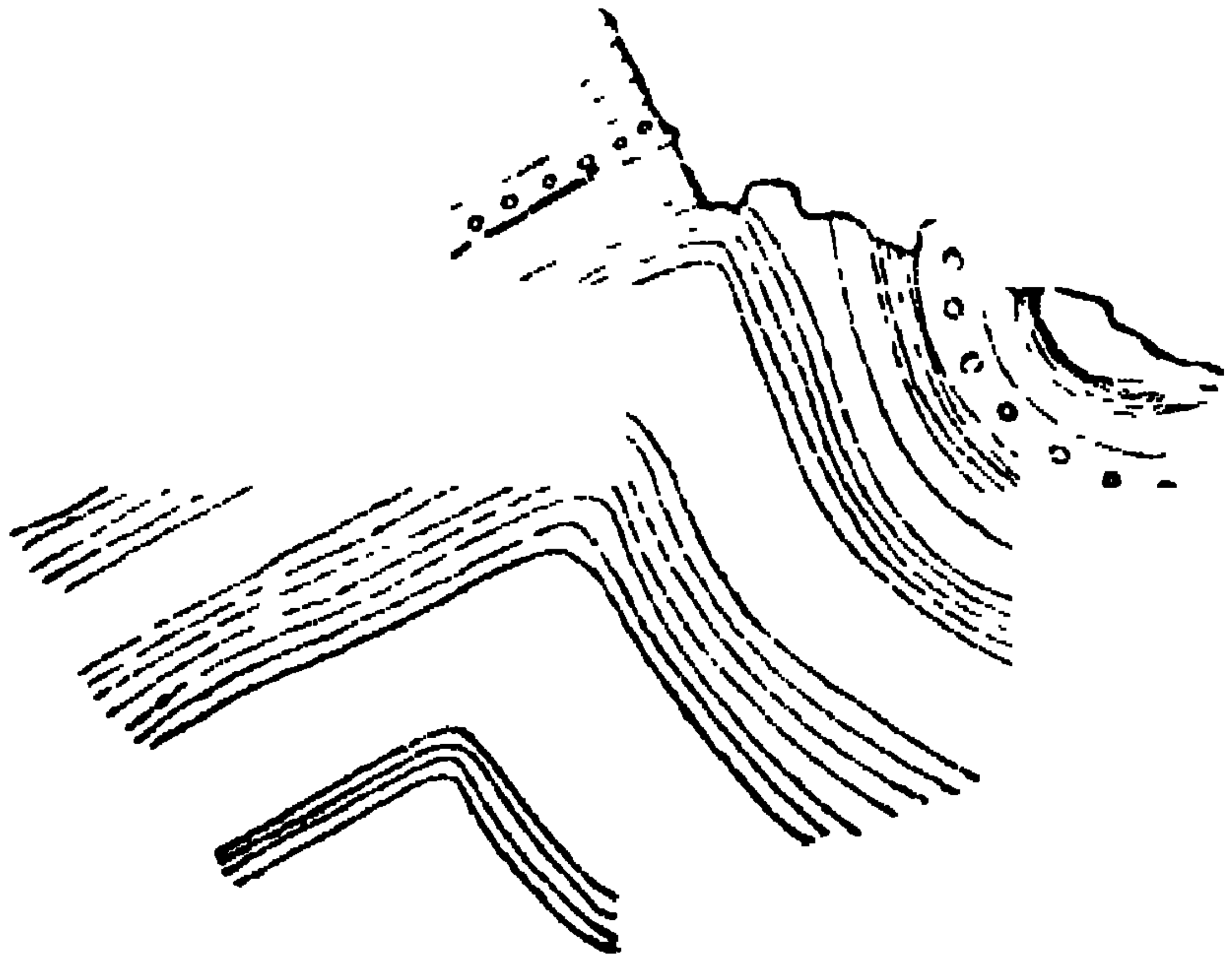

৯৩। কুব্জ ও ন্যুব্জ ভাঁজ

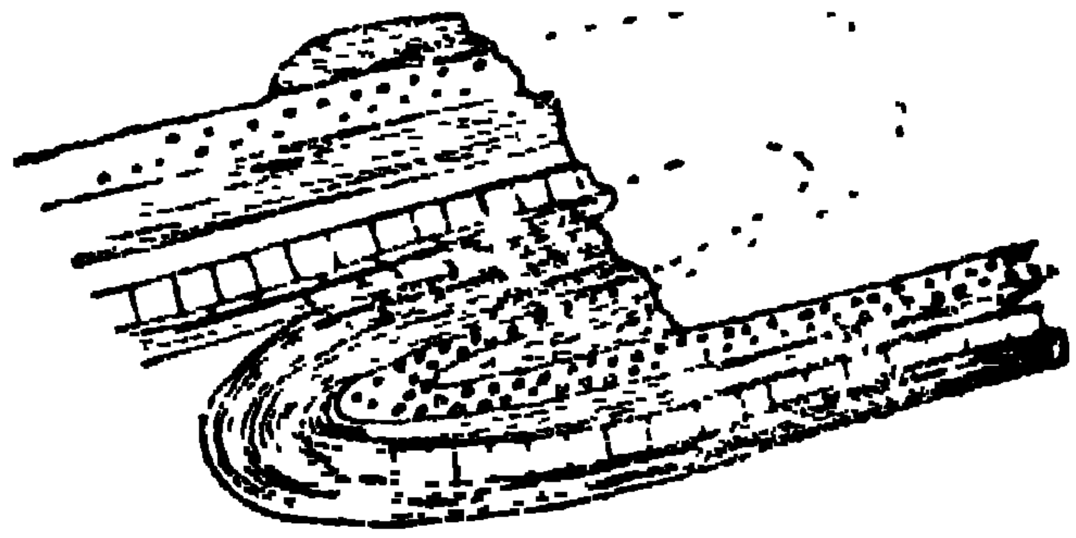

৯৪। হেলান (recumbent) ভাঁজ

দেখিতে পাই যে, এগুলি সর্ব্বত্র সমান্তরালভাবে নাই। খিলানের আকারে গঠিত হইয়া কোন স্থানে উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠে সংলগ্ন অথবা তাহার নিকটস্থ হইয়াছে। আবার সেই স্তরটি কোন কোন স্থানে নিম্নগামী হইয়া একটা বিরাট বাটির আকার ধারণ করিয়াছে; স্থানবিশেষে আবার ভাঁজ (fold) হইয়া গিয়াছে। উপরে দুইটি বিশেষ ভাঁজের ছবি রহিয়াছে। ইহা হইতে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

কয়েকটি ছিটের থান একটির উপর আর একটি সাজাইয়া দুই ধার

হইতে চাপ দিলে থানগুলির যে অবস্থা হয়, পালল শিলার স্তরগুলি অনেক সময় সেই অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাঁজের উৎপত্তি (Formation of folds)—পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত উষ্ণ। ইহা যতই শীতল হইতেছে, ততই সঙ্কুচিত হইতেছে; এবং সেই সঙ্গে ইহার সংলগ্ন স্তর পূর্ব্বে যে চাপের অধীন ছিল, তাহারও অনেক তারতম্য ঘটিতেছে। ফলে কখনও কখনও এই স্তর কুঞ্চিত হইয়া ভাজ উৎপাদন করে। উত্তল বা কুব্জ-পৃষ্ঠ ভাজকে **কুব্জ ভাঁজ** (anticline or up fold) বলে; আর অবতল বা নিম্নপৃষ্ঠ ভাঁজকে **ন্যুব্জ ভাঁজ** (syncline or down fold) বলে।

স্তরচ্যুতি (fault)—স্তর ফাটিয়া অংশতঃ বসিয়া গেলে **স্তরচ্যুতি** (fault) উৎপাদন করে। ভূত্বকের উপর নানাস্থানে **ফাটল** (fissure)

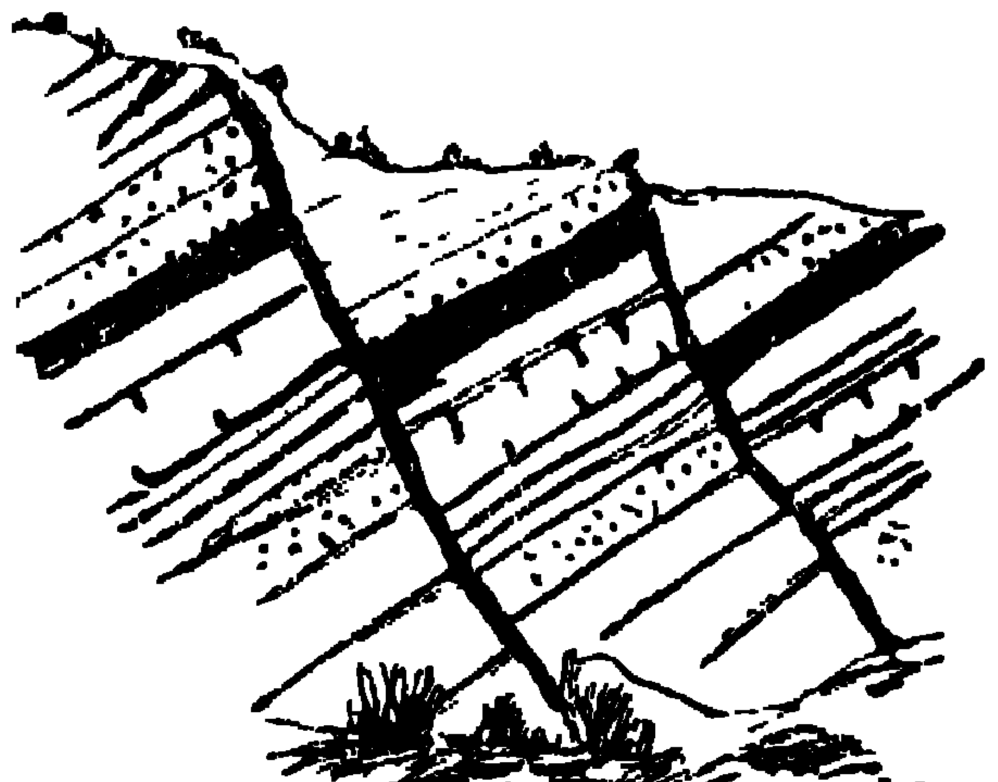

৯ । স্বাভাবিক স্তরচ্যুতি

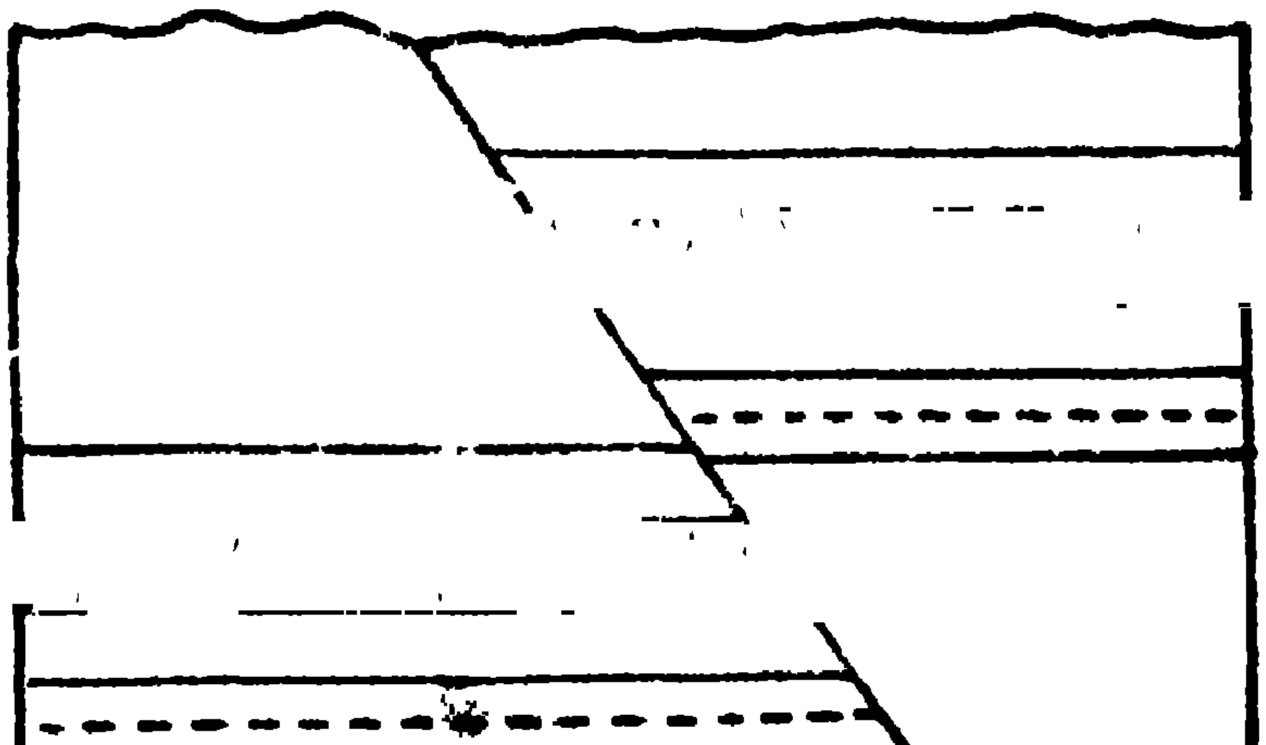

৯৬। বিপরীত চ্যুতি

দেখিতে পাওয়া যায়। ফাটল চারি প্রকারে উৎপন্ন হয়। (১) পালল শিলা সমুদ্রগর্ভ হইতে উপরে উঠিলে উহাতে অনেক জল থাকে। সূর্য্য-তাপে এই জল বাষ্পে পরিণত হয় এবং উহার ফলে, (২) আগ্নেয় শিলা ঠাণ্ডা হইবার কালে ও (৩) ভাঁজ হইবার সময় অত্যধিক চাপের ফলে, এবং (৪) ভূমিকম্পের সময়, ফাটল উৎপন্ন হয়। ফাটল জন্মিবার পর

কখন কখন একদিকের স্তর অপরদিকের স্তরের নীচে বা উপরে সরিয়া যায়। নীচে সরিলে, তাহাকে **স্বাভাবিক চ্যুতি** (Normal fault), ও উপরদিকে গেলে **বিপরীত চ্যুতি** (Reverse fault) বলে।

কোন স্তরের দুইপার্শে স্বাভাবিক চ্যুতি হইলে তাহাকে **হর্ষ্ট** (horst), উভয় পার্শ্বে বিপরীত চ্যুতি হইলে **ট্রাফ** (trough), **চ্যুতি** কহে।

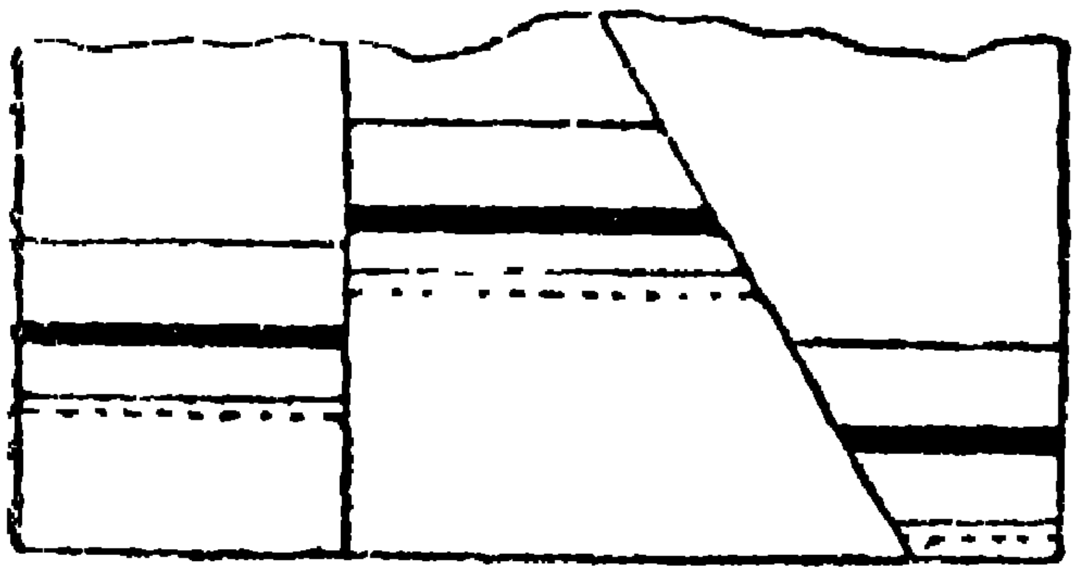

৯৭। হর্ষ্ট চ্যুতি (Horst fault)

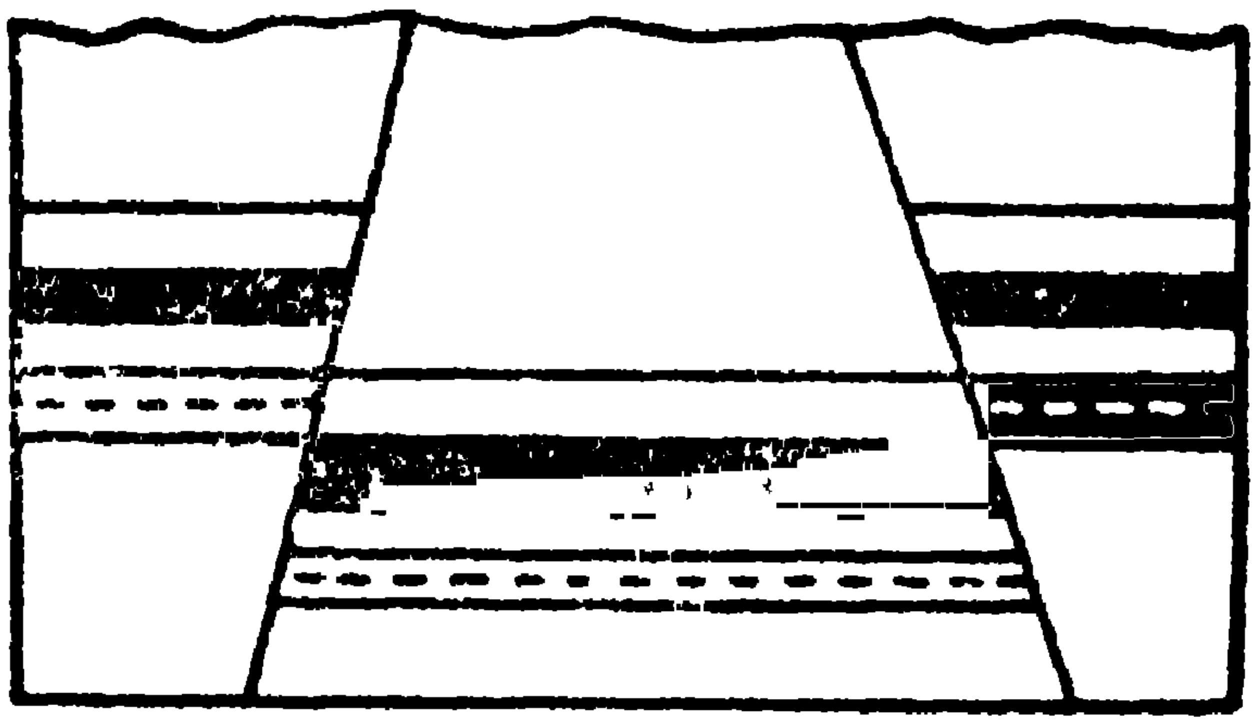

। ট্রাফ চ্যুতি

যাহারা কখনও কয়লার খাদে নামিয়াছে তাহারা দেখিয়াছে যে, অনেক সময়ে যে স্তরে কয়লা থাকে তাহা কিছুদূর গিয়া হঠাৎ থামিয়া যায় ; পরে কিছু উচ্চে বা নিম্নে সেই স্তরটি পুনরায় পাওয়া যায়। খনির স্থানবিশেষ কোন কারণে বসিয়া যাওয়ার ফলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

ভূমিপাত (landslide)—পাহাড় পর্ব্বত বা কোন মালভূমির একটি বৃহদায়তন অংশ ধ্বসিয়া পড়িলে তাহাকে ভূমিপাত কহে। নানা কারণে ভূমিপাত ঘটিয়া থাকে। যদি কোন পাহাড় শিলাস্তরে গঠিত হয় এবং পাহাড় ও শিলাস্তরের ঢাল (slope) একই দিকে থাকে তবে মহাকর্ষের আকর্ষণে অনেক সময়ে সেই ঢালের দিকে শিলাস্তর গড়াইয়া পড়ে। স্তরের ফাটলে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিলে সেগুলিকে আরও শিথিল করিয়া দেয়। এই কারণে বর্ষাকালেই অনেক সময় ভূমিপাত হয়।

আগ্নেয়গিরি (volcano)—পৃথিবীতে এমন অনেক পাহাড় পর্ব্বত আছে, যাহা হইতে কখনও কখনও নানাপ্রকার গলিত প্রস্তর বা লাভাপ্রবাহ, গরম জল, বাষ্প ইত্যাদি নির্গত হয়। ইহাদিগকে আগ্নেয়গিরি বলে।

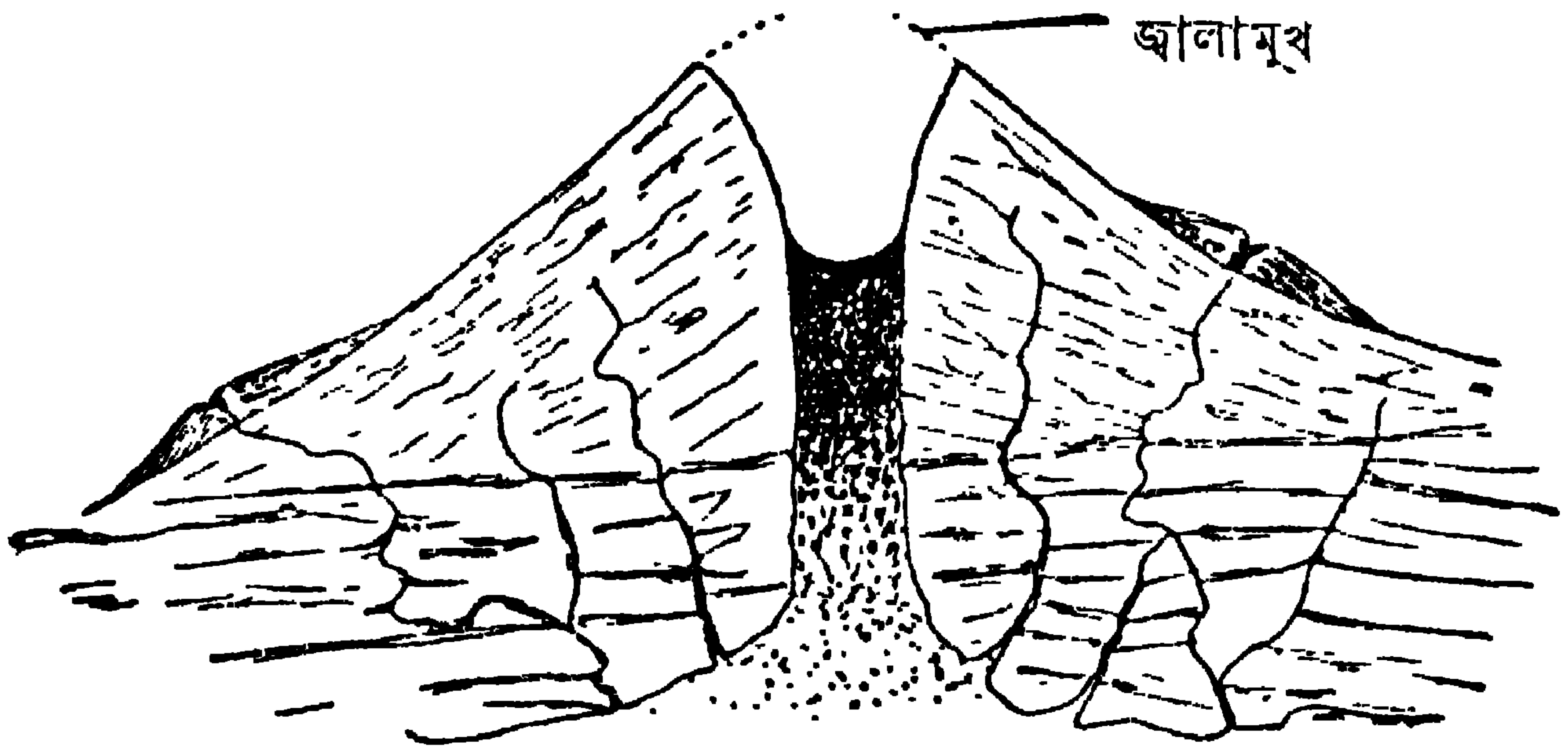

৯৯। আগ্নেয়গিরির নিশ্চল অবস্থার অনুদীর্ঘচ্ছেদ

পাহাড়ের যে মুখ দিয়া এই **অগ্ন্যুৎপাত** (volcanic eruption) হয়, তাহাকে **জ্বালামুখ** (crater) বলে। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে যে গলিত ধাতু ইত্যাদি রহিয়াছে, অগ্ন্যুৎপাতের সময় জ্বালামুখ দিয়া তাহাই বাহির হইয়া আসে। সৃষ্টির আদিতে প্রায় সকল পর্ব্বতই এইরূপ আগ্নেয়গিরি ছিল বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা। কালক্রমে অনেক পর্ব্বত অগ্ন্যুৎপাতের ক্ষমতা হারাইয়াছে। কিন্তু দুই চারি সহস্র বৎসর অগ্ন্যুৎপাত না হইলেই যে আগ্নেয়গিরিটি নির্ব্বাপিত হইয়াছে ইহা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন না। কারণ পুনরায় যে কোন মুহূর্ত্তে নিষ্ক্রিয় গিরি সক্রিয় হইয়া বিপদ ঘটাইতে পারে।

আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি—অত্যধিক উত্তাপে ভূগর্ভস্থ বাষ্পের চাপের পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অবশেষে এই চাপের

পরিমাণ এতই বেশী হয় যে, উহার ফলে গলিত পদার্থসমূহ জ্বালামুখ দিয়া সবেগে নির্গত হইতে থাকে। আগ্নেয়গিরির প্রধান উদ্গীর্ণ দ্রব্য লাভা।

ইহাদিগকে দুইভাগে ভাগ করা হয়,—(১) যাহারা কেবল লাভা উদ্গীরণ করে তাহাদিগকে **শান্ত** আগ্নেয়গিরি বলে; যেমন হাউয়াই (Hawaii) দ্বীপের মউনা লোয়া ও কিলাউয়া।

(২) আর যে সমস্ত আগ্নেয়গিরি হইতে গ্যাস ও জলীয় বাষ্প দুরন্ত বেগে বাহির হয়, তাহাদের **বিস্ফোরক** আগ্নেয়গিরি বলে; যেমন, সুণ্ডা দ্বীপের ক্রাকাটোয়া (Krakatoa) আগ্নেয়গিরি।

বেশীর ভাগ আগ্নেয়গিরি এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি। তাহারা প্রথম বিস্ফোরকের মত গ্যাস ছাড়ে, যাহাতে পর্ব্বতগাত্রের শিলা চূর্ণ হইয়া শিলাধূলিতে পরিণত হইয়া বহুদূর ছড়ায় ও পরে শান্ত আগ্নেয়গিরির মত লাভা উদ্গীরণ করে, যেমন, ভিসুভিয়স আগ্নেয়গিরি।

ভূমিকম্প (earthquake)—পৃথিবীর বহিঃস্থ আবরণে সর্ব্বদাই একটা আন্দোলন রহিয়াছে। কিন্তু ইহা এত মৃদু যে ভূপৃষ্ঠ স্থির ও নিশ্চল বলিয়া মনে হয়। এক এক সময় পৃথিবীর কোন কোন স্থান কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ধীরে বা সজোরে কাঁপিয়া উঠে। ভূস্তরের এই আকস্মিক স্পন্দনকে ভূকম্প বলে।

ভূমিকম্পের উৎপত্তি-স্থানকে **নাভি** (focus) বা কেন্দ্র (centre) বলে। এবং ভূপৃষ্ঠের যে স্থান কেন্দ্রের খাড়া উপরে অবস্থিত তাহাকে **ভূকেন্দ্র** (epicentre) বলে। পুকুরে ঢিল ফেলিলে যেমন বৃত্তাকারে তরঙ্গমালা সৃষ্টি হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়, তেমনি ভূমিকম্পের তরঙ্গও উৎপত্তিস্থান হইতে পৃথিবীর বহিঃস্তর ও পৃথিবীর মধ্য দিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ভূমিকম্পের কারণ—(১) ভূস্তরে ফাট ধরা অথবা ফাটের একদিক বসিয়া যাওয়া ভূমিকম্পের একটি প্রধান কারণ।

(২) ভূমিপাত বহুদূরব্যাপী হইলে অনেক সময় ভূমিকম্প হয়।

(৩) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে অনেক সময় স্থানীয়ভাবে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। কারণ গলিত ও কঠিন পদার্থ সবেগে বাহির হইবার সময় পৃথিবীকে আলোড়িত করে।

ভূমিকম্পের সহিত আগ্নেয়গিরির যত নিকট সম্পর্ক বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ ততটা নহে। আগ্নেয়োচ্ছ্বাস বেশী হইলে ভূমিকম্প কম হইবার সম্ভাবনা।

ভূমিকম্প কোথায় বেশী হয়—স্তরচ্যুতিই ভূমিকম্পের প্রধান কারণ। যদি কোন স্থানের শিলাস্তর বিপর্য্যস্ত অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নূতনভাবে সন্নিবেশিত হইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে অনেক সময় স্তরচ্যুতি ঘটে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ গবেষণা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর কোন কোন স্থান বিশেষরূপে এই প্রকার স্তরের উপর সংস্থাপিত। এই স্থানগুলি পৃথিবীর একটি কটিবন্ধের উপর স্থাপিত বলিয়া কল্পনা করিয়া তাহারা উহার নাম দিয়াছেন **প্রকম্পন কটিবন্ধ** (seismic belt)। বস্তুতঃ এই কটিবন্ধের উপরিস্থ দেশসমূহ প্রায়ই ভূমিকম্প দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া থাকে।

জাপানে ভূমিকম্প একটি সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এশিয়া মহাদেশে দুইটি প্রধান "প্রকম্পন কটিবন্ধ",—একটি জাপানের উপর দিয়া ও অপরটি উত্তরভারতে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বিস্তৃত। সেজন্য এই সকল দেশে ভূমিকম্পের আশঙ্কা অনেক বেশী।

ভূমিকম্পের ফল—ভূমিকম্পের শুধু বিধ্বংসীলীলা ছাড়া ইহার একটা গঠনের দিকও আছে। ভূমিকম্পের ফলে অনেক উর্ব্বর

ক্ষেত্র যেমন অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে, তেমনই অনেক ঊষর মরু উর্ব্বর হইয়া উঠে। নদী তাহার জলধারার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া মরুর বুকের উপর দিয়া ছুটিয়া চলে,—কত দেশ সমুদ্রবক্ষে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, আবার কত দ্বীপ সমুদ্রের বুকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়।

ভূকম্পন-লেখক যন্ত্র (seismograph)—ইহার সাহায্যে ভূমিকম্প-তরঙ্গের গতি, পথ, প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়।

Questions

1. What is a fold?
2. Name a few volcanoes What ideas do they give us about the interior of the earth? (C. U. 1944)
3. Explain--Epicentre. (T. T. 1938)
4. Write short notes on: fault, seismograph, sedimentary rock, volcanic eruption. (T. T. 1939)
5. Have you heard of any recent earthquake in India? What are the causes of earthquakes? (C. U. 1940)
6. What are the reasons for earth movements? How do you think were the Himalayas formed. (C. U. 1942)

চতুর্থ অধ্যায়

মাটি

(Soil)

মাটির উপাদান—পৃথিবীর বাহ্যস্তরের উপরিভাগে যে মাটির স্তর আছে, তাহা আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কারণ ইহাতেই ফলশস্য ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকল জীবজন্তুর আহার্য্য যোগাইয়া থাকে। স্থূলভাবে দেখিলে মাটি সাধারণতঃ দুই প্রকার পদার্থের সংমিশ্রণের ফল। একটি **শিলাকণা,** ও অপরটি **জৈব পদার্থ**।

মাটি দুই প্রকার। ১। **স্থানীয় মাটি** (Indigenous soil)—আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় ইত্যাদি নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়ার ফলে পাহাড়-পর্ব্বতগুলি প্রতিনিয়ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া অবশেষে মৃত্তিকা বা বালুকাকণায় পরিণত হইতেছে। বালুকা বা মৃত্তিকাকণা কখনও কখনও সেই স্থানেই থাকিয়া মাটি উন্নত করে। সাঁওতাল পরগণা বা ছোটনাগপুরে ইঁদারা ইত্যাদি খনন করিবার সময়

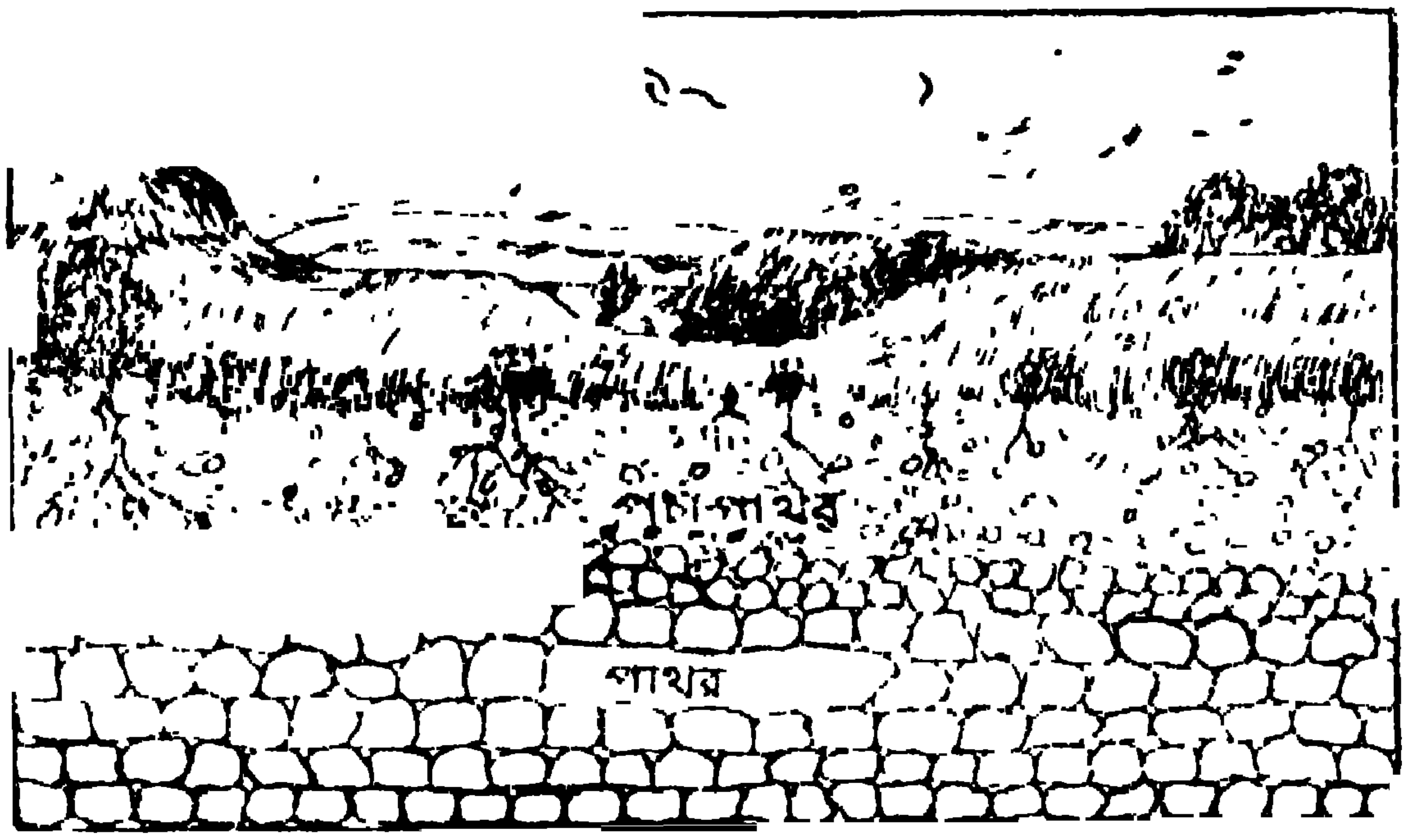

১০০। পাথর হইতে মাটির উদ্ভব

একটু নীচেই "পচাপাথর" আরও নীচে কঠিন পাথর পাওয়া যায়। উপরের মাটি যে পাথর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়।

২। **স্থানান্তরিত মাটি** (Transported soil)—যে মাটি জল বা বায়ুর দ্বারা উৎপত্তি-স্থান হইতে অপর স্থানে বাহিত হইয়াছে তাহাকে স্থানান্তরিত মাটি বলে। ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ নিম্ন বাংলার মাটি, পলিমাটি। পাহাড়পর্ব্বতের ধ্বংসাবশিষ্ট বালুকা বা মৃত্তিকাকণা নদীর স্রোতে আসিবার পর, কোন কারণে স্রোতোবেগ কমিয়া গেলে,

নদীগর্ভে "চর" রূপে ন্যস্ত হইয়াছে। এই কারণে নিম্নবাংলায় গভীর কূপ খনন করিলেও পাথর পাওয়া যায় না।

স্থানবিশেষে আবার বায়ুতাড়িত বালুকা বা মৃত্তিকাকণা—যেমন চীনের লোয়েস (Loess) মাটি—রাশীকৃত হইয়া মাটি সৃটি করে। শিলাকণা ও জৈব পদার্থ ছাড়া মাটিতে প্রাণশক্তি সম্পন্ন অসংখ্য **জীবাণু** থাকে। এই সকল জীবাণু রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক ক্রিয়ার সাহায্যে মাটিকে উর্ব্বর করিয়া তোলে। অতএব মাটির মধ্যস্থিত জীবাণু শস্য উৎপাদনের সাহায্য করিয়া মাটির উপরিস্থিত প্রাণীর জীবনধারণের সহায়তা করিতেছে।

মাটিতে সব সময়ই কিছু ভাগ **জল** থাকে। একটু মাটি লইয়া ওজন করিয়া তাহার পর উহা রৌদ্রে শুকাইয়া আবার ওজন করিলে দেখিবে ওজন কমিয়া গিয়াছে। চুল্লী (oven) সাহায্যে ১০৫°—১১০° সেণ্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিলে দেখিবে ওজন আরও কমিয়া যাইবে। এই ভাবে পরীক্ষা করিলে বেশ দেখা যায় যে, বেলেমাটি অপেক্ষা কাদামাটিতে অনেক অধিক জল থাকে।

মাটির শ্রেণীবিভাগ ও মাটির সহিত উদ্ভিদ্‌-জগৎ ও কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধ

(Varieties of soil and their bearing on plant life and agricultural operations)

মাটির শ্রেণীবিভাগ—যে প্রস্তর বা প্রস্তরসমূহ হইতে মাটি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী মাটিও বিভিন্ন শ্রেণীর হইয়া থাকে। বেলে পাথর হইতে বেলে মাটি (sandy soil), কর্দ্দম

পাথর হইতে কাদা মাটি (clayey soil) চুনাপাথর (limestone) হইতে চুনা মাটি (calcareous) বা marly soil) হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ এই দেশে ছয় শ্রেণীর মাটি দেখিতে পাওয়া যায়—কাদা মাটি, এঁটেল মাটি, দো-আঁশ মাটি (loamy soil), বেলে মাটি, কাঁকর মাটি, লাল মাটি। মাটি কোন্ জাতীয়, তাহা উঁচু কি নীচু, তাহাতে জল দাঁড়ায় কি না, এই সকলের উপর ভূমির উর্ব্বরতা নির্ভর করিতেছে। সব রকম জমিতে সব ফসল জন্মে না। কোন ফসলের জন্য, যেমন ধান ও পাট, বিস্তর জল দরকার। আবার কোন ফসলের জন্য, যেমন কার্পাস, জওয়ার ও অড়হর, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ভূমি প্রয়োজন।

১। **কাদামাটি**—এই প্রকার ভূমি সাধারণতঃ নদী ও বিলের কিনারায় পাওয়া যায়। ইহার চারিভাগের তিন ভাগ কাদা। ইহাতে জল অত্যন্ত বেশী। এই মাটিতে অম্লরসের আধিক্য থাকায় সাধারণ গাছপালা জন্মান কঠিন। চুন বা অন্য কোন ক্ষার দিয়া পাট করিলে ইহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়।

২। **এঁটেল মাটি**—কাদা মাটি শক্ত হইলে এঁটেল মাটি হয়। ইহা কৃষির উপযোগী নয়। তবে ইহার উপর পলি পড়িলে ধানচাষের পক্ষে ভালই হয়।

৩। **দো-আঁশ মাটি**—এই প্রকার জমিতে কাদা ও বালি সমান ভাগে মিশান। কৃষির পক্ষে খুব উপযোগী। ইহাতে গম, যব, ভুট্টা বেশ ভাল ফলে. ও গাছ প্রায় সকল রকমই জন্মে।

৪। **বেলে মাটি**—এই প্রকার জমিতে দশ ভাগের এক ভাগ কাদা, বাকী বালি। ইহাতে মোটে জল ধরে না, তাই শস্য জন্মে না। তবে ইহার উপর পলি পড়িলে পটল, তরমুজ, খরমুজা বেশ ভাল হয়।

৫। **কাঁকর মাটি**—এই জমি বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুরের অনেক স্থানে দেখা যায়। ধান আবাদের উপযোগী।

লাল মাটি—ইহাও ধান চাষের পক্ষে বেশ ভাল। মাটিতে লোহা আছে বলিয়া বর্ণ লাল।

গাছপালাগুলি ইহাদের খাদ্যের উপাদানসমূহ এক অঙ্গার ভিন্ন আর সমস্ত মাটি হইতে কি প্রকারে সংগ্রহ করে, তাহা তোমরা উদ্ভিদ্‌-বিদ্যায় পড়িবে। পাহাড়-পর্ব্বত হইতে সর্ব্বদাই নূতন মাটির সৃষ্টি হওয়ার দরুণ জমির উর্ব্বরতা-শক্তি হ্রাস হইতে পারে না।

মাটির সহিত উদ্ভিদ জগতের সম্বন্ধ—মাটি শুকাইয়া গেলে গাছপালা বাঁচে না। গাছপালার জন্য জলের প্রয়োজন ত আছেই, তাহা ছাড়া উহাদের খাদ্যস্বরূপ নানাবিধ **ধাতব লবণ** উহারা জলে দ্রব অবস্থায় গ্রহণ করিয়া থাকে।

গাছপালার জন্য মাটিতে জল থাকা যেমন প্রয়োজন **বাতাস** থাকারও তেমনি প্রয়োজন। শ্বাস লইবার অক্সিজেনের প্রয়োজন জীবজন্তুর যেমন, গাছপালারও তেমনি। সেটা কিন্তু কেবল গাছের পাতা বা ফুলের জন্য নহে, শিকড় সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। যদি চাপ দিয়া বা জলে পূর্ণ করিয়া মাটি হইতে ভিতরের সমস্ত বাতাস বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তবে সেখানে গাছপালা মরিয়া যাইবে।

মাটির সহিত গবাদি পশুর সম্বন্ধ—মাটির সঙ্গে গাছপালার যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রাণিজগতেরও তেমনি অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। গবাদি পশু যে ঘাস খায় তাহা হইতেই ইহাদের অবশ্য-প্রয়োজনীয় ধাতব লবণগুলি সংগ্রহ করে। মাটিতে কোন একটির অভাব হইলে ঘাসেও তাহার অভাব হয়; ফলে গবাদি পশুগণের যথোপযুক্ত পুষ্টি হয় না। এমন কি কখন কখন ইহারা পীড়িত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে

সমস্ত দেশে কৃষিবিষয়ক গবেষণা দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সেখানে পশুচারণক্ষেত্র এবং পশুদিগের জন্য বিশেষভাবে উৎপন্ন তৃণ-শস্যাদিতে উহাদের অবশ্য-প্রয়োজনীয় ধাতব লবণগুলির অভাব যাহাতে না হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হয়।

Questions

1. How is soil formed? Give a scheme of classification of soil and mention the characteristic of each type. (T. T. 1939)
2. What is the relationship between soil and vegetation?
3. What is the relationship between soil and domestic cattle?
4. Illustrate with examples how the difference in soils influence agricultural operations in India. (C. U. 1942)

পঞ্চম অধ্যায়

পাথর কয়লা ও খনিজ তৈল
(Coal and Mineral Oil)

পাথর কয়লা

পাথর কয়লার ব্যবহার—কয়লার সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত মহাসমুদ্রবক্ষে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিয়া দেশবিদেশের বাণিজ্যসম্ভার এক স্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাইতেছে। ইহারই সাহায্যে রেলগাড়ী ও নানাবিধ কলকারখানা চলিতেছে এবং নানাবিধ খনিজ পদার্থ হইতে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় লৌহ, তাম্র, দস্তা, সীসা ইত্যাদি ধাতু নিষ্কাশিত হইতেছে।

অপরদিকে আবার ইহা হইতে উদ্ভূত আলকাতরা হইতে রাসায়নিক রঞ্জক পদার্থ, বিস্ফোরক পদার্থ, গন্ধদ্রব্য, কৃত্রিম সার এবং ঔষধাদি নানাবিধ বিচিত্র বস্তু প্রস্তুত করিতেছেন। বস্তুতঃ আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার মূলে প্রধানতঃ পাথর কয়লা।

খনিতে কয়লা পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা ভূগর্ভে কিরূপে আসিল?

কয়লার খনির ভিতর নামিলে দেখা যায় যে, ইহাতে কয়লা, কাদাপাথর, বেলেপাথর ইত্যাদি পালল শিলার সহিত স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে ইহাতে অনেক সময় বৃক্ষ, পত্র, কাণ্ড ইত্যাদির অবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্তরে কয়লা থাকে তাহার নীচের স্তরে অনেক সময় গাছের গুঁড়ির জীবাশ্ম থাকে।

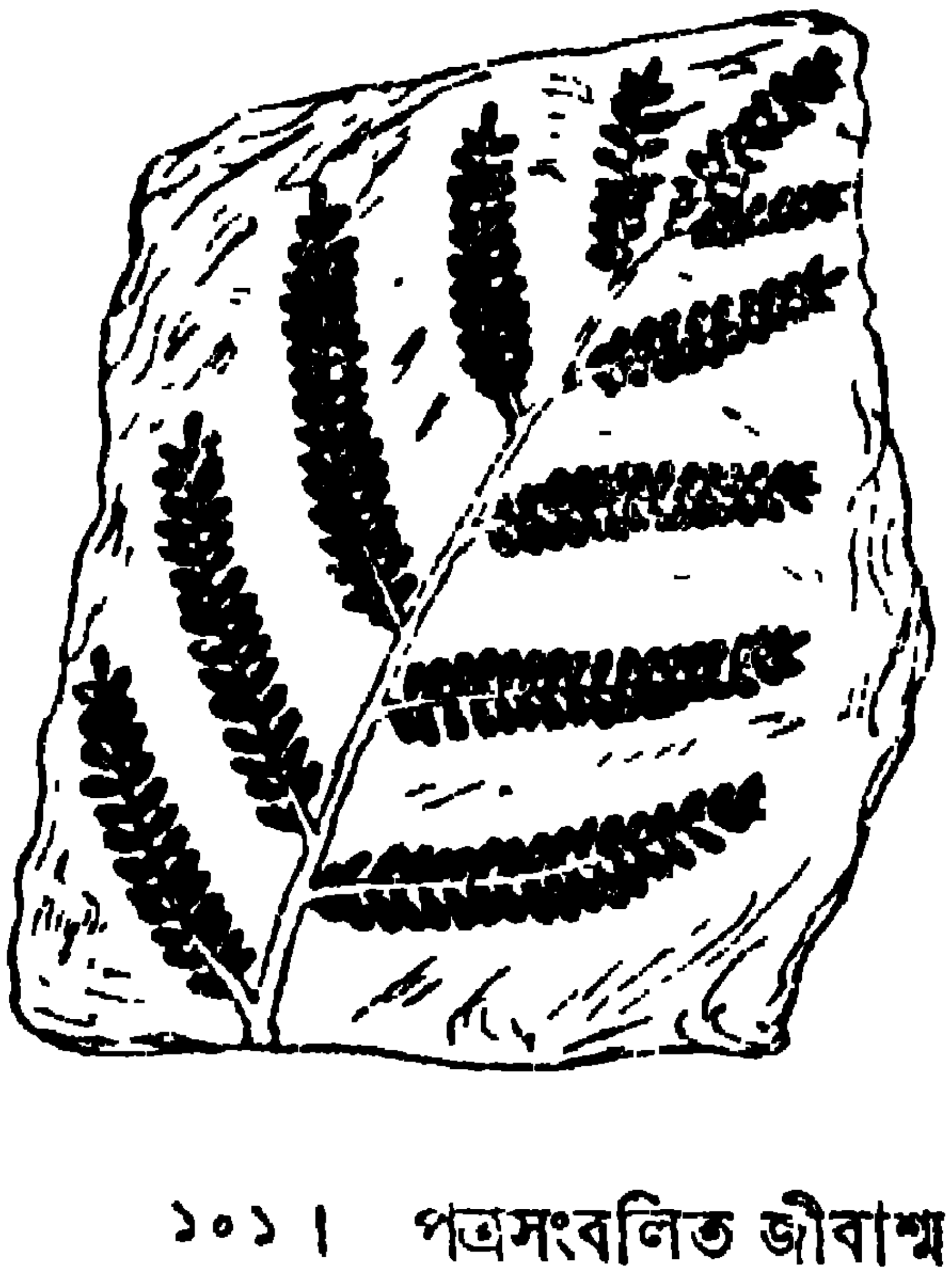

১০১। পত্রসংবলিত জীবাশ্ম

১০২। গাছের গুঁড়ির জীবাশ্ম

পাথর কয়লার সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে— পাথর কয়লাতে একদিকে গাছপালার অবশিষ্টের অস্তিত্ব, অপর দিকে পালল শিলার সান্নিধ্য এই উভয় হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে,

জলাভূমিতে উদ্ভিজ্জাবশিষ্ট হইতেই পাথর কয়লার সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ স্থানে যে সমস্ত গাছপালা জন্মে উহাদের পাতা, ডালপালা ইত্যাদি জলেই পতিত হয়। এই জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাব ঘটিলে পাতা, ডাল, বৃক্ষের কাণ্ড ইত্যাদি না পচিয়া ক্রমে অঙ্গারে পরিণত হয়, এবং দীর্ঘকাল এরূপ ঘটিলে অঙ্গারের স্তর অধিক হইতে অধিকতর পুরু হইয়া থাকে। আমাদের চোখের উপর পৃথিবীর নানাস্থানে এই প্রক্রিয়ায় **পীট** (peat) নামক এক প্রকার উদ্ভিজ্জাবশিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে। গরীব লোকে ইহা পোড়াইবার জন্য ব্যবহার করে। স্থানবিশেষে আবার **বাদামী কয়লা** (brown coal) নামক একপ্রকার কয়লা পাওয়া যায়, যাহা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে পীট ও পাথর কয়লা এই দুইয়ের মাঝামাঝি। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে অতি প্রাচীনকালে পৃথিবী যথেষ্ট উত্তপ্ত ছিল এবং সে সময়ে বাতাস জলীয় বাষ্পে এবং কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডে পূর্ণ ছিল। ইহাতে উদ্ভিদ্ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টি ও নদীর জলের সাহায্যে প্রাচীনকালের বৃক্ষাদি সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় পায় এবং পরবর্ত্তীকালে সঞ্চিত শিলাস্তরে উহা আচ্ছন্ন হয়। উহা হইতে তাপ ও চাপের ক্রিয়ার ফলে জল, কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস নির্গত হইয়া পাথর কয়লার সৃষ্টি হইয়াছে।

খনিজ তৈল (Mineral Oil)

খনিজ তৈলের উৎপত্তি—বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, খনিজ তৈল (petroleum) এবং গ্যাস অতি প্রাচীনকালের **এ্যালগা** (alga), **ডায়াটম** (diatom), প্রভৃতি নিম্নস্তরের

উদ্ভিজ্জের অবশিষ্ট ; অংশতঃ সামুদ্রিক মৎস্য ও শম্বুকাদি জীবের অবশিষ্ট হইতে চাপ এবং তাপের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে।

খনিজ তৈলের প্রাপ্তিস্থান—মার্কিন যুক্তরাজ্যে, রুশিয়ার ও পারস্যদেশে **খনিজ তৈলের ক্ষেত্র** (oil field) আছে। ব্রহ্মদেশে, আসামে এবং পঞ্জাব সীমান্তেও খনিজ তৈল পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ সমুদ্রগর্ভে অগভীর জলে বা সমুদ্রোপকূলে উৎপন্ন পালল শিলার অন্তর্নিহিত হইয়া থাকে। খনিজ তৈলের সঙ্গে এক প্রকার দাহ্য গ্যাসও থাকে। ইহা অঙ্গার ও হাইড্রোজেন এই দুই মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে রাসায়নিক সংযোগ ফলে উৎপন্ন যৌগিকসমূহের মিশ্রণ মাত্র।

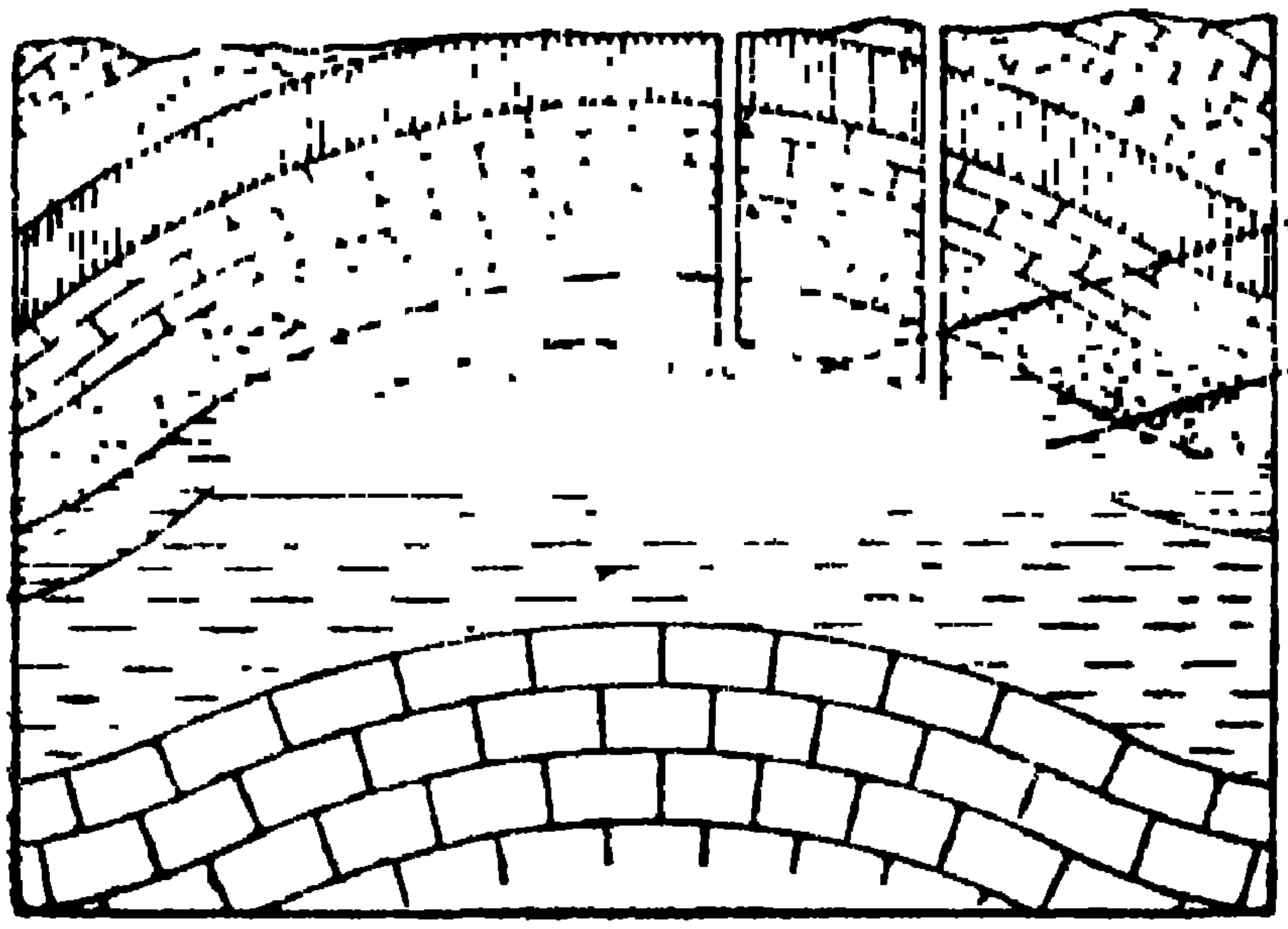

১০৩। পেট্রলিয়ামের খনি

উৎপত্তি স্থানের সন্নিকটে তৈলাদি শোষণক্ষম বেলে বা অন্য কোন সচ্ছিদ্র শিলাস্তর থাকিলে এবং তাহার উপরে এবং নীচে ছিদ্রশূন্য শিলা থাকিলে, সেখানে খনিজ তৈল সঞ্চিত হওয়া সম্ভব হয়। যে সচ্ছিদ্র শিলাস্তরে তৈল থাকে তাহাতে সাধারণতঃ গ্যাস এবং জলও থাকে। সকলের উপরে গ্যাস, মধ্যে তৈল এবং নীচে জল এইভাবেই সচরাচর

তৈলযুক্ত শিলাস্তর পাওয়া যায়। যন্ত্রসাহায্যে ভূমিতে ছিদ্র (boring) করিয়া লৌহনল প্রোথিত করিয়া দিলে নলটি গ্যাস বা তৈলযুক্ত স্তরে পৌঁছিবামাত্র যথাক্রমে গ্যাস বা তৈল নির্গত হয়। অত্যন্ত চাপের অধীন থাকে বলিয়া প্রথমাবস্থায় তৈল আপনা হইতেই উঠে। পরে পাম্পের সাহায্যে তৈল উত্তোলন করিবার প্রয়োজন হয়।

খনিজ তৈলাদির ব্যবহার—খনি হইতে উদ্ভূত গ্যাস জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পরিস্রবণ দ্বারা খনিজ তৈলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভক্ত করা হয়। ৭০° হইতে ১২০° পর্য্যন্ত স্ফুটনাঙ্ক সংবলিত অংশ পেট্রল (petrol) নামে অভিহিত হয় এবং ইহা মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেন চালাইবার জন্য এবং গরম কাপড় ধৌত করিবার নিমিত্ত (dry cleaning) ব্যবহৃত হয়। ১৫০° হইতে ৩০০° পর্য্যন্ত স্ফুটনাঙ্ক সংবলিত অংশই কেরোসিন তৈল নামে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। ৩০০° ডিগ্রীর অধিক স্ফুটনাঙ্ক সংবলিত অংশ যন্ত্রাদির ঘর্ষণজনিত ক্ষয় নিবারণের জন্য প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। এই অংশ হইতে ভ্যাসিলিন (vaseline) ও পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন খনিজ তৈল হইতে আমরা প্যারাফিন নামক মোমের মত বস্তু (paraffin wax) ও পাইয়া থাকি। ইহা হইতে বাতি প্রস্তুত হয়।

Questions

1. Why is coal important to man? Explain its formation under the earth. (C. U. 1941)
2. How, do you think, was coal formed? Where does coal occur in India? Indicate why coal is so important to modern civilisation. (C. U. 1943)
3. What is meant by "mineral oil"? Explain how and where it is formed. What kind of oil does an aeroplane use? (C. U. 1942)
4. What is kerosene? How is it obtained? What are the different things you may use for lighting purpose? Which do you like best any why? (C. U. 1944)

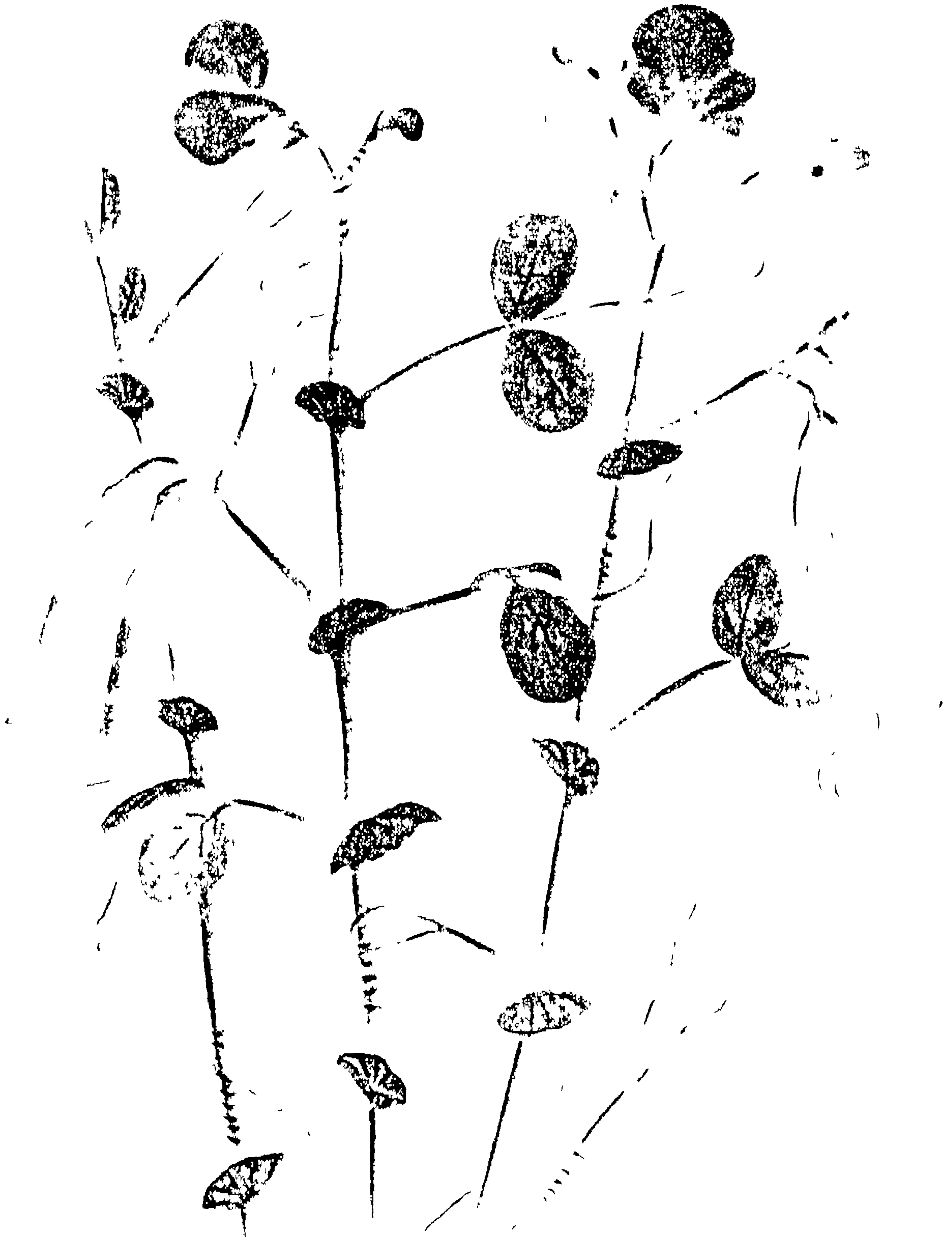

মটর গাছ—ফুল, শুঁটি ও আকর্ষ

জীব-বিজ্ঞান

উপক্রমণিকা

পদার্থের শ্রেণীবিভাগ (Classification of objects) —আমাদের চারিদিকে আমরা যে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাই তাহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়,—**চেতন ও অচেতন**। যাহাদের প্রাণ আছে, তাহারা চেতন। যাহাদের প্রাণ নাই, তাহারা অচেতন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, তৃণ, শৈবাল ইত্যাদি চেতন পদার্থ। মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, বায়ু ইত্যাদি অচেতন বা জড় পদার্থ।

জীববিজ্ঞান ও তাহার ধারা (Biology and its main branches)—যে বিজ্ঞান সাহায্যে চেতন বা জীবন্ত পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহার নাম **জীব-বিজ্ঞান** (Biology)। এই বিজ্ঞানের দুইটি ধারা। একটি উদ্ভিদ্‌-তৃণাদি সম্পর্কীয়, অপরটি পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি সম্পর্কীয়। প্রথমটির নাম **উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা** (Botany) দ্বিতীয়টির নাম **প্রাণিবিদ্যা** (Zoology)। এই দুই বিদ্যা হইতে আমরা জীবমাত্রের স্বরূপ, জাতিপরিচয়, আহার-বিহারাদির তত্ত্ব জানিতে পারি।

জীবজগৎ (The animate world)—জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। উদ্ভিদ্‌ বা প্রাণীর রূপ

অসংখ্য। জীব যে স্থলে বাস করে, কেবল তাহাই নহে। অসীম সমুদ্রগর্ভেও অগণন জীবের বসতি! সকল উদ্ভিদ্ বা প্রাণী যে আমরা চক্ষে দেখিতে পাই, তাহাও নহে। দৃশ্যমান জীবজগতের বাহিরেও জলে, স্থলে, আকাশে এমন কোটি কোটি অতি ক্ষুদ্র জীবাণু আছে, যাহাদিগকে দেখিতে হইলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (microscope) সাহায্য আবশ্যক।

কি বিশাল এই জীবজগৎ! ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইতে হয়।

জীবের দেহকোষ

(Cell of the living objects)

দেহকোষ (cell)—উদ্ভিদ্ ও প্রাণিমাত্রেরই দেহ এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত। উদ্ভিদের এই কোষের একটি আবরণ থাকে, প্রাণিদেহের কোষের সাধারণতঃ কোনও আবরণ নাই।

প্রোটপ্লাজম্ (protoplasm)—প্রত্যেক কোষের মধ্যে **প্রোটপ্লাজ্ম্** নামক অল্পবিস্তর স্বচ্ছ, জেলির মত ঘন একটি পদার্থ থাকে। এই প্রোটপ্লাজ্ম্ই জীবিত-বস্তু, প্রাণের আধার। বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাতে কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ আছে। কখন কখন ফস্ফরস্, লৌহ ও অন্যান্য পদার্থও পাওয়া যায়। জীবিতাবস্থায় প্রোটপ্লাজ্মের বিশ্লেষণ বা রাসায়নিক পরীক্ষা করা যায় না। যে উপাদানগুলির নাম করা হইয়াছে তাহা মৃত প্রোটপ্লাজ্মের; জীবন্ত প্রোটপ্লাজ্মে ইহা ছাড়া অন্য উপাদান থাকিলে, তাহা রাসায়নিক বিশ্লেষণের অতীত।

নিউক্লিয়স্ (nucleus)—জেলি-বৎ প্রোটপ্লাজ্‌মের মধ্যে **নিউক্লিয়স্** নামক একটি কেন্দ্রস্থান থাকে। এই কেন্দ্রস্থানটি আরও ঘন বস্তু দ্বারা গঠিত। ইহাই প্রোটপ্লাজ্‌মের শাসনকেন্দ্র। যদি জীবদেহের একটি কোষ লইয়া তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে যে ভাগে নিউক্লিয়স্ নাই তাহা মরিয়া যাইবে, কিন্তু যে ভাগে নিউক্লিয়স্ আছে তাহা প্রাণশক্তির আধার স্বরূপ বাঁচিয়া থাকিবে।

প্রোটপ্লাজ্‌মের স্বরূপ ও বিশিষ্টতা (Properties and functions of protoplasm)—জীবিত প্রোটপ্লাজ্‌ম্ কখনও স্থির থাকে না, একটা চাঞ্চল্য সর্ব্বদা দেখা যায়। ইথার (ether) কিংবা ক্লোরোফর্ম্ম (chloroform) প্রয়োগ করিয়া যেরূপ প্রাণীকে অচেতন করা যায়, সেইরূপ এই জীবিত-বস্তুকেও অচেতন করা যায়। অচেতন হইলে আর নৈসর্গিক চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় না।

জীবের বিশিষ্টতা ও জড়ের সহিত তুলনা
(Special characteristics of the living and their comparison with non-living objects)

সাধারণতঃ জীবের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হয়।

১। **গমনাগমন শক্তি** (locomotion)—বহু প্রাণীই নড়াচড়া করিতে পারে, এবং উদ্ভিদ্‌জগতেরও কেহ কেহ নড়াচড়া করিতে পারে। সাধারণ উদ্ভিদ্ প্রাণীর ন্যায় নড়াচড়া না করিতে পারিলেও একেবারে অচল নহে। উদ্ভিদ্ মাত্রেরই কোন না কোন অঙ্গ সচল। যেমন সাধারণতঃ মূল মাটির নীচে বহুদূর খাদ্যসংগ্রহার্থ নীত হয়। কাণ্ড সাধারণতঃ মাটির উপর আলোর দিকে বর্দ্ধিত হয়। **তেঁতুল**, **বক**, **কৃষ্ণচূড়া** ও **কালকাসুন্দা** প্রভৃতির পাতা আলোয় খোলে ও

অন্ধকারে গুটাইয়া যায়। **লজ্জাবতী** গাছের পাতা স্পর্শমাত্রই ডালশুদ্ধ নুইয়া পড়ে। কতকগুলি ফুল আছে, যাহারা দিনের আলোয় ফোটে ও রাত্রের অন্ধকারে বন্ধ হয়। আর কতকগুলি ফুল আছে, যাহারা ইহার ঠিক বিপরীত ; তাহারা দিনের আলোয় বন্ধ থাকে ও রাত্রের অন্ধকারে ফোটে। প্রাণিজগতের নড়াচড়া করিবার অঙ্গ নানাপ্রকার। কেহ কেহ সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়, যেমন কেঁচো। প্রাণীদের বেশীর ভাগেরই পা আছে। কাহারও কাহারও পা থাকা সত্ত্বেও ডানা থাকে, যেমন, পতঙ্গ ও পাখী। কাহারও কাহারও সঙ্কোচনশীল মাংসল পা থাকে, যেমন, শামুক, গুগ্লি প্রভৃতির। প্রাণিজগতের নড়াচড়া করিবার চেষ্টা প্রায়ই খাদ্য সংগ্রহার্থ। জড়পদার্থের নিজের নড়াচড়ার ক্ষমতা নাই।

২। **শ্বাস-ক্রিয়া** (respiration)—উদ্ভিদ্ বা প্রাণী সকলেরই নিয়ত শ্বাসকার্য্য চলিতেছে। শ্বাসকার্য্যে বাহিরের বাতাস জীবদেহে প্রবেশ করে। জীবদেহে যে সঞ্চিত খাদ্য থাকে বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা তাহার দহন-ক্রিয়ার ফলে তাপ উদ্ভূত হয় ও দূষিত বায়বীয় পদার্থ (কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড) জীবদেহ হইতে পরিত্যক্ত হয়। জীবদেহে অহোরাত্র এইপ্রকার দহন-ক্রিয়া চলিতেছে। শ্বাসত্যাগকালে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড যে পরিত্যক্ত হয়, তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। যদি ছাঁকা পরিষ্কার চূণের জলের উপর শ্বাসত্যাগ করা যায় তবে তাহা দুধের মত সাদা হইয়া যাইবে।

জলজ উদ্ভিদ্ বা জলজ প্রাণীদের শ্বাসক্রিয়া জলের মধ্যে যে অক্সিজেন গোলা আছে তাহা দিয়া সমাধা হয়। জড় পদার্থের শ্বাসক্রিয়া বলিয়া কিছু নাই।

৩। **পুষ্টি** (nutrition)—জীবমাত্রেরই খাদ্যদ্বারা দেহ-পুষ্টির প্রয়োজন। উদ্ভিদ্ বায়ু ও মাটি হইতে নানা দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ঐ সকল

উপাদান হইতে দেহে প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। প্রাণীরা তৈয়ারী খাদ্যই আহার করে। দেহের পুষ্টিসাধন ব্যতীত জীব বাঁচিতে পারে না। খাদ্যের রাসায়নিক উপাদান উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর একই প্রকার। প্রাণীর খাদ্য গ্রহণ ও জীর্ণ করিবার প্রকরণ ভিন্নপ্রকার। উদ্ভিদের সাধারণতঃ যে প্রকার ও যতটা খাদ্য দেহে সঞ্চিত থাকে প্রাণীদের তাহা থাকে না। জড় জগতের পুষ্টি বলিয়া কিছু নাই।

৪। **দূষিত পদার্থ ত্যাগ** (excretion)—জীবমাত্রেই দেহের দূষিত পদার্থ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু জড়ের সে ক্ষমতা নাই।

৫। **কলেবর বৃদ্ধি** (growth)—জীব বাহির হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া শরীর মধ্যে নানাপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া নিজ দেহোপযোগী পদার্থে পরিণত করে ও তদ্দ্বারা তাহার কলেবর বৃদ্ধি পায়। জড় পদার্থের আহায্য বলিয়া কিছু নাই। জলকে বাড়াইতে হইলে আরও খানিকটা জল তাহাতে ঢালিতে হইবে। লবণকে বাড়াইতে হইলে আরও খানিকটা লবণ তাহাতে মিশাইতে হইবে।

৬। **উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া** (Response to stimulus)—জীব বাহির হইতে আঘাত, তাপ, শৈত্য, জল, বায়ু, তড়িৎ, আলোক, স্পর্শ দ্বারা উদ্দীপনাপ্রাপ্ত হইলে তাহার দেহে প্রতিক্রিয়ার (response to stimulus) লক্ষণ দেখা যায়। একটি গাছশিশুকে যেমন করিয়া রাখা যাউক না কেন, তাহার প্রধান মূল মাটির দিকে ও কাণ্ড উপরদিকে অর্থাৎ সূর্য্যের দিকে যাইবেই। আলোক উত্তেজনার জন্য কাণ্ড সেইদিকে ও মূল বিপরীত দিকে যায়। আঘাত প্রাপ্ত হইলে প্রাণিমাত্রেরই দেহ সঙ্কুচিত হয় ও পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। তপ্ত জিনিস বা ঠাণ্ডা বরফ হাতে ঠেকিলে তৎক্ষণাৎ হাত সরাইয়া লইবার চেষ্টা করি। কিন্তু জড়দেহে এরূপ কোন প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যায় না।

৭। **বংশবৃদ্ধি** (propagation)—জাতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন। জীবজগতের প্রত্যেক জাতিই তাহার বংশ বৃদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু জড় পদার্থের এই ক্ষমতা নাই।

৮। **মৃত্যু** (death)—জীব মাত্রেরই মৃত্যু আছে। তবে বিভিন্ন জীবের জীবনকাল নানা প্রকার। জীবমাত্রই জীবিতাবস্থায় উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে, কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটিলে আর পারে না। জীব প্রাণত্যাগ করিলে তাহার দেহ জড় পদার্থে পরিণত হয়।

জড়পদার্থ সদাই প্রাণহীন, চেতনাহীন ঃ তাহার মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই।

জড় ও জীবের লক্ষণভেদ ঃ

জড়	জীব
১। জড়ের দেহে কোষ নাই	১। জীবের দেহে কোষ আছে।
২। প্রোটপ্লাজ্‌ম্‌ থাকে না।	২। প্রোটপ্লাজ্‌ম্‌ থাকে।
৩। চলৎশক্তি নাই।	৩। অধিকাংশ প্রাণী ও কোন কোন উদ্ভিদ্‌ নড়াচড়া করিতে পারে।
৪। শ্বাসক্রিয়ার ক্ষমতা নাই।	৪। শ্বাসক্রিয়া আছে।
৫। খাদ্যগ্রহণের ক্ষমতা নাই।	৫। খাদ্যগ্রহণ নিয়ত করিতেছে।
৬। খাদ্যগ্রহণ দ্বারা কলেবরের বৃদ্ধিশক্তি নাই।	৬। খাদ্যগ্রহণে কলেবরের বৃদ্ধি হয়।
৭। পুষ্টিসাধনের শক্তি নাই।	৭। খাদ্যদ্বারা দেহ পুষ্ট করে।
৮। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাহ্য স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়।	৮। শরীর মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিলেও বাহ্যস্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না।

জড়	জীব
৯। উত্তেজনায় প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রায়ই দেখা যায় না।	৯। উত্তেজনায় প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যায়।
১০। বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না।	১০। বংশবৃদ্ধি করিতে পারে।
১১। প্রাণ নাই।	১১। প্রাণ আছে।
১২। চেতনা নাই।	১২। চেতনা আছে।
১৩। বোধশক্তি নাই।	১৩। অনেকের বোধশক্তি আছে।
১৪। মৃত্যু থাকিতে পারে না।	১৪। মৃত্যু সুনিশ্চিত। মৃত্যুর পর দেহ জড় পদার্থে পরিণত হয়।

জীব-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখা

(Different branches of Biology)

জীব-বিজ্ঞান বিবিধ শাখায় বিভক্ত। এই শাখাগুলি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

১। (ক) শরীরের গঠন (Morphology)

(খ) আভ্যন্তরিক গঠন (Anatomy)

২। শারীর-বিদ্যা (Physiology)—দেহাভ্যন্তরীণ বিভিন্ন যন্ত্রাদির ক্রিয়া কি নিয়মে সম্পন্ন হয়।

৩। ভ্রূণবিদ্যা (Embryology)—ডিম্বাবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থার ক্রমবিকাশের বিবৃতি।

৪। কোষবিদ্যা (Cytology)—যে কোষদ্বারা জীবদেহ গঠিত, তাহার বিবরণ।

৫। জৈবনীতি (Bionomics)—জীবের সহিত তাহার আবেষ্টন-সম্বন্ধ।

৬। শ্রেণীবিভাগ (Classification)।

Questions

1. Define Biology and state its various branches.
2. What are the characteristics which distinguish the living from the non-living? (C. U. 1940, 1945)
3. State what you know of protoplasm and the nucleus of a living cell. (T. T. 1938)

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর তুলনা

(Comparison between plants and animals)

চলৎশক্তির কথা বিবেচনা করিতে গেলে উদ্ভিদে ও প্রাণীতে বিস্তর প্রভেদ। সাধারণতঃ এ শক্তি উদ্ভিদের নাই। প্রাণীর মধ্যে অধিকাংশই নড়াচড়া করিতে পারে এবং এই নড়াচড়ার জন্য তাহাদের যথেষ্ট বলক্ষয় হয়। এই নিমিত্ত নিয়মিত ভোজনের দ্বারা তাহাদের বেশী বলসঞ্চয়ও করিতে হয়। কোন কোন উদ্ভিদের দেহাংশের নড়াচড়া খালি চোখেই দেখিতে পাই। আবার এমন সব গাছও দেখা যায় যাহাদের অঙ্গে পোকামাকড় ধরিবার রীতিমত ফাঁদ আছে। পোকা বসিলেই একটা ঢাকন কি যাঁতিকল বন্ধ হইয়া যায়, পোকা ধরা পড়ে।

প্রায় সকল গাছই মাটিতে আবদ্ধ, স্বেচ্ছায় চলাফেরা করিতে পারে না। প্রাণী অধিকাংশই চলাফেরা করিতে পারে, আর এই চলাফেরা করিবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নানাপ্রকার।

চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় উদ্ভিদ্-দেহে নাই, কিন্তু উচ্চশ্রেণীভুক্ত প্রাণিদেহে দৃষ্ট হয়।

উদ্ভিদের দেহের সকল অংশ একসঙ্গে বাড়ে না; মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ বেশী বাড়ে। কিন্তু প্রাণীর দেহের সকল অংশ সাধারণতঃ একই সময়ে বর্দ্ধিত হয়।

বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন (nitrogen) বলিয়া এক প্রকার গ্যাস আছে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েরই দেহমধ্যে যথেষ্ট নাইট্রোজেনের প্রয়োজন। কিন্তু এই আবশ্যক পদার্থ বাতাস হইতে কেহই লইতে পারে না। আমরা শ্বাসগ্রহণের সহিত যে নাইট্রোজেন টানিয়া লই, শ্বাসত্যাগের সহিত উহাকে আবার বাহির করিয়া দিয়া থাকি। আমরা প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পাই, মৎস্য, মাংস ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে। উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ নাইট্রোজেন পায় মাটি হইতে। মাটিতে নাইট্রেট (nitrate) প্রচুর পরিমাণে আছে। উদ্ভিদ্ **মূলরোম** (root hair) দ্বারা এই নাইট্রেট গ্রহণ করে।)

উদ্ভিদ্‌মাত্রই শুধু লবণাদি অজৈব (inorganic) পদার্থ খাইয়া থাকে না ও প্রাণিমাত্রই কেবল জৈব বা জান্তব (organic) পদার্থ খাইয়া থাকে না। কিন্তু উভয়ের আহার্য্য একেবারে বিভিন্ন। উদ্ভিদ্ আহার্য্য পদার্থকে স্বীয় শক্তি দ্বারা আহারোপযোগী করিয়া লয়, কিন্তু প্রাণীর দেহের গঠন এরূপ যে, সে আহার্য্য পদার্থ আহারোপযোগী হইলে তবে উদরস্থ করে। উদ্ভিদ্‌ই লবণাদি অজৈব পদার্থকে জৈব পদার্থে পরিণত করিয়া প্রাণীর গ্রহণোপযোগী করিয়া দেয়। কঠিন বা ঘন পদার্থ গ্রহণ করিতে উদ্ভিদ্ পারে না। উদ্ভিদের ভোজ্য শুধু বায়বীয় ও জলীয় পদার্থ।

জীবদেহের প্রধান উপাদান অঙ্গার বা কার্ব্বন। বিজ্ঞানে কয়লার নাম কার্ব্বন (carbon)। কয়লা পোড়াইলে, অর্থাৎ কয়লা ও অক্সিজেন (oxygen) সংমিশ্রণে, প্রধানতঃ যে গ্যাস বা বাষ্প উৎপন্ন হয় তাহার নাম কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড (carbon dioxide)। দহন খুব ধীরে ধীরেও হইতে পারে। যখন ধীরে ধীরে হয়, তখন অগ্নিকাণ্ড দেখা যায় না, উত্তাপ অল্পবিস্তর বাড়ে মাত্র। প্রাণীর দেহে এই অক্সিজেন-সংমিশ্রণ অহরহ ঘটিতেছে। শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা প্রাণী

বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজেন টানিয়া লইতেছে আবার কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়িতেছে।

প্রাণিগণ যে খাদ্যদ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন করে সে খাদ্য যোগায় উদ্ভিদ্। সাধারণ প্রাণীর সাধ্য নাই যে বায়ুমণ্ডল হইতে অঙ্গার সংগ্রহ করে। কয়েকটি জীবাণু আছে বটে যাহারা এরূপ করিতে পারে; কিন্তু তাহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। মাংসাশী প্রাণীদিগকে নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যায় না, কারণ তাহারা যে প্রাণীর মাংস খায় তাহারা তৃণভোজী।

উদ্ভিদের আর এক কার্য্য বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধীকরণ। যদি গাছপালা না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের অনবরত শ্বাসকর্য্যের ফলে ক্রমে সব অক্সিজেন ফুরাইয়া যাইত, আকাশ কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডে ভরিয়া উঠিত, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গকুল নির্ম্মূল হইত। কিন্তু প্রকৃতির আয়ব্যয়ের হিসাবও ঠিক থাকা চাই। উদ্ভিদ্ করে কি, আমাদের পরিত্যক্ত অঙ্গারাম্ল বাষ্প বা কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডকে পাতার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম **রন্ধ্রপথ** (stomata) দিয়া অঙ্গে টানিয়া লয়, ও আপন দেহপুষ্টির জন্য কার্ব্বন ভাগ রাখিয়া বাকী অক্সিজেনটা বাতাসে ফিরাইয়া দেয়। সূর্য্যকিরণ, জলকণা ও পাতার **সবুজ কণা** (chlorophyll) দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয়। প্রাণীর দেহে সাধারণতঃ এই সবুজকণা থাকে না।

উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ শব্দ করিতে পারে না, কিন্তু নিম্নশ্রেণীভুক্ত ছাড়া অনেক প্রাণীই শব্দ করিতে পারে এবং শব্দ করিয়াই মনের ভাব প্রকাশ করে। উদ্ভিদের বুদ্ধি-শক্তি নাই, কিন্তু প্রাণীদের মধ্যে অনেকেরই বুদ্ধিশক্তি দেখা যায়।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য নানা প্রকার। উভয়েরই জন্ম ও মৃত্যু আছে। উদ্ভিদ্দেহের বৃদ্ধি সমস্ত জীবনকালব্যাপী; কিন্তু প্রাণিদেহের বৃদ্ধি একটা নির্দ্দিষ্টকাল থাকে, যাহার পর আর দেহের বৃদ্ধি হয় না।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস উভয়েরই আছে। খাদ্য ও পানীয় উভয়েরই আবশ্যক। উভয়েই বংশবৃদ্ধি করে। প্রাণী যেমন ঘর্ম্ম, মল, মূত্রাদি রূপে দেহের অনাবশ্যক দূষিত পদার্থ ত্যাগ করে, উদ্ভিদ্‌ও তেমনই নানাপ্রকারে তাহার দেহ হইতে দূষিত পদার্থ বাহিরে ত্যাগ করিতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েরই দেহ কতকগুলি **কোষ** (cell) দ্বারা গঠিত।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর তুলনা :

উদ্ভিদ PLANT	ANIMAL প্রাণী
১। সাধারণতঃ স্থানত্যাগ করিতে পারে না। প্রায়ই নড়িতে পারে ; ইহাতে বলক্ষয় কম হয়।	১। সাধারণতঃ স্থানত্যাগ করিতে পারে ; এবং নড়িতেও পারে। ইহাতে বলক্ষয় হয়।
২। দেহে কোন সামঞ্জস্য নাই।	২। দেহে সামঞ্জস্য আছে।
৩। দেহের সকল অংশ এক সঙ্গে বাড়ে না।	৩। সাধারণতঃ দেহের সকল অংশ এক সঙ্গে বাড়ে।
৪। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কোন শ্রেণীতে নাই।	৪। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি নানা ইন্দ্রিয় উচ্চ শ্রেণীতে দেখা যায়।
৫। আহার্য্য পদার্থ স্বীয় শক্তি দ্বারা আহারোপযোগী করে।	৫। আহার্য্য পদার্থ আহারোপযোগী হইলে তবে উদরস্থ করে।
৬। তরল বস্তু খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে।	৬। তরল ও কঠিন উভয় প্রকার খাদ্যই গ্রহণ করিতে পারে।
৭। বাতাসের অঙ্গারাম্ল বাষ্প হইতে অঙ্গার লইয়া অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়।	৭। খাদ্যদ্রব্য হইতে অঙ্গার সংগ্রহ করে।
৮। সাধারণতঃ মাটির নাইট্রেট লবণ হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।	৮। প্রোটিন খাদ্য হইতে নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হয়।

উদ্ভিদ্	প্রাণী
৯। দেহ হইতে নানাপ্রকারে দূষিত পদার্থ ত্যাগ করে, অথবা স্থান বিশেষে সঞ্চিত থাকে।	৯। ঘর্ম্ম, মল, মূত্রাদি রূপে দূষিত পদার্থ ত্যাগ করে।
১০। দেহে প্রায়ই সবুজকণা থাকে।	১০। দেহে সাধারণতঃ সবুজকণা থাকে না।
১১। দেহকোষের আবরণ থাকে।	১১। দেহকোষে আবরণ থাকে না।
১২। জন্ম ও মৃত্যু আছে।	১২। জন্ম ও মৃত্যু আছে।
১৩। দেহের বৃদ্ধিকাল জীবনান্ত পর্য্যন্ত।	১৩। দেহের বৃদ্ধিকাল নির্দ্দিষ্ট।
১৪। বংশ রক্ষা করিতে পারে।	১৪। বংশ রক্ষা করিতে পারে।
১৫। শ্বাসকার্য্য চলে।	১৫। শ্বাসকার্য্য চলে।
১৬। শব্দ করিতে পারে না।	১৬। অনেকেই শব্দ করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করে।
১৭। বুদ্ধি-শক্তি নাই।	১৭। অনেকেরই বুদ্ধি-শক্তি আছে।

Questions

Compare and contrast plants with animals.

Compare and contrast the food of a plant with that of man. How does the plant get its food? (C. U. 1943)

উদ্ভিদ্-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

উদ্ভিদ্ জগতের শ্রেণী বিভাগ (Classification of plants)—সমগ্র উদ্ভিদ্জগৎকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যে সকল উদ্ভিদের বীজ ও পুষ্প নাই, তাহারা অপুষ্পক (Cryptogams); যাহাদের বীজ ও পুষ্প জন্মে, তাহারা সপুষ্পক (Phanerogams)।

অপুষ্পক উদ্ভিদ্ আবার চারিভাগে বিভক্ত। যথা :

১। শৈবাল (Algae)। ২। ছত্রক (Fungi)।
৩। মস (Moss))। ৪। ফার্ণ (Fern)।

সপুষ্পক উদ্ভিদের সাধারণতঃ দুই ভাগ। যথা :

১। নগ্ন বীজ (Gymnosperm)।
২। আবৃত বীজ (Angiosperm)।

আবৃত বীজের আবার দুই প্রকার। যথা :

১। একদল-বীজ (Monocotyledons)।
২। দ্বিদল-বীজ (Dicotyledons)।

উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (The organs of a plant) —মানুষের যেরূপ হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, বৃক্ষেরও সেইরূপ মূল,

কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্রাদি নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। আমাদের প্রতি অঙ্গের যেমন এক একটা নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে, গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তেমনই এক একটা বিশেষ কাজ নির্দ্ধারিত আছে।

সাধারণ বৃহদাকার বৃক্ষের যে অংশ মাটির উপর হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে, তাহার নাম **কাণ্ড** বা **গুঁড়ি**। এই কাণ্ড হইতে বহু শাখা নির্গত হইয়া চারিদিকে প্রসারিত হইয়াছে। প্রতি শাখা হইতে আবার কত প্রশাখা বাহির হইয়াছে। কাণ্ড হইতে শাখা সরু, শাখা হইতে প্রশাখা আরও সরু। গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে।

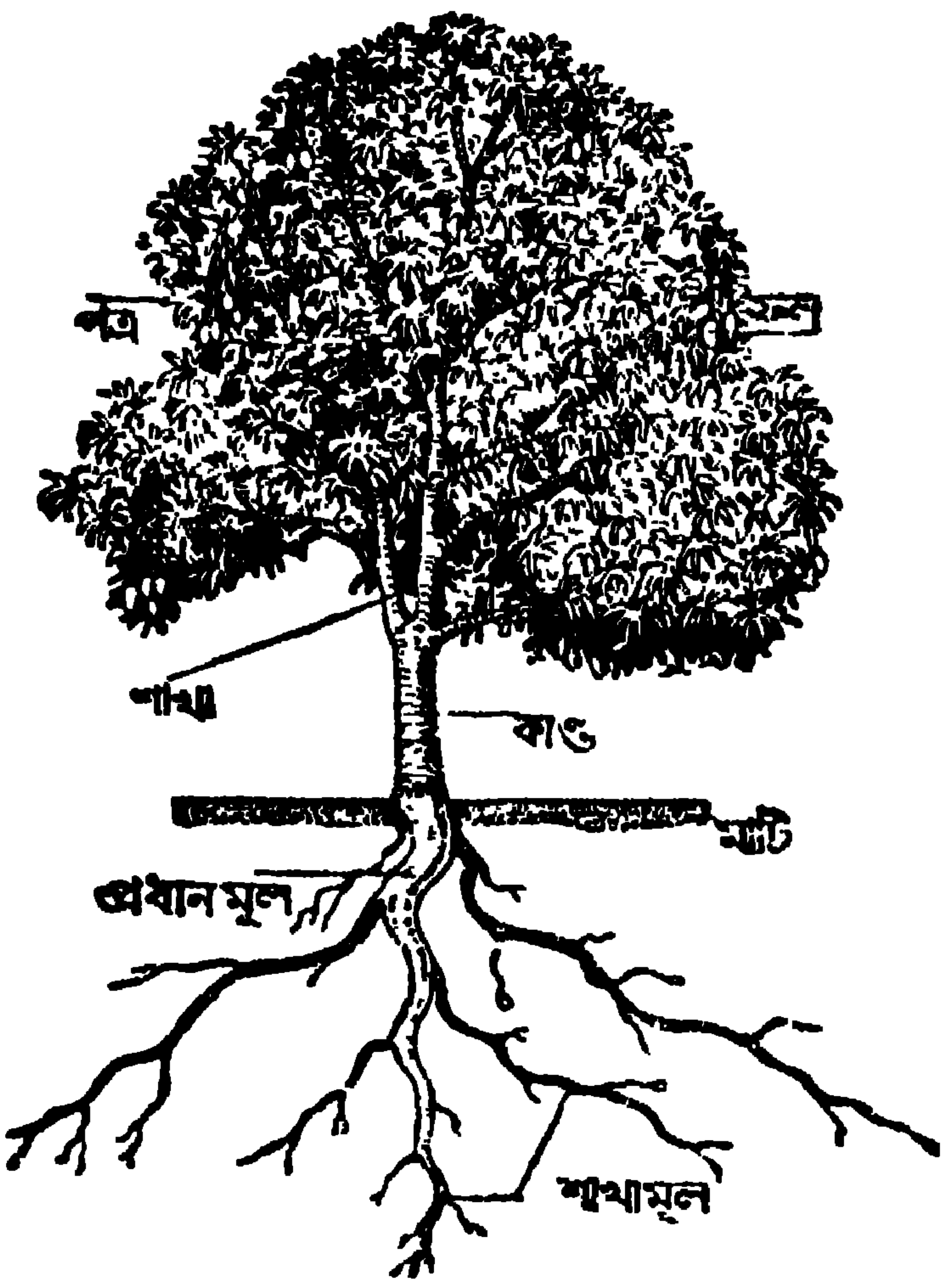

১। আম গাছ

সরু সরু প্রশাখাগুলি হইতে শত শত সবুজ বর্ণের পাতা বাহির হইয়াছে। এই পাতার কোলে আবার কখন কখন মুকুল দেখা দেয়। সেই মুকুল হইতে নূতন ডালপালা বা ফুল বাহির হয়।

এই গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িলে দেখা যাইবে যে উপরের কাণ্ডের মতই একটা প্রধান ভাগ নীচে চলিয়া গিয়াছে ও সেই ভাগ হইতে নানা শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মাটির নীচের এই সমগ্র অংশকে **মূল** বা **শিকড়** বলা যায়।

উদ্ভিদের প্রকারভেদ (Different types of plants)—উদ্ভিদ্ নানাপ্রকার। অতিক্ষুদ্র এককোষ উদ্ভিদ্ হইতে

আরম্ভ করিয়া নানা লতা, গুল্ম, চারা ও বৃহদাকার বৃক্ষ পর্য্যন্ত সমস্তই এই এক উদ্ভিদ্ পর্য্যায়ভুক্ত। গাছ বলিলেই যে তাহার কাণ্ড, মূল, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল থাকিবে এমন কোন কথা নাই।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে শৈবাল ও ছত্রক উদ্ভিদ্ জাতীয় হইলেও তাহাদের দেহকে কাণ্ড ও মূল এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় না।

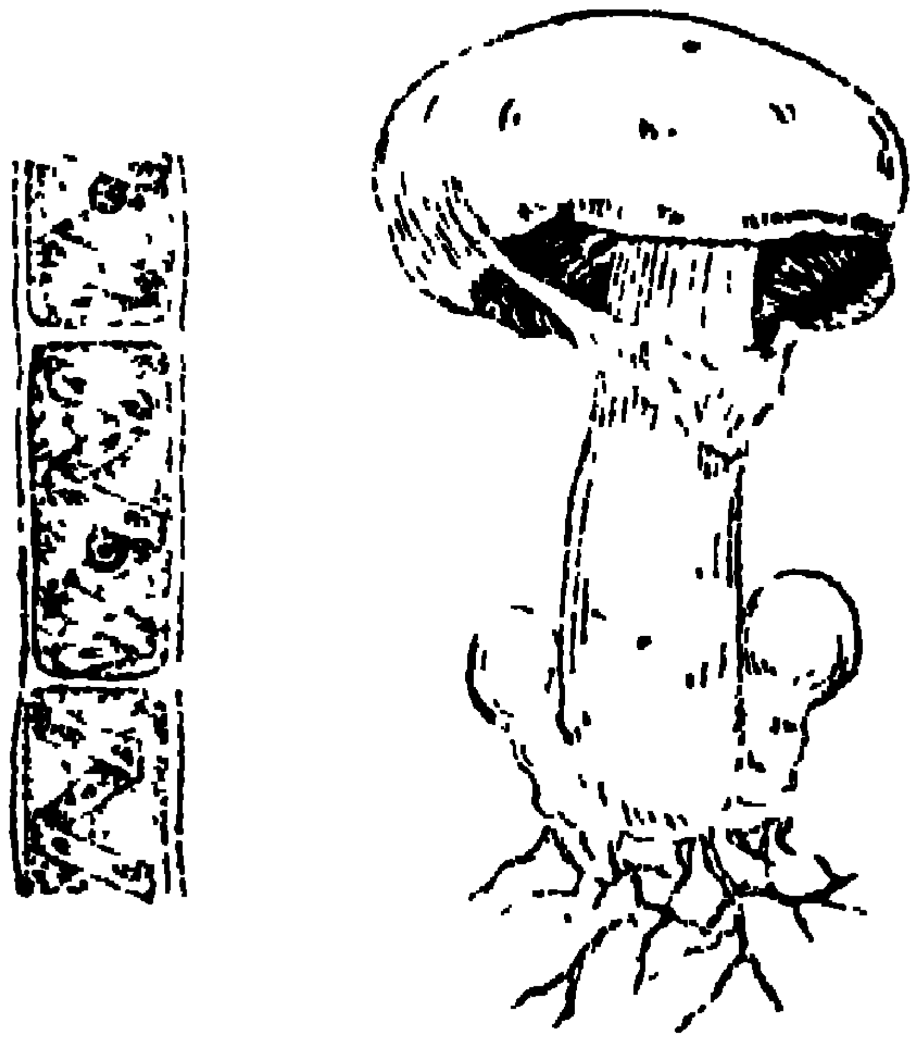

২। শৈবাল ও ছত্রক

সাধারণতঃ সহরের কলতলায়, বা পল্লীগ্রামে পুকুরঘাটের যে সিঁড়ি জলে ডুবিয়া থাকে তাহার উপর, বা ইঁদারার ধারে শেওলা (শৈবাল) দেখা যায়। বর্ষায় জুতা ভিজিয়া গেলে সেই জুতার উপর, অথবা লিখিবার কালীর উপর, এক প্রকার সাদা নরম পদার্থ দেখা দেয়। উহাই **ছাতা (ছত্রক)**।

বর্ষাকালে পুরাতন ভিজা কাঠ বা বাঁশের উপর এক প্রকার সাদা পদার্থ কতকটা ছাতার আকারে দৃষ্ট হয়। তাহাকে ব্যাঙের ছাতা বা ছত্রক কহে। এ সকল গাছে পাতা থাকে না।

বর্ষাকালে দেওয়ালের উপর শেওলার মত যে উদ্ভিদ্ দেখা যায় তাহাকে **মস্** (moss) বলে। ইহাদের মূল বা ফুল কিছুই নাই। এই সকল

গাছে পাতা নাই। **ফার্ণ** জাতীয় কোন উদ্ভিদের ফুল হয় না, অতএব ফলও হয় না। যেমন, ঢেঁকি শাক।

নগ্নবীজক উদ্ভিদের বীজের খোসা বা ঢাকা থাকে না; যেমন, পাইন। সাধারণতঃ আমরা যে সপুষ্পক গাছ দেখিতে পাই, তাহারা আবৃত বীজক গাছ অর্থাৎ তাহাদের বীজের খোসা বা ঢাকা থাকে।

সব গাছের কাণ্ড মাটির উপর থাকে না। আলু, পেঁয়াজ, আদা, কচু, ওল প্রভৃতির কাণ্ডভাগ মাটির নীচে, উপরে শুধু ডালপালা। সে কারণ

৩। ফার্ণ, পেঁয়াজ ও আলু গাছ

ঐ সকল কাণ্ডকে মূল বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু উহারা প্রকৃত মূল নহে। আলু প্রভৃতিতে এই কারণ গাঁইট বা পাব ও ছোট ছোট আঁশের মত পাতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে **শল্কপত্র** (scale leaf) কহে।

মূল অংশও সকল সময় মাটির নীচে থাকে না।

সাধারণতঃ ফলের মধ্যে বীজ থাকে। কতকগুলি বীজের খোসা বা ঢাকা থাকে না। এই সকল বীজের গাছকে **নগ্নবীজ উদ্ভিদ্** বলে।

যেমন, পাইন। আর কতকগুলি বীজের খোসা বা ঢাকা থাকে। সেই সকল বীজের গাছকে **আবৃতবীজ উদ্ভিদ্** কহে। সাধারণতঃ যে সকল সপুষ্পক বৃক্ষ দেখিতে পাই তাহারা আবৃতবীজ। ফুল, ফল বা বীজ বেশী দিন গাছের উপর থাকে না। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কাজ শেষ হইলেই তাহারা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে।

উদ্ভিদ্ জগতের শ্রেণীবিভাগের ছক

(Tabular classification of the plant kingdom)

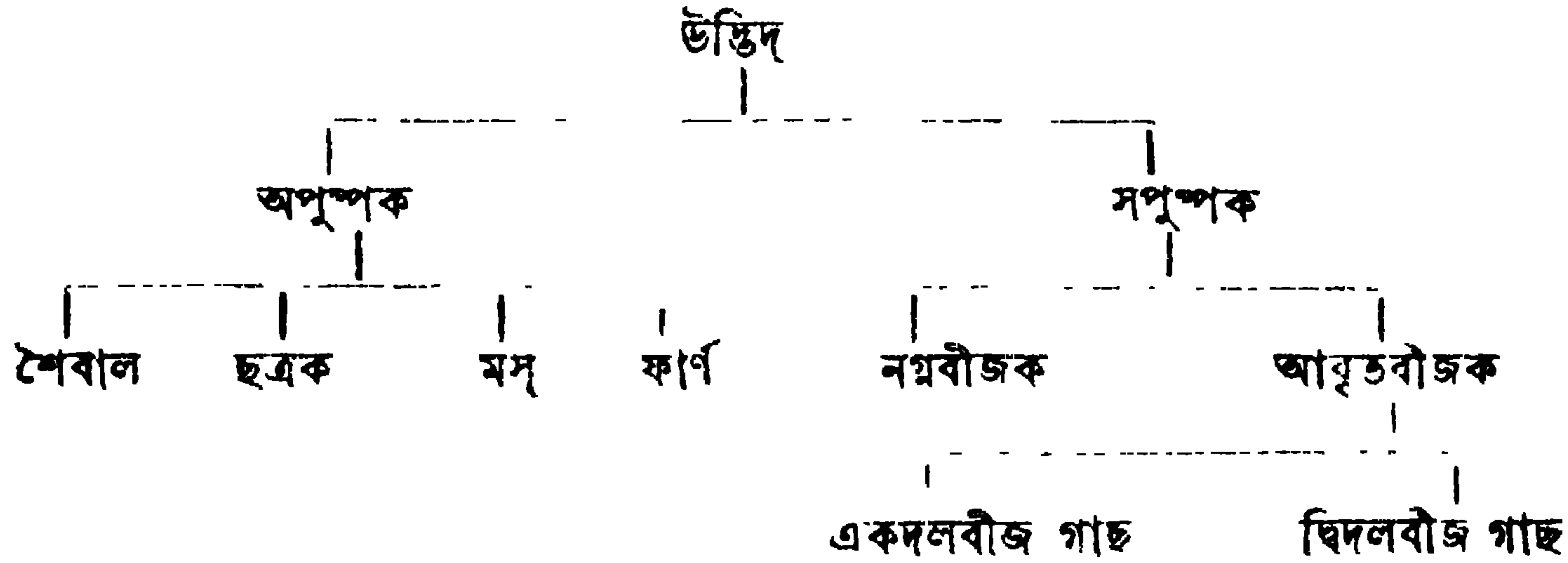

Questions

1. Classify the plant kingdom.
2. Describe the general morphology of a plant and indicate the functions of its different parts.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বীজ ও গাছের জন্ম

বীজের প্রকারভেদ (Different forms of seeds) —বীজ নানাপ্রকার। আম, কুল, পীচ ইত্যাদি ফলের শাঁসের মাঝখানে একটি আঁটি বা বীজ থাকে। কাঁঠাল ও আতার প্রত্যেক কোষের মধ্যে একটি বীজ থাকে। আপেল ও নাসপাতি ফলের মধ্যখানে লম্বা এক শক্ত আবরণের মধ্যে একাধিক বীজ দেখা যায়। আঙ্গুর, পেয়ারা, আঞ্জীরের শাঁসের মাঝে মাঝে অনেক বীজ থাকে। পোস্ত দানা (বা আফিম গাছের বীজ) পেয়ালার মত আকৃতি এক ঢেঁড়ির মধ্যে থাকে। লাউ, কুমড়া, তরমুজ, খরমুজার বীজ ঐ ঐ ফলের মাঝখানে এক সঙ্গে সারবন্দি অনেক পাওয়া যায়। শিম, মটর, মুগ, কলাই এরা শুঁটির ভিতর সারবন্দি থাকে। ছোলাও শুঁটির ভিতর থাকে, তবে এক শুঁটিতে সাধারণতঃ মাত্র দুইটি। ধান, গম, যব, ভুট্টা, বাজরা, জওয়ার ইত্যাদি গাছের শীষের উপর সাজান থাকে। উহাদের বীজ থাকে দানার মধ্যে। সজিনা গাছের বীজ ডাঁটার ভিতর লম্বালম্বি অনেকগুলি সাজান থাকে। সরিষা, মূলা ইত্যাদির বীজও শুঁটির মধ্যে থাকে।

ছোলা, মুগ জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা হইতে কল বা অঙ্কুর বাহির হয়। এই অঙ্কুরোদ্গমকেই বৃক্ষের জন্ম বলা হয়। এই ক্ষুদ্র অঙ্কুর সমেত বীজ মাটিতে পোঁতা থাকিলে ধীরে ধীরে শাখাপত্রশোভিত বৃক্ষে পরিণত হইবে।

প্রত্যেক বীজের খোসার উপর একটি দাগ দেখা যায়। বীজ খসিয়া পড়ার আগে ঐ দাগের স্থানেই উহা ফলের মধ্যে সংলগ্ন ছিল। ঐ দাগের

নাম **প্রবীজ-নাভি** (hilum)। নাভির উপরে একটি ছিদ্র দেখা যায়। তাহাকে **ডিম্বকরন্ধ্র** (micropyle) কহে। ভিজা বীজের উপর চাপ দিলে ঐ রন্ধ্রপথে জল বাহির হয়। উহার মধ্য দিয়াই অঙ্কুরোদ্গমের সময় মূল নির্গত হইতে দেখা যায়।

ভ্রূণ ও তাহার দেহসংলগ্ন খাদ্য—শুষ্ক অবস্থায় বীজ অপেক্ষাকৃত কঠিন ; জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইলে উহা নরম হইয়া যায়।

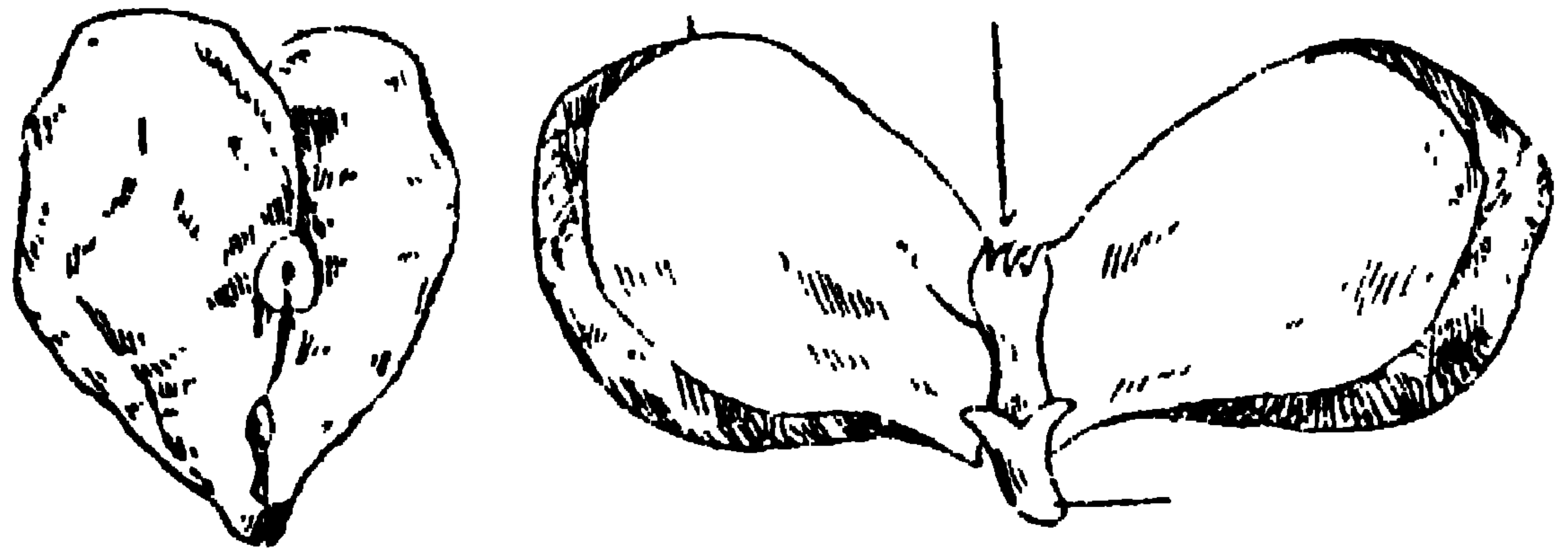

৪। ছোলা ও উহার ভ্রূণ

ভিজা নরম ছোলা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে বাহিরের বাদামী রঙের খোসার মধ্যে এক জোড়া মোটা দল বা দানা আছে। এই দুইটির বাহির দিকটা গোল, ভিতর দিকটা চেপ্টা। ইহাদের নাম **বীজপত্র** বা **বীজদল** (cotyledon)। ইহাদিগকে পৃথক্ করিলে দেখা যায় একটি দণ্ডে এই দুই দল বা দানা আটকান ছিল। এই বীজদল সমেত দণ্ডটি ছোলার **ভ্রূণ** (embryo)। দণ্ডের নীচের দিকটাকে **ভ্রূণ মূল** বা **ভাবী মূল** (radicle) ও মাথার দিকটাকে **ভ্রূণ কাণ্ড** বা **ভাবী কাণ্ড** (plumule) বলে। এই কাণ্ড ও মূলের মাঝখানে দুই বীজপত্র আটকান থাকে। বীজপত্রের শাঁস ভ্রূণের খাদ্য।

মটর বীজের ভিতরের ব্যবস্থা ছোলারই অনুরূপ। রেড়ি বীজ কিন্তু

ছোলা মটরের মত দ্বিদল হইলেও তাহা অন্যপ্রকার। এই বীজ বেশ কঠিন। ইহার খোসার মধ্যে একটি পাতলা পরদা থাকে। সেই পরদার মধ্যে খানিকটা সাদা শাঁস থাকে। শাঁসের মধ্যে ভ্রূণ ও ভ্রূণের সহিত দুইটি পাতলা বীজপত্র থাকে। বীজদলের গায়ে লম্বা লম্বা সূক্ষ্ম শিরা, যেরূপ শিরা গাছের পাতার উপর দৃষ্টিগোচর হয়। ছোলা মটরের ভ্রূণের খাদ্য বীজপত্রের মধ্যস্থ শাঁস, কিন্তু রেড়ির ভ্রূণের খাদ্য বীজপত্রের বাহিরের

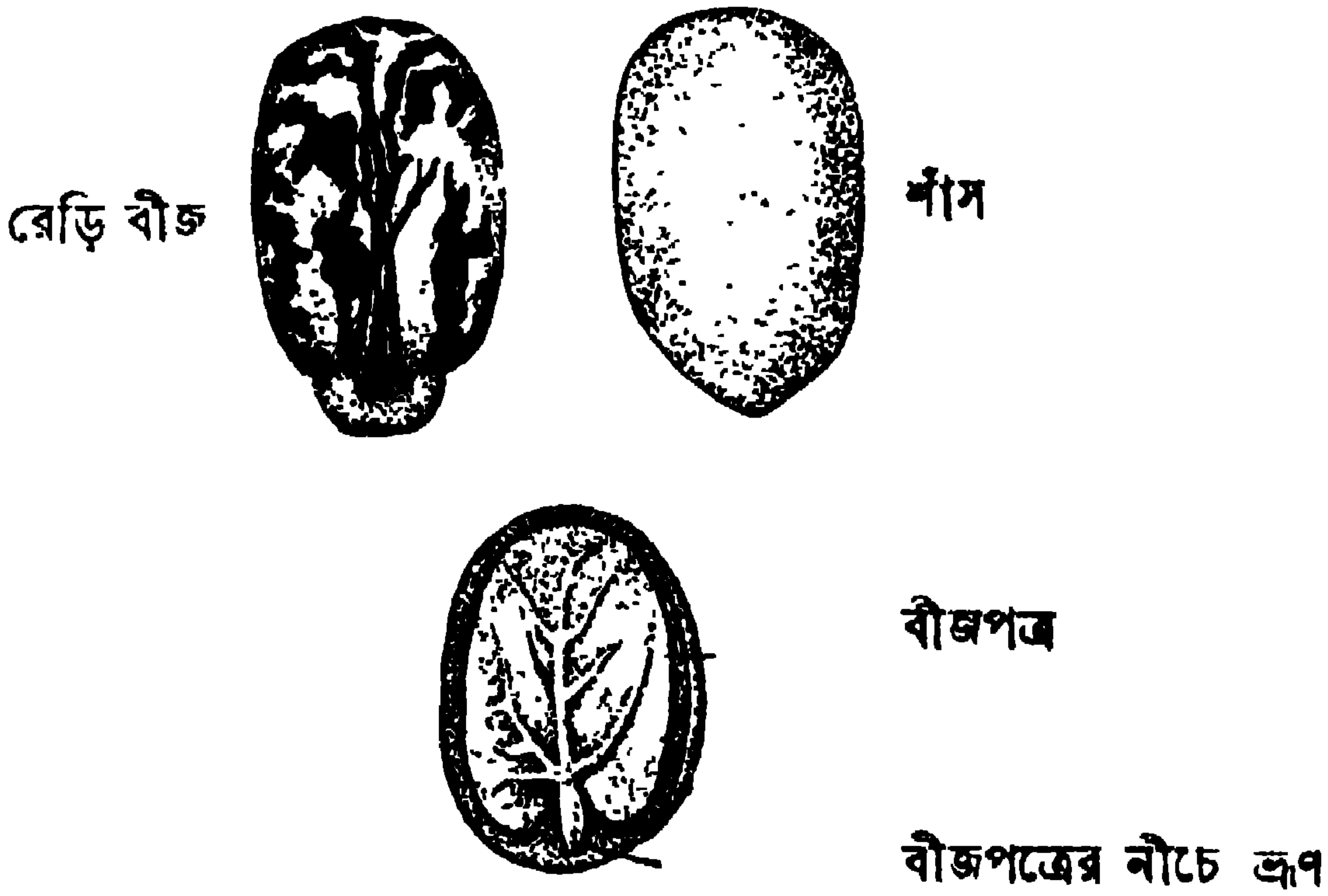

৫। রেড়ি বীজ ও তাহার ভিতরের অংশ

শাঁস। ছোলা মটরকে তাহাতেই বলে **অন্তঃসার** (exalbuminous, or nonendospermic) বীজ, রেড়িকে বলে **বহিঃসার** (albuminous or endospermic) বীজ। অন্তঃসার বীজের বীজপত্র পুরু ও বহিঃসার বীজের বীজপত্র খুব পাতলা।

ধান বা ভুট্টার দানা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় প্রথম বাহিরের সোনালী বর্ণের খোসা বা ছাল। এই ছাল বেশ শক্ত। ধান ও ভুট্টার দানা প্রকৃতপক্ষে ফল, বীজ নহে। বীজ ঐ ফলের মধ্যে থাকে। একটি ভিজা ভুট্টার দানাকে লম্বালম্বি কাটিলেই বুঝা যায় যে ফলের আবরণ ও বীজের

আবরণ মিলিয়া বাহিরের খোসা এরূপ শক্ত হইয়াছে। দানার এক পাশে ভ্রূণ রহিয়াছে ও বাকী ভাগটা শাঁসে পূর্ণ।

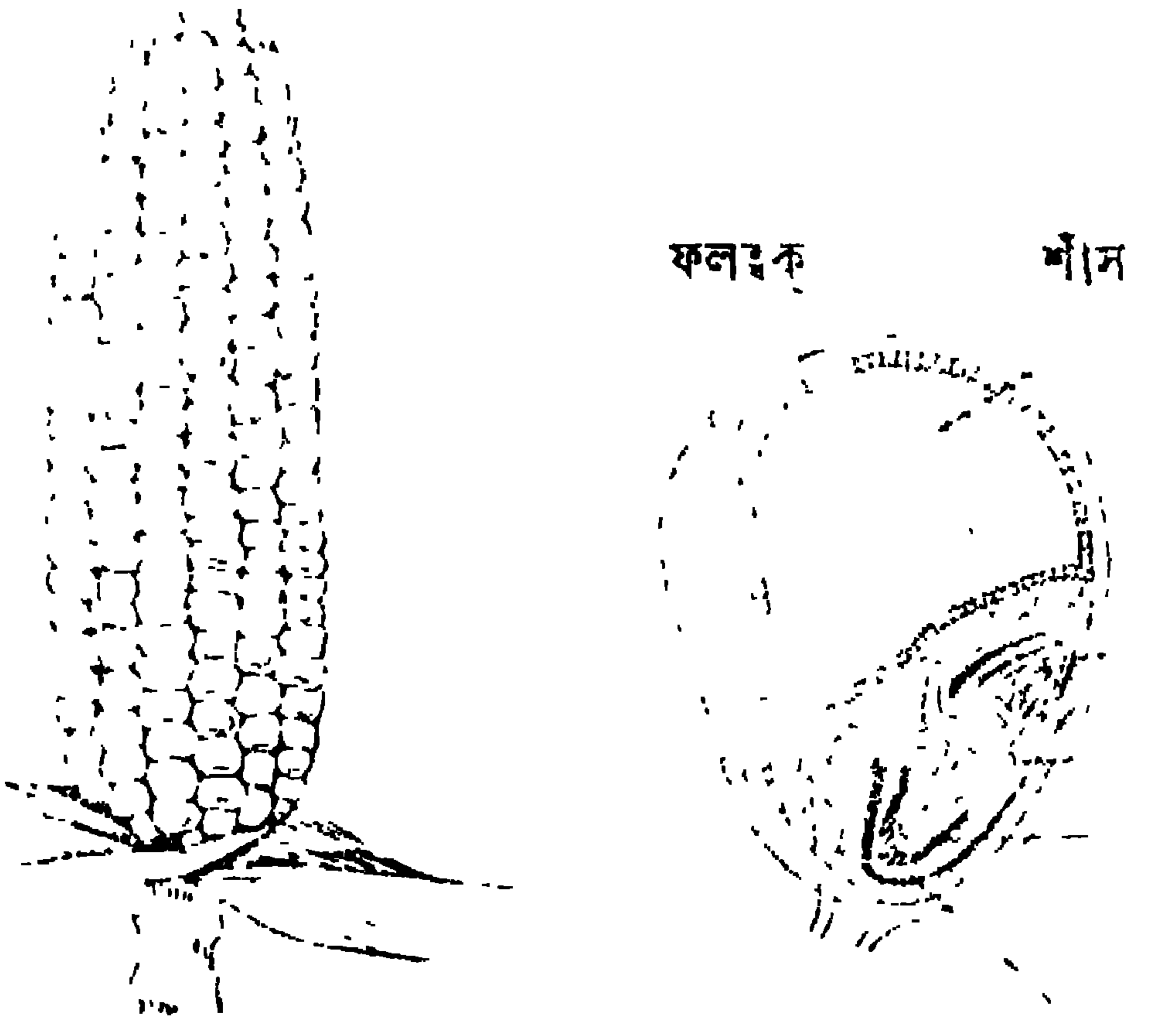

৬। ভুট্টা ও ভুট্টাদানার অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ

ভিজা ধানের খোসা ছাড়াইলে ভিতরের তণ্ডুল বা চাল বাহির হইয়া পড়ে। চালের উপর যে লাল্‌চে আবরণ থাকে, তাহাই বীজ ও ফলের একত্রিত খোসা। ভুট্টার মত চালেরও দেখা যায় এক পাশে ভ্রূণ ও বাকাটা ভ্রূণের সঞ্চিত খাদ্য। চাল কাঁড়ার সময় ভ্রূণ খসিয়া পড়ে। ইহাই চালের **খুদ**। ভুট্টা ও ধান বহিঃসার বীজ।

ইহারা **একদল বীজ,** ছোলার মত দ্বিদল নহে। ভ্রূণ পরীক্ষা করিলে কিন্তু দেখা যায় যে ইহাদেরও উপরের দিকে ভাবী কাণ্ড ও নীচের দিকে ভাবী মূল। ভ্রূণ ও শাঁসের মধ্যস্থ পরদাই ইহাদের বীজপত্রের পৃষ্ঠভাগ; এই চালের মত পরদাকে **স্কুটেলাম** (scutellum) কহে। ইহার সাহায্যে ভ্রূণ তাহার খাদ্য শোষণ করে।

বীজের অঙ্কুরোদ্গম (Germination of the seed)—বীজের মধ্যের ভ্রূণ যেন ঘুমন্ত অবস্থায় রহিয়াছে; **বাতাস, তাপ ও জলের স্পর্শে** জাগিয়া উঠে। বীজ হইতে কল বাহির হয়। এই জাগরণকে বলে **অঙ্কুরোদ্গম** (germination)। বায়ু অর্থাৎ বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস, তাপ ও জল, ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য তিনেরই প্রয়োজন। একটিরও অভাব হইলে চলিবে না। কোনটির আধিক্য হইলেও চলিবে না। সাধারণ বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য আলোর দরকার হয় না, বরং উহাতে বিঘ্ন ঘটে। সেজন্য বীজ বুনিয়া মাটি চাপা দিতে হয়। অঙ্কুর বাহির হইবার পর সূর্য্যালোক বিশেষ দরকার হয়।

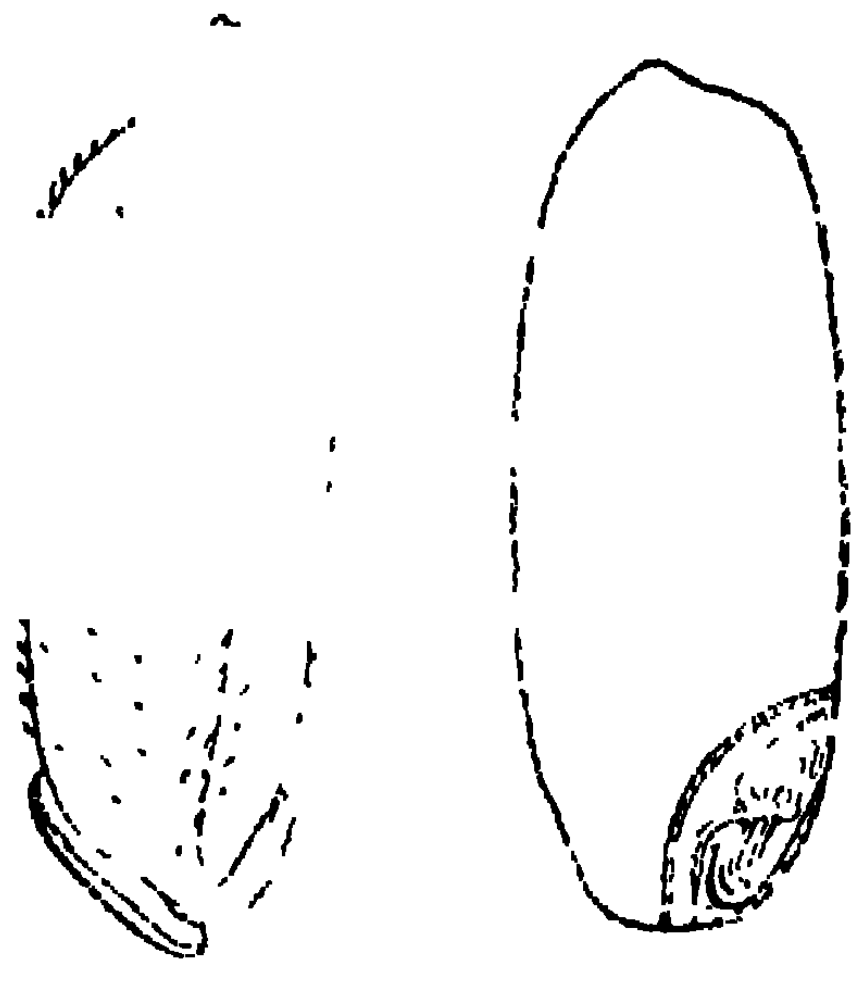

৭। ধান ও চাউলের অনুদীর্ঘচ্ছেদ

অঙ্কুরোদ্গমের পরীক্ষা (Experiments on germination)—একটি কাচপাত্রের অর্দ্ধেক জল ভরিয়া রাখ। এখন একটি কাষ্ঠফলক লইয়া গলান মোমে ডুবাও। মোম গায়ে লাগিলে আর কাষ্ঠফলক জল শুষিতে পারিবে না। পরে সেই কাষ্ঠফলক কাচপাত্রের জলে রাখিয়া তাহাতে তিনটি ছোলা এমনভাবে পিন দিয়া আঁটিয়া দাও যে বীজগুলি কাঠে না ঠেকিয়া থাকে ও প্রথম বীজটি জলের বাহিরে থাকে, দ্বিতীয়টি জলে অর্দ্ধমগ্ন থাকে, ও তৃতীয়টি একেবারে জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। দেখিবে যে তিনটি বীজের মধ্যে মাত্র দ্বিতীয়টি অঙ্কুরিত হইবে। অপর দুইটির অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা অল্পই। ইহার কারণ প্রথমটি জল পায় নাই, তৃতীয়টি বায়ু পায় নাই, দ্বিতীয়টি দুই-ই পাইয়াছে।

জলবায়ু ছাড়া তাপেরও প্রয়োজন। সেই নিমিত্ত অতি শীতল প্রদেশে গাছপালা জন্মে না। চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের উপর বড় একটা গাছ নাই। যত নীচে আসা যায়, গাছপালার সংখ্যা ততই বেশী।

৮। ছোলা বীজ ও অঙ্কুরোদ্গমের অনুকূল অবস্থায় ছোলা চারা

সাহারার মত মরুদেশে বড় একটা গাছপালা জন্মে না। সেখানে জল সেচন করিলেও সাধারণ বীজ অঙ্কুরিত হইবে না। কারণ অত্যধিক উত্তাপও অতিরিক্ত শীতের ন্যায় অঙ্কুরোদ্গমের অন্তরায়। সাধারণ অবস্থায় বীজমধ্যস্থ ভ্রূণ দীর্ঘকাল অবাধে ঘুমাইয়া থাকে। কিন্তু শীত কি উত্তাপ অত্যধিক লাগিলে তাহার নিদ্রা চিরনিদ্রায় পরিণত হয়, আর জাগরণের সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য উপরিউক্ত পরীক্ষায় কাচপাত্রের জল বেশী ঠাণ্ডা বা বেশী গরম হইলে কোনও বীজই অঙ্কুরিত হইবে না।

ধান বা মটরের বীজকে বপন করিয়া যদি প্রয়োজনমত জল, বায়ু ও উত্তাপের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে তাহাদের ভাবী কাণ্ডগুলি ঊর্দ্ধমুখী হইবে ও ভাবী মূল অধোমুখী হইবে। যেমন ভাবেই বীজ বপন করা হউক না কেন, আপনা হইতে কাণ্ড উপরে ও মূল নীচে যাইবেই।

কতকগুলি বীজদল অঙ্কুরোদ্গমের পর মাটির নীচেই থাকে। ইহাকে **মৃত্তিকাস্থ অঙ্কুরোদ্গম** (hypogeal germination) বলে।

একদল বীজের সাধারণতঃ এই রীতি। কিন্তু কোন কোন দ্বিদল বীজও এই শ্রেণীভুক্ত—যথা, কড়াইশুঁটি।

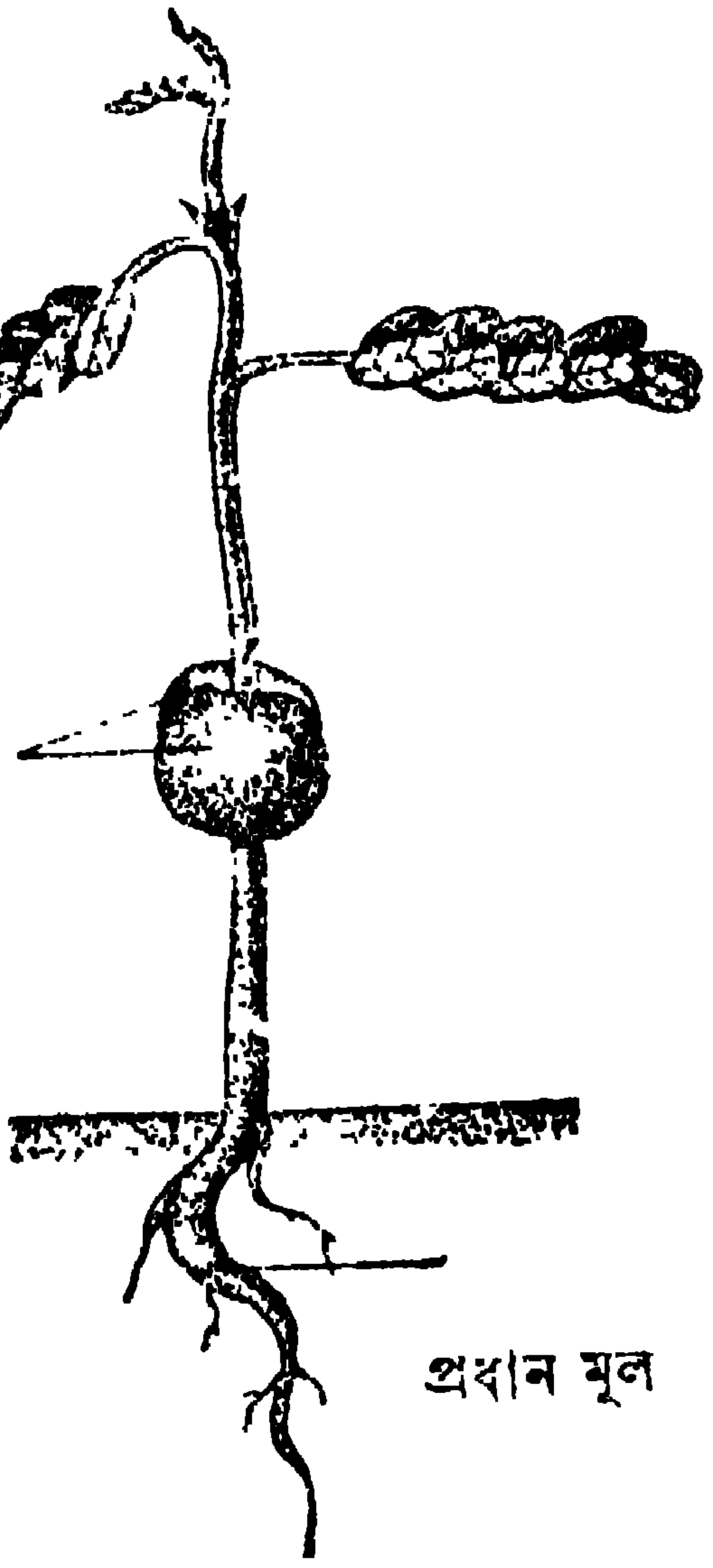

৯। তেঁতুলের মৃদ্ভেদী অঙ্কুরোদ্গম

যে সকল বীজদল অঙ্কুরোদ্গমের পরে অবিলম্বে মাটির উপরে উঠিয়া আসে, আমাদের পরিচিত তেঁতুল সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রকার অঙ্কুরোদ্গমের নাম **মৃদ্ভেদী অঙ্কুরোদ্গম** (epigeal germination)।

একদল বীজক ধানের অঙ্কুরোদ্গম—ভিজা ধান আলগা মাটিতে পুঁতিয়া পরিমাণ মত জল দিলে দুই এক দিনের মধ্যে দেখিবে প্রত্যেক দানার খোসা ফাটিয়া গিয়া ভাবী মূল বাহির হইয়া নীচে যাইতেছে। লক্ষ্য রাখিলে দেখিতে পাইবে ভাবীমূল শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এ কারণ বীজদণ্ডের গোড়া হইতে গুচ্ছমূল বাহির হয়। ইতিমধ্যে ভাবীকাণ্ড মাটি ভেদ করিয়া বাহিরে উঠিতে থাকে। ভাবীকাণ্ড প্রথমে একটা পাতলা আবরণে ঢাকা থাকে, পরে ঐ আবরণ ভেদ করিয়া ভাবী কাণ্ড বাহির হয়। ধানের মৃত্তিকাস্থ অঙ্কুরোদ্গম, সেজন্য বীজপত্র নীচেই থাকে।

দ্বিদল বীজক মটরের অঙ্কুরোদ্গম—ভিজা মটর দানা আলগা মাটিতে পুঁতিয়া পরিমাণ মত জল দিলে বীজের খোসা

ডিম্বক রন্ধ্রের কাছে ফাটিয়া গিয়া ভাবীমূল বাহির হইয়া নীচে যাইবে। ক্রমে উহার গায়ে শাখা-মূল বাহির হইবে। ভাবীকাণ্ড মাটি ফুঁড়িয়া উপরে উঠিবে। পুরু বীজপত্র দুইটি ক্রমে পাতলা হইয়া মাটির মধ্যেই খসিয়া পড়ে। তাহা হইলে মটর বীজেরও মৃত্তিকাস্থ অঙ্কুরোদ্গম।

একদল ও দ্বিদল বীজ ও উহাদের অঙ্কুরোদ্গমের তুলনা

একদল বীজ	দ্বিদল বীজ
১। সাধারণতঃ বীজদল একটি।	১। সাধারণতঃ বীজদল দুইটি।
২। বেশীর ভাগই বহিঃসার বীজ (endospermic)।	২। বেশীর ভাগই অন্তঃসার বীজ (non-endospermic)।
৩। ভাবী কাণ্ড পার্শ্বে (lateral) থাকে ও বীজদল অন্তে (terminal) থাকে।	৩। ভাবী কাণ্ড অন্তে ও বীজদল পার্শ্বে থাকে।
৪। ভাবী কাণ্ড বীজদলের বৃন্ত-বৃদ্ধিতে বাহিরে আইসে।	৪। ভাবী কাণ্ড বীজদলের নিজের বৃদ্ধিতে বাহিরে আইসে।
৫। সাধারণতঃ মৃত্তিকাস্থ অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়।	৫। মৃত্তিকাস্থ ও মৃদ্ভেদী উভয় প্রকার অঙ্কুরোদ্গমই দেখা যায়।
৬। ভাবীমূল প্রধান মূলে পরিণত হয় না; কিন্তু তাহার স্থানে গুচ্ছমূল জন্মায়।	৬। ভাবী মূল প্রায়ই প্রধান মূলে পরিণত হয়।

Questions

1. What is the difference between albuminous and exalbuminous seeds?
2. What are the three main conditions for germination of seeds?
3. Compare monocotyledonous with dicotyledonous seeds and their germination?
4. Write short notes on:—
   cotyledon, plumule, radicle, micropyle, hilum, scutellum, epigeal and hypogeal germination.

তৃতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদ্

মূল ও তাহার কার্য্য

(The root and its functions)

নানাবিধ মূল—মটর প্রভৃতি দ্বিদল বীজ অঙ্কুরিত হইলে প্রথমে তাহার ভ্রূণমূল নির্গত হইয়া নীচে মাটির ভিতর প্রসারিত হয়। ইহাকে **প্রধান মূল** (tap-root) বলে (চিত্র ১, ৯, ৪৪); পরে তাহা হইতে বহু শাখাপ্রশাখা বাহির হয়।

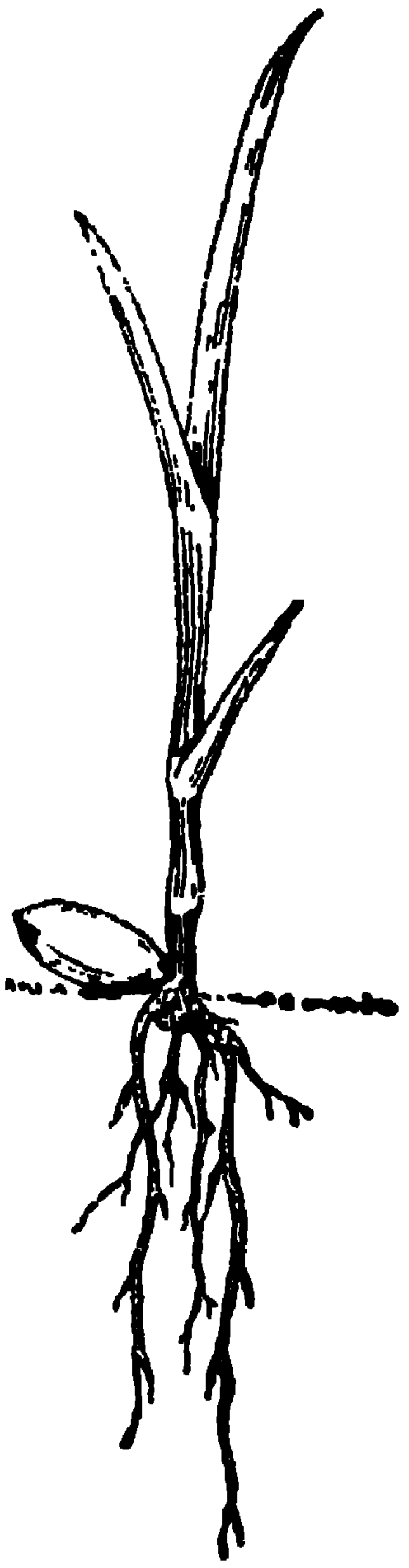

। ধানের ভাবীমূল ও ভাবীকাণ্ড

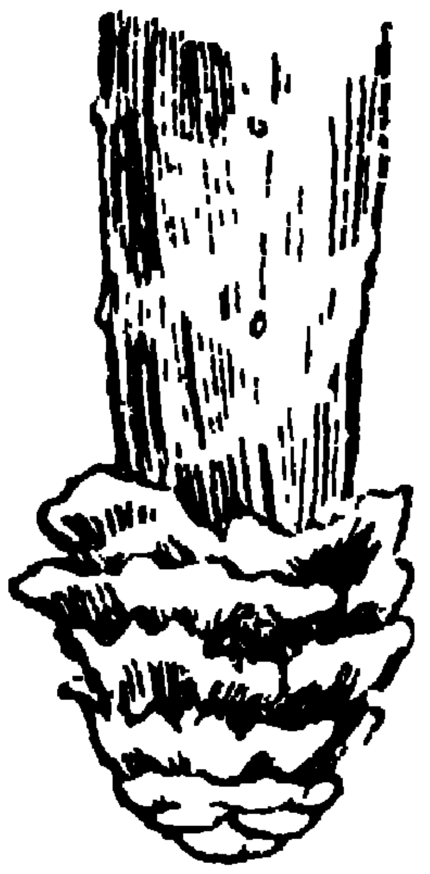

১১। কেয়া ফুলের বায়বীয় মূলের মূলত্র

ধানের বীজ হইতে যে ভ্রূণমূল বাহিরে আসে, তাহা কিন্তু বেশী দিন থাকে না। তাহার পরিবর্ত্তে কাণ্ডের গোড়া হইতেই এক গোছা সূক্ষ্ম মূল নির্গত হয়। এই প্রকার মূলের নাম **গুচ্ছ-মূল** (fibrous root)। সাধারণতঃ একদল বীজ হইতে যে গাছ জন্মায়, তাহার গুচ্ছমূল হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মূলের আগায় একটি টুপির মত ঢাকনি থাকে। শক্ত মাটি ভেদ করিবার সময় যাহাতে কোমল মূলে আঘাত না লাগে সেইজন্য টুপির ব্যবস্থা। এই টুপির নাম **মূলত্র** (root-cap)। কেতকীর (কেয়া ফুল)

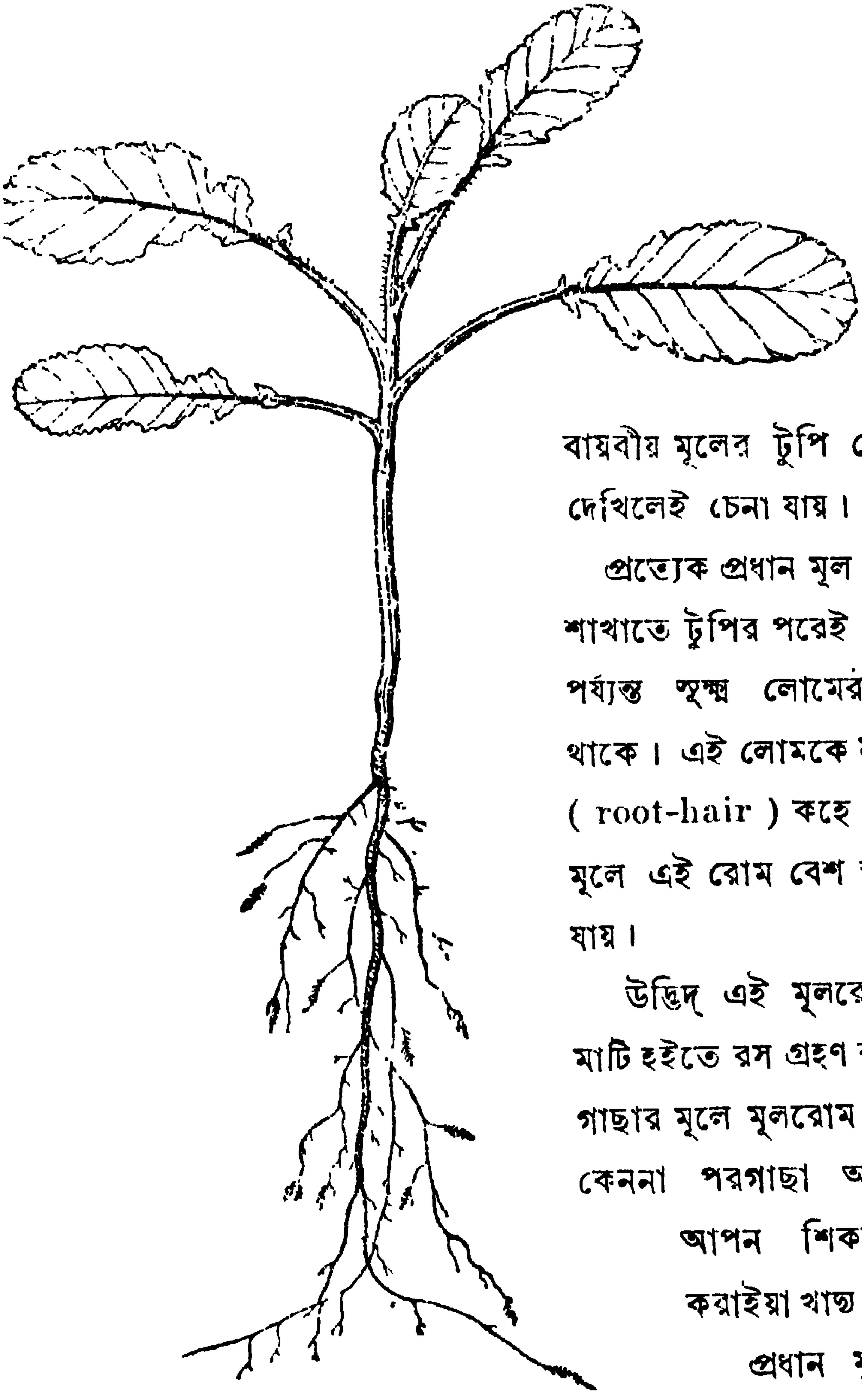

বায়বীয় মূলের টুপি বেশ বড়, দেখিলেই চেনা যায়।

প্রত্যেক প্রধান মূল ও তাহার শাখাতে টুপির পরেই খানিকটা পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম লোমের আবরণ থাকে। এই লোমকে **মূলরোম** (root-hair) কহে। সরিষার মূলে এই রোম বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

উদ্ভিদ্ এই মূলরোম দিয়াই মাটি হইতে রস গ্রহণ করে। পরগাছার মূলে মূলরোম থাকে না, কেননা পরগাছা অন্য গাছে আপন শিকড় প্রবেশ করাইয়া খাদ্য সঞ্চয় করে। প্রধান মূল আবার

১২। সরিষা চারার মূলরোম

সময় সময় ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য-ভাণ্ডারের কার্য্য করে। এই খাদ্যসঞ্চয়ের জন্য মূলের আকৃতিও মোটা হয়।

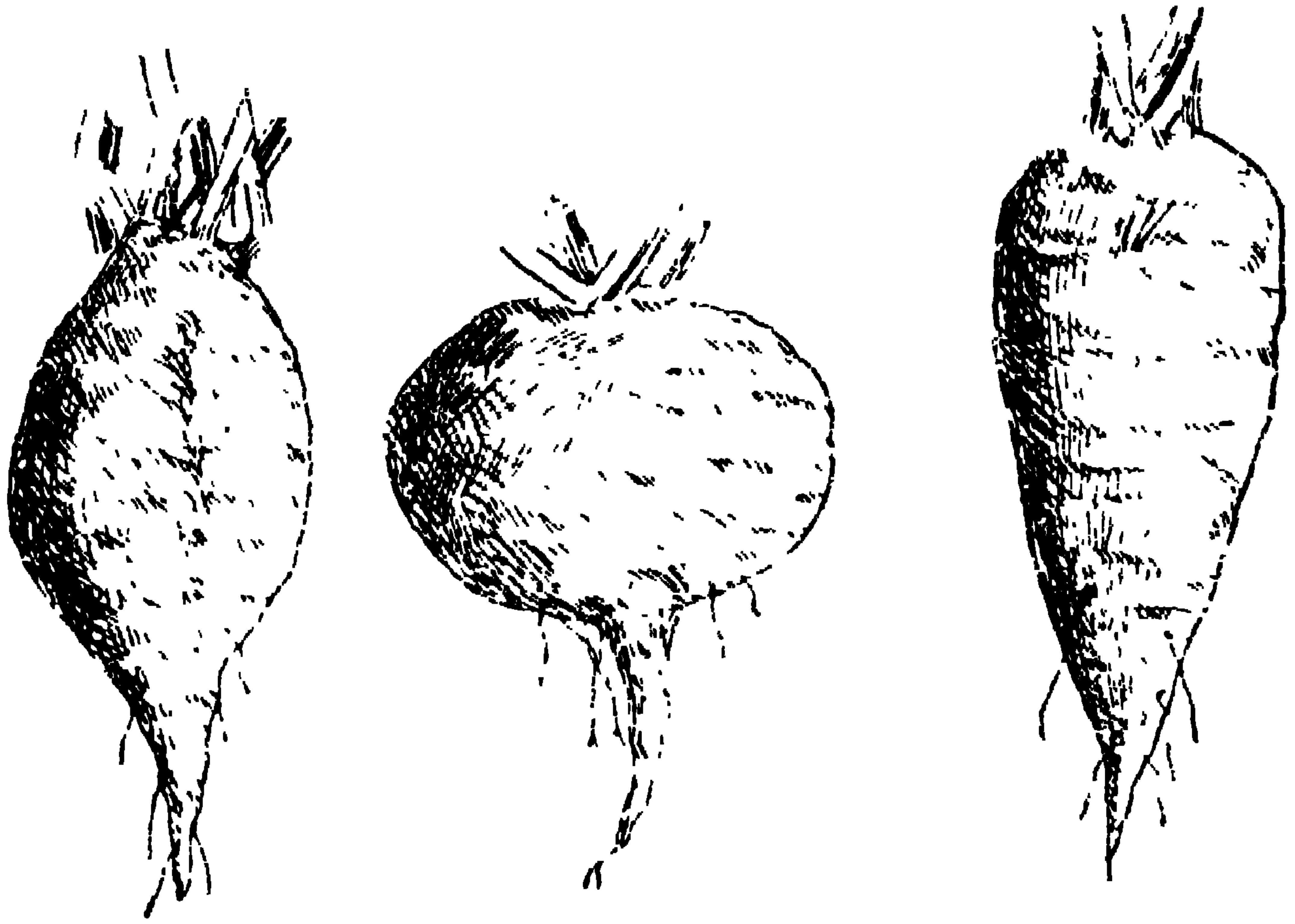

১৩। মূলা, শালগম ও গাজর

মূলের মধ্যভাগ মোটা ও দুই দিক্ সরু হইলে তাহাকে **মূলাকৃতি** (fusiform) বলা হয়। যথা,—মূলা।*

যখন মূল গোলাকার হয়, ও তাহার নীচে হইতে একটি সরু শিকড় মাটির ভিতর চলিয়া যায়, তখন তাহাকে বলে **শালগমাকৃতি** (napiform)। যথা,—শালগম।*

মূলের উপর দিক্ মোটা ও নীচের দিক্ ক্রমশঃ সরু হইয়া গেলে তাহার নাম **গাজরাকৃতি** (conical)। যেমন,—গাজর।

গুচ্ছমূলও কখন কখন ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে। এই

* একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে দেশী মূলা ও শালগমের যাহা আপাত-দৃষ্টিতে মূল বলিয়া মনে হয়, তাহার সবটাই মূল নহে। উহার উপর দিকে সামান্য কাণ্ডের অংশ থাকে।

গুচ্ছমূলের প্রত্যেকটি বা দুই একটি মোটা হয়। প্রথমটির উদাহরণ শতমূলী। দ্বিতীয়টির উদাহরণ রাঙ্গা আলু, শাক আলু প্রভৃতি।

মূলের প্রকারভেদ—ভ্রূণমূল হইতে যে মূল হয় তাহাকে **প্রকৃত মূল** (true root) কহে। ইহা ছাড়া কখনও কাণ্ড, কখনও পাতা হইতেও মূল বহির্গত হয়। এই প্রকার মূলকে **অস্থানিক মূল** (adventitious root) বলে।

অস্থানিক মূল নানা প্রকার

(Different forms of adventitious roots)

(১) **স্তম্ভমূল** (prop root)—শাখা হইতে মূল বাহির হইয়া মাটি স্পর্শ করিয়া শাখার ভার বহন করে। যেমন, বট অশ্বত্থের ঝুরি।

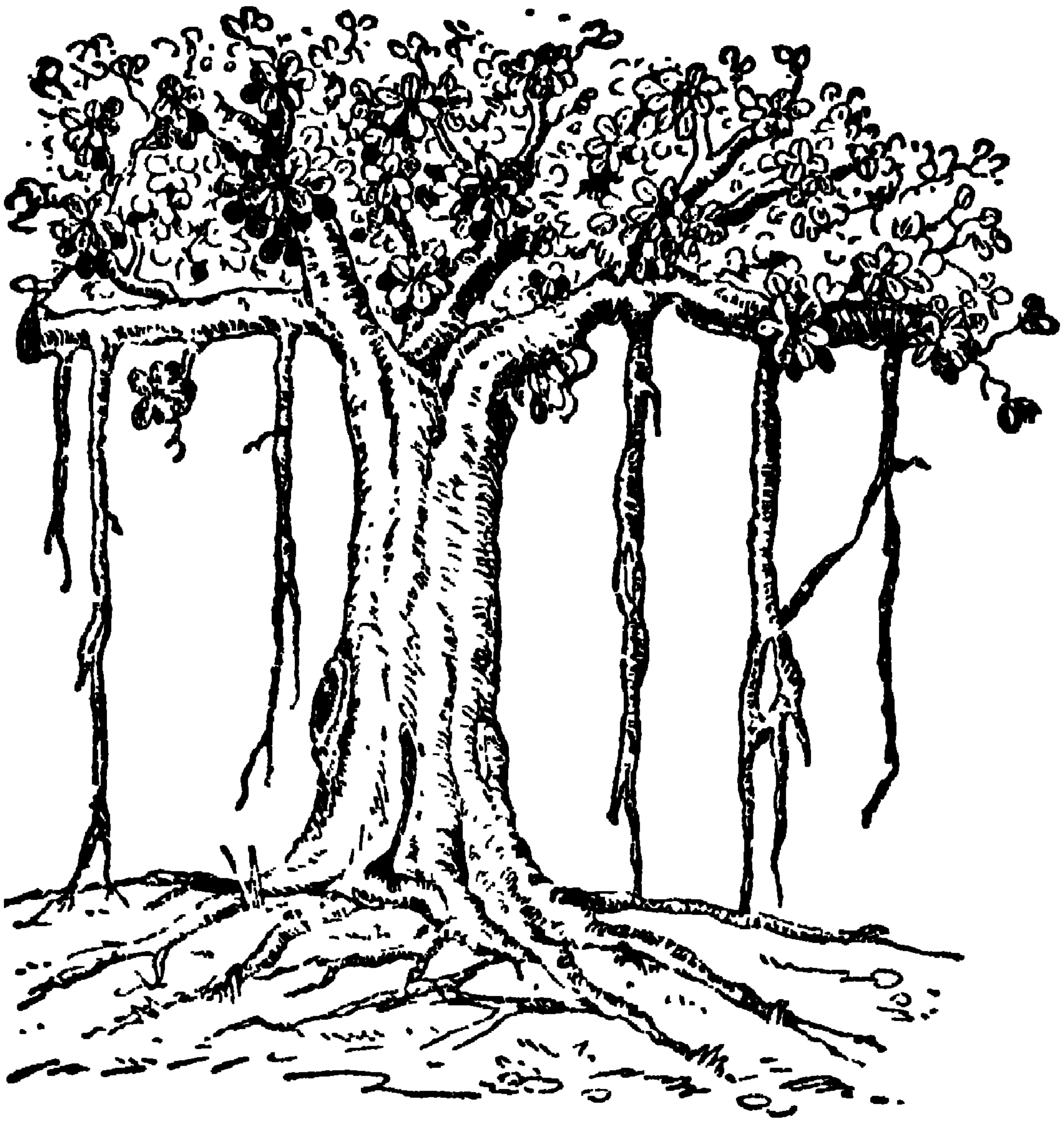

১৪। বটের ঝুরি

(২) **ঠেস মূল** (stilt root)—কাণ্ড হইতে হেলান ভাবে মূল বাহির হইয়া মাটি স্পর্শ করে। ইহাতে গাছ কতকটা সোজাভাবে দাঁড়াইতে পারে। যেমন, কেতকীর ঠেসমূল।

(৩) **আরোহী মূল** (climbing root)—কতকগুলি দুর্ব্বলদেহ গাছ বৃহৎ বৃক্ষের দেহে অস্থানিক মূল আটকাইয়া উপরে উঠিয়া যায়। ইহারা এই উপায়ে আপন দেহকে ঝড়-ঝাপটার হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখে ও উপরে আরোহণ করে। এই প্রকার মূলকে **আরোহী মূল** বলা হয়। যথা, গজপিঁপুলের আরোহী মূল।

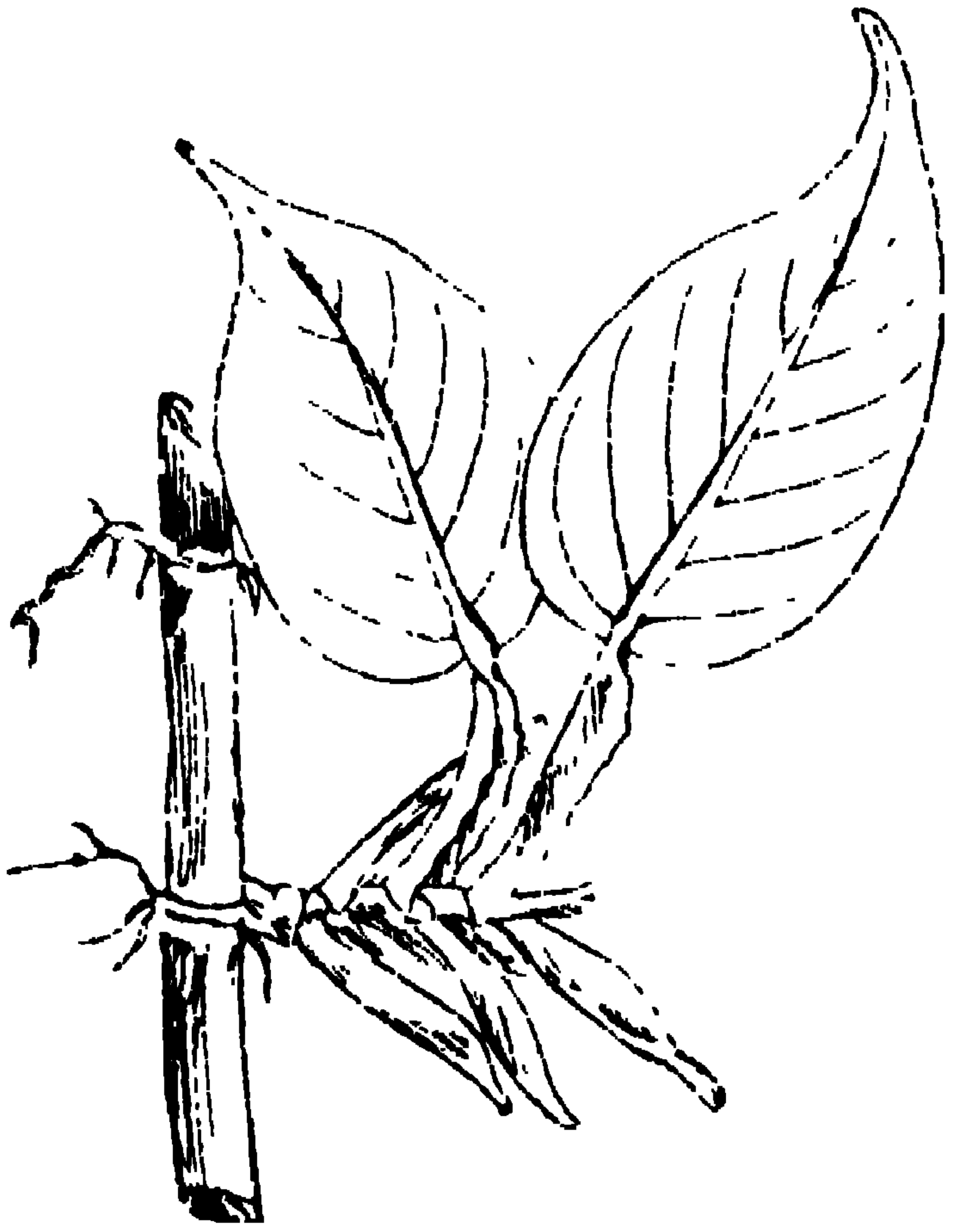
১৫। গজপিঁপুলের আরোহী মূল

(৪) **শ্বাসমূল** (breathing root)—জলা জায়গায় মাটি হইতে পরিমিত বাতাস না পাইলে মূল হইতে অস্থানিক মূল বাহির হইয়া খাড়াভাবে মাটির উপর উঠে। এই খাড়া মূলের আগায় অনেক ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে মুক্ত বাতাস লইয়া এই সকল উদ্ভিদ্ শ্বাসকার্য্য চালায়। যেমন সুন্দরবনের জলাভূমির সুন্দরী, গরান প্রভৃতি।

(৫) **বায়বীয় মূল** (aerial root)—এক প্রকার উদ্ভিদ্ আছে যাহারা অন্য গাছের উপরে বাস করে। ইহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—**বৃক্ষরুহা** (epiphyte) ও **বৃক্ষাদনা** (parasite)। বৃক্ষরুহা যে গাছের উপর থাকে তাহা হইতে খাদ্য লয় না, যথা—**রাস্না**

(orchid)। রাস্নার মূল বাতাসে ঝুলিয়া থাকে। এই মূলগুলি দ্বারা বাতাস ও ধূলিকণা হইতে তাহার খাদ্য সঞ্চয় করে। এইরূপ মূলকে **বায়বীয় মূল** (aerial root) বলা হয়।

(৬) **চোষক মূল** (haustoria)—বৃক্ষাদনী জাতীয় উদ্ভিদ্ আশ্রয়-বৃক্ষের মধ্যে একপ্রকার শিকড় প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহারই রস খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। এই প্রকার মূলকে চোষক-মূল (haustoria) বলা হয়। **আংশিক বৃক্ষাদনী** (partial parasite) আশ্রয়-বৃক্ষে মূল প্রবেশ করাইলেও নিজের খাদ্য কতকটা নিজের সবুজ পত্র দ্বারা নিজেই সংগ্রহ করে ; যেমন,—লোরেন্থাস (আমগাছ হয়)। **সম্যক্ বৃক্ষাদনী** (total parasite)—ইহাদের পাতা নাই, ডাঁটাও সবুজ নয়। সমস্ত খাবারই ইহারা আশ্রয়-বৃক্ষ হইতে সংগ্রহ করে। যেমন, আলোক লতা।

(৭) **ভাসমান মূল** (floating root)—কোন কোন জলজ গাছের কাণ্ডের গাঁইট হইতে গোছা গোছা মূল বাহির হইয়া গাছকে জলে ভাসাইতে সাহায্য করে যেমন, কেশরদাম।

(৮) **পত্র মূল** (leaf root)—কোন কোন গাছের পাতা হইতে মূল বাহির হয় ; যেমন পাথরকুচি পাতা।

মূলের প্রধানকার্য্য—(১) **মূল-রোমের সাহায্যে মাটি হইতে রস গ্রহণ ও (২) গাছকে মাটির উপর মজবুত করিয়া খাড়া রাখা।** বৃক্ষ যত বড় হয়, মূল ও তাহার শাখাপ্রশাখা মাটির মধ্যে তত বিস্তৃত হইয়া উচ্চ বৃক্ষকাণ্ডকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে। সামান্য চারা গাছও খানিকটা বাড়িলে তাহাকে টানিয়া উৎপাটন করা কত কঠিন !

উদ্ভিদ্ খাদ্যগ্রহণ করে শুধু বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া নয়, বড় হইবে বলিয়াও। আমরা যেরূপ মুখ দিয়া আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারি, গাছ ত

তাহা পারে না! তাহার মুখ নাই, আমাদের ন্যায় আমাশয়ও (stomach) নাই, সেইজন্য তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্য টানিয়া লইতে হয় মাটির রসের সহিত তরল অবস্থায়। সবুজ উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে দশটি মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন। তাহার মধ্যে অঙ্গার সংগ্রহ হয় বায়ুমণ্ডলের অঙ্গারাম্ল বাষ্প হইতে। বাকী নয়টি আসে মাটি হইতে মাটির রসের সহিত। এই নয়টি পদার্থের নাম,—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস, ক্যালসিয়ম, পটাসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম ও লৌহ, ইহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের অন্য দ্রব্যেরও প্রয়োজন হয়।

অস্‌মসিস (Osmosis)—খালি চোখে দেখা যাইবার মত মূলে কোন ছিদ্র নাই, তথাপি মৃত্তিকার রস মূলের মধ্য দিয়া কিরূপে যায়?

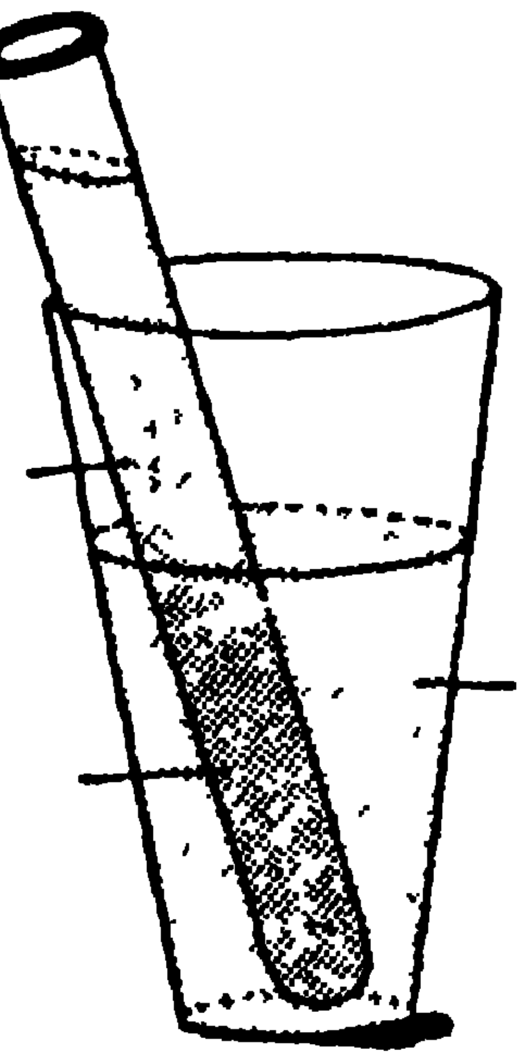

১৬। অস্‌মসিস

ছোলা বা কিশমিশ জলে ভিজাইলে খোসার মধ্য দিয়া জল স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া যায়। একটি পার্চ্চমেণ্ট কাগজের পরীক্ষা-নলে (test tube) সরবত রাখিয়া সেই সরবত সমেত পরীক্ষা নলটি একটি কাঁচের গ্লাসে জল রাখিয়া তাহাতে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত করিলে দেখিবে কিছুদিন পরে পরীক্ষা-নলের মধ্যে সরবত ও তাহার বাহিরে কাচের গ্লাসে জল দুই-ই অতি পাতলা সরবতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ এই যে পার্চ্চমেণ্ট ও ছোলার খোসা দুই-ই ভেদ্য পদার্থ। পার্চ্চমেণ্টে ছিদ্র না থাকিলেও তাহার মধ্য দিয়া দুইদিকের তরল দ্রব্যের সমীকরণ ঘটে। এই সমীকরণের নাম **অস্‌মসিস** (Osmosis)।

মূলরোমে ছিদ্র না থাকিলেও অস্‌মসিস প্রক্রিয়া দ্বারা মূলরোমমধ্যে মাটির রস প্রবেশ লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে রস প্রথমে মূলরোমে ও পরে রোম হইতে মূলে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর **মূলজ চাপ** (root-pressure) ও উপর দিক্ হইতে শোষনের (suction) ফলে মূল হইতে কাণ্ডে ধীরে ধীরে ঐ রস উপরে যায়।

মূলের অন্যান্য কাজ—অবস্থাবিশেষে মূল অন্যান্য কাজ করিয়া থাকে। যেমন, (১) খাদ্যসঞ্চয়, (২) ভারবহন, (৩) ঠেস দিয়া দাঁড়ান, (৪) আরোহণ, (৫) শ্বাসকার্য্য, (৬) বাতাস হইতে খাদ্যগ্রহণ, (৭) পরভোজী, (৮) ভাসিবার সাহায্য ও (৯) বংশবৃদ্ধি।

Questions

1. What is a tap-root? Mention the position and functions of a root-cap and root-hair.
2. Discuss the function of the root. (C. U. 1940)
3. Mention the various shapes of tap-roots that serve as storage of reserve food-material. (T. T. 1938)
4. What is a parasite? Distinguish it from an epiphyte and a saprophyte. Give examples.
5. What are adventitious roots? Describe them fully and state their functions.
6. Describe an experiment by which you can explain the process of osmosis.
7. Write short notes on: root cap, root hair, tap root, aerial root, haustoria, osmosis.
8. What chief functions does the root perform? [What is the peculiarity of the roots of the pea plant?] (C. U. 1944)

কাণ্ড ও তাহার কার্য্য

(The stem and its functions)

কাণ্ড (Stem)—উদ্ভিদের যে অংশ সাধারণতঃ মাটির উপর থাকে তাহাকে কাণ্ড কহে। বেশীর ভাগ গাছের কাণ্ড মাটির উপর থাকিলেও কোন কোন গাছের কাণ্ড মাটির নীচেও থাকে। ভ্রূণ যখন বড়

১৭। কাণ্ড, পাতা ও মুকুল

হয় তখন তাহার ভাবী কাণ্ড উপর দিকে উঠিতে থাকে এবং ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শাখাপ্রশাখা, পত্র ও পুষ্পে শোভিত হয়। সকল গাছের কাণ্ড একরকম নহে।

কাণ্ডের অংশ (Different parts of the stem)—ধান, গম, যব ইত্যাদি একদল-বীজ গাছের কাণ্ড ফাঁপা। চারা অবস্থায় উহাদের কাণ্ড সাধারণতঃ পাতা দ্বারা আবৃত থাকে। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি হইতে পাতা বাহির হয়। এই স্থানগুলিকে

পর্ব্বসন্ধি বা **গাঁইট** (node) বলে। দুই পর্ব্বসন্ধির মধ্যবর্ত্তী অংশের নাম **পর্ব্ব** বা **পাব** (internode)। পর্ব্বসন্ধি হইতে পাতা বাহির হয়। অন্য কোন স্থান হইতে পাতা বাহির হয় না। প্রতি পাতার কোলে একটি করিয়া মুকুল বা কুঁড়ি থাকে। এই মুকুল কখনও কখনও বড় হইয়া শাখায় পরিণত হয়। ইহাদিগকে **কক্ষ মুকুল** (axillary bud) বলে। তাল, নারিকেল, খেজুর গাছে এই প্রকার মুকুল কখনও বর্দ্ধিত হইয়া শাখায় পরিণত হয় না। সে কারণ এই সকল বৃক্ষের শাখা নাই। কাণ্ডের আগা কোমল পাতায় ঢাকা থাকে। এই সকল পাতার কক্ষে যে মুকুল থাকে তাহাকে **মাথার মুকুল** (terminal bud) বলা হয়। মাথার মুকুলের বৃদ্ধিতে কাণ্ড দীর্ঘ হয়। বাঁশ প্রভৃতির পর্ব্ব বেশ মসৃণ এবং পর্ব্বসন্ধি পর্ব্ব অপেক্ষা মোটা।

নানাপ্রকার কাণ্ড (Different forms of the stem)—সকল গাছের কাণ্ড ধান বা বাঁশ গাছের কাণ্ডের মত ফাঁপা নয়। আম, জাম, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি দ্বিদল-বীজ গাছের কাণ্ড একেবারে নিরেট এবং বেশ শক্ত। ইহারা মাটির উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর ইহাদের পরিধি কিছু কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কতকগুলি গাছ আছে যাহাদের কাণ্ড স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার জন্য মাটির উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে অক্ষম। এই সকল দুর্ব্বল কাণ্ড সাহায্য না পাইলে উপরে উঠিতে পারে না। যেমন, লতা গাছ অর্থাৎ লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, কাঁকুড় প্রভৃতি। একদল-বীজ গাছের পাতা আকারে বড কিন্তু সংখ্যায় কম ; দ্বিদল-বীজ গাছের পাতা আকারে ছোট ও সংখ্যায় বেশী। একদল-বীজ গাছের কাণ্ডের প্রায়ই শাখা হয় না, দ্বিদল-বীজ গাছের কাণ্ডের শাখা অনেক।

কাণ্ডের আকার (Shape of the stem)—সাধারণতঃ গাছের কাণ্ড গোল হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি গাছ আছে যাহাদের

কাণ্ডকে মোটেই গোল বলা চলে না, বরং চতুষ্কোণ বলিতে পারা যায়, যেমন, তুলসী, হাড়জোড়া। কাণ্ডের আকার তেশিরাও হইতে পারে যেমন, তেশিরা মনসা। ফণী মনসার কাণ্ড পাতার মত চ্যাপ্টা।

ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড (Underground stems)—সর্ব্বসময়ে কাণ্ড মাটির উপর থাকে না। এই সব কাণ্ডকে অনেকটা মূল বলিয়া মনে হয়। ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডে পর্ব্ব ও পর্ব্বসন্ধি থাকে। পর্ব্বসন্ধিতে শল্ক আঁইশের মত পাতা ও পাতার কক্ষে মুকুল থাকে। ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডে অনেক দাগ থাকে। এই দাগগুলি পুরাতন শাখা মরিয়া যাওয়াতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড চারি প্রকার :—

(১) **মূলাকার কাণ্ড** (rhizome)—সাধারণতঃ ইহারা মাটির নীচে সমান্তরাল থাকে। ইহার দুই পাশ হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়। যথা, আদা, হলুদ প্রভৃতি। একটা কথা মনে রাখিও মান কচুর মূলাকার কাণ্ড মাটির মধ্যে খাড়াভাবে থাকে।

(২) **গুঁড়ির মত কাণ্ড** (corn)—দেখিতে অনেকটা গাছের গুঁড়ির মত। যেমন, ওল।

(৩) **স্ফীতকন্দ কাণ্ড** (tuber)—এই প্রকার কাণ্ডের শাখায় প্রচুর পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত থাকে। যেমন, আলু।

(৪) **শল্ককন্দ কাণ্ড** (bulb)—কাণ্ডের চারিদিকে কতকগুলি শল্কপত্র গুচ্ছাকারে থাকে। যথা, পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি।

ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের প্রয়োজন (Advantages of the underground stem)—(১) আলু, পিঁয়াজ, আদা, কচু ও ওল প্রভৃতির কাণ্ডে খাবার সঞ্চিত থাকে। শীতের সময় যখন পাতা শুকাইয়া যায় তখন এই সঞ্চিত খাদ্য খাইয়া গাছ জীবনধারণ করে। (২) কাণ্ড মাটির নীচে থাকাতে জীবজন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষাও পায়। (৩) ইহাদের

বংশরক্ষার জন্য বীজের দরকার হয় না; নিজের দেহের কোন অংশ হইতেই বংশরক্ষা পায়।

অস্থানজ কাণ্ড ও কাণ্ডের অংশের বিভিন্ন পরিণতি (Adventitious stem and its different forms of modification)—লাউ, কুমড়া, মটর প্রভৃতি লতার শাখা-কাণ্ড রূপান্তরিত হইয়া একপ্রকার সুতার মত **আকর্ষে** (tendril) পরিণত হয়। এই আকর্ষ সাহায্যে অন্য গাছ বা বস্তুকে জড়াইয়া তাহারা উপরে উঠিয়া যায়, বা মাচায় লতাইয়া চলে। আবার কোনও কোনও গাছের কাণ্ডের অংশ **কাঁটায়** পরিণত হয় ও সেই কাঁটার সাহায্যে তাহারা উপরে উঠিয়া যায়। যেমন, কোন কোন গোলাপ এবং বেত। ইহা ছাড়া গজপিপুলের **আরোহী মূল** দিয়া উপরেউঠার কথা আগেই বলা হইয়াছে।

আর কতকগুলি গাছে কাণ্ডের অংশ কাঁটায় পরিণত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়; যেমন, লেবু, বেল, বনখই প্রভৃতি। ইহা ছাড়া আর কতকগুলি গাছ আছে, যাহাদের শুষ্ক ও গরম স্থানে জন্ম বলিয়া পাতা হয় না। **কাণ্ডই চেপ্টা ও সবুজবর্ণ হওয়াতে পাতার কার্য্য করিতে পারে**; যেমন, ফণী মনসা।

কাণ্ডের প্রধান কাজ (Principal functions of the stem)—(১) **মূলদ্বারা মাটি হইতে সংগৃহীত রসকে পাতায় পাতায় চালনা করা,** (২) **তৈয়ারী খাবার পাতা হইতে গাছের অন্যান্য অংশে চালান দেওয়া,** (৩) **পত্র ধারণ ও যথাসময় ফুল-ফল ধারণ,** (৪) **কোন কোন কাণ্ডে ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য জমা থাকে।** যেমন, আদা, ওল ইত্যাদি।

বৃক্ষপত্রের সবুজ কণা সূর্য্যকিরণ সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে কার্ব্বন নিয়মিত না লইলে প্রায় সকল বৃক্ষেরই জীবনধারণ

করা সম্ভব হইত না। কেবল যে সবুজ পাতাই কার্ব্বন লইতে পারে তাহা নহে। অনেক সময় কাণ্ডের শাখা-প্রশাখাতেও সবুজ কণা থাকে। সূর্য্যকিরণ পাইলে উহারাও কার্ব্বন সংগ্রহ করিতে পারে। সকল গাছেই সকল সময়ে পাতা থাকে না, কাণ্ডস্থ সবুজকণা যদি কার্ব্বন লইতে না পারিত তবে অনেক গাছের কার্ব্বন লওয়া চলিত না।

মূল, কাণ্ড ও পত্রের মধ্যে নানাবিধ সূক্ষ্ম নল থাকে। প্রধান মূল বা প্রধান কাণ্ড হইতে যেমন ডালপালা বাহির হয় এই নলেরও তেমনই শাখাপ্রশাখা আছে। নল দুই প্রকারের—**জাইলেম** (xylem) ও **ফ্লোয়েম** (phloem)। যে নল দিয়া মৃত্তিকার রস পাতা পর্য্যন্ত পৌঁছে তাহাকে জাইলেম বলে। আবার সবুজ পাতার মধ্যে সূর্য্যকিরণ সাহায্যে প্রস্তুত খাদ্য যে নল দিয়া উদ্ভিদ্ দেহের সর্ব্বত্র যায়, তাহাকে ফ্লোয়েম বলে। এই দুই জাতীয় নলের বিন্যাস মূলে ও কাণ্ডে ভিন্ন প্রকার, একদল-বীজ ও দ্বিদল-বীজ গাছেও বিভিন্নপ্রকার।

দোপাটি ফুলের একটি চারা লাল জলে ডুবাইয়া উহার গোড়া কাটিয়া কাটা দিক্‌টা জল হইতে বাহির না করিয়া কিছুক্ষণ ঐ জলে ডুবাইয়া রাখিলে দেখা যাইবে যে পাতার শিরা উপশিরাগুলি লাল হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে লাল জল কাণ্ড হইয়া নলের পথে পাতা পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিয়াছে।

কাণ্ডের অন্যান্য কার্য্য—অবস্থা বিশেষে কাণ্ড অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকে। (১) **উপরে উঠিবার সাহায্য**—লতার শাখা আকর্ষে পরিণত হইয়া উপরে উঠিবার সাহায্য করে। যেমন, মটরের আকর্ষ। কখনও কখনও কাণ্ডের অংশ কাঁটায় পরিণত হইয়া উপরে উঠে। যেমন, বেত ও গোলাপ লতায়। (২) **আত্মরক্ষা**—কাণ্ডের অংশ কাঁটায় পরিণত হইয়া জীবজন্তু হইতে আত্মরক্ষা করে; যেমন, লেবু ও বেল। (৩) **পাতার**

কাজ—শুষ্ক ও গরম স্থানে কখনও কখনও কাণ্ডের অংশ পাতার মত সবুজবর্ণ হওয়াতে, পাতার কাজ করে। যেমন, ফণী মনসা। (৪) **খাদ্য সঞ্চয়**—অনেক কাণ্ডে ও সকলপ্রকার ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। যেমন, আলু ও পিঁয়াজ। (৫) **বংশবৃদ্ধির সাহায্য**—এমন অনেক গাছ আছে যাহাদের ফুল, বীজ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও বংশবৃদ্ধি সাধারণতঃ কাণ্ড হইতে হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আলু, পিঁয়াজ, রসুন, পটল, রজনী-গন্ধা, আদা, হলুদ ও কচুর নাম করা যাইতে পারে। শীতকালে ইহাদের বেশীর ভাগেরই পাতাগুলি শুকাইয়া যায়। কাণ্ড মাটির নীচে থাকে ও সেই কাণ্ডে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত খাদ্য সঞ্চিত থাকে। শীতের শেষে ঐ প্রোথিত কাণ্ডে আবার মুকুল ধরে ও নূতন গাছ জন্মায়।

একদল-বীজ ও দ্বিদল-বীজ গাছের কাণ্ডের তুলনা :

একদল-বীজ গাছের কাণ্ড	দ্বিদল-বীজ গাছের কাণ্ড
১। কাণ্ডের প্রায়ই শাখা থাকে না।	১। কাণ্ডের প্রায়ই শাখা থাকে।
২। গাছ ক্রমশঃই বেশী মোটা হয় না।	২। গাছ ক্রমশঃই মোটা হইতে থাকে।
৩। কাণ্ডের উপর বড় আকারের অল্প পত্র থাকে।	৩। শাখা প্রশাখায় ছোট আকারের বহু পত্র থাকে।

মূলের সহিত কাণ্ডের তুলনা :

মূল	কাণ্ড
১। সাধারণতঃ ভ্রূণের ভাবীমূল মূলে পরিণত হয়।	১। ভ্রূণের ভাবী কাণ্ড হইতে কাণ্ডের পরিণতি।
২। প্রায়ই মাটির নীচে অন্ধকারে থাকে।	২। প্রায়ই মাটির উপরে আলোতে থাকে।
৩। পর্ব্ব বা পর্ব্বসন্ধি নাই।	৩। পর্ব্ব ও পর্ব্বসন্ধি থাকে।

মূল		কাণ্ড	
৪।	আগায় মূলত্র থাকে।	৪।	আগায় মাথার মুকুল থাকে।
৫।	সাধারণতঃ মূলে এক কোষ মূলরোম থাকে।	৫।	কাণ্ডে মূলরোম নাই।
৬।	সাধারণতঃ মাটির মধ্যে মূলে কোনও রং থাকে না।	৬।	সাধারণতঃ রং সবুজ।
৭।	প্রধান মূল।	৭।	প্রধান কাণ্ড।
৮।	মূলের শাখা।	৮।	শাখা।
৯।	মূলের প্রশাখা।	৯।	প্রশাখা।
১০।	পত্র থাকে না।	১০।	পত্র।
১১।	পুষ্প থাকে না।	১১।	পুষ্প।
১২।	ফল হয় না।	১২।	ফল।

Questions

1. What is a shoot? Mention its various parts.
2. Compare root and stem.
3. Why are there no branches in some trees?
4. What are the main functions of the stem?
5. Compare monocotyledonous with dicotyledonous stem.
6. What do you know of the propagation through the stem?
7. Describe various shapes of the stem.
8. Give Indian examples of underground stems and branches. How would you distinguish them from roots? (T. T. 1940)

পাতা ও তাহার কার্য্য

পাতা কোথায় থাকে ?—গাছের কাণ্ডে বা শাখা-প্রশাখায় পর্ব্বসন্ধি বা গাঁইট থাকে। এই গাঁইট হইতে কখন একটি, কখন দুইটি, কখনও বা ততোধিক পাতা বাহির হয়। পাতা গাছের শোভা বৃদ্ধি করে এবং দেহ ধারণের ব্যাপারে নানারূপ সহায়তা করে।

পাতার অংশ (The parts of a leaf)—সাধারণ পত্রের তিনটি অংশ—(১) **ফলক** (blade), (২) **বৃন্ত** (petiole) ও

(৩) **বেষ্টনী** বা **খোলা** (leaf-base)। ফলক অর্থ যে অংশকে আমরা সচরাচর পাতা বলি, বৃন্ত অর্থ পাতার বোঁটা, আর খোলা—যে অংশ কাণ্ডের গায়ে লাগিয়া থাকে। খোলা কোন কোন গাছের বেশ ফোলা থাকে ; যেমন, শিম, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি। এই ফোলা খোলাকে **পালভাইনাস** (pulvinus) বলে। সুপারি, তাল, নারিকেল প্রভৃতি গাছের পাতার গোড়া কাণ্ডের কিছু অংশ ঘিরিয়া থাকে

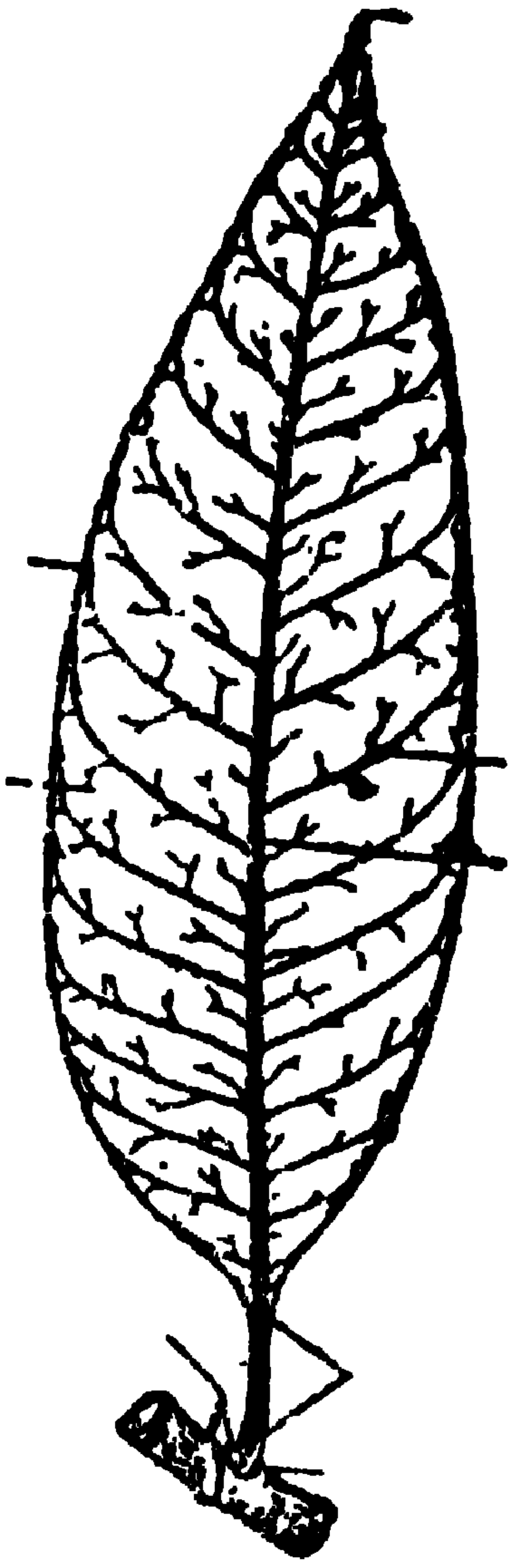

১৮। আম পাতা ও তাহার অংশ

কলাগাছের খোলা এমন ভাবে কাণ্ডকে পরস্পর ঘিরিয়া থাকে যে সম্মিলিত খোলাকে কাণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়।

পাতার বৃন্ত বা **বোঁটা**—সকল পাতার বোঁটা নাই। **সবৃন্তক** (petiolate) ও **বৃন্তহীন** (sessile) দুই প্রকার পাতাই

আছে। অশ্বত্থ ও জবার পাতা সবৃন্তক, ডানকুনি পাতা বৃন্তহীন। আকাশমণি শুষ্ক স্থানে জন্মে বলিয়া ইহার পাতার ফলক ঝরিয়া পড়ে। পাতার কাজ করে বৃন্ত ; উহা চেপ্টা ও অনেকটা পাতার মত। ইহার নাম **পত্রাকার বৃন্ত**। কচুরি পানার বৃন্ত ফাঁপা ; সেজন্য জলে ভাসিবার সুবিধা হয়। ইহাকে **ফাঁপা বৃন্ত** বলা হয়।

বেশীর ভাগ পাতার উপর-পিঠ মসৃণ। কিন্তু কোন কোন পাতার, যেমন কুমড়া, ডুমুর ইত্যাদি, উপরটা আবার

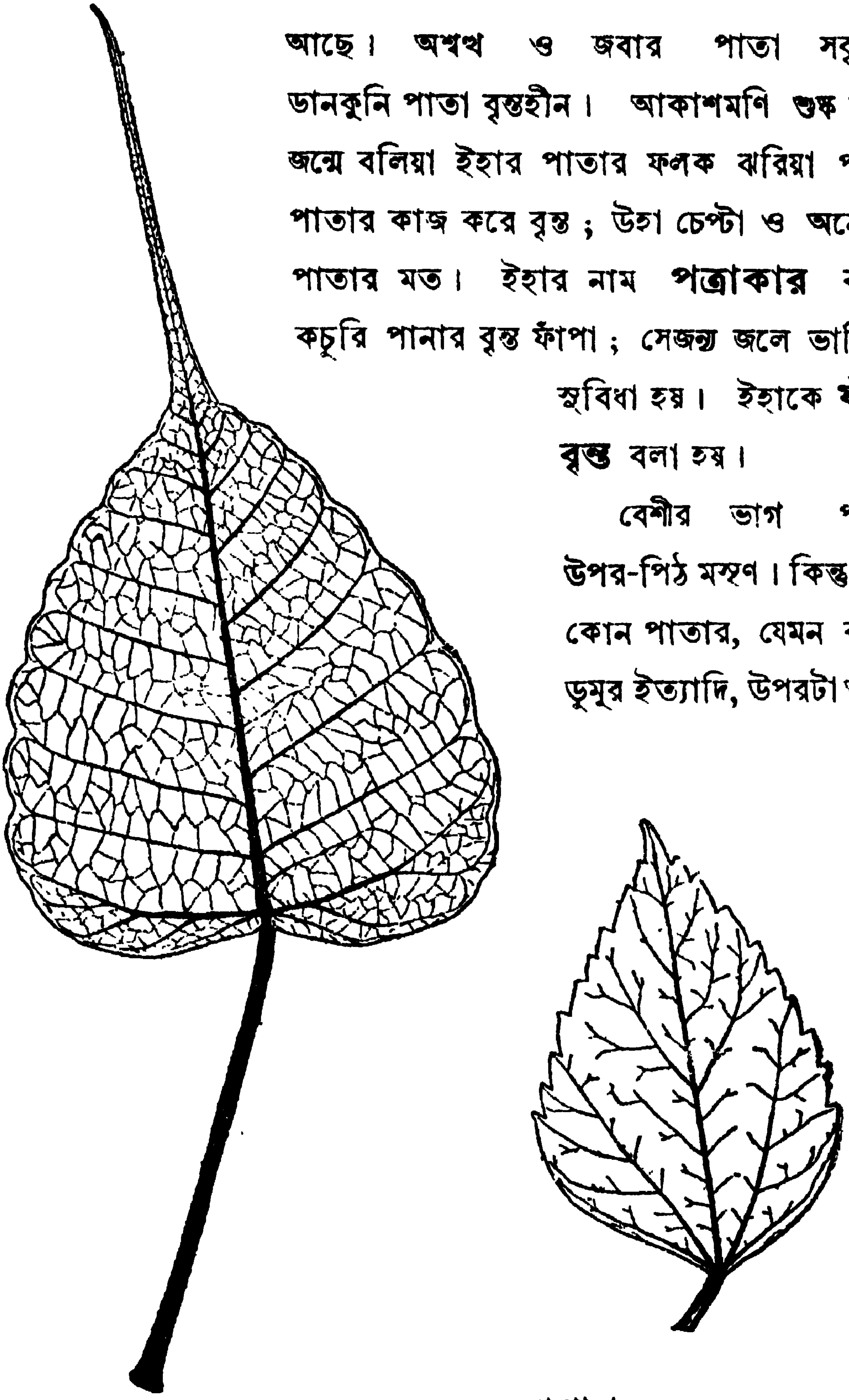

১৯। অশ্বত্থ ও জবা পাতা

বেশ খস্‌খসে। কোন কোন পাতার উপর কাঁটায় ভরা, যেমন শিয়াল কাঁটা, বেগুন ইত্যাদি।

আমাদের দেশে কতক গাছের এবং শীতপ্রধান দেশে প্রায় সব গাছের পাতা শীতকালে ঝরিয়া পড়ে। যাহাদের পড়ে না, তাহাদিগকে **চিরহরিৎ** (evergreen) বৃক্ষ বলে। আমাদের দেশে আমগাছ চিরহরিৎ।

উপপত্র (Stipules)—পাতার বৃন্তের উপাঙ্গকে উপপত্র কহে। উপপত্র নানা প্রকার। (১) সাধারণ পাতার মত; যেমন

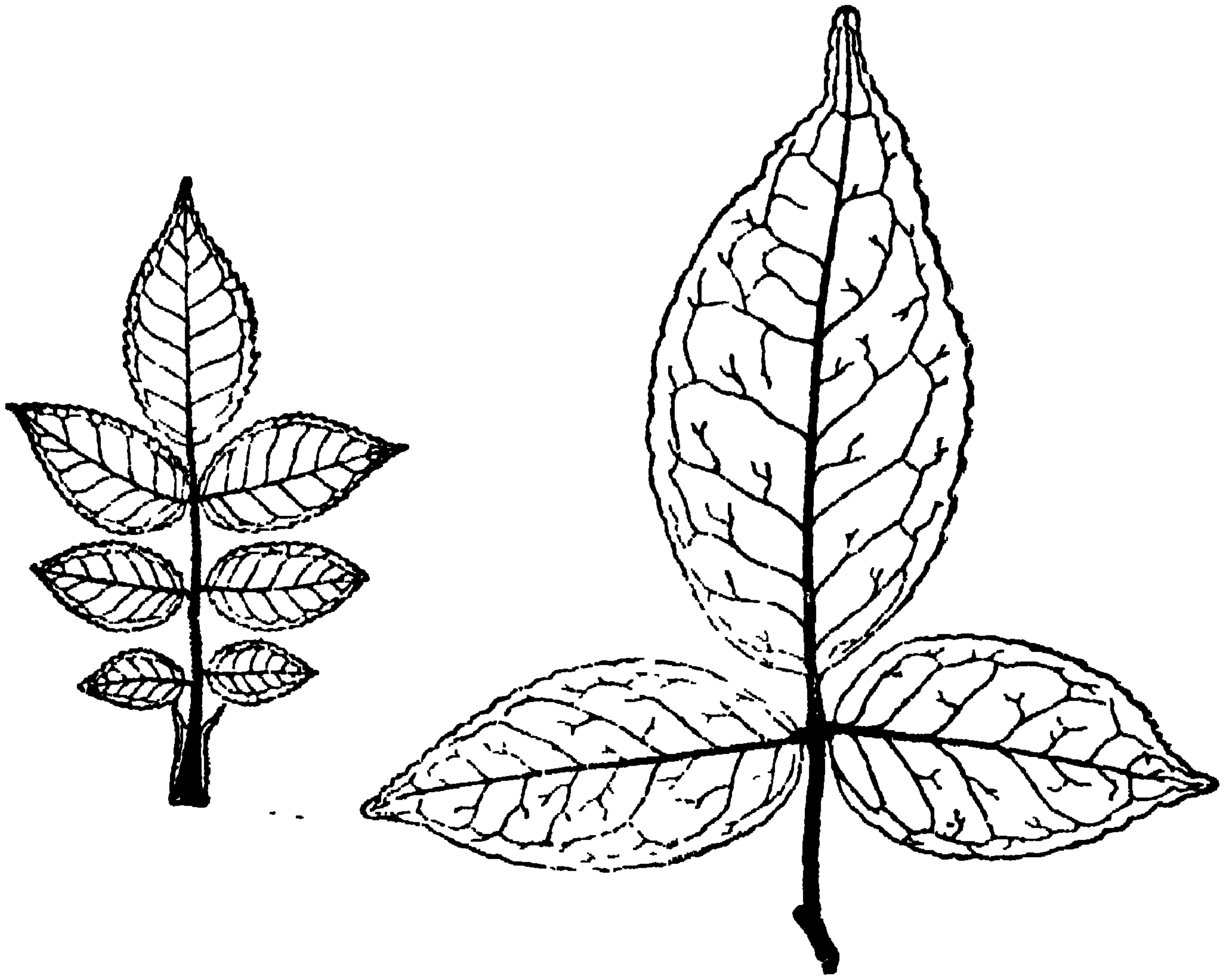

২০। গোলাপ ও বেল পাতা

মটর লতায়। (২) দুই উপপত্র বৃন্তের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত, কিন্তু বৃন্তে জোড়া নহে; যেমন জবায়। (৩) বৃন্তের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ও বৃন্তে জোড়া; যেমন, গোলাপ। (৪) আঁশের মত পত্র মুকুলকে রক্ষা করে; যেমন, বটে। (৫) শূচাকার; যেমন, বাবলায়।

আকর্ষ (Tendril)—সূতার আকারে পরিবর্ত্তিত পাতা বা পাতার অংশের নাম আকর্ষ।

মৌলিক ও যৌগিক পত্র (The simple and the compound leaves)—যে সকল পাতার একটি মাত্র ফলক, তাহাকে **মৌলিক** পত্র বলে ; যে পাতার একাধিক ফলক, তাহাকে **যৌগিক** পত্র বলে। আম, জাম, কাঁঠালের পাতা মৌলিক। গোলাপ, বেল, মটর, শিমূলের পাতা যৌগিক। ফলকের সংখ্যা হইতে আবার যৌগিক পত্রের শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে। যথা, বেল পাতা—ত্রিফলক, শিমূল পাতা—

২১। শিমূল পাতা

সপ্তফলক ইত্যাদি। যৌগিক ফলকের এক একটি ছোট ফলককে **অণুফলক** (leaflet) বলা হয় ; যেমন, তেঁতুলপাতায়।

পাতার আকৃতি.(Shape of the leaf)—সকল ফলকের আকৃতি এক রকমের নয়। ঘাসের বা ধানের পাতা সরু ও লম্বা। ইহাদিগকে **লম্বাকৃতি** (linear) বলে। বটের পাতা গোল ডিমের মত, তাহাকে **ডিম্বাকৃতি** (ovate) পাতা বলা যায়। পানের পাতার

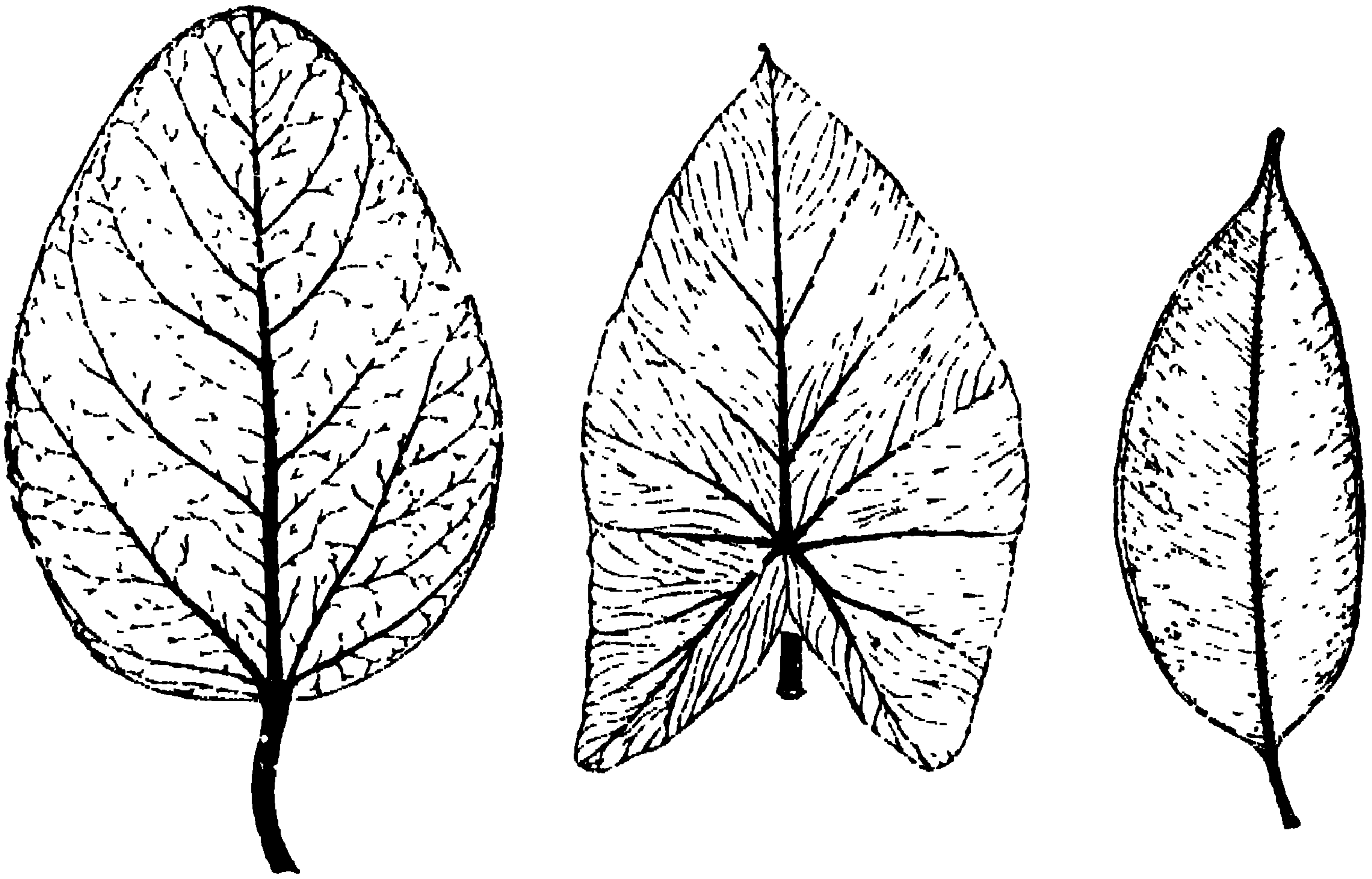

২২। বট, কচু ও জাম পাতা

গঠন তাসের হরতনের মত বা মানুষের হৃদয়ের মত। ঐরূপ পাতাকে বলে **হরতনাকৃতি** বা **হৃদয়াকৃতি** (heart shaped বা cordate)। কচুপাতা অনেকটা তীরের মাথার মত, তাহাকে বলে **বাণাকৃতি** (sagittate)। আমপাতা, জামপাতা বল্লমের ফলার মত, তাহাদের নাম **বল্লমাকৃতি** (lanceolate)। থুলকুড়ির পাতা দেখিতে অনেকটা

শিমবীজ অথবা **বৃক্কের** (kidney) মত। ইহাকে বলে **বৃক্কাকৃতি** (reniform)। লাউ, কুমড়ার পাতা হাঁসের পায়ের মত। তাহাদিগের নাম **হংসপদাকৃতি** (crisped)। পাইন গাছের পাতা সূক্ষ্ম ও লম্বা, সূচের মত। ইহাকে বলে **সূচাকৃতি** (acicular)। পদ্মের গোল পাতাকে **চক্রাকৃতি** (rotund) বলা যায়।

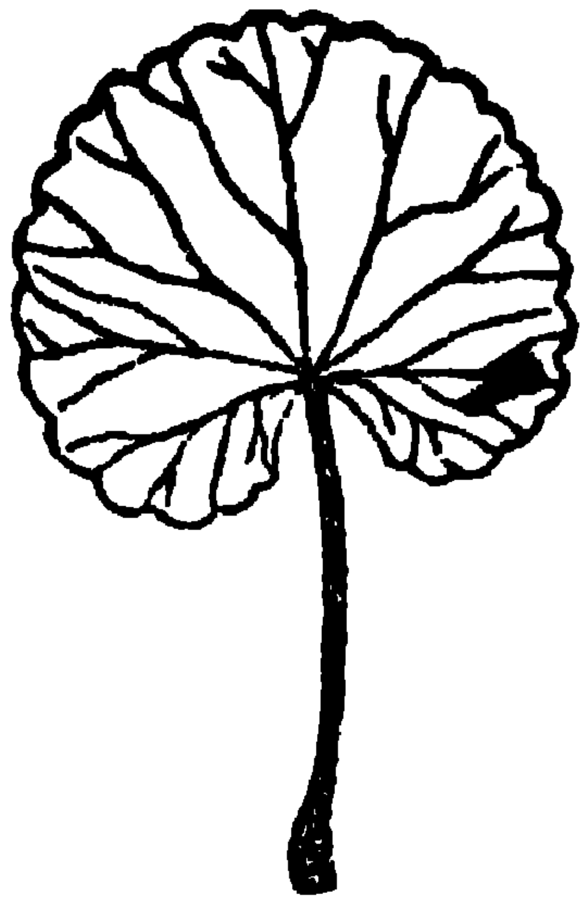

২৩। থুলকুড়ি পাতা

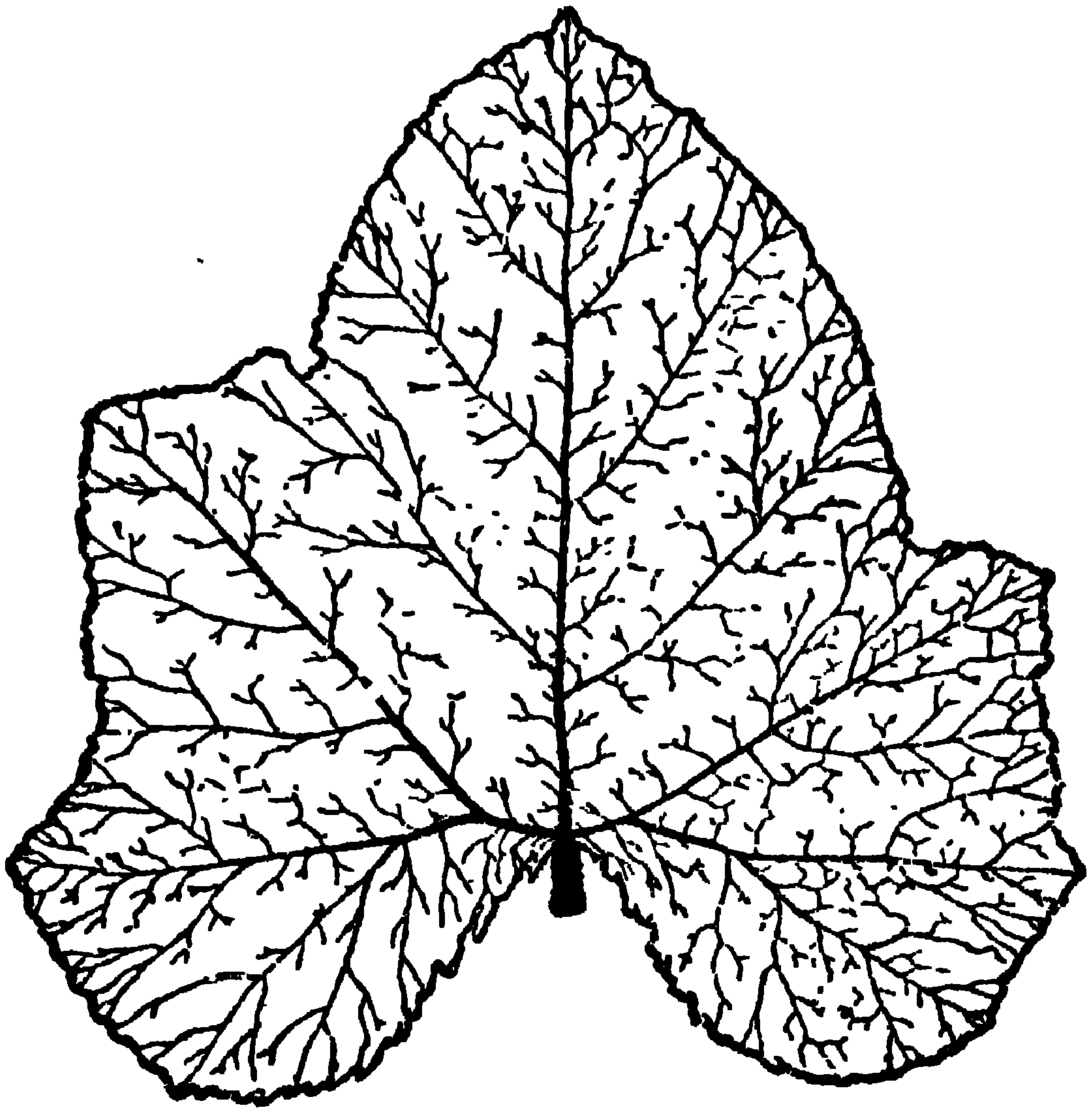

২৪। কুমড়া পাত

পাতার কিনারা (Margin of the leaf)—পত্র-ফলকের ধার বা কিনারা নানাপ্রকার। আম, জাম, মটর প্রভৃতি পাতার কিনারা

বেশ সমান। জবা, আনারস, গোলাপ পাতার কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। দেবদারুর পাতার কিনারা ঢেউ খেলান। এক এক পাতার

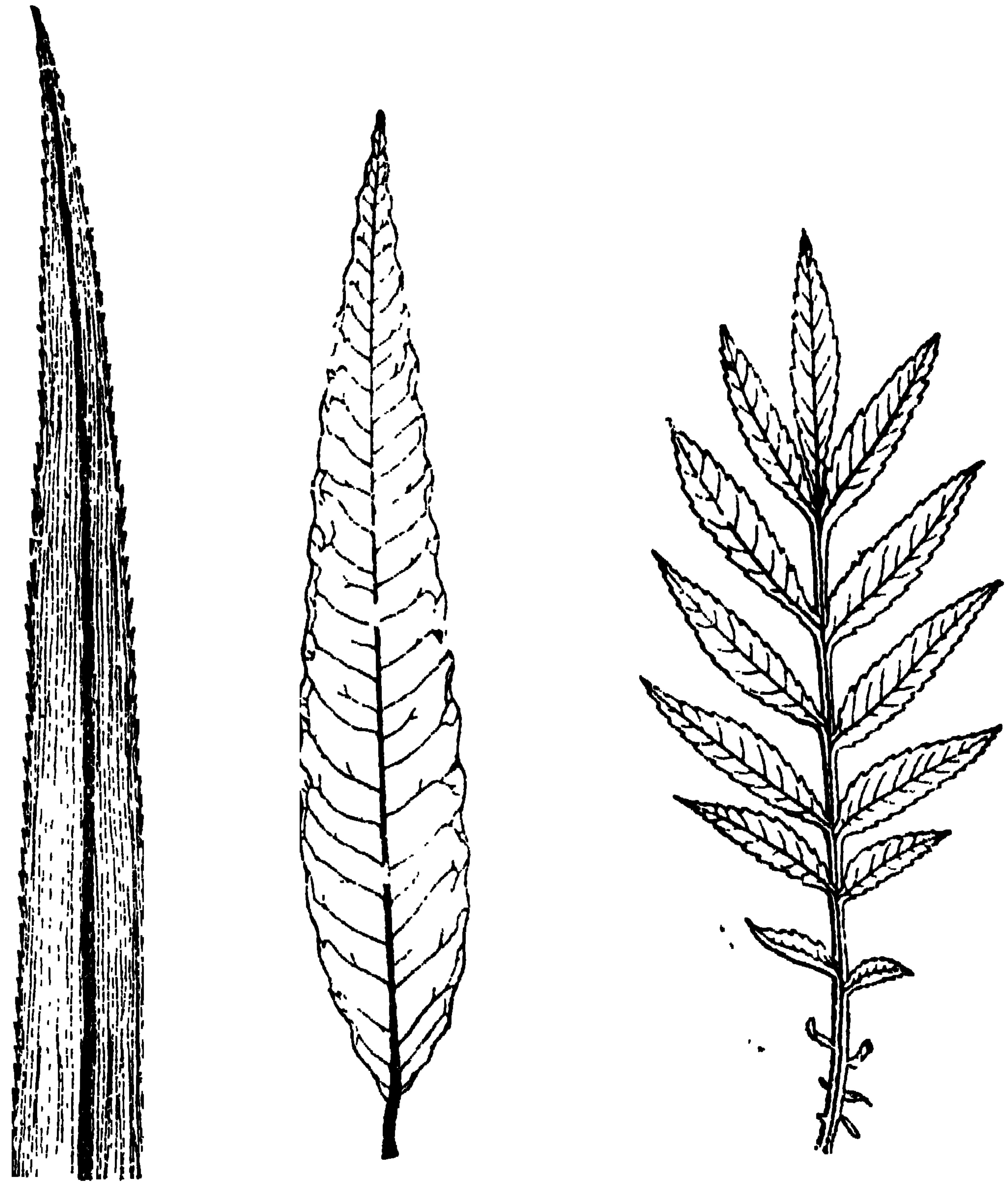

২৫। আনারস, দেবদারু ও গাঁদা পাতা

কিনারা এমনভাবে খাঁজ কাটা যে বস্তুতঃ মৌলিক পত্র হইলেও যৌগিক পত্র বলিয়া ভ্রম হয়; যেমন,—গাঁদা, ভেরেণ্ডা, পেঁপে ইত্যাদি।

পাতার আগা (Apex of the leaf)—সকল পত্র-ফলকের আগা এক প্রকার নহে। আম, জাম, প্রভৃতি পাতার আগা সূক্ষ্ম। তাই তাহাদের **সূক্ষ্মাগ্র** (acute) বলা হয়। অশ্বত্থ, পান প্রভৃতি

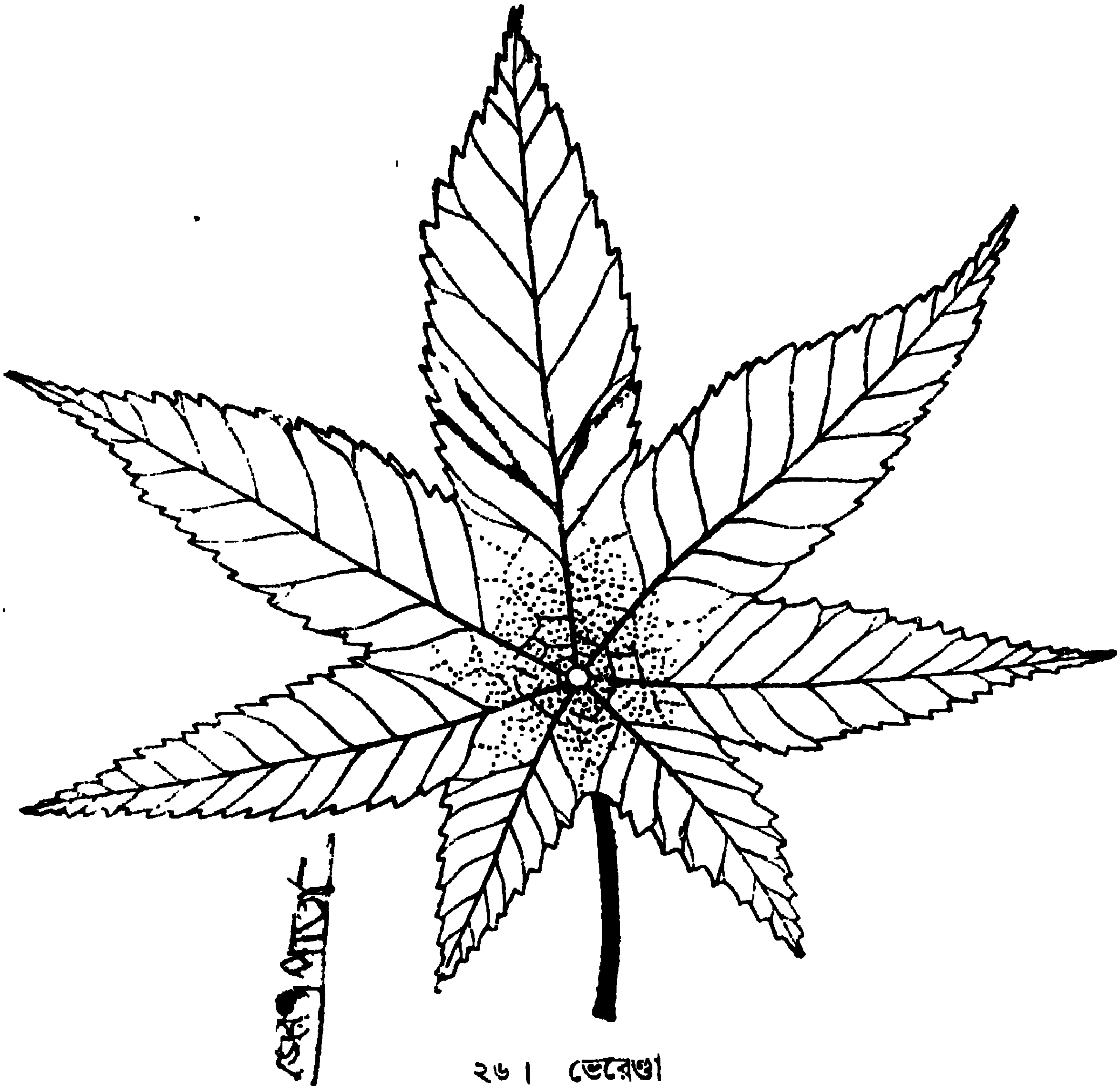

২৬। ভেরেণ্ডা

পাতার আগা লম্বা। সেজন্য তাহাদিগকে **দীর্ঘশীর্ষ** (acuminate) বলা হয়। আনারস ও খেজুর পাতার আগা সরু সূচের মত। সেইজন্য তাহাদের নাম **সূচ্যগ্র** (mucronate)। কাঁঠাল পাতার আগা ভোঁতা (obtuse)।

পাতার শিরা-বিন্যাস (Venation of the leaf)—পাতাকে আলোর সম্মুখে ধরিলে তাহাতে অনেক প্রকার **শিরা** (vein) দেখা যায়।

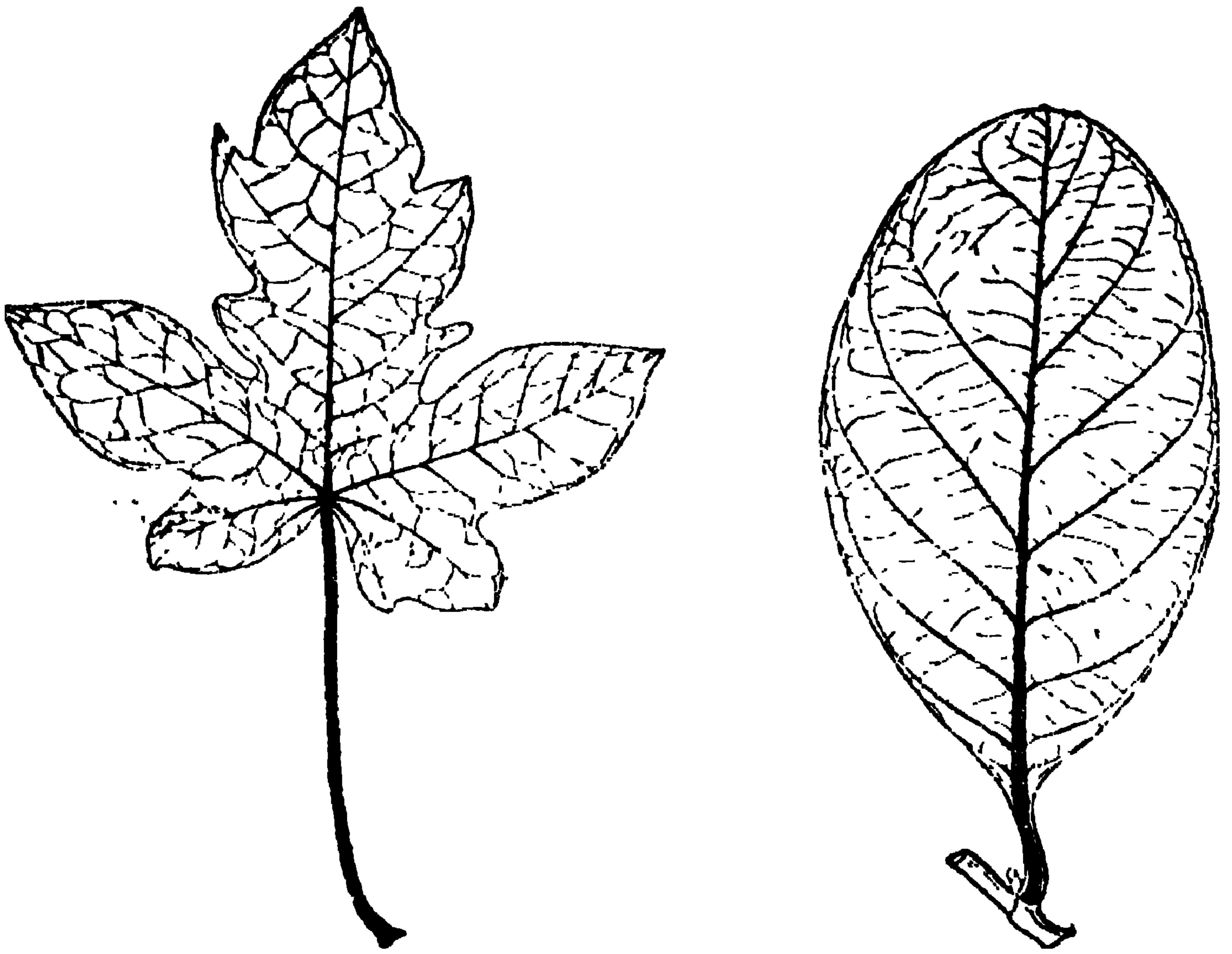

২৭। পেঁপে ও কাঁঠাল পাতা

আম ও কাঁঠাল পাতা পরীক্ষা কর। ইহাদের পাতার ঠিক মাঝামাঝি, বৃন্ত হইতে আগা পর্য্যন্ত, একটি মোটা শিরা চলিয়া গিয়াছে। এই শিরার নাম **মধ্যশিরা** (mid-rib)। মধ্যশিরার উভয় পার্শ্বে শাখা-শিরাসকল বাহির হইয়া পাতার কিনারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রতি শাখা-শিরা হইতে আবার নানাদিকে কত সূক্ষ্ম উপশিরা বাহির হইয়াছে। এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম শিরা উপশিরাবলী মিলিয়া পাতার মধ্যে যেন একটি জটিল জালের

সৃষ্টি করিয়াছে। এই শিরাবিন্যাসের নাম দেওয়া হইয়াছে **জাল-শিরা বিন্যাস** (reticulate venation); দ্বিদল-বীজ উদ্ভিদের শিরাবিন্যাস এইরূপ। জাল-শিরা মধ্যে আবার কতকগুলি পালকের সহিত সাদৃশ্য থাকায় তাহাদের **জাল-পালক-শিরা** (reticulate pinnate) বলে।

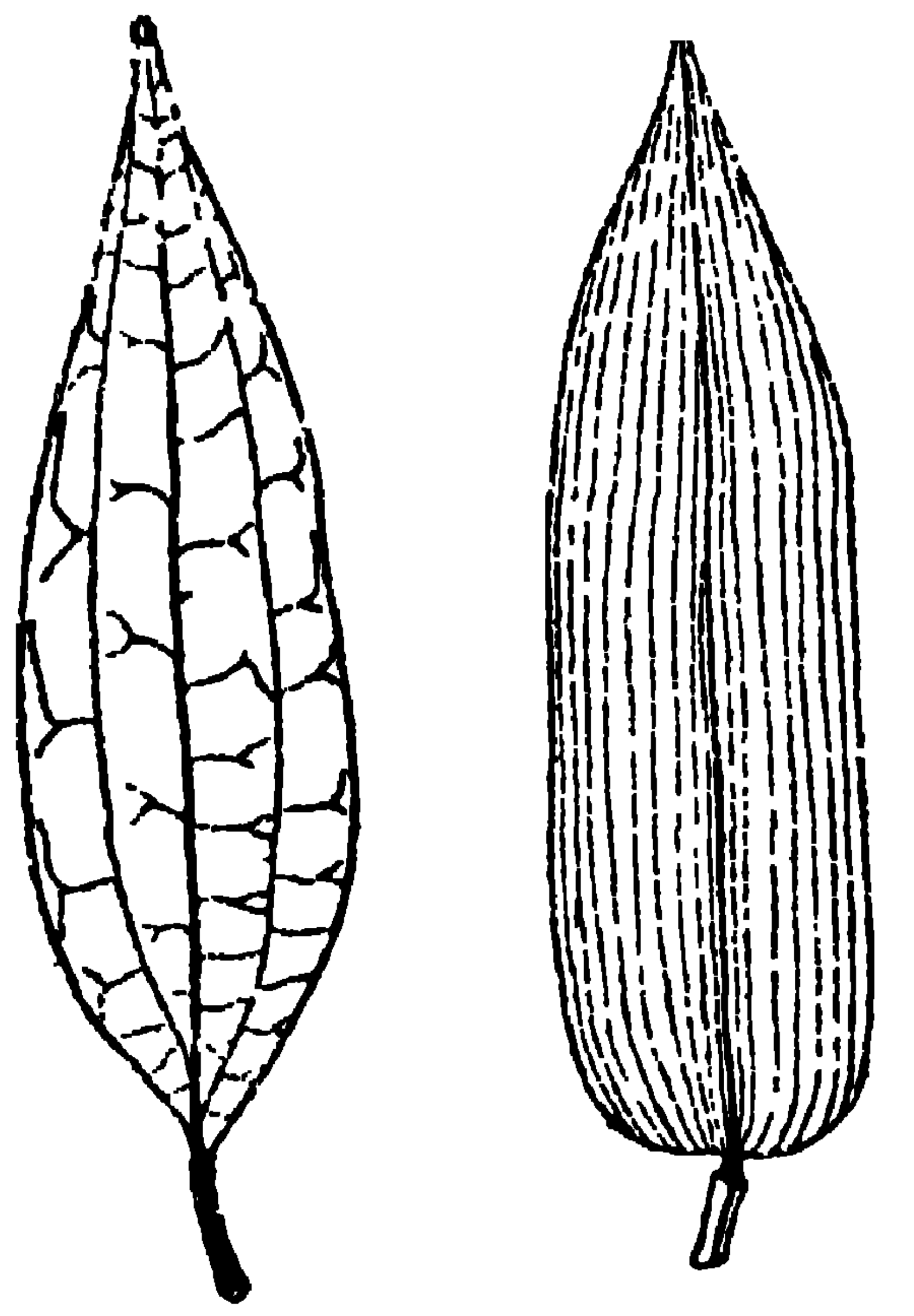

২৮। তেজ পাতা ও বাঁশ পাতা

লাউ, কুমড়া, পেঁপে, ভেরেণ্ডা পাতার শিরাবিন্যাস অন্যরূপ। ইহাদের বৃন্তাগ্র হইতে কয়েকটি শিরা বাহির হইয়া ফলকের মধ্যে মানুষের হাতের আঙ্গুলের মত ছড়াইয়া গিয়াছে। সেইজন্য এই শিরাবিন্যাসকে বলা হয় **জাল-করতল-শিরা** (reticulate palmate)।

তেজপাতার শিরাবিন্যাস আর এক প্রকারের। বৃন্তাগ্র হইতে তিনটি শিরা ফলকে প্রবেশ করিয়াছে। মধ্যশিরাটি সোজা, পাশের দুইটি ধনুকের মত বাঁকা। তিনটি শিরাই পাতার আগা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই প্রকার বিন্যাসের নাম **ধনুঃ-শিরা** (curved venation)। ইহাও জাল শিরার অন্তর্গত।

ধান, ভুট্টা, গম, বাঁশ প্রভৃতির পাতা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে কতকগুলি মোটা শিরা পাশাপাশি সরলভাবে ফলকের গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহাকে **সমান্তরাল শিরাবিন্যাস** (parallel venation) বলে। একদল-বীজ উদ্ভিদের পত্রে সাধারণতঃ এইরূপ শিরাবিন্যাস থাকে।

সমান্তরাল শিরার মধ্যেও আবার পালক-শিরা এবং করতল-শিরা এই দুই ভাগই আছে। **সমান্তরাল পালক-শিরা** (parallel pinnate)

যেমন,—কলাপাতা। **সমান্তরালকরতল-শিরা** (parallel palmate) যেমন,—বাঁশ পাতা।

পাতায় শিরার আবশ্যকতা (The use of venation in a leaf)—মাটির রস উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও শাখার মধ্য দিয়া উঠিয়া এই শিরা-উপশিরার পথে পাতার মাঝে ছড়াইয়া পড়ে। তেমনই আবার পাতায় পাতায় উদ্ভিদের যে খাদ্য প্রস্তুত হয় তাহাও এই শিরা-উপশিরা দিয়া দেহের সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। এ ছাড়াও পাতার শিরা-উপশিরাগুলির জন্য গাছের পাতা মজবুত হয়, সহজে ঝরিয়া বা ছিঁড়িয়া পড়িতে পারে না।

পাতার কার্য্য (Function of a leaf)—পাতার প্রধান কাজ—(১) **শ্বাসকার্য্য,** (২) **অঙ্গার-আত্মকরণ** ও (৩) **প্রস্বেদন।**

শ্বাস-কার্য্য (Respiration)—উদ্ভিদ্‌ও প্রাণীর ন্যায় অহোরাত্র শ্বাস-কার্য্যে রত। শ্বাস-কার্য্য বন্ধ হইলে প্রাণী যেমন মরিয়া যায়, উদ্ভিদ্‌ও তেমনই মরিয়া যায়।

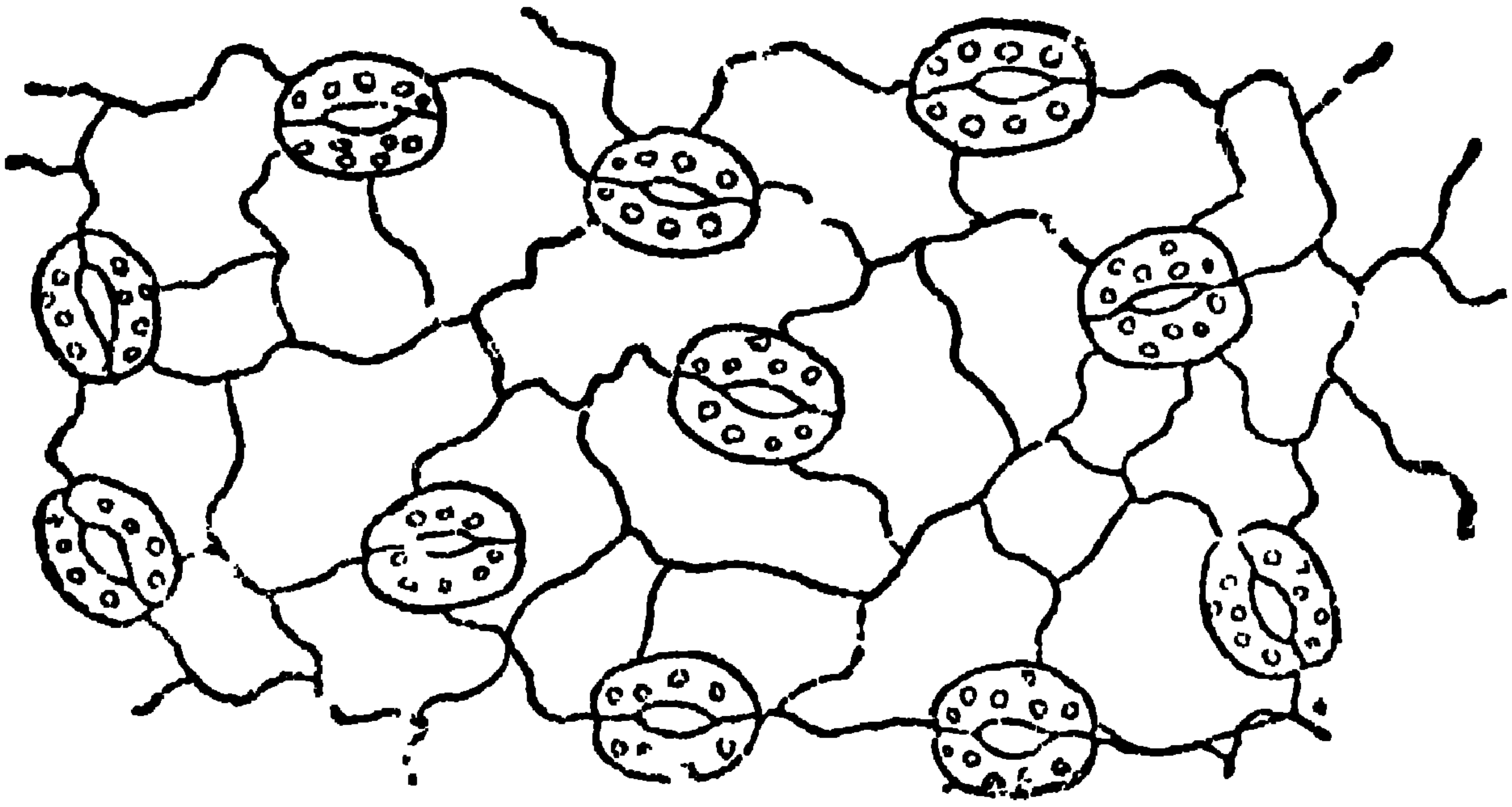

২৯ পাতার ষ্টোমা

গাছের পাতার নীচে অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম রন্ধ্র বা **ষ্টোমা** (stoma) আছে। ইহা এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে দেখা যায় না। সাধারণতঃ এই

রন্ধ্র পথেই গাছের শ্বাসকার্য্য চলে। ইহা ছাড়া গাছের প্রত্যেক কোষই শ্বাসকার্য্য চালাইতে পারে। শ্বাসকার্য্যে প্রাণীর ন্যায় গাছও অক্সিজেন গ্যাস লয় ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে। ইহাতে গাছের শরীরতন্তুর (body tissue) বিশুদ্ধীকরণ ঘটে। শ্বাসকার্য্যে গাছের শরীরের তাপও রক্ষিত হয়।

শ্বাস-কার্য্যের পরীক্ষা (Experiment on respiration)—একটি কাচের ফ্লাস্কের ভিতর কয়েকটি টাটকা ফুল বোঁটা বাদ দিয়া এমনভাবে ঢুকাইয়া দাও যাহাতে ফ্লাস্কের গলা উপুড় করিলে উহারা বাহির হইয়া আসিবে না। এখন একটি কাচ-পাত্রে পারা ঢাল ও সেই

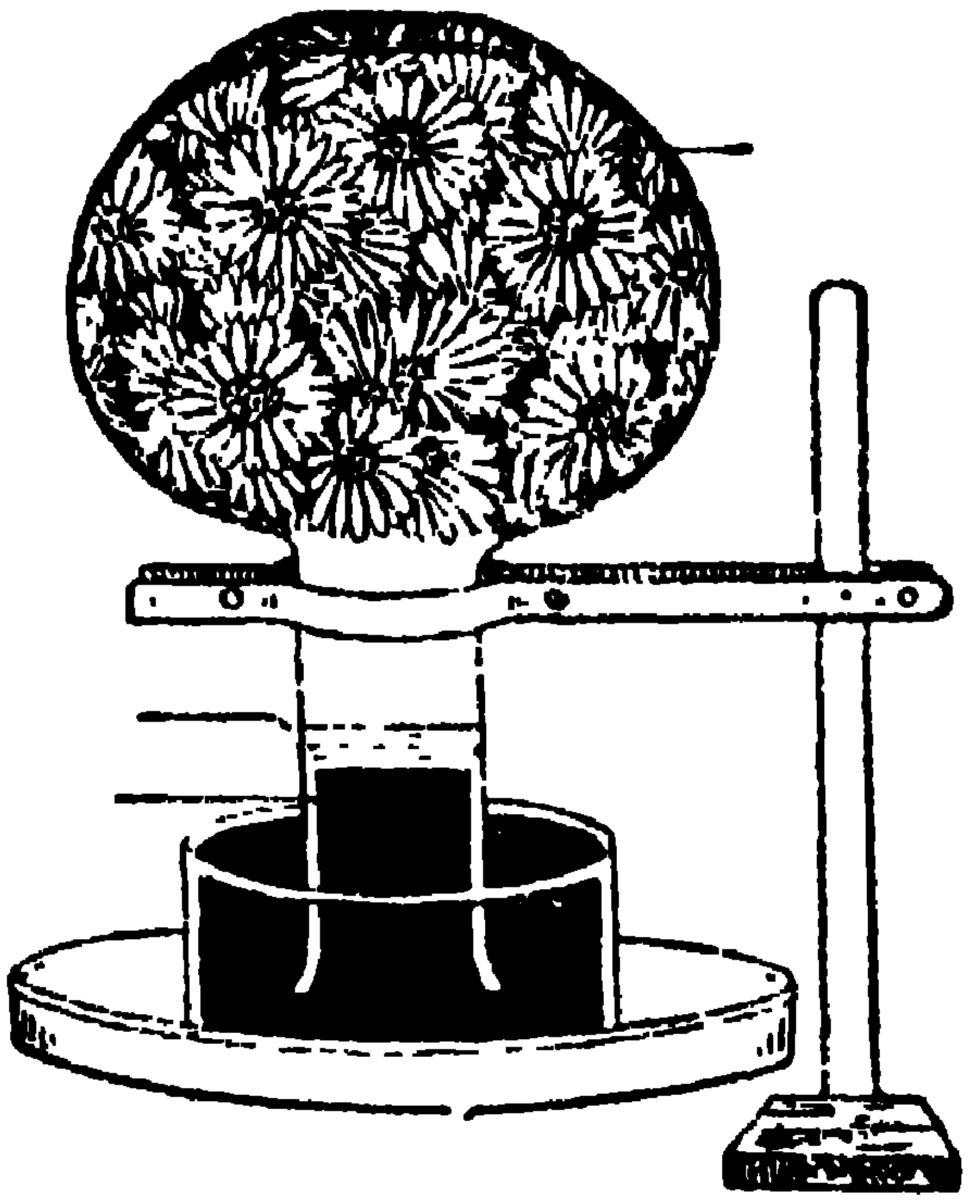

৩০। শ্বাস-কার্য্যের পরীক্ষা

কাচ-পাত্রের নীচে একটি বড় পাত্র রাখ যাহাতে প্রথম পাত্র ভাঙ্গিলেও পারা দ্বিতীয় পাত্রটিতে ধরা পড়িবে, ঘরময় ছড়াইয়া যাইবে না। তারপর ফুল-সমেত ফ্লাস্কটি ঐ পারার মধ্যে এমনভাবে উপুড় করিয়া দাও যে ফ্লাস্কের গলার খানিকটা পারার মধ্যে থাকে। এখন আর একটি পাত্রে কষ্টিক পটাশ (caustic potash) জলে ঘন করিয়া দ্রবীভূত কর ও একটি

বাঁকা নল দ্বারা সাবধানে ঐ দ্রবীভূত কষ্টিক পটাশ ফ্লাস্কের গলায় প্রবেশ করাইয়া দাও। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখিবে ফ্লাস্কের গলার ভিতরে পারা বাহিরের পারা অপেক্ষা খানিকটা উপরে উঠিয়াছে। ইহা হইতে ফুলের শ্বাসকার্য্য প্রমাণ করা যায়। ফ্লাস্কের মধ্যে যে বাতাস ছিল তাহা হইতে ফুল যে পরিমাণ অক্সিজেন শ্বাসকার্য্যে গ্রহণ করে, সেই পরিমাণই কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে। তাহা হইলে ফ্লাস্কের মধ্যস্থ বাতাসের পরিমাণের তারতম্য হওয়া উচিত নয়; কিন্তু কষ্টিক পটাশ কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে ও তাহাতে বাতাসের পরিমাণ কমিয়া যায়। সুতরাং পারা ফ্লাস্কের গলায় সেই পরিমাণ বেশী উঠে।

অঙ্গার-আত্মকরণ (Photosynthesis or carbon 'assimilation)—উদ্ভিদ্ বাতাসের কার্ব্বন্ ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইতে অঙ্গার সংগ্রহ করে। পাতার ও ডালপালার সবুজকণা এই কার্য্যের প্রধান সহায়। সবুজকণা ও সূর্য্যকিরণের সাহায্যে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জলের সহিত মিশিয়া খাদ্যে পরিণত হয়। পরে তাহা হইতে উদ্ভিদের দেহ সংগঠিত হয়।

একটি চারা গাছকে হাঁড়ি চাপা দিয়া রাখিলে দেখা যায় যে সূর্য্যালোকের অভাবে তাহার ডালপালা সাদা হইয়া গিয়াছে, ও গাছটি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। আবার কিছুদিন সূর্য্যকিরণে রাখিলে দেখা যাইবে যে উহা দিব্য সবুজ ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছে।

অঙ্গার-সংগ্রহণ কার্য্যকে প্রাণীর শ্বাসকার্য্যের সহায়ক বলা যায়; কেন না দিনের বেলায় গাছ নিয়ত কার্ব্বন্ ডাই-অক্সাইড টানিয়া লইতেছে ও বিশুদ্ধ অক্সিজেন ত্যাগ করিতেছে। এই অক্সিজেন প্রাণিজগতের প্রাণ সংরক্ষণ করিতেছে।

রাত্রিকালে সূর্য্যকিরণের অভাবে অঙ্গার-আত্মকরণ বন্ধ থাকে; কিন্তু

শ্বাসকার্য্য দিবারাত্র সমভাবেই চলে। সে কারণ প্রাণীদের মত উদ্ভিদ্‌ও রাত্রে শ্বাসকার্য্যের জন্য কেবল অক্সিজেন টানিয়া লয় ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়ে। এই জন্য রাত্রে শয়নাগারে কোন গাছ রাখা উচিত নয়; রাখিলে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে মানুষের শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিবে।

গাছ খাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় যে অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করে তাহার পরীক্ষা—একটি কাচের পাত্রে কয়েকটি ঝাঁঝি জলের মধ্যে রাখ। ইহার উপর একটি ফানেল চাপা দাও। ফানেলের সরু নলটি যেন জলের একটু নীচে থাকে। এই নলের শেষে একটি পরীক্ষা-নল জলে ভরিয়া উপুড় করিয়া পরাইয়া দাও। এখন সর্ব্বসমেত এই পাত্রটি রৌদ্রে রাখ। একটু পরে

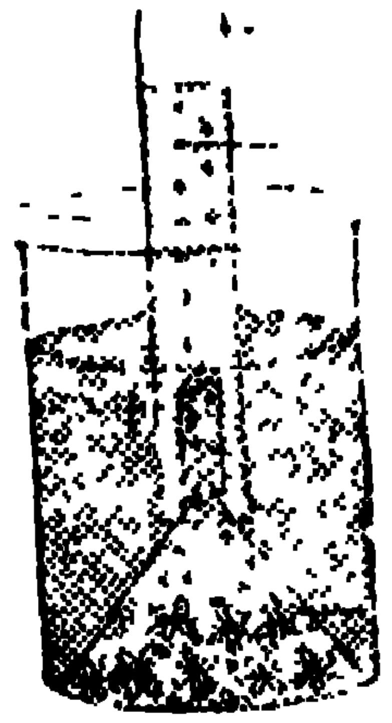

৩১। গাছের খাদ্যপ্রস্তুতকরণে অক্সিজেন ত্যাগ

দেখিবে ঝাঁঝি হইতে বুদ্বুদ বাহির হইয়া জলের উপর উঠিতেছে ও পরীক্ষা-নলের শেষ প্রান্ত জলের পরিবর্ত্তে এই বুদ্বুদের গ্যাসে ভরিতেছে। এই বুদ্বুদ যে অক্সিজেন গ্যাস তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। সমস্ত পরীক্ষা-নলটি এই গ্যাসে ভরিয়া গেলে সাবধানে ফানেল হইতে খুলিয়া লও ও আঙ্গুল দিয়া ইহার মুখ বন্ধ করিয়া সরাইয়া লও। এখন নলের মুখটি নীচু দিকে রাখিয়া শিখাহীন জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি সাবধানে নলের মুখে প্রবেশ করাইয়া দাও, দেখিবে উহা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

ফুঁ দিয়া নিবাও, ও আবার ধর, আবার জ্বলিয়া উঠিবে। ইহাতেই বুঝা যায় যে এই গ্যাস অক্সিজেন। যদি রৌদ্র হইতে অন্ধকারে সরাইয়া লইয়া পূর্ব্বের মত আর সব ব্যবস্থা কর ত দেখিবে ঝাঁঝি আর অক্সিজেন ত্যাগ করিতেছে না।

প্রস্বেদন (Transpiration)—গাছ তরল বস্তু ভিন্ন অন্য কোনরূপ খাদ্য মাটি হইতে গ্রহণ করিতে পারে না। সেইজন্য মাটি হইতে তাহাকে অনেক জল টানিয়া লইতে হয়। যেটুকুর প্রয়োজন আছে সেইটুকু রাখিয়া বাকীটা পাতার ছিদ্র দিয়া বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়। ইহাকে প্রস্বেদন কহে। অত্যধিক উত্তাপ, শুষ্ক বায়ু, প্রবল বাতাস, কাণ্ডের অতিরিক্ত আন্দোলন, এই সকলের ফলে উদ্ভিদের বাষ্পনির্গমন বাড়িয়া উঠে। ইহার উপর আবার মাটি যদি শুষ্ক, নীরস হয় ত বৃক্ষ একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দেহ হইতে জল বাহির হইয়া যাইতেছে অথচ মাটি হইতে যথেষ্ট জল পাইতেছে না; ইহাতে নিস্তেজ হইয়া পড়াই স্বাভাবিক।

প্রস্বেদনক্রিয়া দিনের বেলা বেশী হয়, রাত্রে ইহা কমিয়া যায়।

প্রস্বেদন পরীক্ষা (Experiment on transpiration)—একটি গামলায় মাটি ভর। এখন একখণ্ড পাতলা রবার লইয়া যাহাতে ঐ গামলার মুখ চাপা পড়ে তাহা হইতে একটু বড় করিয়া কাটিয়া লও। রবারের মাঝখানে একটি ছিদ্র করিয়া একটি চারা গাছের গোড়া প্রবেশ করাইয়া দাও। এখন ঐ রবারের ভিতর দিয়া যে চারার গোড়া আসিয়াছে তাহা গামলার মাটিতে পুঁতিয়া দাও ও গাছটি লাগিয়া যাইবার জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা কর। তাহার পর রবার দিয়া গামলার মুখ বন্ধ করিয়া দড়ি দিয়া বেশ করিয়া গামলার কানায় বাঁধিয়া দাও। রবারের যে ছিদ্র দিয়া চারাটি বাহিরে আসিয়াছে তাহা যদি বড় হয় ত তুলা দিয়া বন্ধ

করিয়া দাও। গামলা সমেত চারাটিকে টেবিলের উপর বসাইয়া একটি কাচের বেল-জার (bell-jar) চাপা দাও। পরদিন দেখিবে যে জারের স্বচ্ছ কাচ ক্রমশঃ ঘোলাটে হইয়া যাইতেছে ও ধীরে ধীরে কাচের ভিতর দিকে জলবিন্দু দেখা দিতেছে। ইহা ঐ গাছের প্রস্বেদনক্রিয়ার ফল মাত্র। গাছের পাতা হইতে নিঃসৃত বাষ্প বেল-জারের শীতল কাচের গায়ে লাগিয়া জমিয়া জল হইতেছে। নয় ত জল কোথা হইতে আসিবে ?

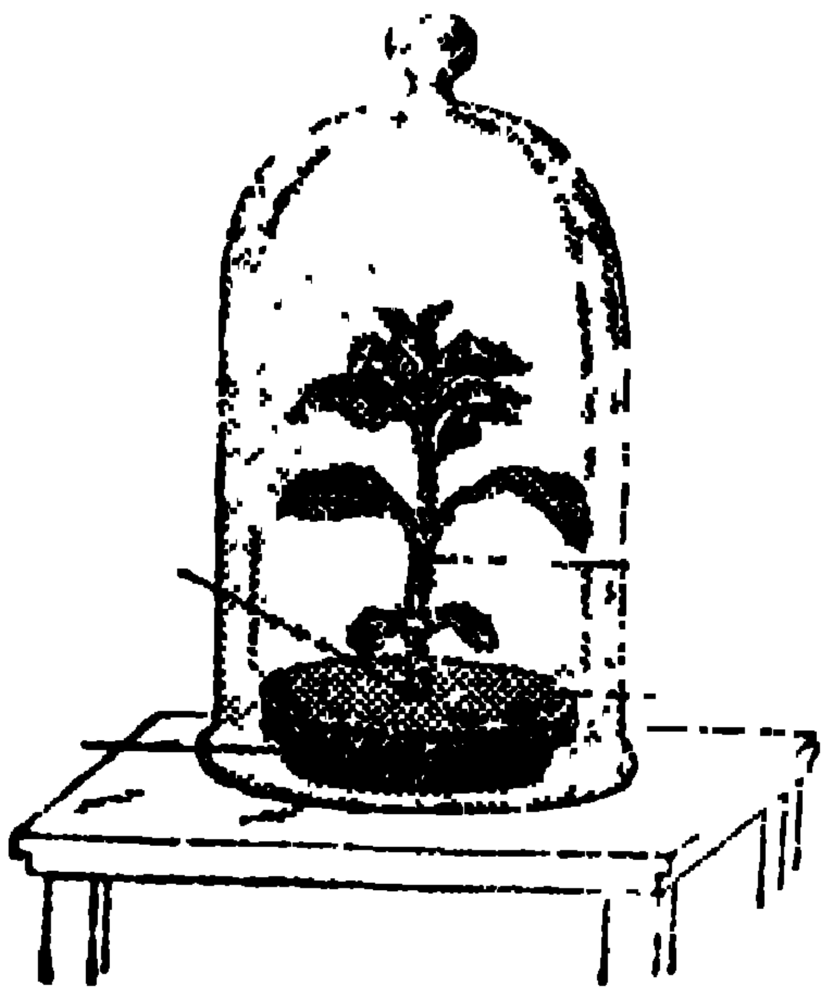

৩২। প্রস্বেদন পরীক্ষা

গাছ ও আলো—একটি ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া মাত্র একটি জানালা খুলিয়া তাহার সামনে ঘরের মধ্যে বোতলে করিয়া একটি গাছ বসাইয়া রাখ। একটি ছিপিতে ছিদ্র করিয়া গাছটির মূল বোতলের ভিতর এমনভাবে জলের মধ্যে প্রবেশ করাও যেন গাছের ডাঁটা ও পাতা ছিপি হইতে বোতলের বাহিরে থাকে। পরদিনই দেখিবে গাছটির ডগা বাঁকিয়া জানালার দিকে মুখ করিয়াছে ও মূল ঘরের ভিতর দিকে বাঁকিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় কাণ্ড ও পাতা সর্ব্বদা আলোর দিকে এবং মূল অন্ধকারের দিকে যায়।

পাতার অন্যান্য কাজ

(Other functions of leaves)

(১) **উপরে উঠিতে সাহায্য**—পাতার আগা আকর্ষে পরিণত হইয়া গাছকে উপরে উঠিতে সাহায্য করে। যেমন, উলট-চণ্ডালের পাতা।

(২) **আত্মরক্ষা**—পাতার আগা কাঁটার মত হইয়া জীবজন্তুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করে। যেমন, খেজুর পাতা।

(৩) **সাধারণ পাতায় খাদ্য-সঞ্চয়**—কখনও কখনও খাদ্য-সঞ্চয়ের জন্য পাতা পুরু হয়; যেমন, ঘৃতকুমারীর পাতা।

(৪) **বীজপত্রে খাদ্য-সঞ্চয়**—বীজের মধ্যে পাতা বীজপত্রে পরিণত হয়। কখনও কখনও এই বীজপত্রে ভ্রূণের খাদ্য জমা থাকে; যেমন, ছোট মটরের বীজপত্রে।

(৫) **তাপ ও শৈত্য হইতে রক্ষার জন্য পাতার শল্কপত্রে পরিণতি**—ভূ নিম্নস্থ কাণ্ডের পাতা শল্কপত্রে পরিণত হইয়া গাছকে উত্তাপ বা শৈত্য হইতে রক্ষা করে। কখনও কখনও এই শল্কপত্র খাদ্য জমা থাকার জন্য পুরু হয়, যেমন, পিঁয়াজের শল্কপত্র।

(৬) **বংশরক্ষা**—পাতা হইতে নূতন চারা জন্মে; যেমন, পাথরকুচির পাতা।

(৭) **পতঙ্গভুক্**—যে সকল উদ্ভিদ্ মাটি হইতে নাইট্রেট লইতে পারে না তাহাদের নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য-সংগ্রহের রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। বাংলা দেশের খালে বিলে একপ্রকার ঝাঁঝি (bladder

wort) পাওয়া যায় (৩৩নং চিত্র), যাহাদের মূল নাই, কিন্তু পাতাগুলি দেখিতে অনেকটা মূলের মত। ইহার পাতার কিয়দংশ থলির আকার

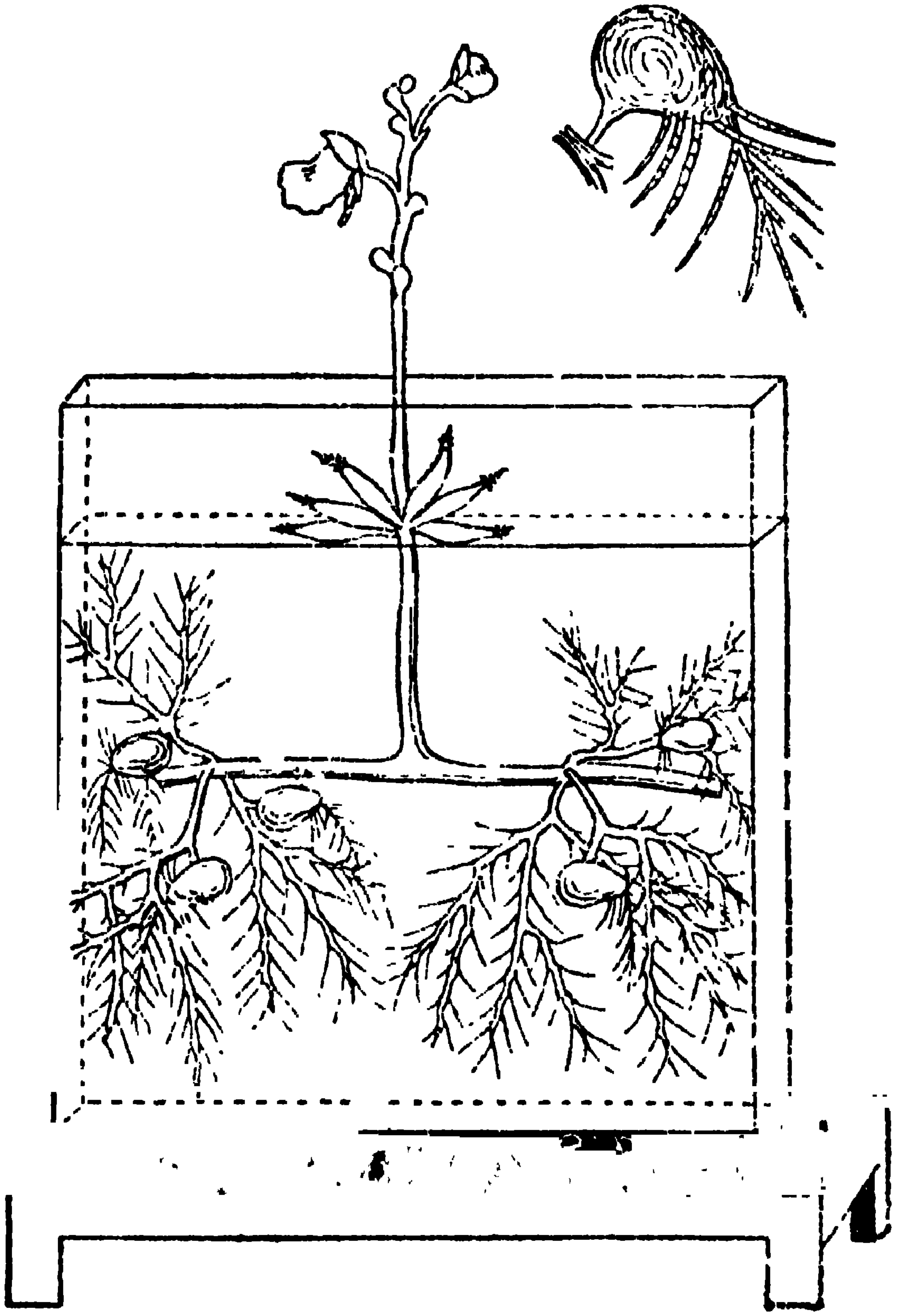

৩৩। ঝাঁঝি

ধারণ করে। এই থলির মুখের কপাট ঠেলিয়া পোকা সহজেই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু একবার ঢুকিলে আর বাহির হইতে পারে না।

জলজ পোকা এই ভাবে থলিতে ধরা পড়িলে গাছ আপন দেহ হইতে এক প্রকার রস বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে পোকা হজম করে।

ড্রসেরা বলিয়া আর এক প্রকার উদ্ভিদ্ আছে (৩৪নং চিত্র) যাহার পাতার উপর লোম থাকে। কোন পোকা-মাকড় তাহার উপর বসিলে

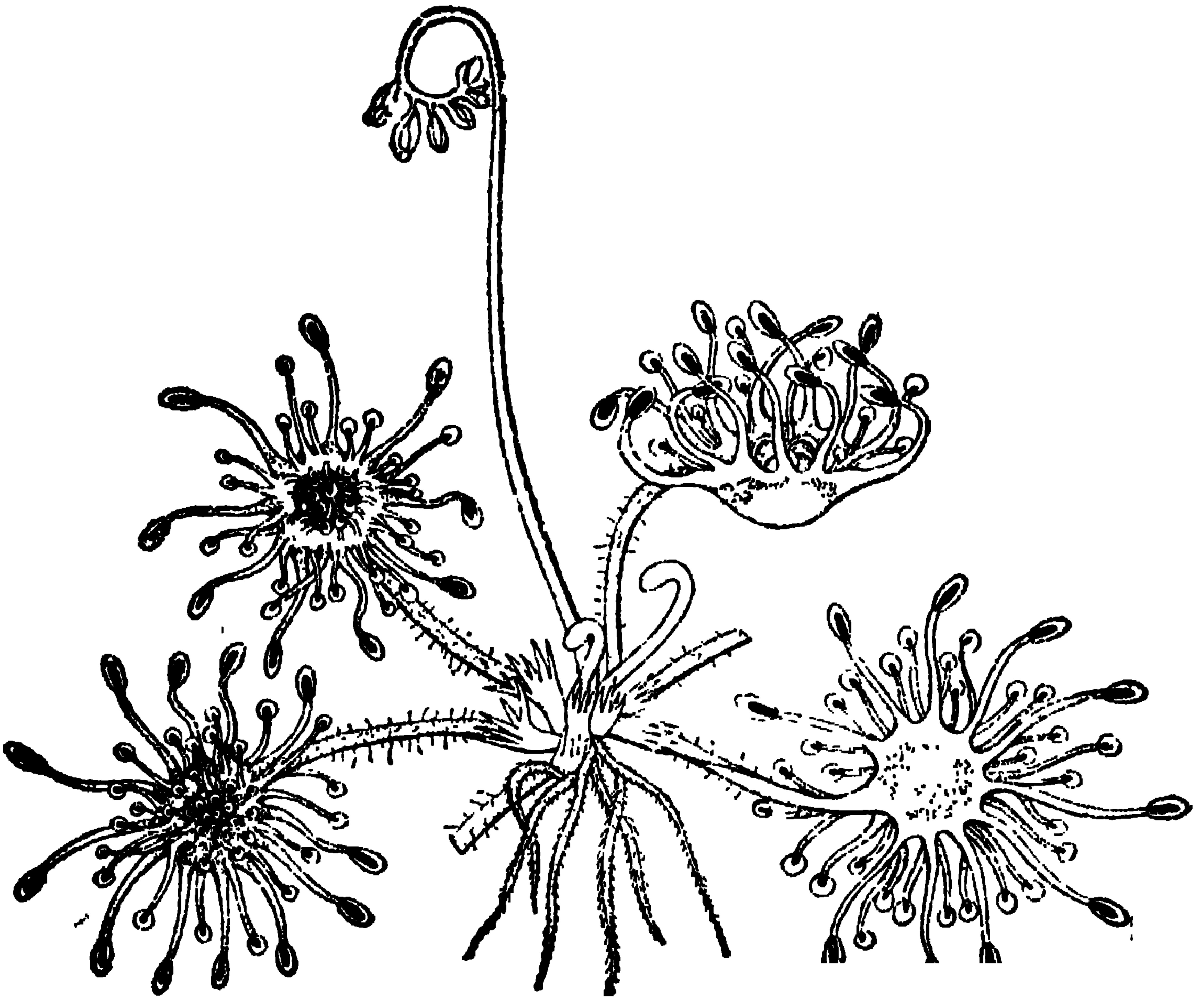

৩৪। ড্রসেরা

এই লোমগুলি তাহাকে ধরিয়া ফেলে। পরে গাছের দেহের রস বাহির হইয়া সেই পোকাকে হজম করিয়া দেয় যাহাতে গাছের পুষ্টিসাধন হয়।

রংপুর ও আসামের জঙ্গলে একপ্রকার **কলস উদ্ভিদ্** (pitcher plant) নামে পতঙ্গভুক্ গাছ দেখা যায়। ইহার ফলকের মধ্যশিরা আকর্ষে পরিবর্ত্তিত হয় এবং আগায় ঘটির মত একটি অঙ্গ থাকে। ঘটির

মধ্যে জল থাকে ও ঢাকনিটি রঙ্গীন। এই ঢাকনির উজ্জ্বল রঙের জন্য পতঙ্গ আকৃষ্ট হইয়া ঘটির উপর বসিয়া মধু পান করে। মধু পান করিবার কালে উহারা ঘটির মুখের নীচে তেলা অংশে আসে ও হঠাৎ পা পিছলাইয়া ঘটির মধ্যে পড়িয়া জলে ডুবিয়া মারা যায়। ঘটির ভিতরকার প্রাচীরে এক প্রকার গ্রন্থি (gland) থাকে। উহা হইতে রস বাহির হইয়া পতঙ্গকে হজম করে। এইরূপে কলস উদ্ভিদ্ পতঙ্গের দেহ হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

উদ্ভিদের শ্বাস-কার্য্য, অঙ্গার-আত্মকরণ ও প্রস্বেদনের তুলনা :

শ্বাস-কার্য্য	অঙ্গার-আত্মকরণ	প্রস্বেদন-ক্রিয়া
১। দেহের সর্ব্বত্র এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।	১। কেবল দেহের সবুজ অংশে সম্পন্ন হইয়া থাকে।	১। কেবল পাতার ষ্টোমাদ্বারা সম্ভব হয়।
২। দিবারাত্র সমভাবেই এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।	২। কেবল সূর্য্যালোকে সম্পন্ন হয়।	২। দিনের বেলা সম্ভব হইলেও রাত্রেও ইহা অসম্ভব নহে।
৩। ইহা দ্বারা শক্তি ব্যয় হয়।	৩। ইহা দ্বারা শক্তি সঞ্চয় হয়।	৩। শক্তির সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই।
৪। অক্সিজেন গৃহীত ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড বাষ্প পরিত্যক্ত হয়।	৪। কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গৃহীত ও অক্সিজেন পরিত্যক্ত হয়।	৪। দেহ হইতে জল বাষ্পাকারে পরিত্যক্ত হয়।
৫। ইহাতে গাছের ওজন কমে।	৫। ইহাতে গাছের ওজন বৃদ্ধি হয়।	৫। ইহাতে গাছের ওজন কমে।

Questions

Describe a typical leaf and mention the function of its various parts. (B. T. 1942)

2. Compare simple and compound leaves.

3. Name the various forms of leaves you know.

4. What is the margin of a leaf? State whether the marigold or papya leaf is simple or not.

5. What do you know about the apex of a leaf?

6. What is the venation of a leaf? Write what you know of the different forms of venation.

7. What is the utility of the leaf to a tree? What is stomata? (T. T. 1938)

Describe an experiment to show that green leaves give off oxygen in the process of carbon-assimilation. Discuss how this process helps animal life. (C. U. 1944)

9. Compare the processes of respiration, carbon assimilation and transpiration.

0. Mention the names of a few insectivous plants. How are insects caught and the Nitrogenous food material in the is absorbed by the plants?

What is transpiration? How do you demonstrate it?

2. Define the following terms:—Stipule, Tendril, Bud, Midrib, Chlorophyll.

3. Describe the importance of green colour in the life of plants. How do the non-green plants live? (T. T. 1940)

4. What are the functions of the green leaves of plants? (C. U. 1945)

ফুল ও তাহার কার্য্য

(The flower and its functions)

ফুল—সারা বৎসর কোন গাছেই ফুল ফোটে না। প্রত্যেক গাছে ল ফুটিবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে।

প্রত্যেক ডালে একটি করিয়া ফুল ধরে অথবা কতকগুলি ফুল চ্ছাকারে একটি বিশেষ ডালে বা শীষের উপর ফোটে। এই শেষোক্ত াকার ডালকে **মঞ্জরী** (inflorescence) বলে।

সাধারণ ফুলের চারিটি স্তবক থাকে—(১) বৃতি; (২) দল;

(৩) **পুংকেশর চক্র** (Andrœcium); (৪) **গর্ভকেশর চক্র** (Gynæcium)।

৩৫। জবাফুল

সব ফুলেরই বোঁটা থাকে না। যাহাদের বোঁটা থাকে তাহাদিগকে **সবৃন্তক** এবং যাহাদের বোঁটা থাকে না তাহাদিগকে **অবৃন্তক** ফুল বলা হয়।

জবাফুল (shoe flower)—জবা সবৃন্তক ফুল। জবার একটি কুঁড়ি লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে উহার উপর একটি সবুজ বর্ণের আবরণ আছে। এই আবরণটিকে **বৃতি** (calyx) কহে। আবরণটি মোটামুটি একটি গেলাসের আকার। ইহার কিনারাতে পাঁচটি

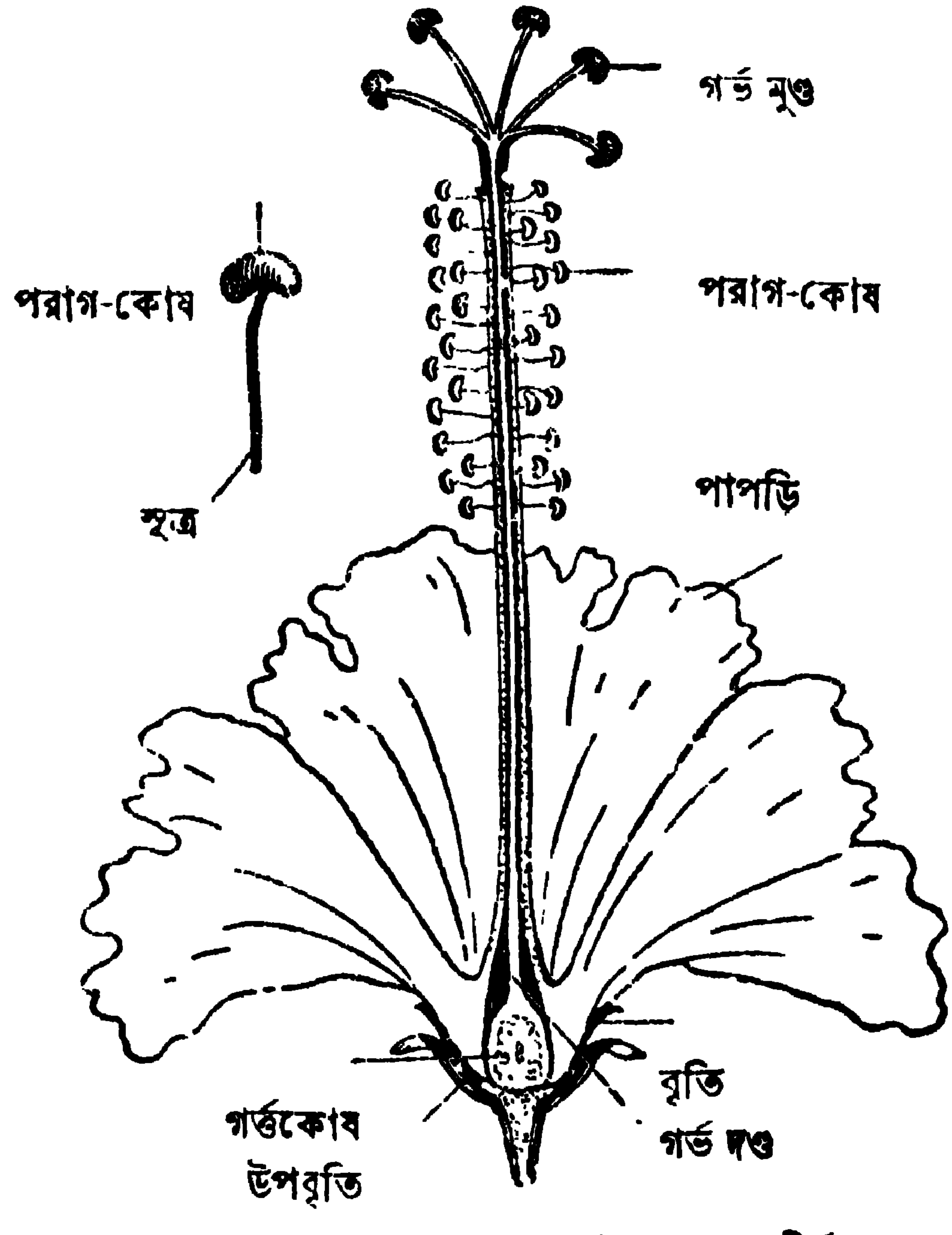

৩৬। জবার পরাগকোষ ও জবাফুলের অনুদীর্ঘচ্ছেদ

দাঁতের মত খাঁজ আছে। এই খাঁজ হইতেই পাঁচটি স্বতন্ত্র খণ্ডের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক খণ্ডকে **বৃত্যংশ** (sepal) কহে। বৃতির নীচে আবার কয়েকটি খণ্ডে গঠিত একটি **উপবৃতি** (epicalyx) আছে। সাধারণ ফুলে এই উপবৃতি বড় একটা থাকে না।

বৃতির ঠিক ভিতরে কয়েকটি লাল **পাঁপড়ি** (petal) আছে। প্রত্যেক পাপড়ি পৃথক্‌ভাবে থাকে। এই পাপড়ির সমষ্টিকে অন্তরাবরণ বা **দল** (corolla) কহে। পাপড়ি বা দলেই ফুলের সৌন্দর্য্য ও উহার গন্ধের আবাস। ফুলের রূপ, বর্ণ, গন্ধ সকলই ইহার উপর নির্ভর করে। যে সকল ফুল দিনে ফোটে তাহাদের পাপড়ির রং প্রায়ই নানা প্রকার, সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে এবং তাহাদের গন্ধও মধুর হয়। আর যে সকল ফুল রাত্রে ফোটে তাহাদের রং সাদা ও গন্ধ অত্যন্ত তীব্র। পাপড়ির ভিতরে যে অংশ দুইটি দেখা যায়, উহাই পুষ্পের **পুংকেশর** ও **গর্ভকেশর** (stamen and carpel)। পু-কেশরের দুইটি ভাগ—একটি **সূত্র** (filament) ও অপরটি সূত্রের মাথায় হরিদ্রাবর্ণের **পরাগ-কোষ** (anther)। এই পরাগ-কোষের ভিতর **পরাগ রেণু** (pollen grains) থাকে। জবাফুলের পুংকেশর অনেকগুলি ও সূত্রের গোড়াগুলি একত্র মিলিয়া গর্ভকেশরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। পুংকেশরের আবরণটিকে ছাড়াইয়া ফেলিলে ফুলের ঠিক মাঝখানে গর্ভকেশর দেখিতে পাওয়া যায়। এই গর্ভকেশরের আবার তিন অংশ—(১) **গর্ভকোষ** (ovary)। ইহা গোড়ার দিকে থাকে এবং আকারে মোটা ও ফাঁপা। ইহার ভিতর অনেকগুলি **ডিম্বকোষ** (ovule) আছে। ডিম্বকোষের ভিতর **ডিম্বক** (ovum) থাকে। (২) গর্ভকোষের অগ্রভাগ, যাহা ক্রমে একটি **গর্ভ দণ্ড** (style) আকারে পরিণত হইয়াছে। (৩) দণ্ডের মাথা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া পাঁচটি গোলাকার অংশে শেষ হইয়াছে। এই গোলাকার অংশের প্রত্যেকটিকে **গর্ভ মুণ্ড** (stigma) বলা হয়। মুণ্ড হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে আঠার মত চটচটে লাগে। পরাগ মুণ্ডে পতিত হইলে এই আঠাই পরাগকে আটকাইয়া রাখে। বৃতি, দল,

পুংকেশর ও গর্ভকেশর যে স্থানে লাগান থাকে তাহাকে **পুষ্পাধার** (thalamus) কহে।

কোন কোন ফুলে পুষ্পাধারের উপর দলের তলদেশে **মধুগ্রন্থি** (nectary) থাকে। ইহা হইতে এক প্রকার মিষ্টরস বাহির হয়।

মটর ফুল (pea flower)—ইহা দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির ন্যায়। মটর ফুলের পাঁচটি বৃত্যংশ একসঙ্গে জোড়া। বৃতিমধ্যস্থ সাদা পাপড়িগুলি দেখিতে সব একরকমের নয়। দুইটি পাপড়ি একসঙ্গে জুড়িয়া নৌকার মত দেখায়। বাকী তিনটি স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত। দলের

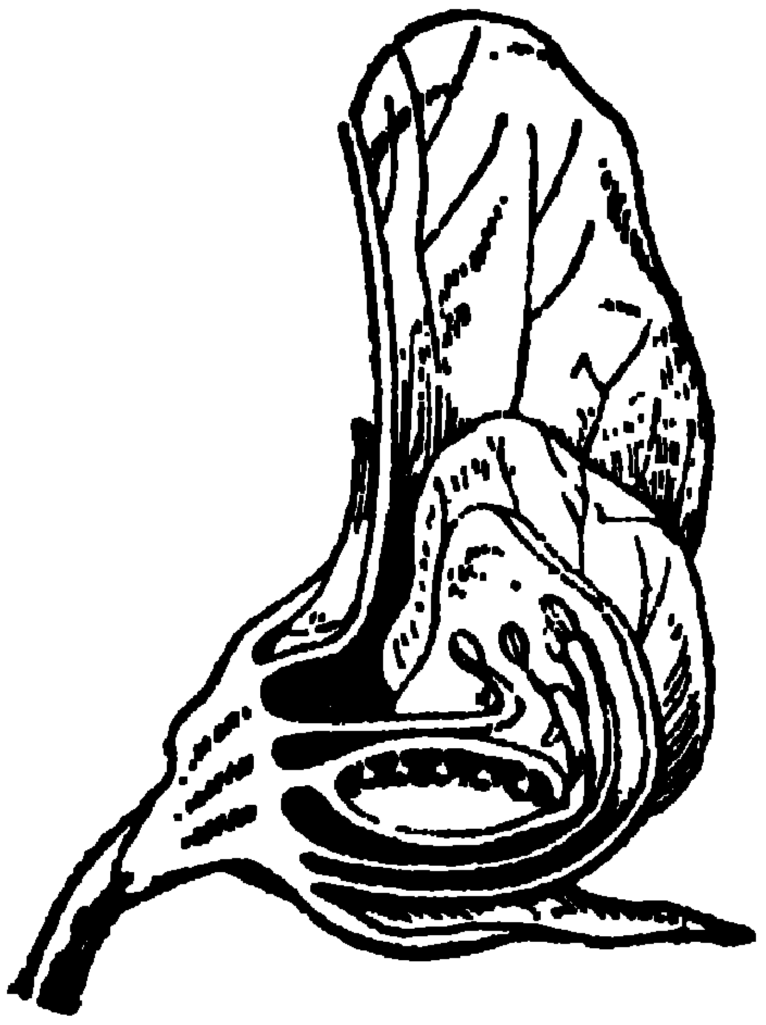

৩৭। মটরফুলের অনুদীর্ঘচ্ছেদ

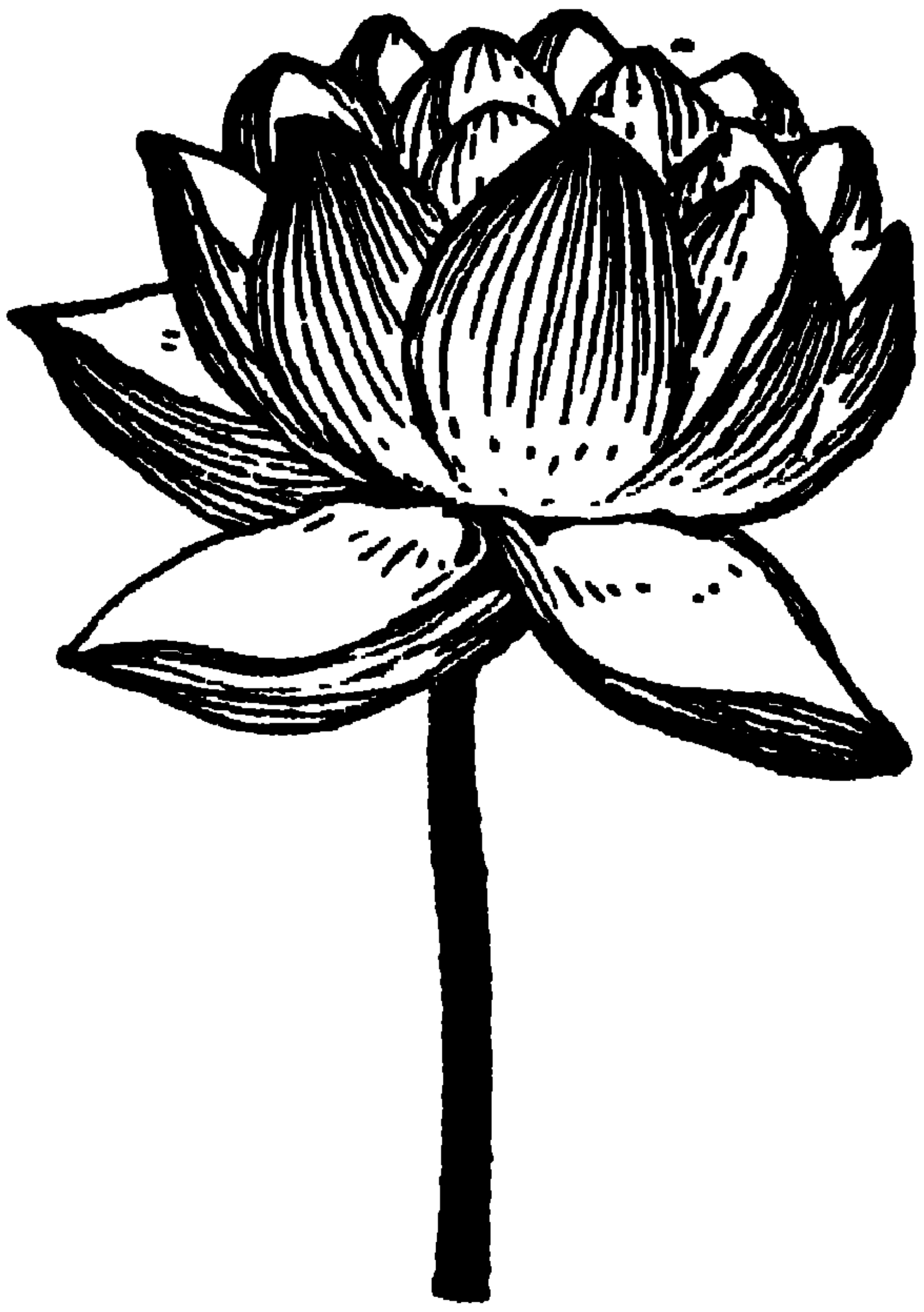

পদ্ম

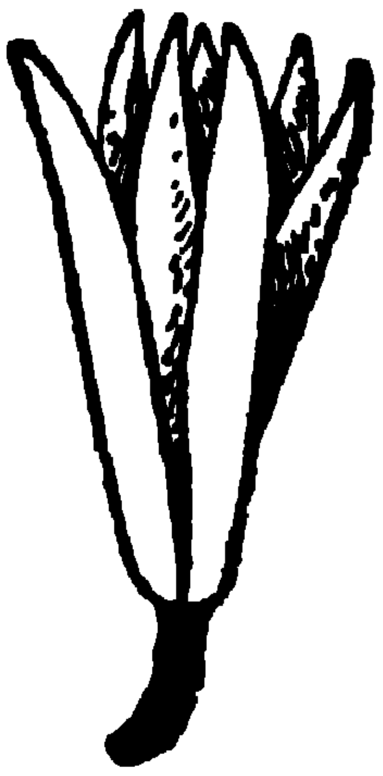

চাঁপাফুল

মধ্যে পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে। পুংকেশর দশটি। তার মধ্যে নয়টি একসঙ্গে জোড়া ও দশমটি পৃথক্। গর্ভকেশর একটি।

উপবৃতি, বৃতি ও দল—ইহারা পুংকেশর ও গর্ভকেশরকে সর্ব্বদা হিম, তাপ, বাতাস ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে। সাধারণ ফুলের বৃতি হইতে অন্যান্য অংশকে সহজেই পৃথক্ করা যায়। কিন্তু কতকগুলি ফুল আছে

যাহাদের বৃতি ও দল পৃথক্ করা যায় না। উহাদের বৃতি ও দলের বর্ণ এক প্রকার। যেমন, চাঁপা, পদ্ম, রজনীগন্ধা প্রভৃতি।

পদ্মফুলের বৃতি ও দল একই প্রকার। তবে বৃতিগুলি ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ। পদ্মের পাপড়ি সংখ্যায় অনেক বলিয়া পদ্মের নাম শতদল। পুংকেশরও

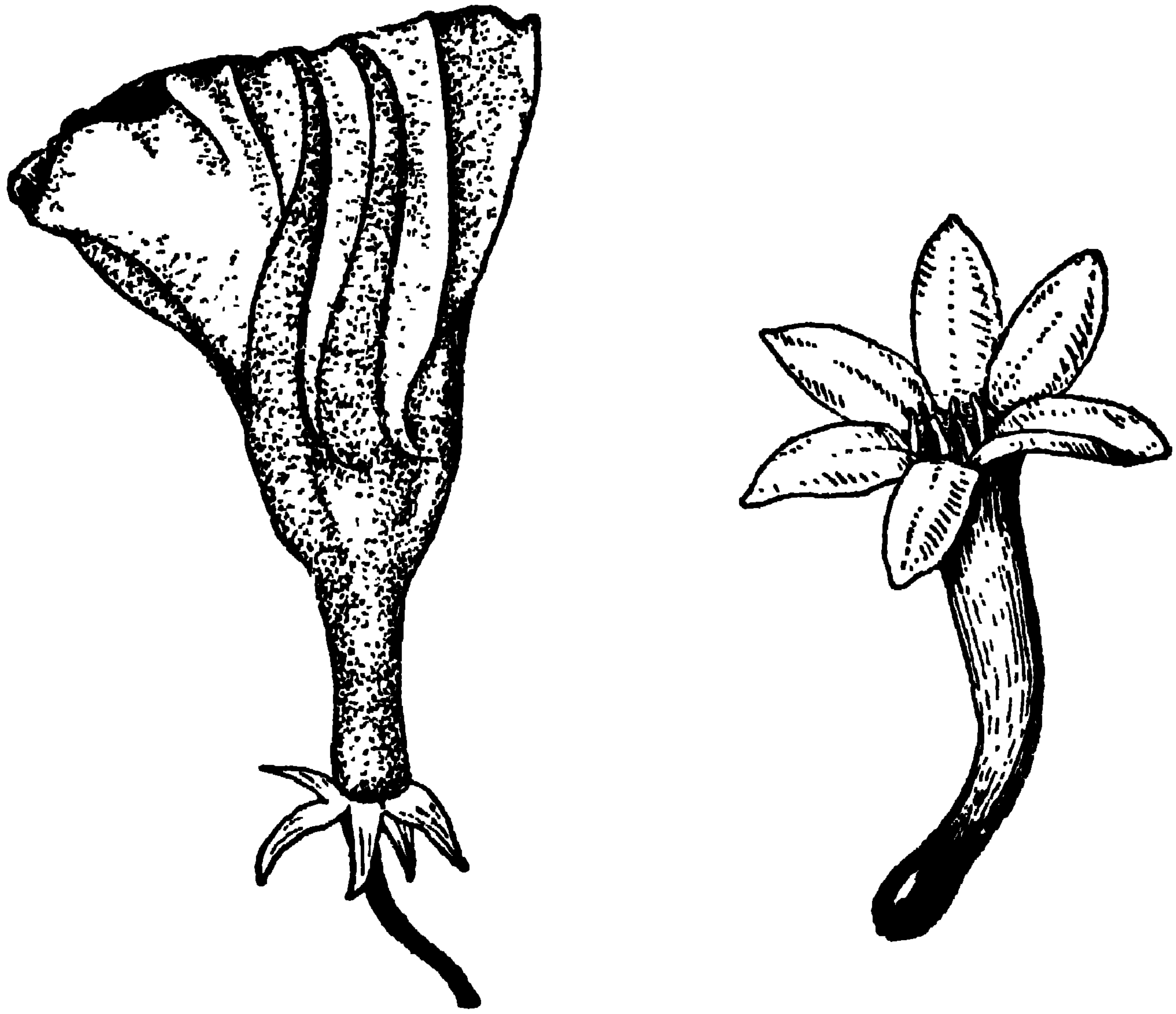

৩৮। কলিকা ও রজনীগন্ধা ফুল

অনেকগুলি। ফুলের মধ্যস্থ পুষ্পাধারটি মোটা ও তাহার উপরিভাগে প্রত্যেক গর্ত্তের মধ্যে একটি করিয়া গর্ভকেশর থাকে। প্রত্যেক গর্ভকেশরের মুণ্ডটি বাহির হইতে দেখা যায়।

কলিকা ফুলের পাঁচটি ও রজনীগন্ধার ছয়টি পাপড়ি মিলিত হইয়া হুকার কলিকার আকার ধারণ করিয়াছে।

গাঁদা ও কদম ফুল অনেকগুলি ফুলের সমষ্টিমাত্র। পাপড়িগুলি পৃথক্ পৃথক্ ফুলের। গাঁদার পুষ্পাধারটির আকার লাটিমের মত। বাহিরের ফুলগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও তাহারা প্রথমে বিকশিত হয়। কদমের পুষ্পাধারটি গোলাকার। ফুলগুলি তাহার উপরে সাজান থাকে।

ফুলের (১) বৃতি, (২) দল, (৩) পুংকেশর ও (৪) গর্ভকেশর এই চারিটি অঙ্গ থাকিলে তাহাকে **সম্পূর্ণ** (complete) পুষ্প বলা হয়; যেমন, জবা, মটর, কলিকা। যে কোনও একটি অঙ্গের অভাব ঘটিলে সেই পুষ্পকে **অসম্পূর্ণ** (incomplete) পুষ্প বলা চলে; যেমন, কুমড়া, লাউ, শশা, পেঁপে, তাল, খেজুর প্রভৃতি।

সাধারণ গাছের প্রত্যেক ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর দুইই থাকে। এই প্রকার ফুলকে পুরুষ ও স্ত্রী দুই-ই বলা যায়।

লাউ কুমড়ার ফুলে হয় পুংকেশর না হয় গর্ভকেশর থাকে, দুইটিই থাকে না। যে ফুলে মাত্র পুংকেশর থাকে তাহাকে **পুরুষ ফুল** বলে। যাহাতে কেবল গর্ভকেশর থাকে তাহাকে **স্ত্রী ফুল** বলে।

তাল-ফুল কুমড়া বা লাউ ফুলের মত; কিন্তু প্রভেদ এই যে, লাউ কুমড়ার একই গাছে পুরুষ বা স্ত্রী দুই জাতীয় ফুল ধরে। আর সাধারণতঃ তালের এক গাছে কেবল এক জাতীয় ফুল ধরে। কোনও গাছে কেবল পুরুষ ফুল, কোনও গাছে কেবল স্ত্রী ফুল। এইজন্য তাল গাছকে হয় পুরুষ গাছ, না হয় স্ত্রী গাছ বলা চলে।

ফুলের কার্য্য (Functions of flower)—বংশবৃদ্ধি করাই ফুলের প্রধান কাজ।

পরাগসংযোগ (Pollination)—ফুল তাহার দলের বা পাপড়ির সুন্দর রং দ্বারা কীট-পতঙ্গকে আকর্ষণ করে। কীট-পতঙ্গ ফুলের উপর বসাতে তাহাদের **পরাগসংযোগের** সাহায্য হয়। যে সকল ফুলে

বৃতিরও নানাবিধ রং থাকে তাহারা বৃতির রঙের দ্বারা কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে।

Questions

1. Explain the function of a flower? What use are the colour and the scent? Name half a dozen flowers and mention their respective colours. (C. U. 1943)
2. Describe any familiar flower e.g., Shoe (জবা) or Pea and mention the function of its different parts.
3. State the different parts of a flower. What is a complete and what is an incomplete flower?
4. Mention a flower with epicalyx and state what you know of its stamen and carpel.
5. Draw a diagram of the pea flower and label its parts.
6. How many parts are generally there in a stamen?
7. How does the ovary of a lotus lie in the thalamus?

৪.

ফল ও তাহার কার্য্য
(The fruit and its functions)

ফলের অংশ—সাধারণতঃ ডিম্বকের (ovum) সহিত পুংবীজ মিলিলে ফলের উৎপত্তি হয়। ফলের দুই অংশ :

১। **ফলত্বক্** (pericarp), অর্থাৎ যাহা গর্ভাশয়ের ত্বকের পরিণতি।

২। **বীজ**, যাহা ডিম্বক হইতে উৎপন্ন।

কোন কোন কৃষিজাত ফলের বীজ থাকে না।

ফলত্বকের তিন ভাগ :

১। **বহিফলত্বক্** (epicarp)—যাহা হইতে সচরাচর ফলের খোসা তৈয়ার হয়।

২। **মধ্যফলত্বক্** (mesocarp)—যাহা হইতে সাধারণতঃ ফলের শাঁস উৎপন্ন হয়। যেমন আমের শাঁস। কিন্তু সময়ে সময়ে ইহা শুষ্ক থাকে ; যেমন, নারিকেলের ছোবড়া।

৩। **অন্তর্ফলত্বক্** (endocarp) অনেক সময় ইহা অত্যন্ত পাতলা ঝিল্লীবৎ হইয়া থাকে, যেমন কমলালেবুতে। কখন কখন কঠিন প্রস্তরবৎ হয় ; যেমন, আমের আঁটিতে।

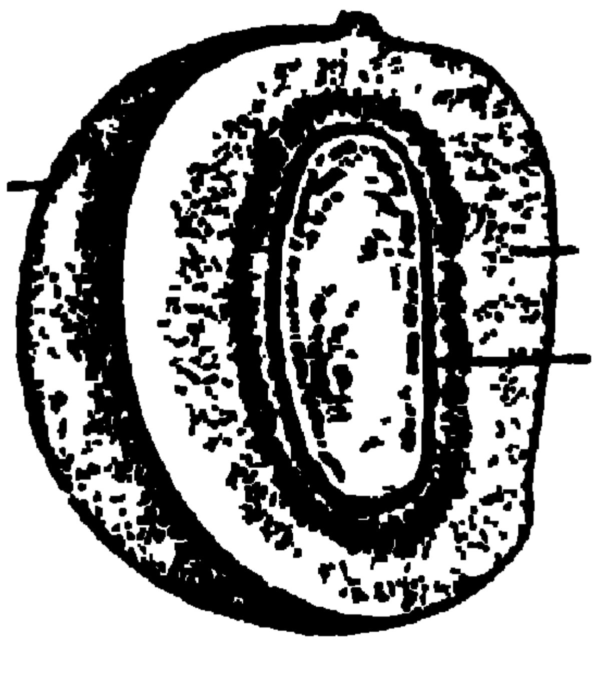

৩৯। আমের অনুদীর্ঘচ্ছেদ

সকল ফলের ফলত্বক্‌কে তিন ভাগ করা যায় না।

আম, জাম, কুল, আমড়া প্রভৃতি সরস ফল। এরূপ শাঁসযুক্ত ফলকে সাষ্টিক ফল বলা হয়। নারিকেল সুপারিও সাষ্টিক ফল, কিন্তু তাহাদের শাঁস আঁটির বাহিরে নয়, ভিতরে ; এই জন্য তাহাদের নাম সাষ্টিক নীরস ফল।

ফলের প্রধান কার্য্য—ফলের মধ্যে বীজ জন্মে। এই বীজ হইতে আবার নূতন চারা জন্মায়। ফলের প্রধান কার্য্য হইল—(১) **বীজকে অপরিণত অবস্থায় রক্ষা করা।** (২) **পরিপক্ক হইলে বীজ-বিস্তারের সাহায্য করা।** (৩) **বীজ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গাছের বংশ রক্ষা করা।**

ফলের প্রকার-ভেদ (Different types of fruits) —সাধারণতঃ ফলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা :

(১) একটি ফুলের (ক) একমাত্র গর্ভকোষ, কিংবা (খ) একত্র মিলিত (syncarpous ovary) কয়েকটি গর্ভকোষ, হইতে যে ফলের উৎপত্তি হয় তাহাকে **মৌলিক ফল** (simple fruit) কহে। মৌলিক ফল দুই প্রকার : (১) নীরস ও (২) রসাল।

(ক) মটর শুঁটি, বরবটি, ছোলা, শিম প্রভৃতি ফল পাকিয়া শুকাইয়া গেলে ইহাদের খোসা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায় ও জোড়ের মুখে এক সারি বীজ দেখা যায়। ইহারা **নীরস স্ফোটক** ফল।

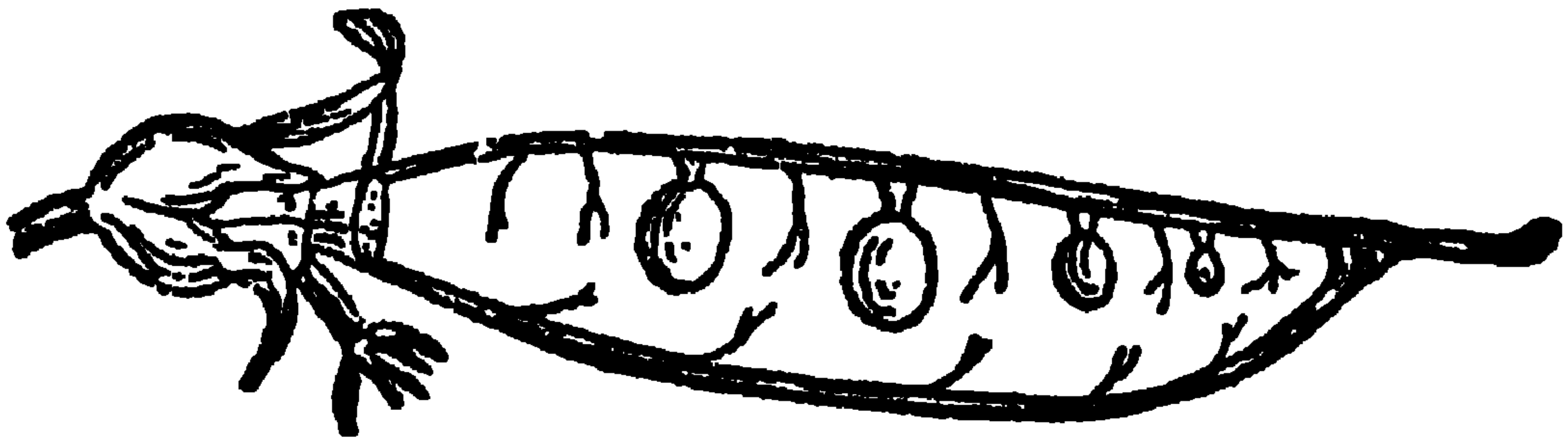

৪০। মটর শুঁটির ভিতর মটর দানা

ধান, যব, গম প্রভৃতি শস্য ঐ ঐ গাছের ফল। ধানের খোসা ছাড়াইলে একটি পাতলা লাল আবরণ দেখা যায়। এই আবরণের ভিতর চাল ও তার নীচে এক পার্শ্বে ধানের ভ্রূণ দেখা যায়। ইহারা **নীরস অস্ফোটক** ফল।

(খ) বেগুন, আঙ্গুর, কলা, টেপারি ও পেয়ারা প্রভৃতি ফলে বহু বীজ থাকে। ইহারা রসাল **বেগুন জাতীয়** ফল। আমরা ইহাদের তিনটি স্তরই খাই।

পাতি, কমলা, বাতাবি, কাগজি, প্রভৃতি লেবুর ছাল পুরু ও ভিতরটা কোষে বিভক্ত। প্রত্যেক কোষ রসপূর্ণ ছোট ছোট থলিতে ভরা।

লাউ, কুমড়া, শশা অনেকটা বেগুনের মত বহুবীজ সংবলিত শাঁসযুক্ত ফল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে ভিতরে তিনটি পৃথক্ প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। সময় সময় ভিতরে একটু ফাঁকও থাকে। ইহাদের **শশা জাতীয়** ফল বলে।

(২) একটি ফুলের পৃথক্ পৃথক্ অনেকগুলি গর্ভকোষ একত্রে (apocarpous ovaries) যে ফল হয় তাহাকে **গুচ্ছফল** (aggregate fruit) বলে, যেমন আতা। ইহার মধ্যে বহু বীজ ও প্রত্যেক বীজের বাহিরে শাঁস ও সবগুলি একত্রে ফলটি।

(৩) যখন একটি ফুলের মঞ্জরীর সকল ফুলগুলি একত্র হইয়া একটি মাত্র ফলে পরিণত হয়, তাহাকে **যৌগিক ফল** (compound fruit) বলে ; যেমন, কাঁঠাল। কাঁঠালে যতগুলি কাঁটা থাকে ততগুলিই ছিল তাহার ফুল। আনারসে যতগুলি চোখ থাকে ততগুলিই ছিল উহার ফুল।

বীজ ও তাহার বিস্তার

(Seeds and their dispersal)

বিস্তারের আবশ্যকতা (Use of dispersal)—গাছে ফুল হইল. ফল হইল, সব ফল পাকিয়া ভূতলে পড়িল, তাহার প্রত্যেক বীজ হইতে গাছের তলায় চারাগাছ গজাইল—শুধু এই ব্যাপার যদি ঘটিত তাহা হইলে প্রত্যেক গাছের চারিপাশে দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড জঙ্গল হইয়া উঠিত। একস্থানে এতগুলি গাছের প্রয়োজন মত আলো, বাতাস, খাদ্য, কিছুই মিলিত না। পরিণামে সমস্ত গাছেরই দ্রুত অবনতি ঘটিত, অধিকাংশগুলি মরিয়া যাইত। এই বিপত্তি হইতে উদ্ভিদ্-জগৎকে রক্ষা

করিবার জন্য বীজবিস্তারের ব্যবস্থা। কি কি উপায়ে গাছের বীজ দূরদূরান্তে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা নীচে বিবৃত হইতেছে।

বিস্তার কত প্রকারে সাধিত হয় (Different modes of dispersal)—জল, বাতাস ও নানাজাতীয় প্রাণী এই বীজবিস্তারের কার্য্যে সহায়তা করে। নদী বা সমুদ্রের জলে ভাসিয়া, বাতাসে উড়িয়া, নানাপ্রকার ফল ও বীজ বহুদূর অবধি ছড়াইয়া পড়ে। পাখীরা বটফল, অশ্বত্থফল খাইয়া গিয়া পুরাণো পাকা বাড়ীর ফাটলে বীজ ফেলে, তাহার ফলে ছাদে ইটের গাঁথনির মাঝে পর্য্যন্ত বটগাছ অশ্বত্থ গাছ জন্মায়, এ সমস্ত হইল প্রাকৃতিক নিয়মে বীজবিস্তার। ইহা ছাড়া আবার সভ্য মানব নিয়ত আপন লাভের জন্য এক দেশের বীজ অন্য দেশে লইয়া যাইতেছে, এক দেশের ফসল অন্য দেশে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। তামাকু আজ পৃথিবীর কত স্থানে আবাদ হইতেছে। কিন্তু তাহার বীজ প্রথম আসিয়াছিল আমেরিকা হইতে; মর্ত্তমান কলা আসিয়াছিল মার্টাবান হইতে, লিচু আসিয়াছিল চীন হইতে। টোমাটো, আপেল, পীচ আসিয়াছিল বিলাত হইতে। যে আম্রফলকে আমরা আজ নিতান্তই আপন বলিয়া জানি, সেও আসিয়াছিল বিদেশ হইতে। আলু এ দেশে আগেকার দিনে ছিল না, কপি-কলাইশুঁটির ত কথাই নাই!

আম, জাম, লীচু, পীচ ইত্যাদি শাঁসাল ফল পাকিলে সুগন্ধ হয় ও বিচিত্র বর্ণ ধারণ করে। ফলভোজী প্রাণিগণ এই গন্ধ ও বর্ণ দ্বারা আকৃষ্ট হয় ও ফল খাইয়া তাহার বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলে। বট, অশ্বত্থ, ডুমুর, পেয়ারা, ইত্যাদি ফলের বীজ পাখীর মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায় বাহির হয়, ও নানাস্থানে পড়িয়া চারা উৎপাদন করে। শুধু পাখী কেন, শৃগাল, বাদুড়, কাঠবিড়াল, এমন কি পিপীলিকাও বীজ-বিস্তারের কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করে। ভেরেণ্ডা জাতীয় অনেক গাছের বীজ দেখিতে

কীটাকৃতি। কীটভুক্ পাখীরা কীটভ্রমে ঐ সমস্ত বীজ লইয়া যায়, ও পরে ভুল বুঝিতে পারিয়া ফেলিয়া দেয়।

প্রাণীরা যে শুধু খাইবার জন্য ফল লইয়া গিয়া বীজ ছড়ায়, তাহা নহে। অনেক সময় ছোট ছোট ফল বা বীজ পাখীর পালকে কি জানোয়ারের লোমে তাহাদের অজ্ঞাতসারে আটকাইয়া যায়। পরে তাহারা যেখানে যায় সেখানে যদি পড়ে তবে এই ফল বা বীজ বিস্তারলাভ করে।

জলজ উদ্ভিদের বীজ জলে ভাসিয়া বিস্তার লাভ করে। কখন বা কাদার সহিত বক-সারসাদির পায়ে আটকাইয়া যায়, ও দূরদূরান্তে নীত হয়। কখন বা মাছের পেট হইতে মলের সহিত নির্গত হইয়া নূতন নূতন স্থানে অঙ্কুরিত হয়।

কতকগুলি গাছ আছে যাহাদের ফল পাকিলে বা শুকাইলে ফাটিয়া যায় ও বীজ আপন হইতে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, যথা, দোপাটি, শিম, অড়হর, কলাইশুঁটি ইত্যাদি।

কার্পাস, শিমূল, আকন্দ, ইত্যাদির ফল শুকাইলে ফাটিয়া যায় ও বীজ হাওয়ায় ইতস্ততঃ উড়িতে থাকে, কেন না প্রত্যেক বীজের সহিত অনেক তূলা লাগান থাকায় বীজ অত্যন্ত হাল্‌কা হয়। এইরূপে উড়িতে উড়িতে এই সমস্ত বীজ বহুদূরে যাইতে পারে।

শুধু যে ছোট ছোট ফল বা বীজ নৈসর্গিক উপায়ে ইতস্ততঃ চালিত বা বিক্ষিপ্ত হয় তাহা নহে, নারিকেলের মত প্রকাণ্ড ফলও জলে ভাসিয়া বহুদূরে চলিয়া যায়। অনেক দিন ধরিয়া জলে ভাসিলেও ইহার ভ্রূণের কোন ক্ষতি হয় না। কেন না ভিতরে খাদ্য যথেষ্ট, আর আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ছোবড়া ঢাকা কঠিন খোল রহিয়াছে।

Questions

1. What are the main parts of a fruit? What are simple, aggregate and compound fruits?
2. Discuss the functions of fruit. (C. U. 1940)
3. What is the utility of dispersal of seeds? Mention the various ways by which dispersal of seeds is effected. (B. T. 1942)
4. Describe the structure of any common flowering plant and state the functions of the different parts. (C. U. 1946)

চতুর্থ অধ্যায়

ধান্য ও মটর

ধান্য (Paddy)

পৃথিবীর উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ—ধান্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান খাদ্য শস্য। ইণ্টারন্যাসন্যাল এগ্রিকালচার ইনষ্টিটিউট নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে পৃথিবীর প্রতি বৎসরের উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ তিনশত বিলিয়ন পাউণ্ডেরও অধিক। মানুষের খাদ্যমধ্যে আর কোন শস্য এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা হয় না।

ধান্য উৎপত্তির ইতিহাস (Origin of paddy)—ধান যে কোন্ সময়ে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা ঠিক জানা নাই। উদ্ভিদ্‌বিদের হিসাবে ইহার প্রথম উৎপত্তি দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায়। ভারত, মালয় প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাসের বহু পূর্ব্বে চীন ইতিহাসে ধান উৎপন্নের কথা লেখা আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা নির্দ্দিষ্টভাবে বলা চলে না যে চীনেই প্রথম ধান জন্মিয়াছিল।

ভারতে, উত্তর-পশ্চিমাংশ বাদে চাউলই প্রধান খাদ্য। ধান হইতে চাউল প্রস্তুত হয়। সকল দেশে সমানভাবে ধান জন্মে না। ইহা স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর অনেকটা নির্ভর করে। বাংলা, আসাম ও ব্রহ্মদেশে প্রচুর ধান জন্মে।

ধান গাছ—ধান একপ্রকার ঘাস। জমিতে ও বায়ুমণ্ডলে প্রচুর জল না থাকিলে এই ফসল ভাল জন্মে না, এজন্য রাজপুতানা প্রভৃতি শুষ্ক প্রদেশে ধান হয় না।

স্বভাবজাত ও আবাদজাত ধান (Natural and cultivated paddy)—সাধারণতঃ ধান দুই প্রকার, স্বভাবজাত ও আবাদজাত। স্বভাবজাত ধানকে "উড়ি" বা "ঝরা" বলে। এই জাতীয় ধান সুপক্ক হইবার আগেই ঝরিয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও আসামের বড় বড় বিলের মধ্যে এই স্বভাবজাত ধান জন্মায়। আবাদ ও চেষ্টার ফলে আবাদজাত ধানের সহজে-ঝরিয়া-পড়া দোষ নিবারিত হইয়াছে।

ভারতে ধান জমির পরিমাণ—ভারতবর্ষে প্রায় সত্তর লক্ষ একর জমিতে ধান জন্মে। ইহার মধ্যে বাংলা, বিহার ও আসামে চল্লিশ লক্ষ একর। মাদ্রাজে আট হইতে নয় লক্ষ। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে চার সাড়ে চার লক্ষ। যুক্তপ্রদেশে ছয় লক্ষ। বোম্বাই ও সিন্ধু প্রদেশে দুই বা আড়াই লক্ষ। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মাত্র পঁচাত্তর হাজার একর।

ধানের আবাদ (Cultivation of paddy)—ধান দুই ভাবে জন্মান হয়; একপ্রকার, যাহাকে **বপন** বলে। জমি তৈয়ার হইলে বীজ-ধান তাহার উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়। জল, তাপ ও বাতাস পাইয়া এই সকল বীজধানের অঙ্কুরোদ্গম হয়; দ্বিতীয় প্রকারকে **রোপণ** বলে। ইহার একটু বিশেষত্ব আছে। প্রথম একটু ছোট

জায়গায় বীজ বুনিতে হয়। সেই ছোট জমিতেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং অঙ্কুর চারায় পরিণত হয়। যখন খুব বৃষ্টি হইয়া সারা ক্ষেতে জল দাঁড়াইয়া যায়, তখন চারাগুলি ছোট জমি হইতে তুলিয়া বড় ক্ষেতে রোপণ করা হয়। প্রত্যেক ক্ষেতের চারিদিকে আল বাঁধিয়া জল ধরিয়া রাখিতে হয়। নহিলে ধানচারা শুকাইয়া যায়। বৃষ্টির অভাব হইলে খাল, বিল, পুকুর হইতে জল সেচন করা দরকার।

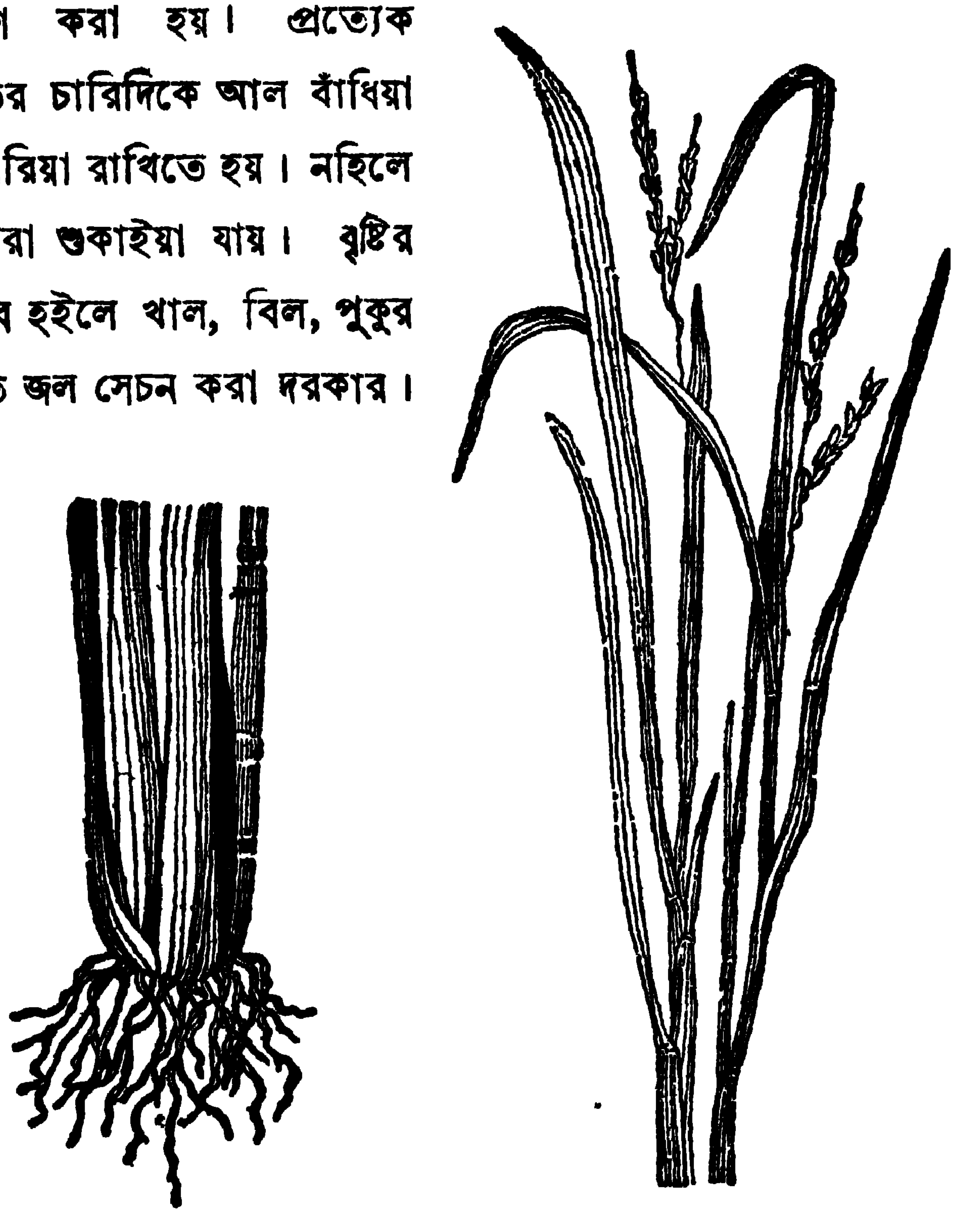

৪১। ধান গাছের মূল ও কাণ্ড

কেন না প্রচুর জল না হইলে ধান গাছ বাড়িবে না। গাছ বাড়িলেও ফল ধরিবে না। ধান গাছের মূল খুব ছোট গুচ্ছাকার। শক্ত এঁটেল মাটির উপর খানিকটা পলি পড়িলে তাহাতে ধান আবাদ ভালই হয়।

ধান গাছের গঠন (Structure of paddy)—**প্রধান মূল** (tap root) অল্পকাল মধ্যে নষ্ট হইয়া যায় ও **অস্থানিক মূল** (adventitious root) গুচ্ছাকারে গোড়া হইতে বাহির হয়। কাণ্ডের পাব ফাঁকা। পর্ব্বসন্ধি হইতে পাতা বাহির হয়। পাতা দীর্ঘ, সূচ্যগ্র। পত্রের শেষভাগ কাণ্ডকে জড়াইয়া থাকে।

৪২। ধান ফুলের নক্সা, প্রত্যেক অংশ ছাড়াইয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে

ধানের শীষ ও তাহার অংশ (Inflorescence of paddy and its parts)—কাণ্ডের শীর্ষদেশে বা চূড়ায় ফুলফল ধরে। এই অংশকে শীষ (inflorescence) বলে। সাধারণ পুষ্পের ন্যায় ইহাদের বৃতি ও দল বিকশিত হয় না। কয়েকটি **পৌষ্পিক পত্র** (bract) পুষ্পমুকুলটিকে আবৃত রাখে। পরে যখন ফুল হইতে বীজ হয় তখনও ইহারাই বীজটিকে রক্ষা করে। ধান্যফুলে দুইটি অতি ক্ষুদ্র ও দুইটি অপেক্ষাকৃত বড় পৌষ্পিক পত্র থাকে। একই প্রকারের দুইটি

করিয়া পত্র পরস্পরের সম্মুখভাগে স্থাপিত। তৃতীয় পৌষ্পিক পত্রের কোলে ফুলটি থাকে। চতুর্থ পৌষ্পিক পত্রকে **পালিয়া** (palea) বলে। বাকী তিনটিকে **গ্লুম** (glume) বলা হয়। ধানজাতীয় গাছের ফুলের বৃতি ও দল রূপান্তরিত হইয়া দুইটি অতি ছোট **লডিকিউল** (lodicule) গঠন করে। চতুর্থ পৌষ্পিক পত্র পালিয়ার ঠিক উপরেই লডিকিউল দুইটি থাকে। ইহারা এত ছোট যে চোখে দেখা যায় না। লডিকিউলের উপরে দুইটি **আবর্ত্ত** (whorl)। প্রত্যেক আবর্ত্তে

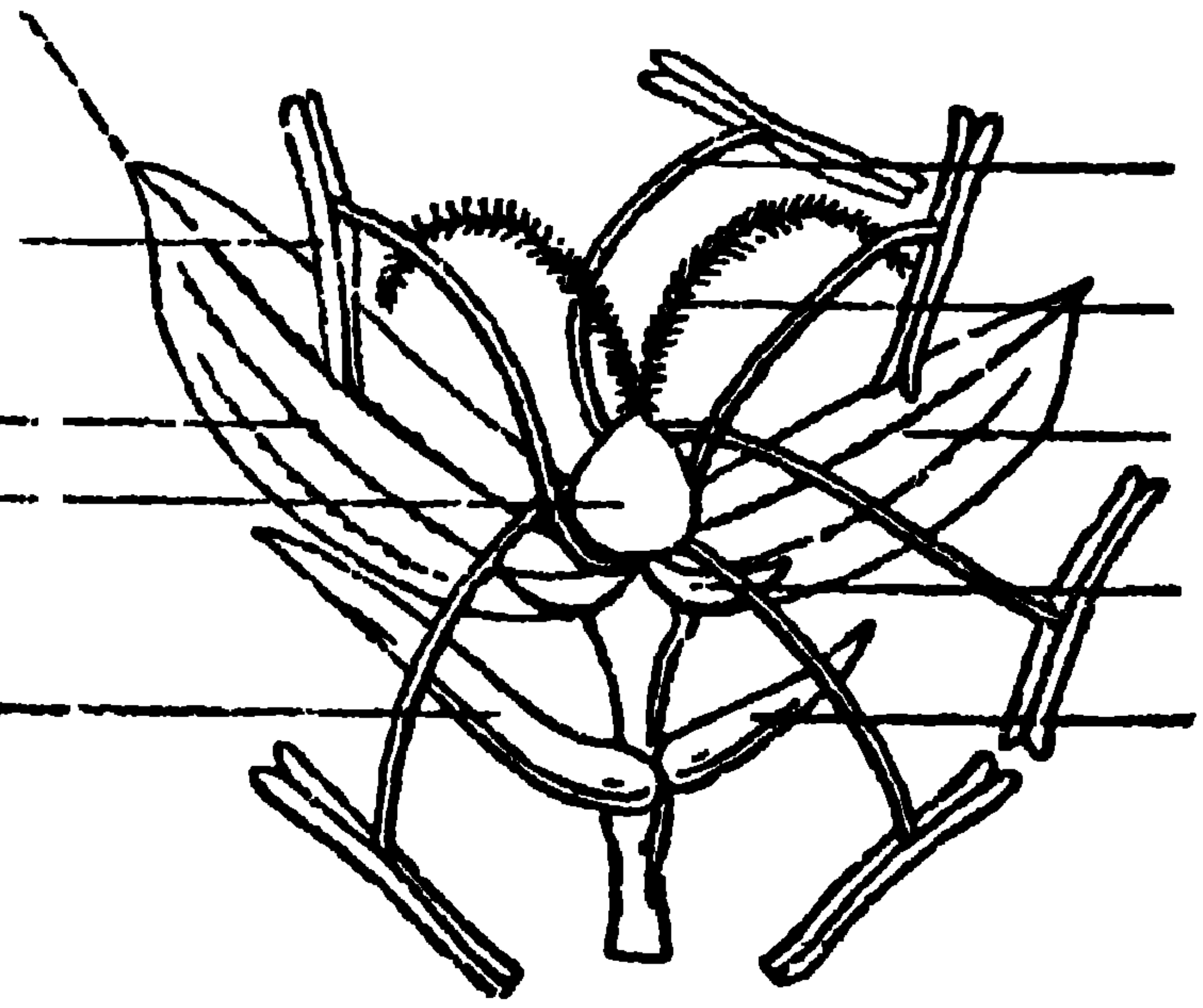

৪৩। ধান ফুল, যে ভাবে অংশগুলি সংলগ্ন থাকে

তিনটি করিয়া পুংকেশর থাকে। পুংকেশরের ঠিক উপরেই আর একটি আবর্ত্তে গর্ভকেশরের স্থান। চাউল উৎপন্ন হইবার পর ফুলের পুংকেশর ও লডিকিউল দুইটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। পৌষ্পিক পত্র চারিটির মধ্যে বাহিরের দুইটি ছোট ও ভিতরের দুইটি বীজের সঙ্গে বাড়িয়া উঠে ও তাহাকে ঢাকিয়া রাখে।

বাংলাদেশে ধানের সাধারণ শ্রেণীবিভাগ— একা বাংলাদেশেই বহুপ্রকার ধান পাওয়া যায়।—ধান মোটামুটি তিন

প্রকার—(১) আউস বা আশু ধান্য, (২) আমন ও (৩) বোরো। প্রত্যেক জাতীয় ধানের মধ্যে আবার বহু রকম ধান আছে।

(১) **আউস ধান** বৈশাখ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা হয়। সাধারণতঃ আশু বা আউস ধান বপন হইতে তিন মাসের মধ্যে পাকে। জমির ও দেশের অবস্থাভেদে কখনও কখনও ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত আউস ধান বপন করা হয়। আউস ধানের চাউল কিছু মোটা ও দুষ্পাচ্য। ইহা সাধারণতঃ উঁচু জমি ও বেলে মাটিতে জন্মে। ইহার জন্য আমন অথবা বোরো অপেক্ষা কম জলের প্রয়োজন হয়।

(২) **আমন ধান** অগ্রহায়ণ বা পৌষে পাকে। আমন ধান সাধারণতঃ দুই প্রকার—[১] বড়ন, [২] ছোট্না। বড়ন পূর্ব্ববঙ্গেই বেশীর ভাগ জন্মায়। পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষাকালে জমিতে গভীর জল জমে, তথায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার গাছ না জন্মিলে, ঐ গাছ জলে ডুবিয়া যায়। এই দীর্ঘাকার অমনই 'বড়ন'। এই গাছের বৃদ্ধি এত বেশী যে প্রত্যেক দিন জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছও বাড়িতে থাকে এবং গাছের একটুখানি জলের উপর থাকিলেই তাহা জীবিত থাকে। খুলনা, যশোহর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানেই বড়ন-ধানের আবাদ দেখা যায়। যে সকল জমির উপর বেশী জল জমে না, সেখানে 'ছোট্না' আমনের আবাদ হয়। এই ধানই ক্ষুদ্রাকার ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহার চাউল খুব সাদা।

মিহি ভাল চাউল প্রায়ই আমন ধানের। কোন কোন চাউলে খুব সুন্দর গন্ধ থাকে; যেমন গোবিন্দভোগ, বাঁশমতি, বেনেফুলি, কামিনী, বাদসাভোগ, পরমান্নশাল, রাঁধুনীপাগল প্রভৃতি। হরিণামুরি, বাকচুর ও নলকোষ ধানে ভাল খই হয়।

যে সকল আমন ধান উঁচু জমিতে ভাল ও মিহি জন্মায়, জলা জমিতে

তাহাদের আবাদ করিলে ধান মোটা ও নিকৃষ্ট হইয়া যায়। বাকরগঞ্জের আমন ধান মোটা ও মিহি দুই প্রকারই জন্মে। বাকরগঞ্জের চাউল অন্য স্থানের আমন হইতে ভিন্নপ্রকার। ইহাকে বালাম চাউল কহে।

(৩) **বোরো ধান** খুব কমই আবাদ করা হয়। ইহা বৎসরে দুইবার জন্মে। (১) ফাল্গুন-চৈত্র মাসে রোপণ করিয়া বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে কাটা হয়; (২) ভাদ্র মাসে রোপণ করিয়া কার্ত্তিক মাসে কাটা হয়। বোরো ধান অতিশয় মোটা ও ইহার চাউল বড়ই দুষ্পাচ্য।

নানাপ্রকার ধান—কোন্ সময়ে বপন অথবা রোপণ এবং কাটা হয়:

ধানের নাম	বপন অথবা রোপণের সময়	কাটার সময়
আউস	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	ভাদ্র
আমন	আষাঢ়, শ্রাবণ	অগ্রহায়ণ, পৌষ
বোরো	ফাল্গুন, চৈত্র ও ভাদ্র	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক

চাউল—ধান হইতে চাউল পৃথক্ করিবার সাধারণতঃ দুই প্রকার প্রথা আছে। ধানকে রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া চাউল বাহির করে। ইহাকে 'আতপ শুষ্ক' বা আতপ কহে। ব্রহ্মদেশে আতপ চাউলই বেশী। আমাদের বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বিধবারা এই চাউল ব্যবহার করেন।

সাধারণতঃ ধান জলে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করে, পরে ঢেঁকিতে কুটিয়া চাউল বাহির করে। ঢেঁকিতে ধান কুটাকে "ধানভানা" কহে। আজকাল কলের সাহায্যে ধান সিদ্ধ ও ভানার ব্যবস্থা হইয়াছে; তাহাতে সময় ও খরচ খুব কম লাগে

চিড়া, খই ও মুড়ি—ধান সিদ্ধ করিয়া খোলায় নাড়িয়া ঢেঁকিতে কুটিলে ঐ ধানের ভিতরকার নরম চাউল চেপ্টা আকারে পরিণত হয় ও তাহাকে চিড়া কহে। কোন কোন ধান গরম বালির খোলায় ভাজিলেই ফুটিয়া খই হয়। কোন কোন সুসিদ্ধ চাউল গরম বালির খোলায় ভাজিলে মুড়ি তৈয়ার হয়।

চাউল হইতে খাদ্য ও অন্যান্য উপকার—চাউল জলে সিদ্ধ করিলে ভাত ও দুধে সিদ্ধ করিলে পায়স হয়। চাউল ভাঙ্গিয়া যে সবেদা হয় তাহা হইতে রুটি, পিঠা ইত্যাদি উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হয়। চাউলের মণ্ড বা মাড় দিয়া কাপড়ের কলে কাপড় পালিশ করে। ধান হইতে মদ চোলাই হয়। ধানের খড় গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতিকে খাইতে দেওয়া হয়। কোন কোন খড় দ্বারা পল্লীগ্রামে ঘর ছাওয়া হয়।

চাউল ও বেরিবেরি নামক ব্যাধি—বৈজ্ঞানিকেরা বলেন চাউলের উপরিস্থিত লাল আবরণে একপ্রকার সার পদার্থ থাকে। চাউল পরিষ্কার করিবার জন্য অনেক সময় চুণ দিয়া চাউলকে মাজা বা পরিষ্কৃত করা হয়। কলেও ঐরূপ পরিষ্কার হইতে পারে এবং এই চাউলকে 'কলছাঁটা' চাউল বলে। উভয় প্রকার চাউল খাইলে **বেরিবেরি** নামক ভীষণ ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে।

Questions

1. Describe the structure and germination of paddy.
2. Describe the structure of a riceplant with the help of a sketch. What varieties of rice are common in Eastern India? Which is the cereal more commonly eaten in the Punjab? (C. U. 1943)
3. Write an essay on the cultivation of rice.
4. Mention the main forms of rice.
5. State the kinds of paddy that can produce fine rice.
6. Prepare a table showing the various kinds of rice with their respective times of cultivation and harvesting.
7. What different kinds of food are produced from rice?

মটর

(Pea)

আমাদের নিত্য ভোজ্য পদার্থ ভাত ও দাল। ধান্য যেমন ভাত জোগায়, মটর ও মটর-জাতীয় অন্য উদ্ভিদ্ তেমনি দাল জোগায়।

৪৪। মটর চারা

চাউল একদল বীজ। মটর দ্বিদল বীজ। ধান হয় ধানগাছের শীষে। মটর হয় ডালে ডালে শুঁটির মধ্যে।

মটর লতা (Pea plant)—শুষ্ক মটর দানা ভিজাইয়া বপন করিলে তিনদিনে কল বাহির হইবে। ভাবী কাণ্ড উপর দিকে যাইবে ও ভাবী মূল মাটির মধ্যে যাইবে। ইহার শিকড় কিন্তু ধান্যের মত গুচ্ছ মূল নয়। প্রধান মূল বেশ খানিকটা নীচে গেলে পর শাখা বাহির হয়। কাণ্ড যেমন বড় হইতে থাকে, তেমন শাখা ও প্রশাখা গজাইতে থাকে। প্রত্যেক পর্ব্বসন্ধিতে পাতা বাহির হয়। মটরের পাতা যৌগিক। বৃন্তের উভয় পার্শ্বে দুইটি বড় উপপত্র থাকে। ধান তৃণজাতীয় গাছ, মটর লতা গাছ। লতায়

ইহাদের **আকর্ষ** (tendril) থাকে। এই আকর্ষের সাহায্যে ইহারা অন্য গাছ বা কাঠি বা বেড়ার উপর উঠিয়া যায় ; নহিলে আপন শক্তিতে দাঁড়াইতে পারে না। মটর ফুল পরীক্ষা করিলে দেখিবে ইহার একটি বিশেষত্ব আছে। বৃতি পাঁচটি এক সঙ্গে জোড়া। দল পাঁচটির মধ্যে দুইটি নীচে নৌকার মত ও তিনটি তাহার মাথার উপর ফনার মত দেখায়। ফুলের ভিতর নয়টি পুংকেশর জোড়া ও আলাদা রহিয়াছে। গর্ভকেশর একটি। মটর ফলকে শুঁটি বলে। শুঁটির মধ্যে একসারি মটর দানা থাকে।

মটরের আবাদ ও মটর হইতে জীবের উপকার—কার্ত্তিক মাসে মটরের বীজ বোনা হয়। পৌষ মাসে শুঁটি ধরে। শুঁটি ও দানা সবুজ বর্ণ। দানা পাকিলে রং হলদে হইয়া যায়। চৈত্রমাসে ফল পাকিয়া উঠে ও লতা শুকাইতে আরম্ভ করে। মটর গাছ ধান গাছের মত প্রতিবৎসর ফলধারণের পর মরিয়া যায়। শুষ্ক দানাকে যাঁতায় ভাঙ্গিয়া খোসা ও দানা দুইভাগ করিলে তাহাকে মটরের দাল বলে। মটর ছোট বড় নানাপ্রকার হয়। মটর দানা হইতে নানাপ্রকার খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত হয়। মটরের গাছ, শুঁটি ও দানা গরু ছাগলকে খাওয়াইলে তাহাদের দুধ বাড়ে।

মটর লতার মূলের বিশেষত্ব (Special property of the root of a pea plant)—মটর **শিম জাতীয়** (leguminous) **লতা**। এই জাতীয় উদ্ভিদের মূলে একপ্রকার **গুটি** হয়। অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় যে তাহাতে এক প্রকার জীবাণু (bacteria) রহিয়াছে। মটর লতার ইহারা পরম উপকারক। এই জীবাণু মাটির মধ্যস্থ বাতাস হইতে নাইট্রোজেন লইয়া তাহা মটর লতার খাদ্যোপযোগী করিয়া দেয় এবং নিজেরা মটর লতা হইতে শর্করাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে।

সেইজন্য শিম জাতীয় উদ্ভিদ্ যে কোন জমিতে রোপণ করিলে উহার উর্ব্বরতা বাড়িয়া যায়। এই প্রকার জীবাণুকে নাইট্রোজেন-খাদ্য-পরিণতকারক জীবাণু (nitrogen fixing bacteria) কহে।

ধান ও মটরের তুলনা :

ধান	মটর
১। একদল বীজ।	১। দ্বিদল বীজ।
২। বীজের আবরণ ও ফুলের আবরণ সংযুক্ত।	২। বীজের আবরণ ও ফুলের আবরণ পৃথক্।
৩। গুচ্ছ মূল। প্রধান মূল শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।	৩। প্রধান মূল ও তাহা হইতে শাখা প্রশাখা বাহির হয়।
৪। কাণ্ডের পাব ফাঁপা। কিন্তু গাঁইট ভরাট।	৪। কাণ্ড ফাঁপা নহে।
৫। পাতা মৌলিক, লম্বা, বোঁটা স্পষ্ট নহে, আগা সূচাল, শিরাবিন্যাস সমান্তরাল।	৫। পাতা যৌগিক, আগায় আকর্ষ থাকায় কোথাও আটকাইয়া থাকে। শিরা-বিন্যাস পালকাকৃতি জাল-শিরা।
৬। কাণ্ডের আগায় একটি শীষে বহু ফুল ও ফল ধরে। বৃতি ও দল বিকশিত হয় না। ৪টি পৌষ্পিক পত্র পুষ্প-মুকুলটিকে ঢাকিয়া রাখে। তৃতীয়	৬। পাঁচটি বৃত্যংশ এক হইয়া বৃতির পরিণতি। দল পাঁচটি, নৌকার আকারে দুইটি জোড়া, তিনটি স্বতন্ত্র। পুংকেশর দশটি, নয়টি জোড়া

	ধান		মটর
	পৌষ্পিক পত্রের কোলে মুকুলটি। চতুর্থটি পালিয়া ও বাকী তিনটি গ্লুম। ফুলের বৃতি ও দল রূপান্তরিত হইয়া ২টি ছোট লডিকিউল গঠন করে। লডিকিউলের উপর তুই আবর্ত্তে তিনটি করিয়া ৬টি পুংকেশর। তাহার উপর আর একটি আবর্ত্তে গর্ভকেশরের স্থান।		ও একটি পৃথক্ থাকে। গর্ভকেশর একটি।
৭।	ফুলের পুংকেশর ও লডিকিউল তুইটি ক্রমশঃ ঝরিয়া পড়ে। পৌষ্পিক পত্র চারিটিই চাউলকে ঢাকিয়া রাখে। এই আবরণসহ চাউলই ধান।	৭।	ফল একটি শুঁটির আকার ধারণ করে। শুঁটির মধ্যে দানাগুলি এক সারিতে সাজান। কাঁচা অবস্থায় দানা বেশ নরম।
৮।	ফল নীরস; কখনও ফাটে না।	৮।	ফল স্ফোটক; তুই খণ্ডে ফাটে।
৯।	বীজ একটি।	৯।	কয়েকটি বীজ থাকে।
১০।	ধান মোটামুটি তিন প্রকার: আউস, আমন ও বোরো।	১০।	কার্ত্তিক মাসে বীজ বোনা হয়। পৌষ মাসে শুঁটি ধরে। চৈত্র মাসে ফল পাকিয়া ওঠে ও লতা শুকাইতে থাকে।
১১।	প্রতি বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়া ফলদান করিয়া মরিয়া যায়।	১১।	প্রতি বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়া ফল দিয়া মরিয়া যায়।
১২।	ইহা ঘাস জাতীয় গাছ।	১২।	ইহা শুঁটি জাতীয় লতা গাছ।

Questions

1. Describe the structure of a common flowering plant like pea.
2. Describe the root, shoot, leaf and flower of a pea plant.
3. What is a tendril? How does the pea plant make use of it?
4. Compare a rice plant with a pea plant.
5. Describe the flower of a pea plant and compare it with the inflorescence of rice.
6. Write short notes on:—lodicule, palea, glume, whorl, bract, nitrogen fixing bacteria.

   What part do the Leguminous plants play in the rotation of crops? (T. T. 1938)

উপরে) প্রজাপতি ও (নীচে) তসর রেশম মথ ও তাহার
লার্ভা এবং গুটি

প্রাণিবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

প্রাণিজগৎ (The animal kingdom)—এই বিরাট বিশ্বে—জলে, স্থলে, আকাশে, যে সমস্ত প্রাণী বিচরণ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা অগণন। উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে, অন্ধকার গহন বনে, সমুদ্রের অতল গর্ভে নানা আকার, নানা বর্ণের কত প্রাণী যে আছে তাহার বর্ণনা বা সংখ্যা গণনা করা সাধ্যের অতীত। তাহাদের অনেককে চক্ষে দেখা যায়। কিন্তু দৃশ্যমান প্রাণীদের অপেক্ষা অদৃশ্য প্রাণিজগৎ অনেক গুণ বেশী! অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই অদৃশ্য জগতের রহস্য কিয়দংশ উদ্ঘাটিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও কত বাকী আছে, কে বলিবে! প্রতিবৎসর দুর্গম প্রদেশে কত নূতন নূতন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, আবিষ্কৃত হইতেছে। কত পণ্ডিত, কত পর্য্যটক, এই দুরূহ কার্য্যকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু নূতন কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী আবিষ্কার করিলেই ত প্রাণিবিজ্ঞানের চর্চ্চা হইল না। দেখিতে হইবে যে নূতন প্রাণীটি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহার আকৃতি কিরূপ, অভ্যাস কিরূপ, সে খায় কি, থাকে কোথায় ইত্যাদি। তাহা হইলে প্রথম আমাদের শিখিতে হইবে প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগ। কতকগুলি বৈলক্ষণ্য দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলি—মানুষ ও তিমি দেখিতে একরকম নয়, তিমি ও বাদুড় দেখিতে এক রকম নয়, বাদুড় ও ঘোড়া সম্পূর্ণ

ভিন্নাকৃতি। তথাপি ইহারা সকলেই একশ্রেণীভুক্ত, সকলেই স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী, অর্থাৎ সকলেরই শিরদাঁড়া আছে ও সকলেই মায়ের দুধ খাইয়া বড় হইয়া থাকে।

প্রাণিজগৎকে দশ পর্ব্বে (phyla) ভাগ করা যাইতে পারে। যথা :

১। **প্রোটোজোয়া** (Protozoa) বা **আদ্যপ্রাণী**—ইহারা এক-কোষ প্রাণী। উদাহরণ—**অ্যামিবা** (amœba)। প্রোটোজোয়া নানাপ্রকার, সাধারণতঃ জলে থাকে ; মানবদেহেও পাওয়া যায়। অনেকে ম্যালেরিয়া, আমাশয়, কালাজ্বর, পীতজ্বর, ইত্যাদি রোগ উৎপাদন করিতে পারে। কোন কোন আদ্য প্রাণীর কোটি কোটি দেহকঙ্কাল জমিয়া ধীরে ধীরে সমুদ্রের তলায় একটা চা-খড়ির স্তর গঠিত হইয়া উঠে। ইহাদের মুখ, চোখ, নাক, কান কিছুই নাই। সমস্ত শরীর দিয়া খাদ্য গ্রহণ করে। একটি প্রাণীর দেহ আপন হইতে দুই খণ্ড হইয়া দুইটি প্রাণী হইয়া যায়। অণুবীক্ষণ দ্বারা একটি অ্যামিবাকে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করিলেই এই সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়।

২। **পরিফেরা** (Porifera) বা **ছিদ্রাল প্রাণী** ইহাদের দেহ দুই স্তর কোষদ্বারা গঠিত। উদাহরণ—**স্পঞ্জ**। আমরা যাহাকে স্পঞ্জ (sponge) বলিয়া জানি তাহা এই প্রাণীরই দেহকঙ্কাল। ইহারা সকলেই জলচর। দেহের ছিদ্রগুলি দিয়া জলের সহিত খাদ্য ভিতরে যায় ও দূষিত পদার্থ বাহিরে আসে।

৩। **সিলেন্টারাটা** (Cœlenterata) বা **একনালী প্রাণী**—ইহাদের খাদ্য-বহা নালী ছাড়া দেহে আর কোন গর্ত্ত বা নালী নাই। অনেকেরই **শুঁড়** বা **টেণ্টাকল** (tentacle) আছে যাহার দ্বারা শত্রুকে দূরে রাখে। ইহাদের মধ্যে কেবল হাইড্রা (hydra) পুকুরের জলজ লতার উপর আটকাইয়া থাকে। বাকী সকল সমুদ্রে পাওয়া যায় ;

যেমন, **জেলি-ফিস, প্রবাল, পলিপ** ইত্যাদি। শাখা-প্রশাখা সংবলিত প্রবালদেহ দেখিলে সহজেই উদ্ভিদ্ বলিয়া ভ্রম হয়। **সাগর-কুসুম** (sea-anemone) ফুলের মত দেখিতে। উষ্ণদেশের সমুদ্রে প্রবালের অসংখ্য দেহকঙ্কাল জমা হইয়া ধীরে ধীরে প্রবালদ্বীপ গড়িয়া উঠে।

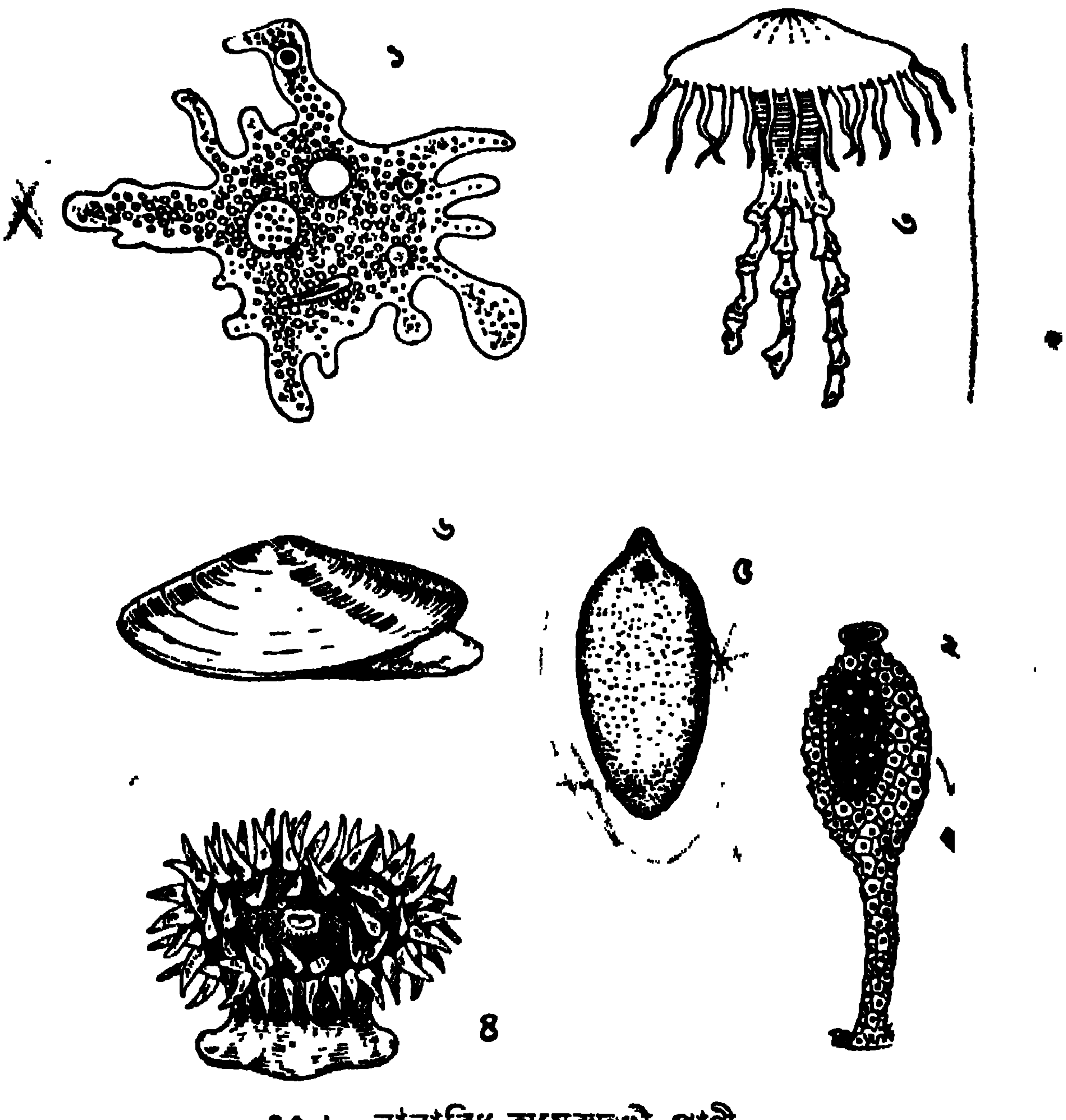

৪৫। নানাবিধ অমেরুদণ্ডী প্রাণী

(১) অ্যামিবা (২) স্পঞ্জ (৩) জেলি-ফিস
(৪) সাগর কুসুম (৫) লিভার ফ্লুক বা যকৃৎ কৃমি (৬) ঝিনুক

৪। **প্ল্যাটিহেলমিনথিস্** (Platyhelminthes) বা **চেপ্টাকৃমি**—ইহাদের পৃষ্ঠ উপরদিকে চেপ্টা। ইহারা বেশীর ভাগই উভলিঙ্গ। উদাহরণ—**লিভার ফ্লুক** (liver fluke) বা **যকৃৎ কৃমি**।

উহাদিগকে প্রধানতঃ ভেড়ার ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুর যকৃৎ ও পিত্তস্থলীতে (gall bladder) পাওয়া যায়।

৫। **নিমাথেলমিনথিস্** (Nemathelminthes) বা **গোলকৃমি**—সূতার বা দড়ির মত লম্বা প্রাণী। মুখ, **পৌষ্টিক নালী** (alimentary canal) ও **পায়ু** (anus) স্পষ্ট দেখা যায়। দেহ একপ্রকার পুরু স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা। বেশীর ভাগেরই স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। উদাহরণ—মানুষের পেটের সাধারণ **কৃমি**।

৬। **আনেলিডা** (Annelida) বা **অঙ্গুরীমাল**—দেহ পরস্পর জোড়া এক সারি অঙ্গুরীর মত অবয়বের দ্বারা গঠিত। এই অঙ্গুরী-শ্রেণী বাহির হইতেও দেখা যায়। দেহ স্বচ্ছ আবরণ **কিউটিকূল** (cuticle) দ্বারা আবৃত। কোন কোন জাতির গায়ে **কিটা** (chæta) আছে। ইহারা উভলিঙ্গ। উদাহরণ—**কেঁচো, জোঁক** ইত্যাদি।

৭। **একাইনোডার্মাটা** (Echinodermata) বা **কণ্টকত্বক্**—ইহাদের ত্বক্ কাঁটায় ভরা; সকলেই সমুদ্রবাসী ও মন্থরগতি প্রাণী। উদাহরণ—**তারামাছ** (starfish), **সমুদ্র শশা** (sea cucumber) ইত্যাদি। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে।

৮। **আর্থ্রোপোডা** (Arthropoda) বা **সন্ধিপদ**—আনেলিডার ন্যায় ইহাদের দেহও যে অঙ্গুরীয়-শ্রেণী দ্বারা গঠিত তাহা দেখিলেই বুঝা যায়; তবে দুই পর্ব্বের প্রাণীদের বাহিরের আকৃতি একেবারে বিভিন্ন। চিংড়িমাছ, কাঁকড়া, মাকড়সা সন্ধিপদ প্রাণী। কখন কখন ইহাদের শরীরের প্রত্যেক বা অনেক অঙ্গের আবার **উপাঙ্গ** (appendage) থাকে। উপাঙ্গ নানা অংশে বিভক্ত। দেহ কঠিন আবরণে আবৃত। দেহের গঠন এরূপ যে মাঝখানে লম্বালম্বি কাটিলে ঠিক একরকম দুইটি ভাগ হয়। প্রাণিজগতের এই পর্ব্ব বিশাল। ইহার

মধ্যে শুধু যে চিংড়ি, কাঁকড়া, বিছা, মাকড়সার মত প্রাণী আছে তাহা নয়, মাছি মশা প্রভৃতি পতঙ্গশ্রেণীও ইহার অন্তর্গত। তাহাদেরও স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে।

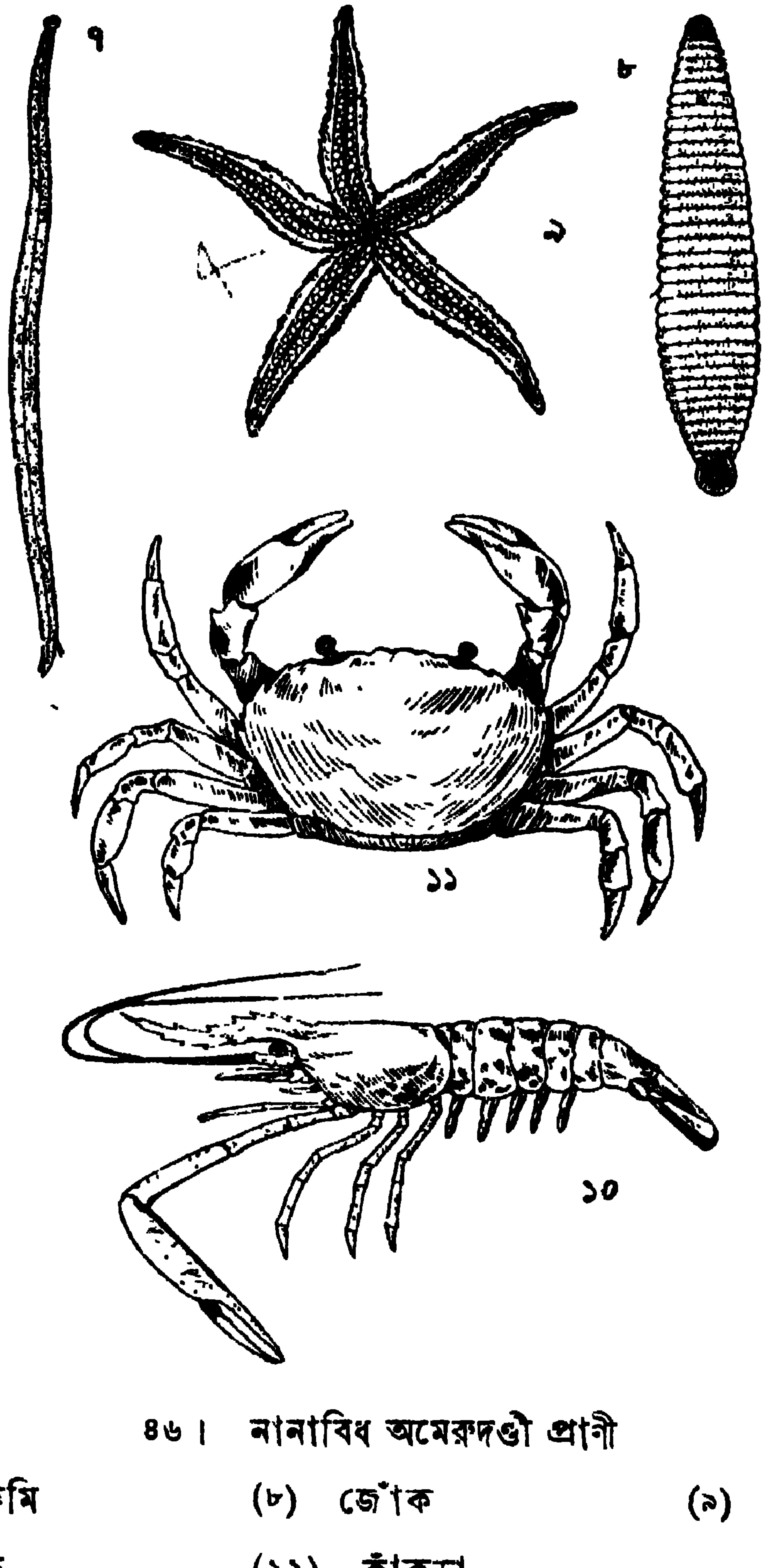

৪৬। নানাবিধ অমেরুদণ্ডী প্রাণী

(৭) গোলকৃমি (৮) জোঁক (৯) তারামাছ
(১০) চিংড়ি (১১) কাঁকড়া

৯। **মলাস্কা** (Mollusca) বা **শম্বুক**—ইহাদের দেহ আংটির মত অংশেও বিভক্ত নয় বা ইহাদের উপাঙ্গও নাই। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদও আছে, আবার উভলিঙ্গও আছে। সন্ধিপদের ও ইহাদের দুই পর্ব্বের প্রাণীদেরই শ্বাস-গ্রহণ, খাদ্য-পরিপাক, রক্তসঞ্চালনাদি দেহের ক্রিয়া নিম্নতর প্রাণীদের অপেক্ষা অনেক পূর্ণতর। উদাহরণ—**শামুক, ঝিনুক, শঙ্খ,** সমুদ্রের **শীর্ষপদ** (cephalopod) জাতীয় প্রাণিসমূহ।

১০। **ভারটিব্রেটা** (Vertebrata) বা **মেরুদণ্ডী**—যাহাদের শিরদাঁড়া আছে তাহারা এই পর্ব্বের অন্তর্গত। ইহারা আবার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত—**মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী।** মাছ, ব্যাঙ, টিকটিকি, সাপ, কচ্ছপ, কুমীর প্রভৃতি প্রথম তিন শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর রক্ত ঠাণ্ডা। পাখী ও স্তন্যপায়ীর রক্ত গরম।

প্রাণিজগতের দুই মুখ্য বিভাগ—আদ্যপ্রাণী হইতে শম্বুক অবধি প্রথম নয় পর্ব্বের অন্তর্গত প্রাণীদের মেরুদণ্ড নাই, আর দশম পর্ব্বভুক্ত প্রাণীদের মেরুদণ্ড আছে। এক কথায়, প্রাণিজগতের দুইটি মুখ্য বিভাগ—**অমেরুদণ্ডী** (invertebrata) ও **মেরুদণ্ডী**। মেরুদণ্ডীর সহিত আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর, আমরা নিজেরাও মেরুদণ্ডী, কিন্তু অমেরুদণ্ডীর সংখ্যা অনেক বেশী।

অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডীর বিশেষত্ব—অমেরুদণ্ডী প্রাণীর নার্ভের সমাবেশ প্রধানতঃ পেটের দিকে থাকে। ইহাদের গলদেশে **ফ্যারিংক্সের** (pharynx) ছিদ্র নাই, তাই শ্বাসকার্য্যের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা আছে। অনেকেরই চক্ষু নাই। যাহাদের আছে তাহাদেরও অনেকের **পুঞ্জাক্ষি** (compound eye), অর্থাৎ অনেকগুলি চক্ষু মিলিয়া একটি চক্ষু হইয়াছে।

মেরুদণ্ডীমাত্রেরই শক্ত হাড়ের শিরদাঁড়া আছে ; কিন্তু শিশু অবস্থায় এই শিরদাঁড়া থাকে একটি নরম কাঠির মত, পরে ক্রমশঃ তাহা অস্থিতে পরিণত হয়। শিশু অবস্থায় শিরদাঁড়ার নাম **নোটকর্ড** (Notochord), পূর্ণ পরিণত মেরুদণ্ড অনেকগুলি **কশেরুকা** (vertebra) নামক অস্থিখণ্ডে বিভক্ত। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে সমস্ত পিঠটা তক্তার মত শক্ত হইয়া থাকিত, নড়াচড়া কঠিন হইত। মেরুদণ্ডীর নার্ভসমূহ থাকে প্রধানতঃ পিঠের দিকে, হৃদয় থাকে পেটের দিকে। অমেরুদণ্ডীর ঠিক বিপরীত।

অমেরুদণ্ডীর চক্ষু শুধু ত্বকের পরিণতি, কিন্তু মেরুদণ্ডীয় চক্ষু ত্বক্ ও মস্তিষ্ক হইতে বিবর্দ্ধিত।

মাছ ও ব্যাঙাচির ফ্যারিংক্সের দুই পার্শ্বে কতকগুলি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র-পথে ফুলকা ঝুলিতে থাকে। এই ছিদ্র দিয়া ফ্যারিংক্সের সহিত বাহিরের যোগাযোগ আছে। ছিদ্রগুলি মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবনের কোন না কোন সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। মাছে ইহা চিরদিন বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মেরুদণ্ডীতে কেবল শিশু বা ভ্রূণাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর তুলনা :

অমেরুদণ্ডী : কেঁচো, পতঙ্গ প্রভৃতি	মেরুদণ্ডী : মৎস্য, ভেক, মনুষ্য প্রভৃতি
১। মেরুদণ্ড নাই।	১। মেরুদণ্ড আছে।
২। মেরুদণ্ড না থাকাতে পিঠ ও পেটের দিকে ভারের বিশেষ তফাৎ নাই।	২। মেরুদণ্ড থাকাতে পিঠের দিক প্রায়ই ভারী।

অমেরুদণ্ডী : কেঁচো, পতঙ্গ প্রভৃতি	মেরুদণ্ডী : মৎস্য, ভেক, মনুষ্য প্রভৃতি
৩। এক কোষ প্রাণীও হইতে পারে।	৩। বহুকোষ প্রাণী।
৪। প্রায়ই দেহের দুই দিকে সামঞ্জস্য থাকে না।	৪। প্রায়ই দেহের দুই দিক এক প্রকার।
৫। যদি নার্ভতন্ত্র থাকে, তাহা বেশীর ভাগ পেটের দিকে।	৫। নার্ভতন্ত্র বেশীর ভাগ পিঠের দিকে।
৬। ফ্যারিংক্সে ছিদ্র থাকে না।	৬। ফ্যারিংক্সের ছিদ্র থাকে।
৭। চক্ষু অনেকের থাকে না। থাকিলে—পুঞ্জাক্ষি।	৭। প্রায় সকলেরই চক্ষু থাকে এবং তাহা প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র।
৮। প্রধানতঃ ত্বক্ হইতে চক্ষু উৎপন্ন হয়।	৮। প্রধানতঃ মস্তিষ্ক (brain) হইতে চক্ষু উৎপন্ন হয়।
৯। যদি হৃদয় থাকে ত তাহা প্রায়ই পিঠের দিকে অবস্থিত।	৯। হৃদয় পেটের দিকে অবস্থিত।

Questions

1. Give the broad classification of the animal kingdom.
2. Mention the ten phyla of the animal kingdom with short description and examples of each phylum.
3. Compare the morphological characters of vertebrata with those of Invertebrata. (T. T. 1938)

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেঁচো

(Earthworm)

কেঁচোর বাসস্থান (Habitat) **ও খাদ্য**—কেঁচো আনেলিডা পর্ব্বভুক্ত প্রাণী। সাধারণতঃ মাটির নীচে বাস করে ও দিবাভাগে বাহিরে আসে না। রাত্রে আহারের সন্ধানে মাটি ভেদ করিয়া উপরে আসে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নীচে চলিয়া যায়। মাটি হইতে আপন প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্থাৎ মাটির মধ্যের জৈব পদার্থ (organic matter) গ্রহণ করিয়া বাকীটা বিষ্ঠারূপে পরিত্যাগ করে। এই বিষ্ঠার কুণ্ডলী ভিজা মাটির সর্ব্বত্র দেখা যায়। কুণ্ডলী দেখিলেই বুঝা যায় নীচে কেঁচো আছে। পতঙ্গ, মৎস্য, ভেক, সরীসৃপ, পাখী, সকলেই কেঁচো খাইতে ভালবাসে।

নানাপ্রকার কেঁচো (Different kinds of earthworm)—নানাপ্রকার কেঁচো পাওয়া যায়। তবে কোন কেঁচোই বিশেষ বড় হয় না—বড় জোর আঠার ইঞ্চি লম্বা। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক রকম কেঁচো আছে, যাহার দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট। কেঁচোর গর্ত্ত আঁকা-বাঁকা হয় না। খুঁড়িলে দেখিবে হাত খানেক গভীর, সোজা ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। ইহাই সাধারণ নিয়ম, তবে দারুণ শীতে কি গ্রীষ্মে ইহারা ছয় সাত ফুট অবধি নীচে যেখানে ভিজা মাটি পায় সেখানে বাস করে।

কেঁচোর বিশিষ্টতা (Speciality of the earthworm)—আত্মরক্ষার জন্য ইহারা ঢিল কি কাঁকর কি পাতার কুচি

দিয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া রাখে। পাতার কুচি দিয়া বন্ধ করিলে দুই কাজ হইল। দরজাকে দরজাও হইল, খাদ্যসংস্থানও রহিল।

কেঁচোর মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী বলিয়া দুই ভিন্ন প্রাণী নাই। প্রত্যেক কেঁচোকে পুরুষও বলা যায়, স্ত্রীও বলা যায়।

ইহাদিগকে নিশাচর বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ এ কথা সত্য। কিন্তু ভিজা মাটিতে দিনের বেলাও বাহির হয়। বর্ষাকালে ইহারা বাসা বদলায়। নহিলে এক গর্ত্তে থাকিতেই ভালবাসে।

কেঁচোর স্বভাব (Habits of the earthworm)—কেঁচো কাহাকেও কামড়ায় না। লোকে শুধু ঘৃণাবশে ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে চায় না। কেঁচোর দেহ পরীক্ষা করিতে হইলে আগে উহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, কেন না জীবন্ত অবস্থায় উহাদের দেহ প্রায়ই সঙ্কুচিত হয়। একভাগ মেথিলেটেড স্পিরিটে দশভাগ জল মিশাইয়া তাহার মধ্যে কেঁচোকে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে উহা প্রসারিত অবস্থায় মরিয়া যাইবে।

ফেরেটিমা (*Pheretima*) **কেঁচোর দেহ**—পূর্ণবয়স্ক ফেরেটিমা সাত আট ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়া থাকে। দেহের গঠন একখণ্ড সরু দড়ির মত। ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে এই শরীর অনেকগুলি আংটির মত **খণ্ডকায়** (segments) বিভক্ত। প্রত্যেক কেঁচোর দেহে মোট একশত হইতে একশত কুড়িটি এইরূপ আংটি-অংশ আছে। শরীরের একটি অংশের কিছু বিশেষত্ব আছে। এই অংশের নাম **ক্লাইটেলম** (clitellum)। ইহা তিনটি আংটি খণ্ডকের স্থান লইয়া গঠিত ও মাংসের ফিতা দ্বারা ঢাকা। এই অংশের আংটিগুলি বাহির হইতে বুঝা যায় না।

ক্লাইটেলমের অবস্থিতি হইতে দেহের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ বুঝা যায়। ইহাদের সম্মুখের তেরটি আংটির পরে ক্লাইটেলম আছে। প্রথম আংটির পিঠের দিকে এক অতি ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড আছে, ইহাই ওষ্ঠ বা **প্রষ্টোমিয়ম** (prostomium)। ওষ্ঠ বা প্রথম আংটির মধ্যে যে ছিদ্র দেখা যায় তাহাই কেঁচোর **মুখ**। শরীরের শেষ ভাগে যে ছিদ্র আছে তাহা **পায়ু**। উদরদেশ অপেক্ষা পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ। উপরোক্ত দুই দ্বার ছাড়াও কেঁচোর দেহে আরও অনেক ছিদ্র আছে। পৃষ্ঠদেশে দ্বাদশ অঙ্গুরীর সন্নিকট হইতে দেহের শেষ অবধি এক সারি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে।

৪৭। ফেরেটিমা কেঁচো

এই ছিদ্রশ্রেণী হইতে একপ্রকার রস ক্ষরণ হয়। ছিদ্রগুলি সর্ব্বদা খোলা থাকে না। কেঁচো ইচ্ছামত পেশীসঙ্কোচন দ্বারা এই ছিদ্র খুলিয়া রস নিঃসারিত করিতে পারে। এই রস থাকে দেহপ্রাকারের ও খাদ্যনালীর মাঝে। ইহা ক্ষার জাতীয় পদার্থ।

কেঁচোর দেহের উপর এক প্রকার কূর্চ (bristle) আছে। তাহার নাম **কিটা** (chæta) বা **সিটা** (seta)। এই কিটাগুলি প্রথম ও শেষ আংটি ছাড়া অন্য সব আংটির মধ্যভাগ বেষ্টন করিয়া থাকে। খালি চোখে এই সূক্ষ্ম কিটা দেখা যায় না। কিন্তু লেজের দিক হইতে আস্তে আস্তে হাত বুলাইলে বেশ খসখসে বোধ হয়। এই প্রকার কিটা থাকার জন্য কেঁচোকে **কিটোপোডা** (chætopoda) বা কিটাপদ প্রাণী বলা হয়।

কেঁচোর দেহপ্রাকার (Body-wall)—ইহা চারি স্তরে গঠিত—(১) **কিউটিক্‌ল** (cuticle), (২) **ত্বক্‌**, (৩) **পেশীস্তর** (চক্রপেশী ও লম্বপেশী) ও (৪) **প্রাকারাবরণ** (cœlomic epithelium)।

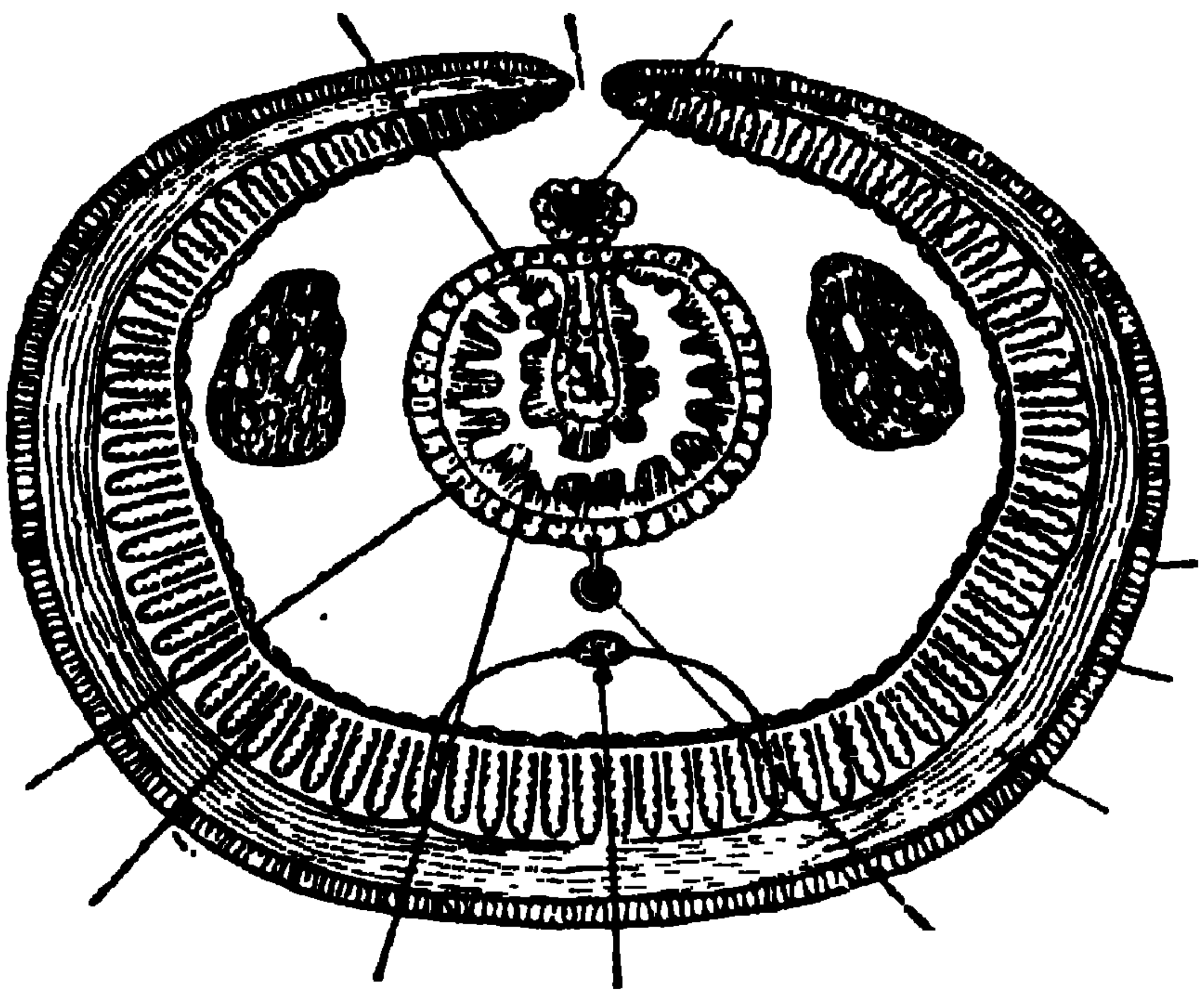

৪৮। শরীরের মধ্যভাগের অনুপ্রস্থচ্ছেদ

পেশীস্তর ও কিটার সাহায্যে কেঁচো চলাফেরা করে। চলিবার সময় ইহারা দেহ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে থাকে, আর কিটাগুলি মৃত্তিকাসংলগ্ন করিয়া রাখে।

পিঠের মাঝামাঝি লম্বালম্বি চিরিলে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি দেখিতে পাইবে। খাদ্য-নালী মুখ হইতে পায়ু অবধি একটি নলের মত বিস্তৃত।

এই নলের বাহির দিকের স্থানকে দেহগহ্বর বা **সিলোম** বলে। শরীরের যন্ত্রাদি এই গহ্বরে অবস্থিত। **সিলোমীয় সেপ্টা** (septa) দ্বারা গহ্বর বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এই প্রকোষ্ঠগুলি সব একই প্রকারের। বহির্দ্দেশে যেমন আংটি, ভিতরে তেমনি এই প্রকোষ্ঠশ্রেণী। আনেলিডা প্রাণীর ইহাই বিশেষত্ব।

ফেরেটিমা কেঁচোর পৌষ্টিক নালী (Alimentary canal)—প্রথমে **মুখ-বিবর** (buccal cavity)। এই বিবর হইতে খাদ্য প্রথম যে প্রকোষ্ঠে যায় তাহা লাটিম আকার; নাম **ফ্যারিংক্স** (pharynx)। এই প্রকোষ্ঠ হইতে খাদ্য প্রবেশ করে সঙ্কীর্ণ **ইসোফেগসের** (œsophagus) মধ্যে। ইসোফেগসের মধ্যভাগে ডিম্বাকার স্থানটির নাম **গিজার্ড** (gizzard)। ইহাই কেঁচোর খাদ্যপেষণ যন্ত্র। দুই অবিভক্ত প্রকোষ্ঠ মিশিয়া ইহা গঠিত। গিজার্ডের পরে আবার খানিকটা নালী, তাহার পরে **অন্ত্র** (intestine) আরম্ভ হইয়াছে। এই অন্ত্র **পায়ু** (anus) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অন্ত্রের আরম্ভে ও শেষে কয়েকটি আংটি বাদ দিলে বাকী সব স্থানে অন্ত্রের অভ্যন্তরে পিঠের দিকে একটা লম্বা ভাঁজ পড়ে। এই ভাঁজের মধ্যে বিস্তর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী থাকে। ভাঁজটির নাম **টিপ্‌লোসোল** (typhlosole)। ইহা অন্ত্রের পরিধি বৃদ্ধি করে, ফলে খাদ্যশোষণে (absorption) সহায়তা করে।

কেঁচোর শ্বাসকার্য্য (Respiration)—ইহারা ত্বক্-সাহায্যেই শ্বাসক্রিয়া চালাইয়া থাকে। ত্বক্ মধ্যে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী থাকায় বাতাস হইতে অক্সিজেন লওয়া ও কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ সম্পন্ন হয়।

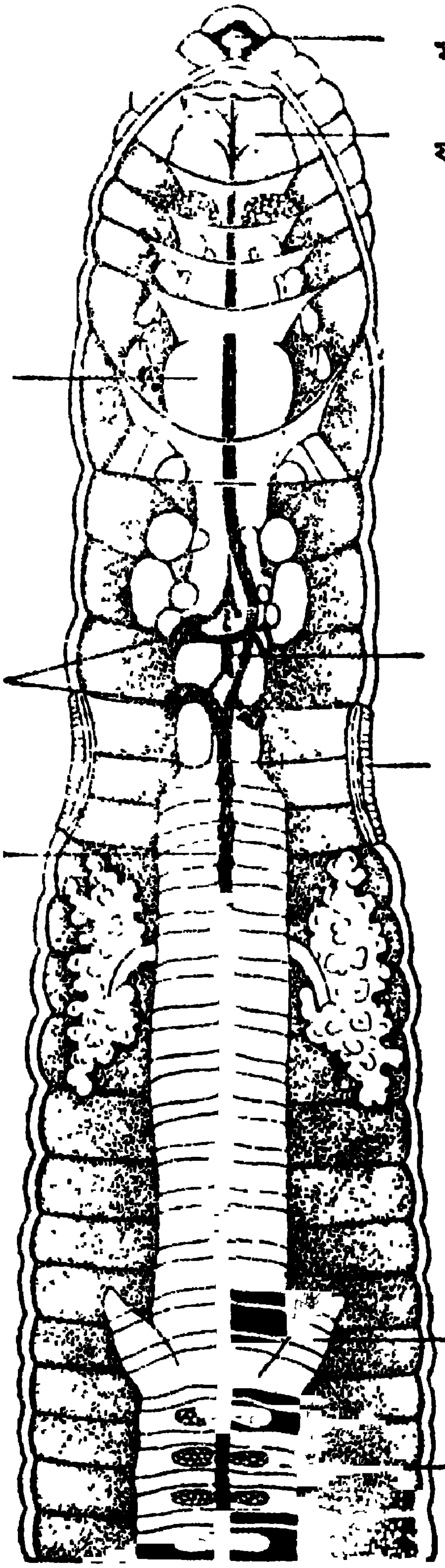

৪৯। ফেরেটিমা কেঁচোর পৃষ্ঠদেশ হইতে অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পুরোভাগের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসকল দেখান হইয়াছে

ফেরেটিমা কেঁচোর রক্ত-সংবহন তন্ত্র (Circulatory System)—আমাদের অর্থাৎ মেরুদণ্ডীর রক্তে শ্বেতকণিকা ও লোহিতকণিকা দুইই আছে। শ্বাসকার্য্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয় যে **হিমোগ্লোবিন** (hæmoglobin) পদার্থ তাহা আমাদের এই লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে থাকে। কেঁচোর রক্তে শ্বেতকণিকা আছে কিন্তু লোহিতকণিকা নাই, সেজন্য তাহার হিমোগ্লোবিন থাকে **প্লাস্‌মা** (plasma) বা রক্তের তরল অংশের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায়।

দেহের সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ আংটির মধ্যে, অর্থাৎ দেহের পুরোভাগে, পৃষ্ঠদেশে কয়েকটি স্ফীত রক্তবহা নালী দেখা যায়। ইহারা আড়া দিকে লম্বমান। এই রক্তবহা নালীগুলিই হৃদয়ের কার্য্য করিয়া থাকে।

হৃদয়গুলির সঙ্কোচ ও প্রসারের ফলে দেহের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালিত হইয়া পুনরায় হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। এই রক্ত ত্বকে পৌছিলে তাহা অক্সিজেন গ্রহণ করে ও দূষিত কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে।

৫০। ডারউইন

কেঁচোর অন্যান্য ইন্দ্রিয় কেঁচোর স্পর্শেন্দ্রিয় বেশ তীক্ষ্ণ, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় বলিয়া কিছুই নাই। ডারউইন দেখাইয়াছেন যে পিয়ানোর সুরে ইহারা সাড়া দেয় না। কিন্তু কোন শব্দতরঙ্গ যদি এমনভাবে ইহাদের নিকট পৌছান যায় যে উহা ইহাদিগকে স্পর্শ করিবে তবে ইহারা সাড়া দেয়। কেঁচোর দর্শনেন্দ্রিয় নাই, কিন্তু কতকগুলি অঙ্গুরীয়াংশে আলো পড়িলে সাড়া দিয়া থাকে। ইহারা রাত্রে যখন

আহার অন্বেষণে বাহির হয় তখন অঙ্গে উজ্জ্বল আলোক পড়িলে তৎক্ষণাৎ পলাইয়া যায়।

কেঁচোর শরীরের খানিক অংশ নষ্ট হইলে সেই অংশ ধীরে ধীরে আবার গজাইয়া উঠে, এবং কিছুকাল মধ্যে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়।

Questions

1. Give the special characteristics of the earthworm.
2. Describe the alimentary canal of the earthworm.
3. Describe briefly the internal anatomy of the viscera of the earthworm.
4. What is the peculiarity of the blood of the earthworm?

তৃতীয় অধ্যায়

পতঙ্গ

(Insects)

প্রাণিজগতে পতঙ্গের স্থান—মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মধ্যে সংখ্যায় পতঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেকেই মানবের শত্রু, অশেষ প্রকারে ক্ষতি করে। মশা, মাছি, ছারপোকা, উকুন প্রভৃতি প্রাণীরা সুপরিচিত। ইহারা যে কত রকম রোগের জার্ম্ম (germ) বা জীবাণু আমাদের দেহে সংক্রামিত করে তাহার ইয়ত্তা নাই। মাছি যেস্থানে বসে সর্ব্বদা সেই স্থানে মলত্যাগ করে। যে সকল খাদ্যদ্রব্যে মাছি বসে তাহা খাইলে নানা রোগের জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। ভীমরুল, বোলতা, পিপীলিকা শুধু যে আমাদিগকে দংশন করে, তাহা নয়; সুবিধা

পাইলেই খাদ্যদ্রব্য খাইয়া অপচয় করে। পঙ্গপাল দলে দলে আসিয়া শস্যক্ষেত্র নির্দ্দয়ভাবে ধ্বংস করিয়া যায়। পঙ্গপাল ছাড়াও অন্য নানা জাতীয় পতঙ্গ ক্ষেত্রের শস্য একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। কাঠের জিনিস ও কাগজপত্র ধ্বংস করিবার জন্য উই জাতীয় পতঙ্গ সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

তবে সকল পতঙ্গ আমাদের শত্রু নয়। উপকারী মিত্রও আছে। উদাহরণ—**মৌমাছি, গুটিপোকা** ও **লাক্ষা পোকা**। মৌমাছি হইতে মধু, গুটিপোকা হইতে রেশম এবং লাক্ষা পতঙ্গ হইতে গালা পাওয়া যায়। পতঙ্গ স্থলচর, জলচর ও খেচর তিন প্রকারেরই পাওয়া যায়।

পতঙ্গের দেহ (Body of the insect)—ইহাদের দেহ তিন অংশে বিভক্ত,—(১) **মস্তক,** (২) **বক্ষ** ও (৩) **উদর**। মস্তকে একজোড়া **শুঙ্গ** বা **অ্যানটেনা** (antenna) আছে। তাহার স্পর্শ দ্বারা অন্য পদার্থের স্বরূপ বুঝিতে পারে। এক জোড়া চক্ষুও আছে। পতঙ্গের চোখের বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক চোখের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট চোখ থাকে। এইরূপ চোখকে **পুঞ্জাক্ষি** (compound eye) বলে।

বুকের তিন ভাগ। প্রত্যেক ভাগে দুইটি করিয়া পা আছে। সেজন্য পতঙ্গের নাম **ষট্পদ**। আমাদের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় পতঙ্গের পা বুকের দুই পার্শ্বে অবস্থিত, কিন্তু আমাদের পা দুইটি পেটের নীচে থাকে। পতঙ্গের প্রত্যেক পা আমাদের পায়ের মতই কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। অবশ্য খণ্ডের সংখ্যা এক নহে। কোন কোন পতঙ্গের পেটের পরে হুল থাকে।

পতঙ্গের শ্বাসতন্ত্র (Respiration)—ইহাদের নাক নাই। পতঙ্গের দেহের উভয় পার্শ্বে (মাথা ছাড়া) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বা

শ্বাসরন্ধ্র (stigmata or spiracle) আছে, সেই রন্ধ্রপথে ইহারা শ্বাস লয়। শরীর-মধ্যে ফুসফুসের পরিবর্ত্তে কতকগুলি **বায়ুনালী** (air tubes) আছে। বাহিরের রন্ধ্রের সহিত এই নালীগুলির যোগ থাকে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে কোথাও পতঙ্গ বসিলে পেট অনবরত উপর নীচে নড়িতে থাকে। এইরূপে সে তখন শ্বাসকার্য্য চালাইতেছে বুঝিতে হইবে।

পতঙ্গের ডানা (Wing)—সাধারণতঃ পতঙ্গের ডানা থাকে। তাহাতে না আছে হাড়, না আছে পালক এবং সংখ্যাও সব সময় সমান নয়। ডানা পিঠে থাকে। আবার অনেক পতঙ্গের ডানা নাই।

পতঙ্গের দেহাবরণ—সাধারণ পতঙ্গের দেহের উপর একটা আবরণ (body wall) থাকে। এই আবরণ তাহারা মাঝে মাঝে ত্যাগ করে ও শরীর-রস হইতে আবার নূতন আবরণের সৃষ্টি করে। সাপ খোলস ছাড়ে শুনিয়াছ। আরসোলা যখন খোলস ছাড়ে তখন তাহার রং সাদা; ক্রমে তাহার বহিরাবরণ পুরাতন রং ফিরিয়া পায়।

পতঙ্গের রূপান্তর (Metamorphosis)—পতঙ্গ-জীবনের সাধারণতঃ চারি অবস্থা—(১) ডিম; (২) লার্ভা; (৩) পিউপা; (৪) ইম্যাগো (Imago) বা পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। পিপীলিকা, মশক, মক্ষিকা, প্রজাপতির বাচ্চা যখন ডিম্ব হইতে বাহির হয়, তখন তাহারা দেখিতে ক্লমির মত, নাম **লার্ভা** (larva) বা **শূক**। প্রজাপতির লার্ভা শুঁয়াপোকা (caterpillar), ইহাদের অঙ্গে অজস্র কাঁটার মত তীক্ষ্ণ শুঁয়া আছে। সেই শুঁয়া মানুষের গায়ে ফুটিলে বড় যন্ত্রণা দেয়।

লার্ভা বা শূক প্রথমাবস্থায় বড় পেটুক। গুরুভোজনের পরে ইহাদের দেহে এক প্রকার আবরণের সৃষ্টি হয়। এই আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত পতঙ্গকে **পিউপা** (pupa) বলে। কিছুদিন পরে ঐ

আবরণ ভেদ করিয়া তাহার মধ্য হইতে বাহির হয় সুন্দর বিচিত্র পক্ষশোভিত পতঙ্গ! স্বচক্ষে না দেখিলে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার বিশ্বাস করা কঠিন।

পতঙ্গের সমাজ-গঠন—সাধারণতঃ পতঙ্গ স্বতন্ত্র বাস করিতে ভালবাসে। কিন্তু পিপীলিকা, মৌমাছি, উই, ইত্যাদি প্রাণীরা রীতিমত গ্রাম ও সমাজগঠন করিয়া একত্র বাস করে।

পতঙ্গের অন্যান্য ইন্দ্রিয়—পতঙ্গের স্পর্শেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় সুতীক্ষ্ণ। শ্রবণশক্তিও আছে। অনেকেই শব্দ করিতে পারে। কেহ মুখ দ্বারা, কেহ বা পক্ষদ্বারা, কেহ বা পা ঘষিয়া। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। দিবাচর, নিশাচর, দুই প্রকার পতঙ্গই পাওয়া যায়। মাছি দিনের বেলায় চরে, ছারপোকা রাত্রে বাহির হয়। খাদ্যও নানাপ্রকার। পতঙ্গের রক্তে হিমোগ্লোবিন (hæmoglobin) নাই, উহার রং সাদা। মশা মারিলে যে লাল রক্ত দেখা যায়, তাহা আমাদের, মশার নয়।

পতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ

(১) **আপটেরা** (Aptera)—পক্ষবিহীন। যথা, রূপালীপোকা।

(২) **হেমিপটেরা** (Hemiptera)—অর্দ্ধপক্ষযুক্ত। যথা শ্যামাপোকা।

(৩) **ডিপটেরা** (Diptera)—দ্বিপক্ষ। যথা, মশক, মাছি।

(৪) **লেপিডপটেরা** (Lepidoptera)—আঁশযুক্ত পক্ষ। যথা, প্রজাপতি, মথ।

(৫) **কলিঅপটেরা** (Coleoptera)—দুই জোড়া পক্ষ। এক জোড়া শক্ত পক্ষ অন্য জোড়ার উপর ঢাকা থাকে। যথা, গুবরে পোকা।

(৬) **নিউরপটেরা** (Neuroptera)—জালবৎ পক্ষ। যথা, ড্রাগন ফ্লাই।

(৭) **অরথপটেরা** (Orthoptera)—দুই জোড়া পক্ষ, ভিতর জোড়া মোড়া যায়। উপরের জোড়া পাশাপাশি সমান্তরাল থাকে। যথা, আরসোলা, পঙ্গপাল।

(৮) **হাইমেনপটেরা** (Hymenoptera)—ঝিল্লীবৎ (membraneous) পক্ষ। যথা, মৌমাছি, বোলতা।

Questions

1. What economic advantages and disadvantages do we generally derive from insects?
2. What are the diagnostic features of an insect?
3. Describe the metamorphosis of an insect?
4. Give the broad classification of insects adding short notes and examples.

পিপীলিকা
(The Ant)

পিপীলিকার আকার (External characters of the ant)—মাথা ও বুকের মাঝে সরু গলা, বুক ও পেটের মাঝে সরু কোমর আছে। পুরুষ ও স্ত্রী, উভয় প্রকার পিপীলিকারই দুই জোড়া পাতলা ডানা থাকে। ডানাবিহীন আর এক প্রকার পিপীলিকা আছে, নাম শ্রমিক পিপীলিকা। সাধারণতঃ ইহাদিগকেই আমরা দেখিয়া থাকি।

পিপীলিকার দেহ (The body of the ant)—মস্তক গোলাকার ও তাহাতে এক জোড়া **পুঞ্জাক্ষি** (compound eye) ও দুইটি **শুঙ্গ** বা **অ্যানটেনা** (antenna) আছে। শুঙ্গ দ্বারা গন্ধ পায় ও

পথ চিনিয়া চলে। চোখে নজর করিয়া পথ চলে না। এক সারি পিপীলিকা চলিয়াছে। কয়েকটিকে সরাইয়া স্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ফেল। দেখিবে যে পরের পিপীলিকাগুলি দিশাহারা হইয়া গিয়াছে। কারণ ইহারা গন্ধ পাইতেছে না।

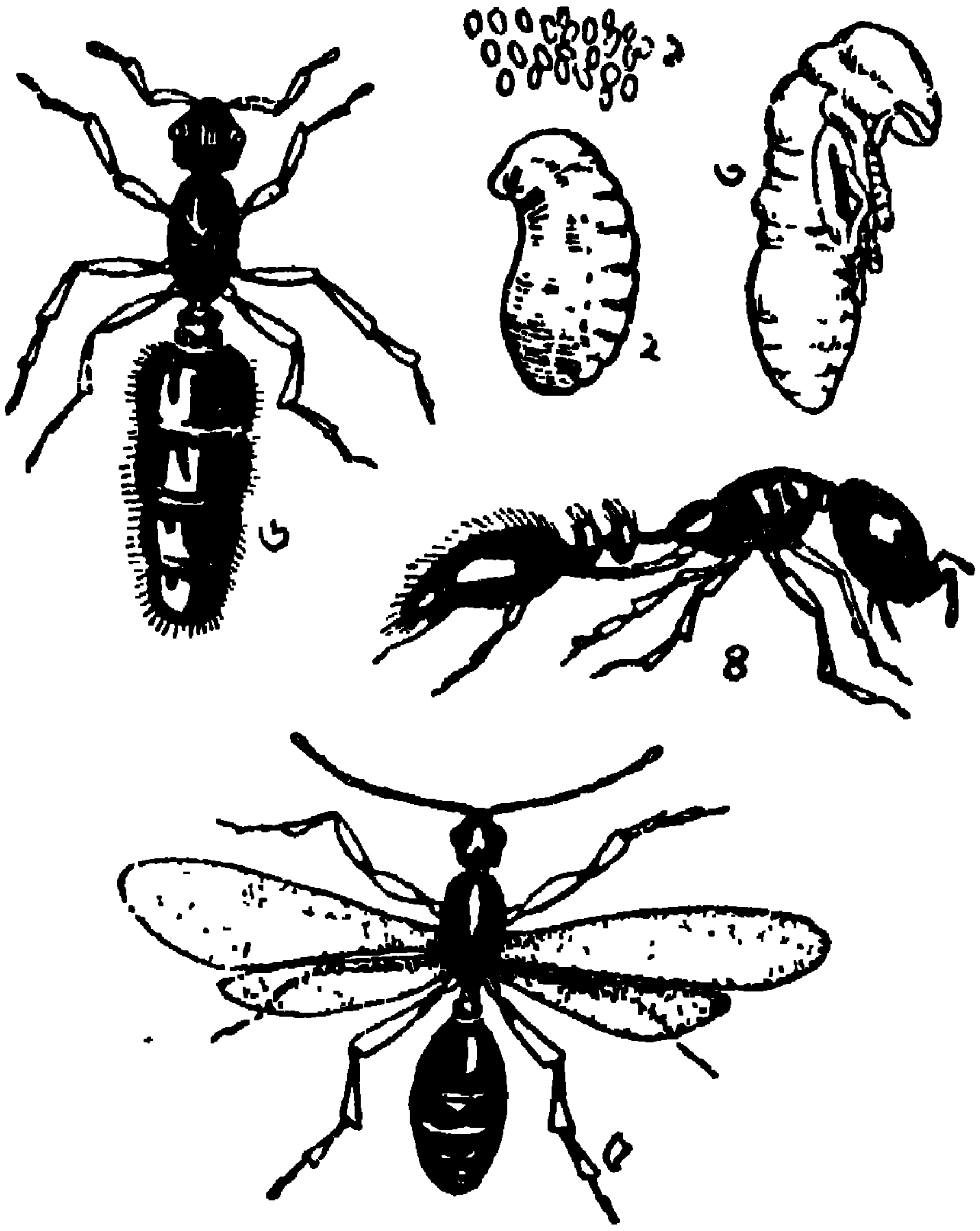

১। ডিম্ব ২। লার্ভা বা শূক ৩। পিউপা
৪। শ্রমিক ৫। পুরুষ ৬। স্ত্রী বা রাণী

৫১। পিপীলিকার বিভিন্ন রূপ ও তাহাদের জীবনেতিহাস

পিপীলিকার সমাজ-গঠন (Social habits of the ant)—এই প্রাণীরা দল বাঁধিয়া বাস করে। কিন্তু প্রত্যেক দল স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও বাসায় যায় না। শ্রমিক পিপীলিকা নানা রকমের, যেমন চাকর মুটিয়া আছে, তেমনি যোদ্ধাও আছে। যোদ্ধারা বলিষ্ঠকায়। তাহারা প্রহরী ও সিপাহীর কাজ করে। শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের

বাসা বাঁচায়। যুদ্ধের পর বিজেতারা বিজিতের ঘরে ঢুকিয়া ডিম ও বাচ্চা জবরদস্তি করিয়া লইয়া আসে। তাহাদিগকে ঘরে আনিয়া সযত্নে বড় করে ও পরে আপন দাসশ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়। চাকরের দল ঘর পরিষ্কার করে ও বাহির হইতে খাদ্য লইয়া আসে। খাবার পাইলে আগে নিজেরা খুব খাইয়া লয়, পরে ঘরের লোকের জন্য আনে।

পিপীলিকার স্বভাব (Habits of the ant)—পুরুষ পিপীলিকা অত্যন্ত অলস, তাহাদের দেহ অপেক্ষাকৃত ছোট। দলে সাধারণতঃ একটি স্ত্রী-পিপীলিকা বা রাণী থাকে। শ্রমিকেরা এই রাণীকে খুব যত্ন করে। রাণী ডিম প্রসব করে বটে, কিন্তু সন্তানের কোন খবর রাখে না। সন্তান লালনপালন করে শ্রমিকেরা। রাণীর দেহ বেশ বড়, পেটে ডিম থাকিলে আরও বড় দেখায়। রাণী বড় একটা ঘরের বাহিরে যায় না।

পিপীলিকারা স্বভাবতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহাদের দেহ ও ঘরদ্বার পরিষ্কার। খাওয়ার পরে শস্যের খোসা বা কীটপতঙ্গের দেহ যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা শ্রমিকেরা ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দেয়।

এই ক্ষুদ্র প্রাণীদের একতা সত্যই অনুকরণীয়। এক বাসায় এতগুলি প্রাণী একত্র থাকে, অথচ কখন ঝগড়া মারামারি হয় না। সাধারণতঃ দলের মধ্যে ইহারা কখন কলহ করে না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদিগকে শান্তিপ্রিয় মনে করিও না। একদলের সহিত আর একদলের অনবরত যুদ্ধ হইতেছে। যুদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ কোন কারণেরও প্রয়োজন হয় না। সময়ে সময়ে যুদ্ধ বহুদিবসব্যাপী হইয়া থাকে। এক পক্ষ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া গেলে লড়াই থামিয়া যায়।

পিপীলিকা কি শব্দ করিতে পারে ?— সাধারণতঃ পিপীলিকারা শব্দ করিতে পারে না, তবে **লোবোপেল্টা**

(Lobopelta) নামে এক প্রকার পিপীলিকা আছে যাহারা বেশ শব্দ করিতে পারে।

পিপীলিকার বুদ্ধি (Intelligence of the ant)—মানুষ যেমন দুগ্ধের জন্য গরু পোষে, ইহারাও তেমনি মধুর (মধুর মত এক প্রকার মিষ্ট পদার্থ) জন্য অন্য নানা পতঙ্গকে আপন দলে আশ্রয় দিয়া থাকে। এই পতঙ্গের বাস করিবার জন্য একটা স্বতন্ত্র গোলাঘরও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিন্তু ইহার চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার পিপীলিকার কৃষিকার্য্য। বর্ষার আগে ইহারা আপন বাসার সম্মুখে ব্যাঙের ছাতার মত উদ্ভিদের বীজ আনিয়া বপন করে। বৃষ্টির জল পাইলে ঐ উদ্ভিদ্ অঙ্কুরিত হয় ও ক্রমশঃ পুষ্ট হয়। তখন পিপীলিকাকুল মনের সুখে অহা খাইয়া থাকে।

পিপীলিকা খাদ্যসঞ্চয় করে। কিন্তু মার্কিন দেশে এক প্রকার পিপীলিকা আছে তাহাদের খাদ্যসঞ্চয়-প্রণালী সত্যই অদ্ভুত। তাহারা নিজ দলের কয়েকটি প্রাণীকে বাছিয়া লইয়া এক আশ্চর্য্য কৌশলে তাহাদের হজমশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। পরে তাহাদিগকে ক্রমাগত মধু পান করাইতে থাকে। হজম শক্তি নাই, সুতরাং যে মধু তাহাদের পেটে যায় তাহা হজম হয় না, জমা হইতে থাকে। কালে এইরূপ প্রত্যেক পিপীলিকার পেট একটি মধুভাণ্ডে পরিণত হয়। দরকার পড়িলে দলশুদ্ধ সকলে এই সঞ্চিত মধু পান করিয়া জীবনধারণ করে।

বিদেশের পিপীলিকা—আফ্রিকাতে এক প্রকার ভীষণ পিপীলিকা আছে। তাহারা দল বাঁধিয়া শিকারে বাহির হইলে হাতী, বনমানুষ পর্য্যন্ত ভয়ে পথ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। আগেকার দিনে নাকি রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে বাঁধিয়া এই পিপীলিকাদের পথে ফেলিয়া রাখা হইত!

পিপীলিকার প্রকারভেদ ও বাসস্থান (Different kinds of ants and their habitat)—পিপীলিকা ছোট বড়, লাল কাল, নানা আকারের ও নানা রঙের হইয়া থাকে। পিপীলিকা সাধারণতঃ মাটিতে গর্ত্ত করিয়া বাস করে। কখন কখন গাছের কোটরে, কি ফলের মধ্যে, কি পাতার ঘরে থাকে। পাতার ঘর যে নির্ম্মাণ করে, তাহা অতি সুন্দর।

পুরাতন বাসগৃহ মেরামতের অযোগ্য হইয়া পড়িলে, বা স্থান সঙ্কুলান না হইলে ইহারা নূতন আবাসে চলিয়া যায়। সকলে মিলিয়া দলবদ্ধ হইয়া যখন ইহারা যায়, তখন শ্রমিকেরা প্রখর দৃষ্টি রাখে যে তাহাদের অক্ষম রাণী বা অলস পুরুষেরা দলভ্রষ্ট না হইয়া পড়ে।

পিপীলিকার রূপান্তর (Metamorphosis)—পিপীলিকার ছোট ছোট সাদা ডিম। এই ডিমে যে বাচ্চা হয় তাহা কৃমির মত, তাহাকেই **লার্ভা** বা **শূক** বলে। এই শূক পাখীর প্রিয় খাদ্য বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। শূকের মুখ হইতে নিঃসৃত লালা দ্বারা ক্রমশঃ দেহের একটি কঠিন আবরণ হয়। এই আবরণস্থ শূককে **পিউপা** কহে। যথাকালে উহা কাটিয়া পূর্ণাঙ্গ পিপীলিকা বাহির হয়। এই পিপীলিকা স্ত্রী বা পুরুষ বা পক্ষহীন শ্রমিক হইতে পারে। পুরুষ বা স্ত্রী পিপীলিকা পিউপা হইতে বাহির হইয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহারা মারা পড়ে। স্ত্রী পিপীলিকা কেহ কেহ বাঁচিয়া যায় ও মাটিতে পড়িয়া আপন চেষ্টায় ডানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া মাটির অনেক নীচে চলিয়া যায়। ইহারাই রাণী। রাণী কিছুকাল পর্য্যন্ত এই গর্ত্তে বাস করিয়া কিছুদিন অন্তর কয়েকটি করিয়া ডিম পাড়িতে থাকে। প্রথম বারের ডিমগুলি হইতে শ্রমিক-শিশু জন্মায়। এই সময়ে রাণীর কোন আহার জোটে না। আপন দেহের চর্ব্বি ও ডানার পেশী

শোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। শ্রমিকদিগের জন্মের পর তাহারা তরলখাদ্য আনিয়া দুর্ব্বলদেহ রাণীকে খাওয়ায়, ঘরদ্বার বড় করে। প্রথমবারের পর যত ডিম হয় সেই সকল ডিম হইতে পুরুষ, স্ত্রী ও শ্রমিক জন্মায়।

পিপীলিকার জীবনকাল (Longevity of the ant) —এক একটি রাণী পনের কুড়ি বৎসর বাঁচিয়া থাকে। শ্রমিক পিপীলিকা অধিক দিন বাঁচে না। পুরুষেরা ত আকাশ-বিহারেই অনেকে মারা যায়। শ্রমিকেরা মৃত পিপীলিকার দেহ সাধারণতঃ ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু এমন পিপীলিকাও আছে যাহারা মৃতদেহ সমাধিস্থ করে।

পিপীলিকার দ্বারা মানবের অপকার ও উপকার—পিপীলিকা খাদ্যদ্রব্য, বিশেষতঃ মিষ্টদ্রব্য, পাইলেই খাইয়া ফেলে। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য জলে বসাইলে কিছু করিতে পারে না, কেননা ইহারা সাঁতার জানে না। তবে পিপীলিকা কিছু কিছু উপকারও করে। অন্য পোকা মাকড় খাইয়া ফেলে। ছারপোকা, উই, ইত্যাদির সন্ধান পাইলেই পিপীলিকা দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করে, এমন কি ডিম পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে।

Questions

1. Describe the external features of an ant.
2. Describe the social life of an ant.
3. Narrate the life-history of the ant (T. T. Sept., 1935) and state what lesson we can derive from it.
4. What do you know of the cleanliness and the unity of ants?
5. What do you know of the "cowshed", agriculture and storage of honey of the ant?

মৌমাছি (The Bee)

মৌমাছির বাসস্থান ও প্রকারভেদ (Bees—their habitat and classification)—প্রায় সকল দেশেই মৌমাছি দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু যে দেশে দারুণ শীত, সে দেশে ইহারা থাকিতে পারে না।

মৌমাছি সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) যাহারা মৌচাক বাঁধে ও (২) যাহারা বাঁধে না। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে স্ত্রী, পুরুষ ও শ্রমিক, তিন রকম মৌমাছি। শেষোক্ত শ্রেণীতে শুধু স্ত্রী ও পুরুষ। সকল রকম মৌমাছিরই দুই জোড়া ডানা আছে। স্ত্রী মৌমাছিকে রাণী বলে।

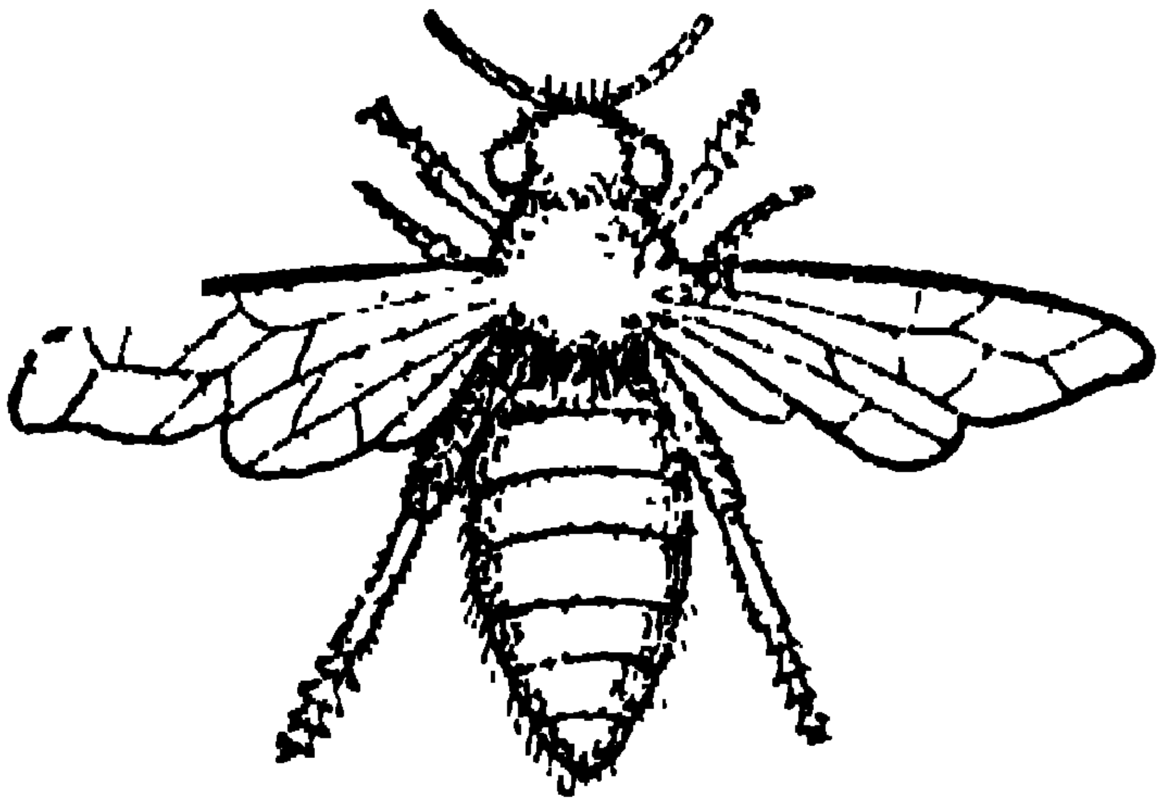

রাণী মৌমাছি

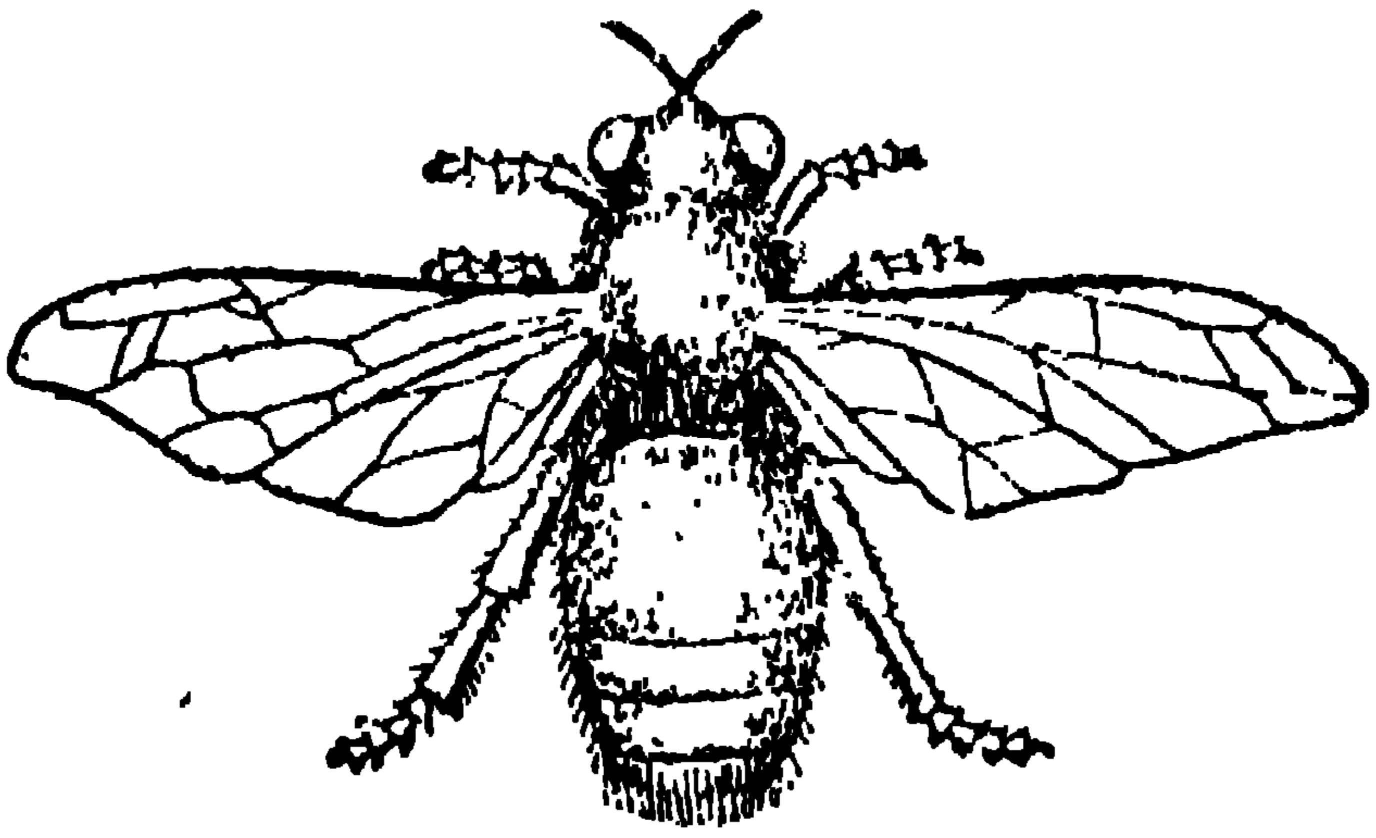

পুরুষ মৌমাছি

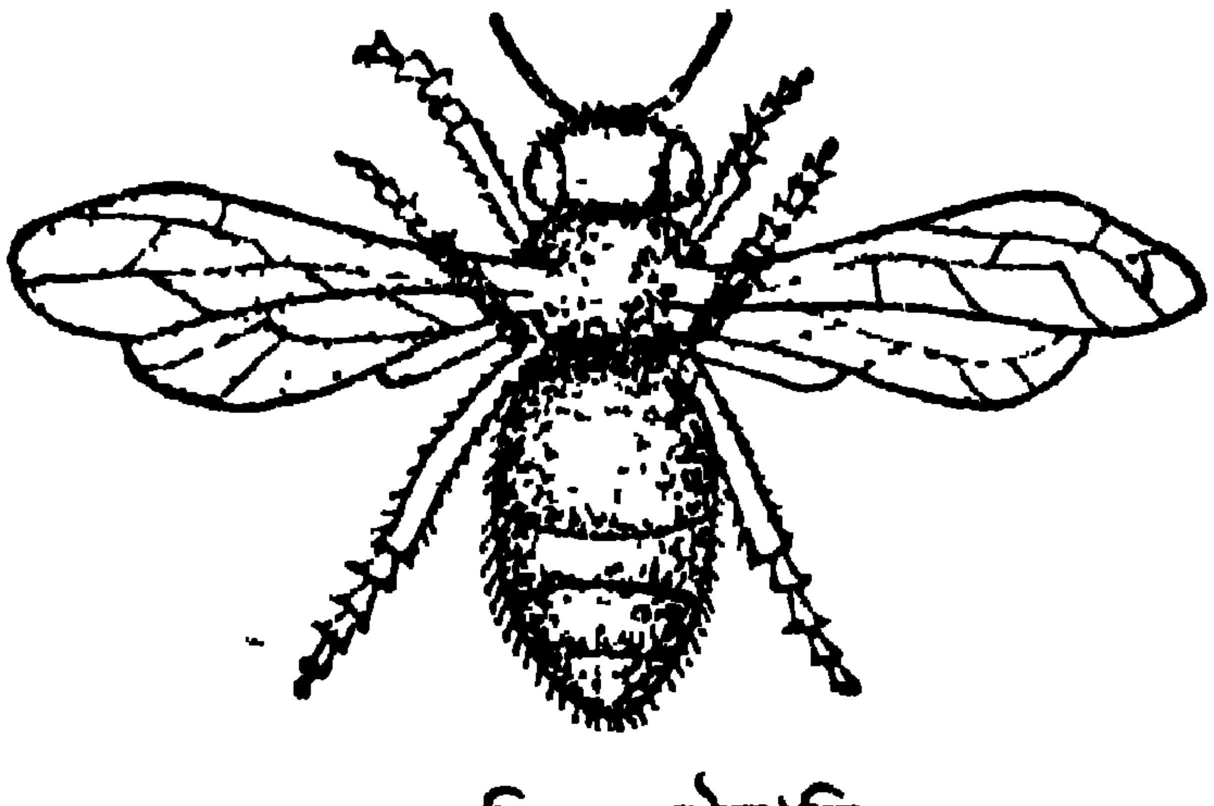

শ্রমিক মৌমাছি

৫২। মৌমাছি—পুরুষ, রাণী ও শ্রমিক

মৌচাক (Honey comb)—মৌচাকই ইহাদের বাড়ী। এক একটি চাকে হাজার হাজার প্রকোষ্ঠ থাকে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ষট্-কোণ। চাক মোম দিয়া গঠিত। এই মোম শ্রমিক মৌমাছির দেহ হইতে নিঃসৃত হয় ও পেটের নীচে সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজন পড়িলে

ইহারা মুখের লালা মিশাইয়া মোমকে নরম করে ও পিছনের পা দিয়া একটু একটু কাটিয়া লয়। গরমের সময় অতিরিক্ত জল পান করিলে আমাদের যেমন সেই জল ঘর্ম্মরূপে শরীর হইতে বাহির হয়, শ্রমিক মৌমাছিও সেইরূপ অতিরিক্ত মধু পান করিলে তাহার শরীর হইতে মোম বাহির হয়। চাক তৈয়ার করিবার আগে শ্রমিকেরা যথেষ্ট মধু পান

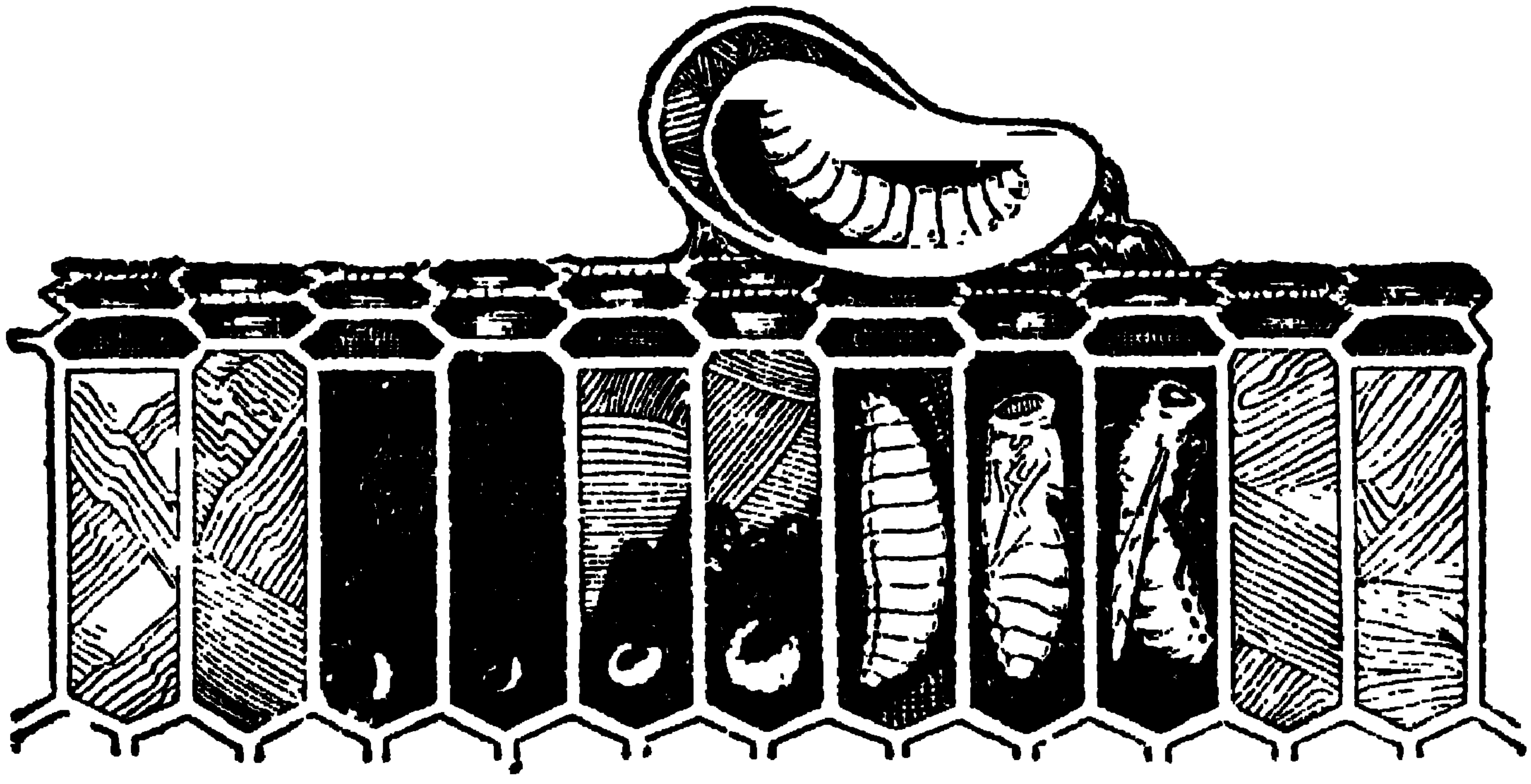

৫৩। মৌচাকের মধ্যে মৌমাছির ডিম, লার্ভা ও পিউপা

করিয়া থাকে। নূতন মৌচাক তৈয়ার করিবার জন্য ইহারা পুরাতন মৌচাক হইতে সব মধু পান করিয়া ফেলে। সে কারণে পরিত্যক্ত মৌচাকে মধু থাকে না।

পুরুষ মৌমাছি বেশ বড়। বড় মাথায় দুইটি বড় বড় চোখ। রাণীর মাথা তত বড় নয়, কিন্তু পেটটি খুব লম্বা। শ্রমিকের দেহ অপেক্ষাকৃত ছোট। তাহাদের পেটের শেষে হুল থাকে। এই হুল দ্বারা তাহারা আত্মরক্ষা করে। পুরুষের হুল নাই ; রাণীর আছে কিন্তু ছোট, বড় একটা কাজে লাগে না।

পুরুষ কিছুই করে না, রাণী শুধু ডিম পাড়ে, আর সমস্ত কাজ করিতে হয় শ্রমিকদিগকে। এক একটি চাকে রাণী থাকে একটি, পুরুষ থাকে প্রায় দুইশত। আর শ্রমিক থাকে পঁচিশ হাজার। ইহা ছাড়া বহু ডিম্ব থাকে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর। সব ঘর একরকম নয়।

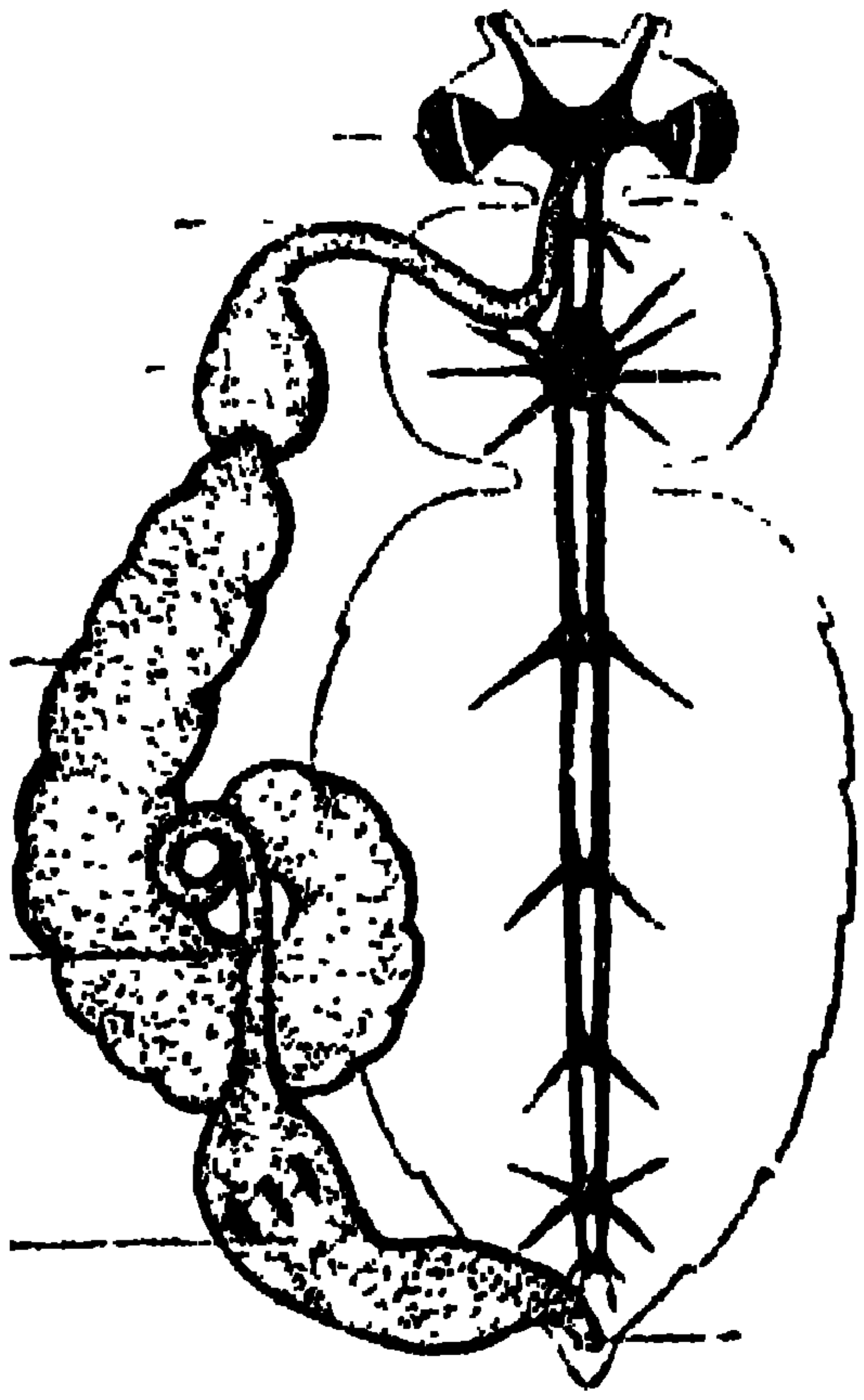

৫৪। মৌমাছির পৌষ্টিক নালী

থাকিবার ঘর ছাড়া আবার অনেক ভাণ্ডারঘর আছে। সেগুলিতে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। ইহাদের প্রধান খাদ্য ফুলের মধু (মিষ্টরস) ও পরাগ। শ্রমিকেরা বাহির হইতে এই দুই বস্তু লইয়া আসে। তাহাদের দেহে মিষ্টরস ও পরাগ বহিয়া আনিবার মত ব্যবস্থা আছে। দেহময় একপ্রকার লোম থাকে ; রসপানের সময় সেই লোমগুলিতে ফুলের পরাগ লাগিয়া যায়। পিছনের পায়ে চিরুণীর মত লোমাবলী আছে। তাহা দিয়া পরে আঁচড়াইয়া সমস্ত শরীরে মাখান পরাগ লইয়া মুখের লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট বড়ি প্রস্তুত করিয়া পায়ের গোড়ায় যে পাত্র থাকে তাহাতে জমা করে।

ফুলের মিষ্টরস হইতে মধুর পরিণতি (Nectar of flower and its transformation into honey)—ফুলের মিষ্টরস ও মৌমাছি কর্ত্তৃক প্রস্তুত মধু দুই পদার্থ এক নহে। মৌমাছির মুখে যে ক্ষুদ্র লোমশ শুঁড় থাকে, তাহার নাম **লেবিয়া** (labia)। এই লেবিয়ার দ্বারা শ্রমিকেরা ফুলের মধু অর্থাৎ রস শুষিয়া খায়। আমাশয়ের অগ্রভাগে মধুসঞ্চয় থলীতে ঐ রস জমা হয়। ফুলের মিষ্টরস মধুসঞ্চয় থলিতে গাঁজাইয়া (fermented) মৌমাছির মধুতে পরিণত হয়। এইরূপে সঞ্চিত মধু ও পরাগ মৌমাছিরা মধুচক্রে ফিরিয়া ভাণ্ডারঘরে রাখিয়া দেয়।

মৌমাছির জীবনকাল (Longevity of the bee)—শ্রমিকেরা বেশী দিন বাঁচে না—বড় জোর দুই তিন মাস। রাণী জীবিত থাকে এক হইতে তিন বৎসর। পুরুষ মৌমাছি ও রাণীর মিলন কালে উহারা শূন্যে উড়িতে থাকে। এই উড্ডীয়মান অবস্থায় পুরুষদের অনেকেরই মৃত্যু হয়—কাহারও শত্রুহস্তে, কাহারও স্বাভাবিক নিয়মে। ইহাদের সহিত সে সময় যে শ্রমিকেরা থাকে, তাহারা রাণীকে চাকে ফিরাইয়া আনে, কখনও বা নূতন চাকে লইয়া যায়। চাকে আসিবার পর রাণী ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে।

মৌমাছির রূপান্তর (Metamorphosis)—পিপীলিকার মত মৌমাছিরও রূপান্তর ঘটে। ডিম হইতে লার্ভা, পরে পিউপা এবং শেষে পূর্ণ মৌমাছি। স্ত্রী মৌমাছি হইতে ১৫ দিন, শ্রমিক হইতে ২১ দিন, ও পুরুষ হইতে ২৪ দিন লাগে।

মৌমাছির সন্তান-পালন (Care of the brood of the bee)—শ্রমিকদের উপর শিশুপালনের ভার। তাহারা আপন মুখের রস খাওয়াইয়া শিশুকে বড় করে। এই সময়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে।

যে শিশুরা শুধু শ্রমিকের মুখের রস খাইয়া বড় হয় তাহারা পরিণত হয় রাণীতে, আর যে শিশুরা কয়েকদিনের মধ্যে মধু ও পরাগ খাইতে আরম্ভ করে তাহারা পরিণত হয় শ্রমিকে। তিন চার দিন মধুপানের পর শিশুর শরীরের বাহিরে একটি আবরণের সৃষ্টি হয়। শ্রমিকের এই পিউপা অবস্থাপ্রাপ্ত শিশুদিগকে ঘরে রাখিয়া ঘরের দ্বার মোম দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। বার দিন এই অবস্থায় থাকিয়া মৌমাছি-শিশু আবরণ ভেদ করিয়া পূর্ণাঙ্গ শ্রমিকরূপে বাহির হইয়া আসে।

রাণী মৌমাছির বিশেষত্ব (Peculiarity of the queen bee)—সাধারণতঃ চাকের রাণী অন্য রাণীকে জন্মিতে ও বড় হইতে দিতে চায় না। নূতন রাণী জন্মিলে প্রায়ই তাহাকে হুল ফুটাইয়া মারিয়া ফেলে। আবার নূতন রাণী বড় হইয়া পুরাতন রাণীকে মারিয়া ফেলিবে, ইহাও শ্রমিকেরা ঘটিতে দেয় না। ফলে নূতন রাণী বড় হইলে বৃদ্ধা রাণীকে চাক ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। পুরাতনের সিংহাসনে নূতন রাণী অধিষ্ঠিত হন।

মধু ও তাহার ব্যবহার (Honey and its uses)—মধু খাদ্য ও ঔষধরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহা অত্যন্ত গরম জিনিস; বেশী খাইলে গা জ্বালা করে। অনেক দেশে মধুর জন্য মৌমাছি পোষা হয়। ইহাকে মৌমাছির চাষ বলে। চাকের নিকট যে সকল ফুল থাকে তাহা হইতেই মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করে বলিয়া পদ্মবনের মৌমাছি **পদ্মমধু** সংগ্রহ করে। পদ্মমধু চক্ষুরোগের বিশেষ উপকারী। মৌমাছিরা মধু তৈয়ার করিয়াই যে কেবল আমাদের উপকার করে তাহা নহে; চাকের মোম হইতে আমাদের অনেক উপকার হয়।

আমাদের দেশে মধু-সংগ্রহ করিবার জন্য মৌচাকের নীচে আগুন জ্বালিয়া ধোঁয়া দেওয়া হয় এবং ধোঁয়ার জন্য মৌমাছিরা পলাইলে চাক

পাড়িয়া আনিয়া তাহা নিংড়াইয়া মধু সংগ্রহ করা হয়। তাহাতে চাক নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকায় চাক নষ্ট করা হয় না। চাক পাড়িয়া আনিয়া যন্ত্রসাহায্যে খুব জোরে পাক দেওয়া হয়। তাহাতে মধু ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসে। তখন সেই প্রায় খালি চাক আবার পুরাতন স্থানে লাগাইয়া দেওয়া হয় ও মৌমাছিরা সেই চাকে ফিরিয়া আসে।

পিপীলিকা ও মৌমাছির তুলনা :

পিপীলিকা	মৌমাছি
১। আকারে রাণী সকলের বড়, তার পর শ্রমিক। পুরুষ সকলের ছোট।	১। আকারে রাণী সকলের অপেক্ষা লম্বা, তারপর পুরুষ। শ্রমিক সকলের ছোট।
২। পুরুষ ও রাণীর দুই জোড়া পাতলা ডানা থাকে। শ্রমিকের ডানা নাই।	২। পুরুষ, রাণী ও শ্রমিক প্রত্যেকের দুই জোড়া করিয়া ডানা থাকে।
৩। মুখ দিয়া খাদ্যবহন করে।	৩। মধুথলীতে মধু ও পায়ে যে পরাগপাত্র আছে তাহাতে পরাগ বহন করে।
৪। মাটিতে গর্তের মধ্যে বা গাছের কোটরে থাকে, অথবা গাছের পাতা দিয়া সুন্দর বাসা তৈয়ার করে।	৪। মোম দিয়া মৌচাক প্রস্তুত করে।
৫। অধিকাংশের হুল নাই।	৫। শ্রমিকের লম্বা হুল, রাণীর ছোট, পুরুষের একেবারেই নাই।
৬। রাণী ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।	৬। তিন বৎসরের অধিককাল রাণী বাঁচে না।

Questions

1. Describe the life history of the bee. (C. U. 1945)
2. How do you derive honey? How is honey collected in Europe?
3. Compare an ant with a bee.

মশা (The Mosquito)

মশার বাসস্থান (Habitat of the mosquito)—ইহারা সর্ব্বব্যাপী, দারুণ শীতেও বাঁচিয়া থাকে। আইসল্যাণ্ড, ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও ইহাদের দেখা যায়। প্রাণিজগতে ইহাদের মত শত্রু মানুষের আছে কিনা সন্দেহ। দংশন করিয়া মানুষকে তখনই মারে না বটে, কিন্তু নানা মারাত্মক রোগের বীজ মানুষের রক্তে সংক্রামিত করে। সেইজন্য ইহাদের সম্বন্ধে সব কথা জানা কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ ইহারা নিশাচর এবং অন্ধকার ভালবাসে। যেখানে রৌদ্র আসে, হাওয়ার চলাচল আছে, সেখানে মশা থাকে না। যেখানে হাওয়া নাই, আলো আসে না, সেখানে অষ্টপ্রহরই মশা পোঁ পোঁ শব্দ করিয়া উড়ে।

মশার দেহ (External characters of the mosquito) —মশার এক জোড়া পাতলা পাখা আছে। উড়িবার সময় এই পাখার নানারকম শব্দ হয়। ইহাদের দ্বিতীয় জোড়া ডানার পরিবর্ত্তে দুইটি কাঠির মত অঙ্গ আছে যাহার দ্বারা ইহারা নিজ দেহের ভারের সমতা (equilibrium) রক্ষা করে। সাধারণ পতঙ্গের মত ইহাদের দেহ তিন অংশে বিভক্ত, মাথায় এক জোড়া অ্যানটেনা বা শুঙ্গ ও দুইটি পুঞ্জাক্ষি আছে। পা ছয়টি। পেট নয় ভাগে বিভক্ত। ইহাদের অ্যানটেনা লোমশ ও মাথার সম্মুখে এক নল আছে। স্ত্রী-মশক সেই নল ফুটাইয়া তাহার দ্বারা সুখে আমাদের রক্ত পান করে। একটা সুবিধা যে পুরুষদের নল ভোঁতা, তাহারা রক্তপানে বঞ্চিত। গাছের রস খাইয়াই তুষ্ট থাকে।

মশার প্রকারভেদ ও রোগবাহী মশা (Different kinds of mosquitoes and carriers of germs of diseases)—মশা নানাপ্রকার। ইহাদের কামড় বিশেষ

যন্ত্রণাদায়ক। স্ত্রী-মশা যে কেবল আমাদের রক্ত চুষিয়াই ক্ষান্ত হয় তাহা নহে। ইহাদের দ্বারা আমরা নানাপ্রকার রোগের বীজ পাইয়া থাকি। **এনোফিলিস** (Anopheles) নামক মশা ফাইলেরিয়ার জীবাণু বহন করে। **কিউলেক্স্** (Culex) নামক মশা ফাইলেরিয়ার বা গোদের জীবাণু লইয়া আসে। **ষ্টেগোমিয়ার** (Stegomya) দংশনে ডেঙ্গু জ্বর হয়। এনোফিলিস যখন কোথাও বসে তখন তাহাদের মুখের নল ও পেট এক লাইনে অর্থাৎ সমভাবে থাকে। সেইজন্য মনে হয় তাহাদের দেহের শেষটা উঁচু হইয়া আছে।

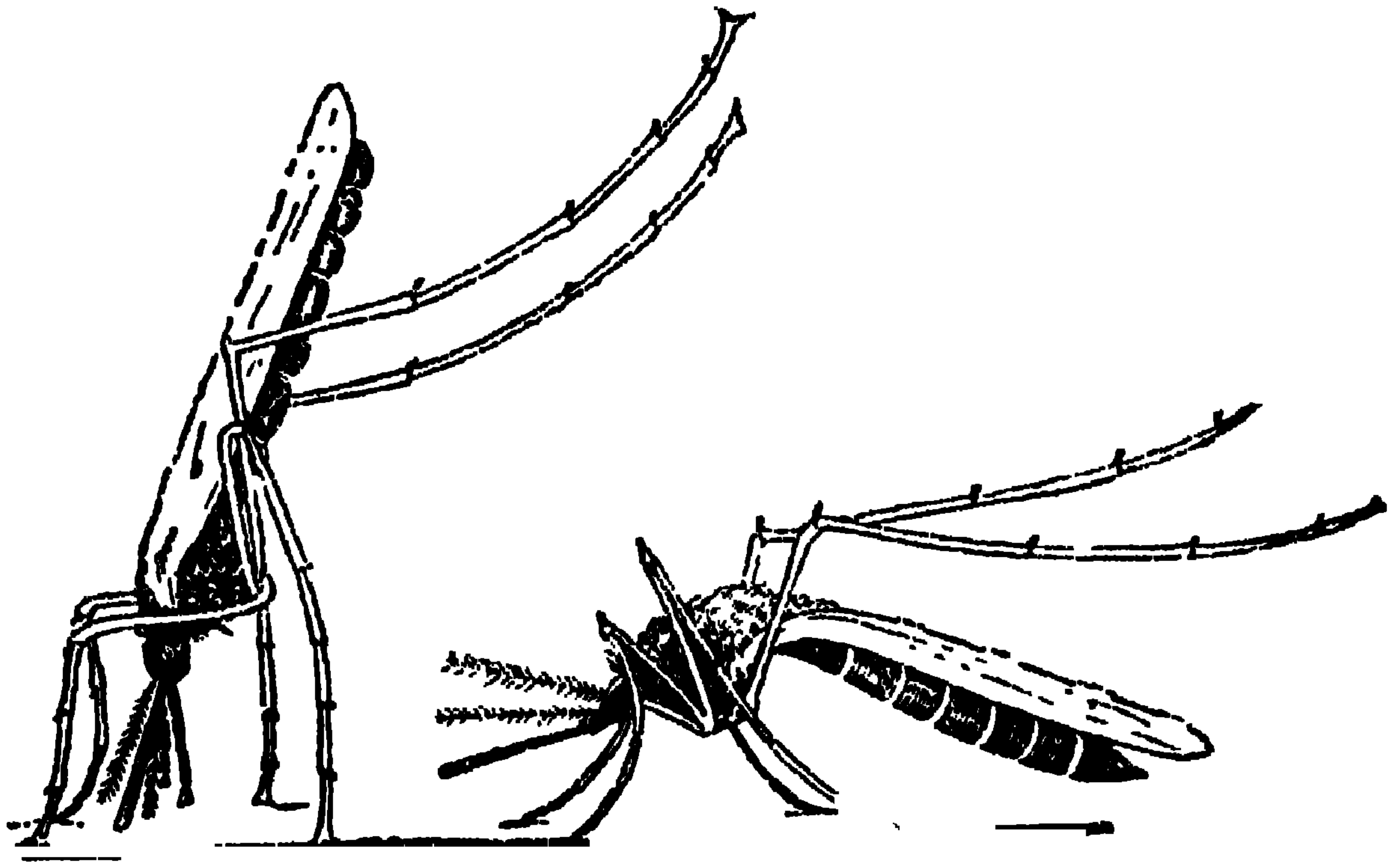

এনোফিলিস মশা কিউলেক্স মশা

৫৫। মশা

ম্যালেরিয়ার জীবাণু ও মশা (Malarial germs and mosquitoes)—এনোফিলিস স্ত্রীমশক কোন ম্যালেরিয়া রোগীকে দংশন করিলে রোগবীজ রোগীর দেহ হইতে মশকের পেটে প্রবেশ করে। আশ্চর্য্য এই যে ইহার ফলে মশককে ম্যালেরিয়া ব্যাধি ধরে না। রোগ জীবাণু তাহার শরীরে সংখ্যায় বেশী বৃদ্ধি পায় ও লালানিষ্কাশন

গ্রন্থি (salivary gland)তে যায়। তারপর সে যখন অন্য কোন মানুষকে কামড়ায় তখন তাহার দেহস্থ জীবাণু সেই মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়। মশা যখনই কামড়ায় তখনই সে থুতু ফেলিতে থাকে যাহাতে যাহাকে কামড়াইতেছে তাহার রক্ত জমিয়া না যায়। এই থুতু ফেলিবার কালে ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

মশার রূপান্তর (Metamorphosis)—মশা জলে ডিম পাড়ে। কিন্তু সকল মশাই সকল রকম জলে ডিম পাড়ে না।

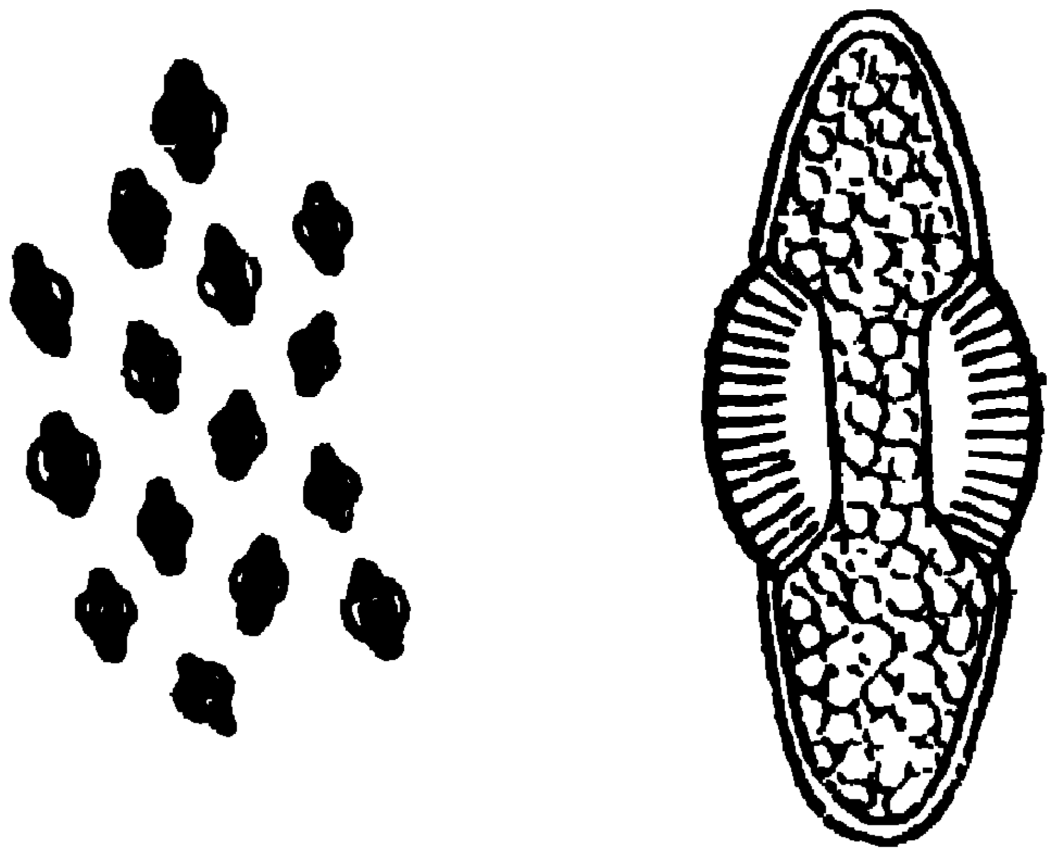

১। ডিম্বসমূহ ২। ডিম্বের বর্দ্ধিত আকার

৫৬। এনোফিলিসের ডিম্ব

এনোফিলিসেরা 'বাবু' পতঙ্গ। তাহাদের নদী বা বড় পুকুর চাই। অন্ততপক্ষে পরিষ্কার জল চাই। কিউলেক্স কিন্তু যেকোন জলে ডিম

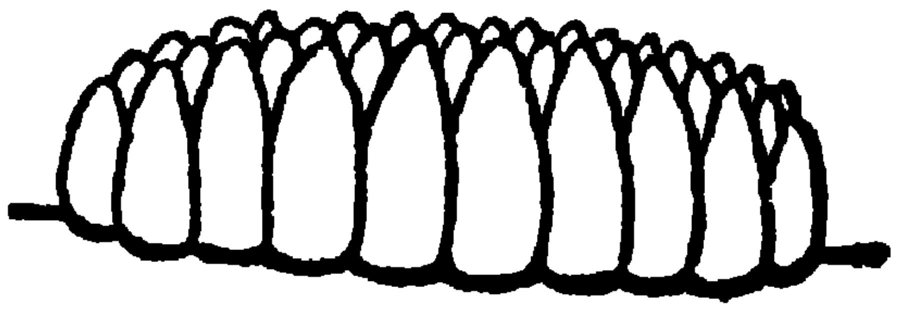

১। ডিম্বের বর্দ্ধিত আকার ২। ডিম্বপুঞ্জ

৫৭। কিউলেক্সের ডিম্ব

পাড়িতে প্রস্তুত। কিউলেক্সের ডিম একসঙ্গে অনেকগুলি জলে ভাসে, কিন্তু এনোফিলিসের ডিম আলাদা আলাদা ভাসে।

কিউলেক্সের ডিম হইতে যে লার্ভা বা শূক জন্মে, তাহার লম্বা দেহ, চোখশুদ্ধ চেপ্টা মাথা ও গায়ে বড় বড় লোম থাকে। ইহারা জলের খুব ছোট ছোট জীব খাইয়া বাঁচে। তবে দরকার পড়িলে যাহা পায় তাহাই খায়, পরস্পরকেও খাইয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদের পেটের শেষ প্রান্তে একটি নল থাকে। তাহার দ্বারা শ্বাস লয়। ক্রমে ইহাদের দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া কতকটা বঁড়শির মত বাঁকিয়া যায়। তখনও তাহারা জলে থাকে। শেষে যখন পূর্ণাবয়ব মশাতে পরিণত হয়, তখন খোলস ছাড়িয়া ডানা মেলিয়া উড়িয়া যায়।

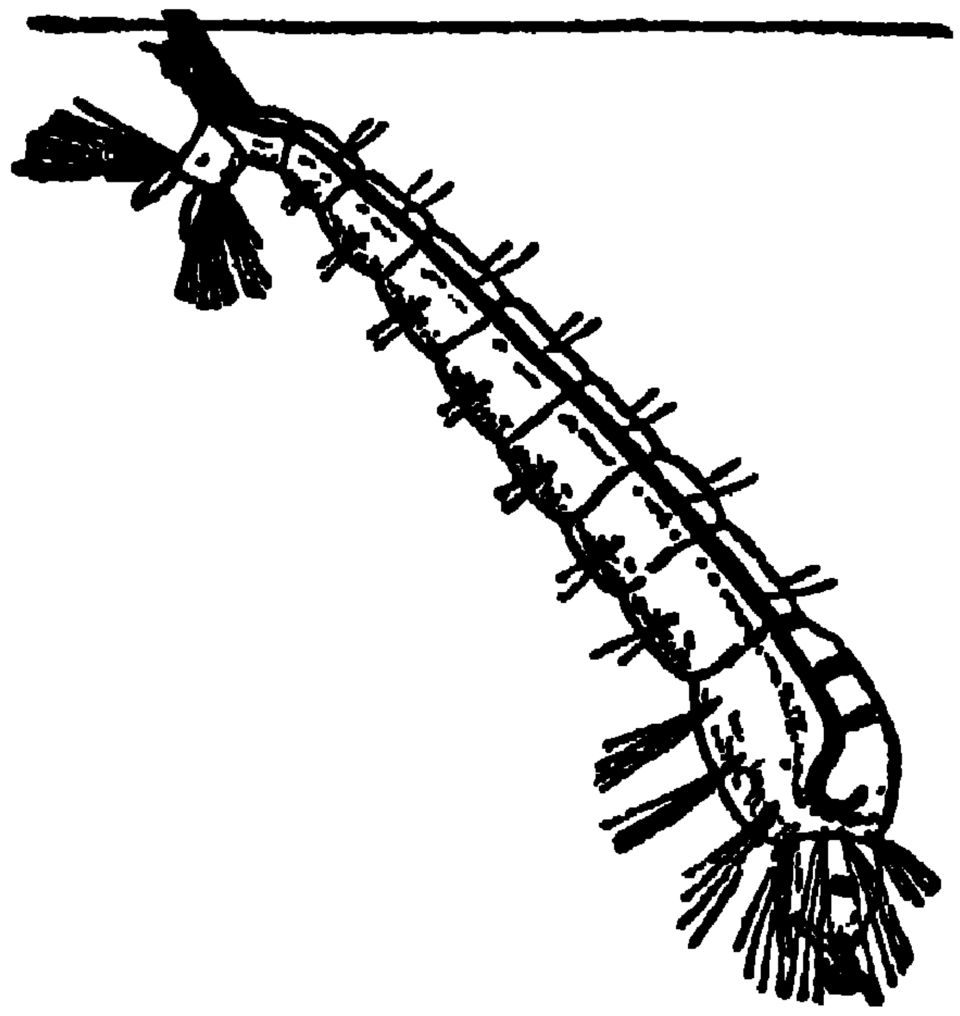

৫৮। কিউলেক্সের লার্ভা বা শূক

এনোফিলিসের লার্ভা জলের তলে যায় না এবং দেহ জলের উপরিভাগের একটু নীচে সমান্তরাল ভাবে ভাসে। যথাসময়ে লার্ভা পিউপাতে পরিণত হয়। তারপর সেই পিউপা কয়েকবার খোলস ছাড়ার পরে পূর্ণাঙ্গ মশার আকৃতি প্রাপ্ত হয়। নবজাত মশক পরিত্যক্ত খোলসের উপর বসিয়া কিছুক্ষণ জলবিহার করে। পরে ডানা বেশ শুকাইলে উড়িয়া যায়। এই রকমের মশামাত্রই স্থির অচঞ্চল জলে ডিম পাড়ে, তাহা না হইলে ঢেউয়ে তার নবজাত শিশুর নৌকাডুবির ভয় থাকে।

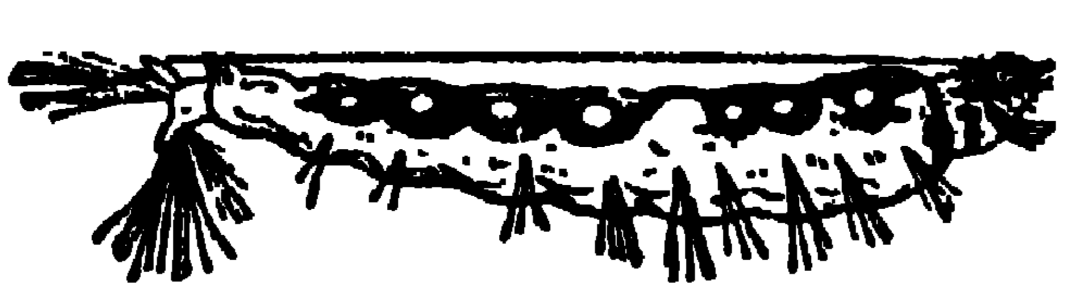

৫৯। এনোফিলিসের লার্ভা বা শূক

ম্যালেরিয়া রোগের কবলে পড়িয়া বাংলা দেশের গ্রামগুলি উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। প্রতিবৎসর কত লোক যে এই এক রোগে মরিতেছে

তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাও দুর্ব্বল, নিরুদ্যম ও অস্থিচর্ম্ম-সার।

ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণের উপায় (Prevention of malaria)—দেশকে বাঁচাইতে হইলে গ্রামের ঝোপ জঙ্গল কাটিয়া ফেলিতে হইবে, যাহাতে মশককুল লুকাইবার জায়গা না পায়। পুকুরে, ডোবায় মাঝে মাঝে কেরোসিন তেল ছড়াইতে হইবে। এই তেল ছড়াইলে জলের উপর একটি সূক্ষ্ম আবরণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মশা এই আবরণ ভেদ করিয়া ডিম পাড়িতে জলে যাইতে পারে না। জলমধ্যস্থ লার্ভাও শ্বাস লইতে জলের উপরে আসিতে পারে না। কেরোসিনের বদলে প্যারিস-গ্রীন নামক এক ঔষধ দিলে একই কাজ হইবে। তারপর দেখিতে হইবে যে কোথাও জল জমিতে পাইতেছে কি না। খাল কাটিয়া সব জমা জল বাহির করিয়া দিতে হইবে। ভাঙ্গা হাঁড়ি-কুড়ি পর্য্যন্ত বাহিরে ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। কেন না বৃষ্টি পড়িলে তন্মধ্যে যেটুকু জল জমিবে তাহাতে কিউলেক্স অনায়াসে ডিম পাড়িতে পারিবে। আমাদের দেশে যখন রেল ছিল না তখন জল এত আবদ্ধ হইত না। রেলের জন্য বাঁধ দিয়াই জল প্রায় সর্ব্বত্র রেলের লাইনের দুইধারে বর্ষায় আটকাইয়া থাকে। এই বদ্ধ জলে মশার আড্ডা। ইহার প্রতিকার করা প্রয়োজন।

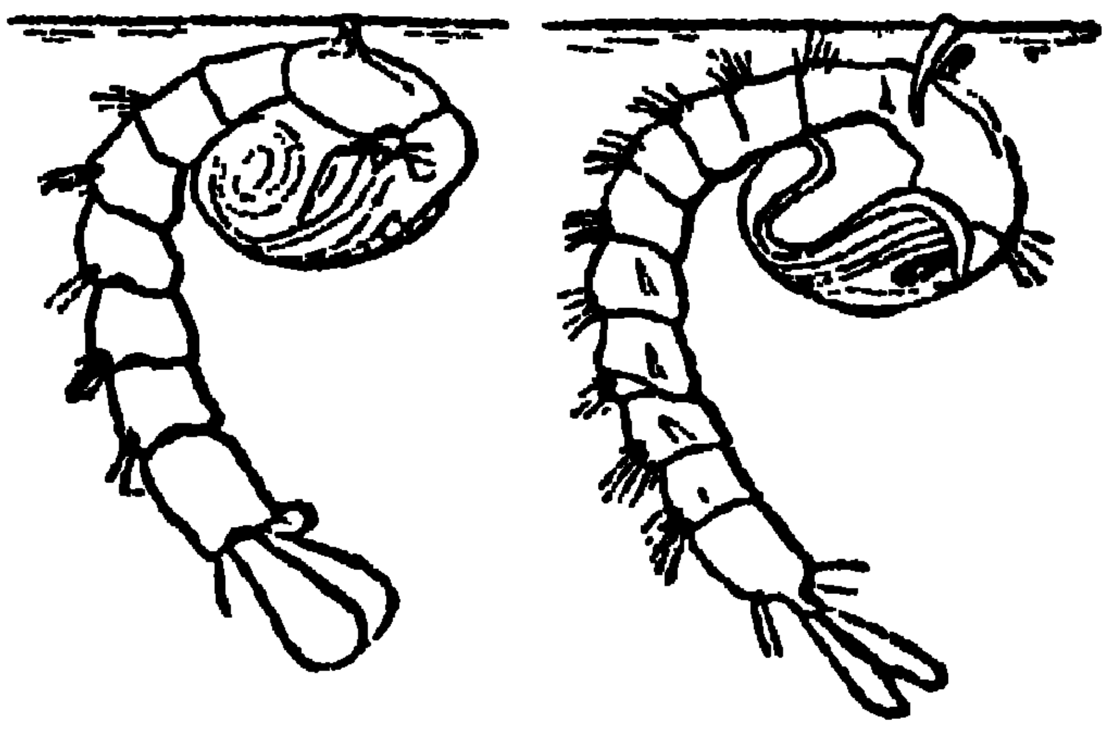

এনোফিলিসের পিউপা   কিউলেক্সের পিউপা

৬০। পিউপা

মশা নির্ম্মূল করিতে হইলে পুকুরে ডোবায় নিয়মিত চারা-পোনা মাছ ফেলা উচিত। মশার লার্ভাগুলি বড় মাছের বাচ্চার অতি প্রিয়খাদ্য। তাহারা জলে থাকিলে লার্ভাকে কিছুতেই বাঁচিতে দিবে না।

ব্যক্তিগত হিসাবেও ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থা আবশ্যক। ম্যালেরিয়া বীজাণুযুক্ত এনোফিলিস মশা কামড়াইলে ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। সে কারণ যাহাতে এনোফিলিস মশা না কামড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। ঘরের দ্বারে বা জানালায় সরু তারের জাল লাগান দরকার; যাহাতে মশা প্রবেশ করিতে না পারে। সন্ধ্যার সময় যখন বাহিরের আলো হইতে বাড়ীর মধ্যে অন্ধকারে মশা প্রবেশ করে সে সময় ধূপ, ধূনা, গন্ধক প্রভৃতি জ্বালান আবশ্যক। ইহাতে যে ধোঁয়া হয় তাহার গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া মশা পলাইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় কোনপ্রকার উগ্রগন্ধযুক্ত তৈল মাখা আবশ্যক। যেমন, টারপিন্, লেবুর তৈল বা ইউকালিপটাস্ তৈল যাহার গন্ধে মশা কাছে আসে না। রাত্রে মশারির মধ্যে শয়ন করা দরকার, যাহাতে রাত্রে মশা কামড়াইতে না পারে। ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র ঔষধ কুইনিন সপ্তাহে ১০ গ্রেণ করিয়া সেবন করা উচিত। কুইনিন যেমন ম্যালেরিয়ার ঔষধ, তেমনই ম্যালেরিয়া জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট প্রতিশেধক।

Questions

1. Narrate the life-history of a mosquito. (T. T. January, 1936, 1937, 1938)
2. What is the difference between a male and a female mosquito? Which of them bites? Name the mosquitoes that carry germs of malaria, philaria and dengue fever.
3. Describe the life-history of the mosquito. In what ways are mosquitoes injurious to health? (C. U. 1946)
4. How can we save our country from the grip of malaria?

প্রজাপতি (The Butterfly)

প্রজাপতির স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ—প্রজাপতি পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণী। ইহাদের এক জোড়া বড় পুঞ্জাক্ষি ও দুই জোড়া ডানা থাকে।

দুই রকমের প্রজাপতি দেখা যায়—দিবাচর ও নিশাচর। দিবাচরের ইংরেজী নাম **বাটারফ্লাই** (butterfly), নিশাচরের নাম **মথ** (moth)। দিবাচর প্রজাপতি যখন কোথাও বসে, তখন তাহার ডানা নৌকার পালের মত পিঠের উপর খাড়া হইয়া থাকে। নিশাচর বসিলে তাহার ডানা পিঠের উপর মেলিয়া পড়িয়া থাকে।

সাধারণতঃ দিবাচরের দেহের ও পাখার রং বেশী সুন্দর। নিশাচরের দেহ বেশী মোটা। দিবাচরের শুঙ্গের অগ্রভাগ মোটা। নিশাচরের শুঙ্গের মধ্যভাগ মোটা; অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ সরু।

দুই জাতীয় প্রজাপতিরই ডানার উপর এক রকম চূর্ণ পদার্থ থাকে, যাহা হাত দিলে হাতে লাগিয়া যায়। মাইক্রসকোপের দ্বারা দেখিলে এই চূর্ণ আঁশের মত দেখায়।

প্রজাপতির মুখে একটি চেপ্টা নল ঘড়ির স্প্রিংএর মত জড়ান থাকে। খাইবার সময় নলটি সোজা হইয়া যায় ও ইহার সাহায্যে প্রজাপতি ফুলের মিষ্টরস (মধু) কি ফলের রস শোষণ করে। ইহারা কামড়াইতে পারে না।

প্রজাপতির রূপান্তর (Metamorphosis)—স্ত্রী-প্রজাপতি একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে। এই ডিম প্রায়ই গাছের পাতায় দেখিতে পাওয়া যায়। এমন পাতার উপর ইহারা ডিম পাড়ে যে ডিম ফুটিলে শুঁয়াপোকা (লার্ভা অবস্থা) বাহির হইয়া সেই পাতা খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে। ডিম ফুটিতে ১০।২০ দিন লাগে। প্রজাপতি সন্তানপালন করে না। আত্মরক্ষার জন্য সন্তানের অঙ্গ সাধারণতঃ কাঁটায় ভরা হইয়া থাকে। কোন কোন শুঁয়াপোকা অত্যন্ত বিষাক্ত।

জন্মান মাত্র শুঁয়াপোকা তাহার ডিমের খোসাটা প্রায়ই খাইয়া ফেলে। তারপর সবুজ পাতা খাইতে আরম্ভ করে। ইহাতে গাছের বিশেষ ক্ষতি হয়; কিন্তু পূর্ণ প্রজাপতি অবস্থায় তাহারা কোনও ক্ষতি

করে না। শুঁয়াপোকা খুব পেটুকের মত দিনকয়েক খায়। এই সময় ইহারা বারকতক খোলস ত্যাগ করে। তারপর খাওয়া বন্ধ করিয়া দেহের চারিদিকে একটি আবরণ গড়িয়া তোলে। ইহারই নাম **গুটি** (cocoon)। গুটির দ্বার নাই। উহার মুখের ভিতর হইতে একপ্রকার লালা নিঃসৃত হয়, যাহা শুকাইলে রেশম-সূত্রে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে বাসকালে শুঁয়াপোকা মোটে কিছু খায় না। ঐ সময়ে গুটির ভিতরে বাচ্চাকে **পিউপা** বা **ক্রাইসালিস** (chrysalis) কহে। ইহার দেহ অতিদ্রুত পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার দাড়া, গায়ের কাঁটা, পদশ্রেণী সব চলিয়া যায়। যখন গুটি কাটিয়া বাহিরে আসে তখন সে বিচিত্রবর্ণ ডানাযুক্ত সুন্দর প্রজাপতি! পূর্ণ রূপান্তর ঘটিতে প্রায় দেড়মাস সময় লয়।

কোন কোন প্রজাপতির শুঁয়াপোকা আবার গুটি প্রস্তুত করে না। তাহারা সুন্দর উজ্জ্বল এক কঠিন আবরণে নিজের দেহ আচ্ছাদিত করে ও গাছের সরু ডালে বা পাতায় ঝকঝকে নোলকের মত ঝুলিয়া থাকে।

রেশম-মথ (Silk moth)—এণ্ডি, তসর, গরদ ইত্যাদি রেশমের সূত্র যে প্রাণী তৈয়ার করে তাহারা নিশাচর মথ। সাধারণ প্রজাপতির জীবন-কাল দুই এক মাস, কিন্তু এই মথেরা পাঁচ ছয় দিবসের বেশী বাঁচে না। ইহাদের ডিম সাদা ও পোস্তদানার মত ছোট। একটির গায়ে আর একটি লাগিয়া থাকে। তুঁত, এরণ্ড, পেয়ারা, কুল, পলাশ, শাল, মুরগা (শালের মত গাছ) ইত্যাদি গাছের পাতায় ইহারা ডিম পাড়ে। এক একটি মথ হাজার হাজার ডিম পাড়ে। দশ বার দিনে ডিম ফুটিয়া শুঁয়াপোকা বাহির হয়। এই অবস্থায় ইহার নাম **পলু**। পলু জন্মিয়াই পাতা খাইতে আরম্ভ করে। মাসখানেক ধরিয়া পাতা খায়, আর বারচারেক খোলস ছাড়ে। তারপর খাওয়া বন্ধ করে ও মুখ হইতে লালাবৎ রেশমের সূতা বাহির করিয়া গায়ে জড়াইতে থাকে। দিন চার

পাঁচেকের মধ্যে গুটি পাতিলেবুর আকার প্রাপ্ত হয়। এক একটি গুটির মধ্যে প্রায় সাড়ে চারি শত গজ দীর্ঘ সূতা থাকে।

প্রজাপতি বা মথ বাহির হইবার সময় গুটি কাটিয়া পথ করিয়া লয়। ইহাতে অনেকখানি রেশম নষ্ট হয়। সেই জন্য রেশম-চাষীরা গুটি গরম জলে ডুবাইয়া ভিতরের প্রাণীকে আগে মারিয়া ফেলে; তারপর ধীরে ধীরে তাহার অঙ্গে জড়িত রেশম খুলিয়া লয়।

ভারতের নানা ভাগে রেশম-চাষীরা গুটির জন্য এণ্ডি ও তুঁতের চাষ করে। বীরভূম ও বাঁকুড়ার তসর-গুটি সাধারণতঃ শাল বা মুরগা বা কুল গাছে বাঁধে।

অতীতের রেশম চাষ—প্রাচীনকালে চীন হইতে ভারতে রেশম আমদানী হইত। রেশমের পুরাতন নাম চীনাংশুক। পাট, এণ্ডি, তসর, গরদ, মুগা, মটকা ইত্যাদি রেশমের সূতার বর্ণের খুব তফাৎ আছে, দেখিলেই চেনা যায়।

আধুনিক রেশম চাষ—ভারতবর্ষের অনেক স্থানে রেশমের কারখানা আছে। বহরমপুরের গরদ, ভাগলপুরের বাপ্‌তা, গৌহাটি, নওগাঁ, শিবসাগর জেলার এণ্ডি, মুগা ও পাট প্রসিদ্ধ। ভাল পাটসূতার রং মাখনের মত। গরদের রং ঘৃতের মত। মুগার রং তামাক পাতার মত। এণ্ডির রং আলুর মত।

আজকাল, ফরাসী, স্পেন, ইতালি প্রভৃতি দেশে অনেক রেশমের কারবার হইয়াছে। জাপান, চীন ও ব্রহ্মদেশ হইতে এখনও আমাদের দেশে বহু রেশমবস্ত্র আমদানী হয়।

রেশম পতঙ্গ দুই প্রকার। এক প্রকার বৎসরে একবার ডিম পাড়ে (univolt)। দ্বিতীয় প্রকার বৎসরে বহুবার ডিম পাড়িতে পারে (multivolt)। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই দ্বিতীয় প্রকারের পতঙ্গই বেশী।

প্রজাপতি ও মথের তুলনা :

প্রজাপতি	মথ
১। দিবাচর।	১। নিশাচর।
২। দেখিতে সুন্দর।	২। দেখিতে সুন্দর নয়।
৩। শরীর রোগা।	৩। শরীর মোটা।
৪। শুঙ্গ গদার মত।	৪। শুঙ্গ পটলের মত।
৫। বসিলে পাখা নৌকার পালের মত উঁচু হইয়া থাকে।	৫। বসিলে পাখা পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে।
৬। কেহ কেহ রেশম প্রস্তুত করিতে পারে।	৬। ইহারা রেশম তৈয়ার করে।

মশা ও প্রজাপতির তুলনা :

মশা	প্রজাপতি
১। এক জোড়া পাতলা ডানা। এক জোড়া কাঠির মত প্রত্যঙ্গ থাকে।	১। দুই জোড়া ডানা।
২। ডানায় চূর্ণ পদার্থ নাই।	২। ডানায় চূর্ণ পদার্থ আছে।
৩। উড়িতে পাখার শব্দ হয়।	৩। উড়িতে পাখার শব্দ হয় না।
৪। মাথার সম্মুখে সোজা নল থাকে।	৪। মুখে জড়ান নল। খাইবার সময় নল সোজা হইয়া যায়।
৫ পুরুষের নলের আগা মোটা ও ভোঁতা, স্ত্রীর নল সূক্ষ্মাগ্র ও তীক্ষ্ণ। এই নলদ্বারা স্ত্রী রক্তশোষণ করে।	৫। জড়ান নল দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ফুলের মধু চোষণ করে।
৬। রোগজীবাণু বহন ও উহা মানুষের রক্তে সংক্রামিত করে।	৬। রোগজীবাণু বহন করে না।
৭। জলে ডিম পাড়ে।	৭। পাতায় ডিম পাড়ে।
৮। শূক জলের ক্ষুদ্র জীব খায়।	৮। শূক গাছের পাতা খায়।

Questions

1. Do you consider the life-history of a butter-fly interesting? If so, why? (C. U. 1943, 1945)
2. What do you know of the silk-worm? What are their main diseases?
3. Compare a butterfly with a month.
4. Compare a mosquito with a butterfly. (T. T. July, 1939)

চতুর্থ অধ্যায়

মাকড়সা

(The Spider)

মাকড়সার দেহ—ইহাদের মাথা ও বুক এমনভাবে জোড়া যে মনে হয় ইহাদের দেহের মাত্র দুই ভাগ—মাথা ও পেট। এই প্রকার মাথা ও বুক জোড়া লাগার নাম শিরোবক্ষ (Cephalothorax)। ইহারা **অষ্টপদ**। পা মস্তকদেশের নীচে। চারি জোড়া সরল চক্ষু (পুঞ্জাক্ষি নয়) দুই সারিতে মাথার সম্মুখে সাজান। চোখ নাড়িতে পারে না। মুখের কাছে দুইটি হস্তের ন্যায় ছোট প্রত্যঙ্গ। ইহাদের সাহায্যে ভোজন করে। ইহাদের মুখে অতি ছোট দাড়া আছে, তাহা প্রায়ই ফুটাইয়া দেয়। এই দাড়ায় এক প্রকার বিষাক্ত রস থাকে; উহার দ্বারা শিকারকে মারিয়া ফেলে। পুরুষের এই প্রত্যঙ্গ গোলাগ্র, স্ত্রীর সূচ্যগ্র।

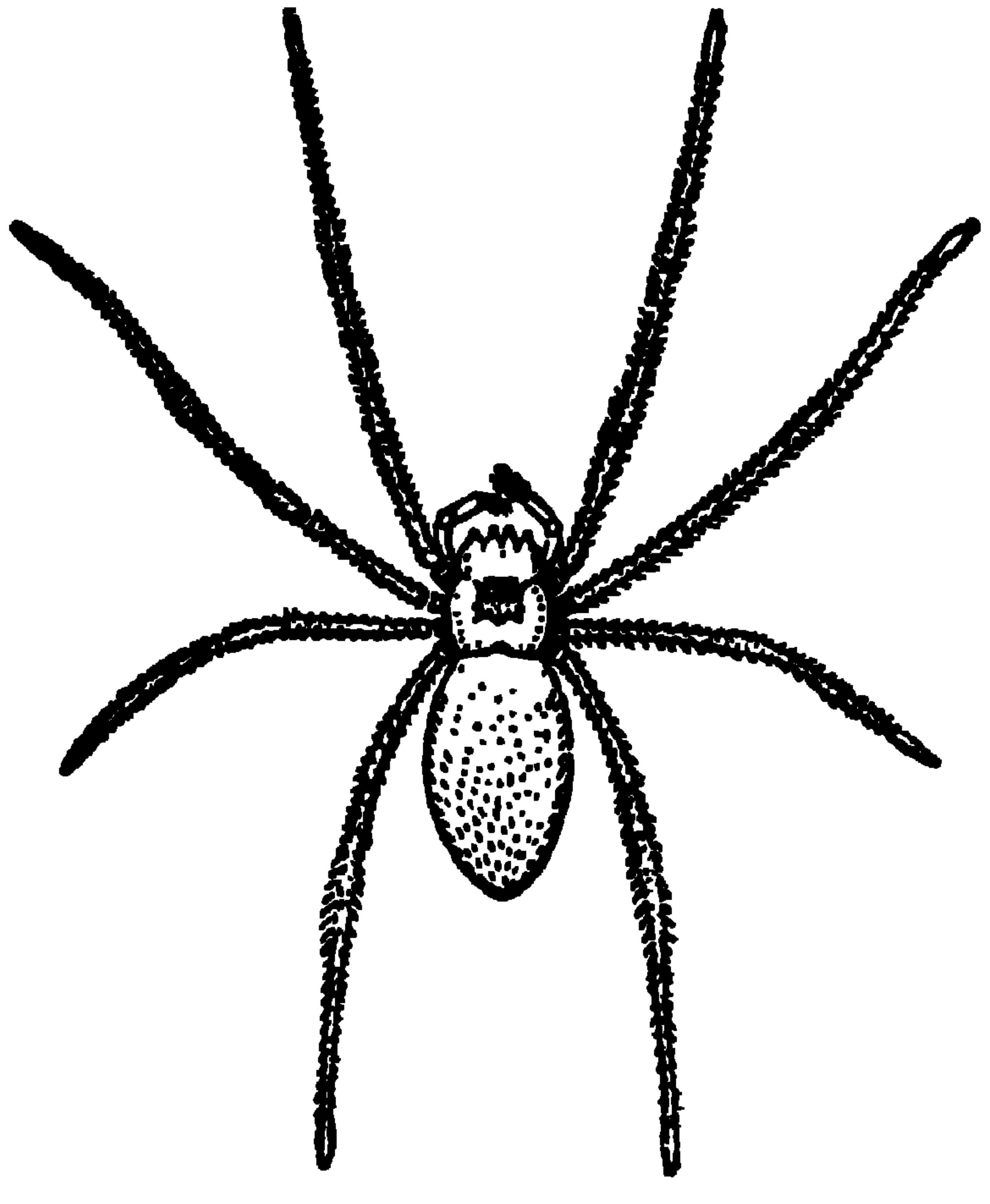

৬১। মাকড়সা

মাকড়সার শ্বাসকার্য্য (Respiration of a spider) —শ্বাসকার্য্যের জন্য যে অঙ্গ আছে, তাহাকে **ফুসফুস-বই** (lung book) বলা হয়। অঙ্গটি পুস্তকেরই মত অনেকগুলি পাতা দিয়া গঠিত। দেহস্থ কতকগুলি ছিদ্রদ্বারা বাহিরের বাতাসের সহিত এই পুস্তকাঙ্গের যোগ আছে। পাতার মাঝে মাঝে রক্ত যাইয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে ও দূষিত কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে।

মাকড়সার জাল (Web of a spider)—আপন দেহের সূতা দিয়া জাল বোনে বলিয়াই মাকড়সার প্রাচীন নাম উর্ণনাভ। বিভিন্ন

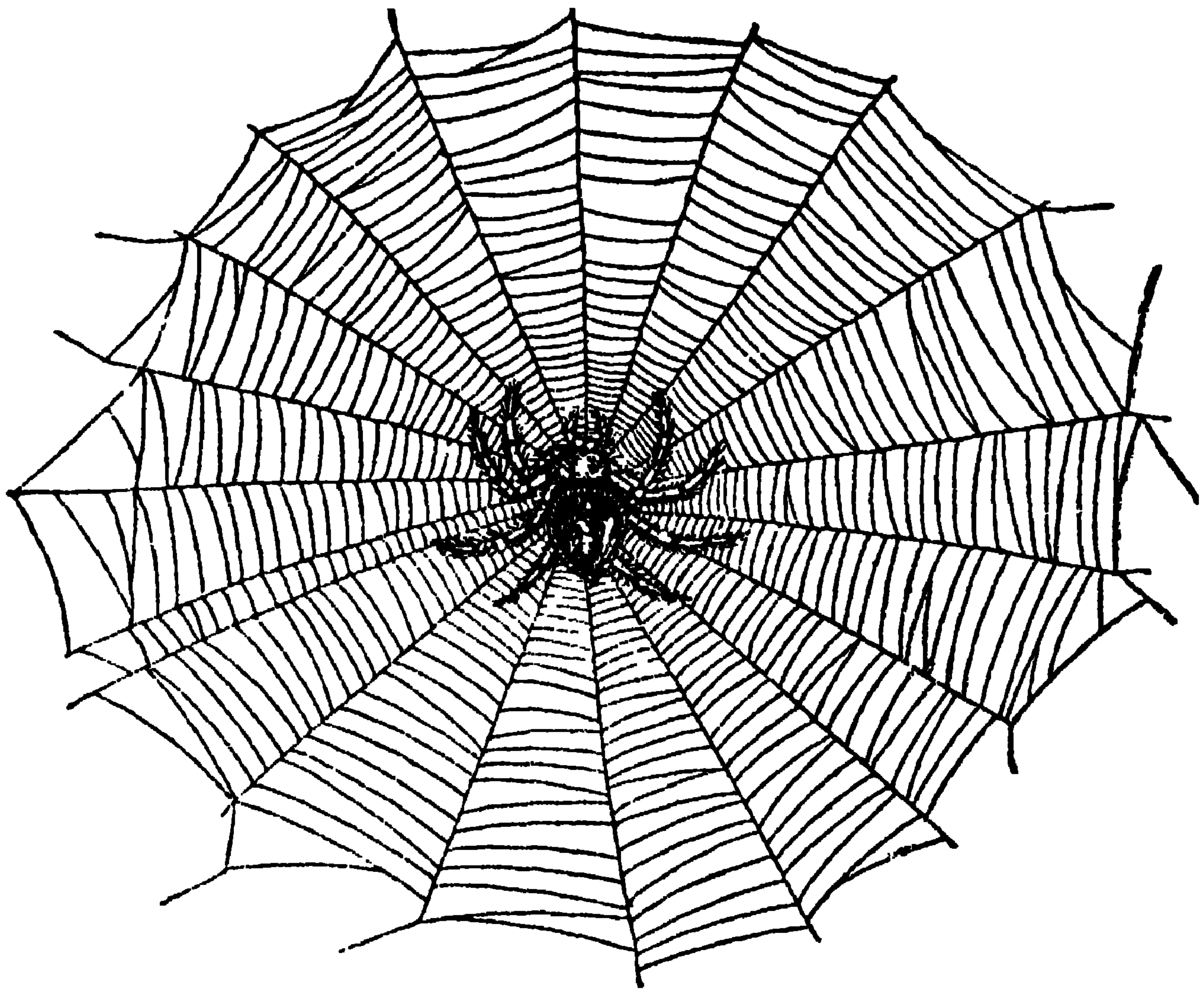

৬২। মাকড়সা ও তাহার জাল

জাতীয় মাকড়সা বিভিন্ন প্রকারের জাল বোনে। সূতা প্রস্তুত ও জাল বয়ন, এই দুই কার্য্যের উপযোগী যন্ত্র ইহাদের পেটের নীচে থাকে। প্রথমে

পেটের নীচে হইতে অল্প রস লইয়া এক স্থানে লাগায়, তারপর একদিকে বেগে দৌড়াইয়া যায়। এই রসের সূক্ষ্ম তার হাওয়া লাগাতে তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া একগাছি মজবুত ও দীর্ঘ সূতায় পরিণত হয়। এইরূপে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া ছুটাছুটি করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে সুন্দর একখানি জাল বুনিয়া ফেলে। জালের উদ্দেশ্য খাদ্যসংগ্রহ। জালের মাঝখানে একগাছি সূতা পায়ে আটকাইয়া মাকড়সা বসিয়া থাকে। জালে শিকার পড়িলেই সূতায় টান পড়ে। তৎক্ষণাৎ শিকারী ছুটিয়া গিয়া শিকার ধরে।

এই জাল বুনিবার কাজে ইহাদের অনেক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। যে দিকে হাওয়া বহে সেদিকে সূতা ছাড়িতে থাকে। এই উড়ন্ত সূতা কোন গাছে লাগিয়া গেলে মাকড়সা সূতা ধরিয়া সেই গাছে উপস্থিত হয় ও নূতন সূতা ছাড়িতে ছাড়িতে ফিরিয়া আসে। এইরূপে তাহারা সময় সময় বৃহৎ জাল বুনিয়া ফেলে।

নানাপ্রকার মাকড়সা (Different forms of spider)—মাদাগাস্কার প্রভৃতি অত্যুষ্ণ প্রদেশে খুব বড় বড় মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের জালও অতি প্রকাণ্ড, সময় সময় সারা গাছ জালে ঢাকিয়া ফেলে। লঙ্কাদ্বীপে এক প্রকার মাকড়সা আছে যাহারা জালে ইঁদুর পর্য্যন্ত ধরিয়া খায়। এই জালের সূতা খুব মজবুত ও ধারাল। হাতে লাগিলে হাত কাটিয়া যায়।

আর এক প্রকার মাকড়সা আছে যাহারা জাল বোনে না। ইহারা দেয়ালের ফাটলে, ঘরের চালে, গাছের কোটরে বাস করে; লাফ দিয়া শিকারের ঘাড়ের উপর পড়ে ও তাহাকে মারিয়া ফেলে।

আবার এমন মাকড়সাও আছে যাহারা মাটিতে গর্ত্ত করিয়া সেখানে বাসা বাঁধে। এই বাসার প্রবেশপথে ডালা আঁটা থাকে। এরূপ ভাবে

তাহা আঁটা থাকে যে মাকড়সা ইচ্ছামত খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে। এই মাকড়সারা নিশাচর। ইহাদিগকে সচরাচর দিনে দেখা যায় না।

পুরুষ মাকড়সা স্ত্রীর অপেক্ষা অনেক ছোট। স্ত্রী পুরুষের বার চৌদ্দ গুণ পর্য্যন্ত বড় হইতে পারে। পুরুষের দেহের রং নানাপ্রকার। স্ত্রীর দেহ দেখিতে মোটেই সুন্দর হয় না। **মিগেল** নামক এক জাতীয় মাকড়সা আছে যাহারা ছোট পাখী ধরিয়া তাহাদের দেহের রক্ত ও তরল রস চুষিয়া খায়। মাকড়সা কখন কোনও কঠিন দ্রব্য খাইতে পারে না।

ইহারা একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে। ডিমগুলি একটি থলির মধ্যে থাকে। ইহাদের ডিম ফুটিলে যে বাচ্চা বাহির হয় তাহারা পূর্ণাঙ্গ মাকড়সারই মত, শুধু আয়তনে ছোট। পতঙ্গের মত ইহাদের ডিম ফুটিয়া শূক বা লার্ভা বাহির হয় না। বাচ্চা মাকড়সা ছোট ছোট কীটপতঙ্গের রস খায় ও মধ্যে মধ্যে খোলস ত্যাগ করিয়া বড় হয়।

জলচর মাকড়সা (Aquatic spider)—ইহাদের আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট। জলচর হইলেও ইহাদিগকে বাহিরের বাতাস ভিতরে লইয়া গিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। জলচর মাকড়সা প্রথমে সূতা বুনিয়া তাহার ঘরের কাঠামটি তৈয়ার করে। তারপর নিজ দেহনিঃসৃত একপ্রকার আঠাল দ্রব্য ঐ সূতার উপর লাগাইয়া দেয়, ফলে ঘরের দেওয়াল ও ছাদ শক্ত কাগজের মত দৃঢ় হয়। ঘরের মুখ নীচের দিকে থাকে। প্রথমে ঘরটি জলে ভরা থাকে। মাকড়সা জলের উপরে যাইয়া পা জলের বাহিরে তুলিয়া ধরে। পা লোমে আবৃত, খানিকটা বাতাস সেই লোমে আটকাইয়া যাওয়ামাত্র মাকড়সা তাড়াতাড়ি ঘরের নীচে গিয়া পায়ে আটকান বাতাস ছাড়িয়া দেয়। বাতাস জল অপেক্ষা হালকা বলিয়া ঘরের মধ্যে উপরের দিকে যায় ও ঘরের জল বাহিরে আসে। এইরূপে ইহাদের

ঘর জলের পরিবর্ত্তে বাতাসে ভরিয়া যায়। এই বাতাসে ইহারা শ্বাসকার্য্য চালায়।

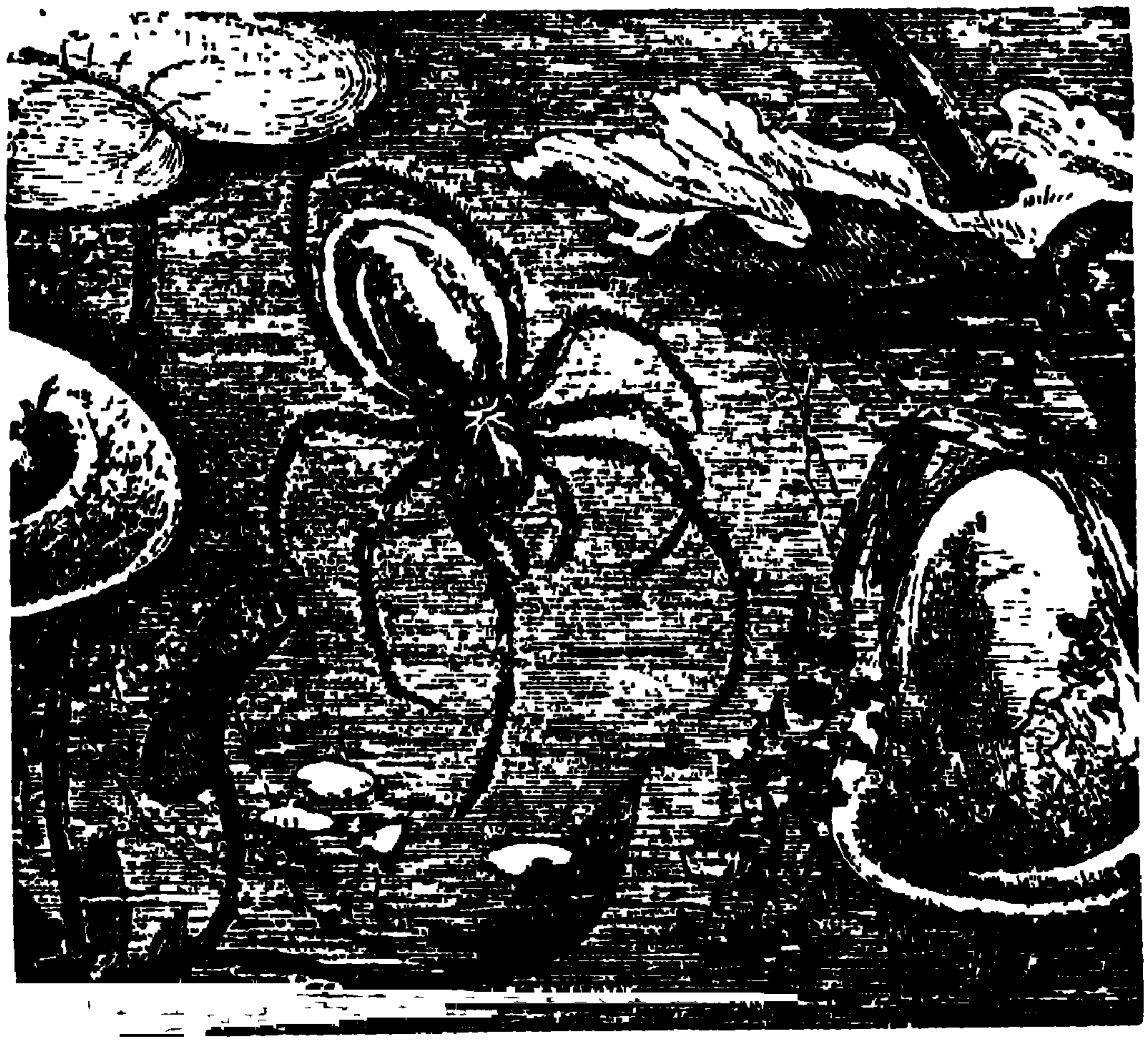

৬৩। জলের মাকড়সা

জলচর মাকড়সার খাদ্য—মাকড়সা বড় বড় মাছ পর্য্যন্ত খাইতে পারে। কাঁটা বাদ দিয়া মাংসপেশীর রস গলাধঃকরণ করে। ছোট ছোট পতঙ্গ জলে পড়িলে তাহাদিগকে ধরিয়া জলের তলায় লইয়া যায়। সমুদ্রবাসী মাকড়সা গুগ্‌লি খাইতে ভালবাসে। এমন মাকড়সাও আছে যাহারা ডাঙায় বাস করে, কিন্তু ভোঁদড়ের মত জলে গিয়া মাছ ধরিয়া আনে। মাকড়সার শরীর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমে ঢাকা; সেই লোমের ভিতর জল প্রবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য ইহাদের দেহ কখনও জলে ভিজিয়া যায় না। ইহারা জলে সুন্দর হাঁটিয়া যাইতে পারে।

পতঙ্গ ও মাকড়সার তুলনা ঃ

পতঙ্গ	মাকড়সা
১। দেহ তিন অংশে বিভক্ত—মাথা, বুক ও পেট।	১। দেহ দুই অংশে বিভক্ত—মাথা ও পেট।
২। শুঙ্গ বা অ্যানটেনা আছে।	২। শুঙ্গ বা অ্যানটেনা নাই।
৩। দুইটি পুঞ্জাক্ষি।	৩। ৮টি সরল চক্ষু।
৪। তিন জোড়া পা।	৪। চারি জোড়া পা।
৫। অনেকেরই ডানা থাকে।	৫। কাহারও ডানা নাই।
৬। কাহারও হুল থাকে।	৬। হুল থাকে না।
৭। জাল বুনিতে পারে না।	৭। জাল বুনিতে পারে।
৮। আকারে স্ত্রী-পুরুষের বেশী তফাৎ নাই।	৮। আকারে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অনেক বড়।
৯। শ্বাস-কার্য্য চলে বায়ুনালী দিয়া।	৯। শ্বাসকার্য্য চলে বায়ুনালী ও ফুসফুস বই দিয়া।
১০। রূপান্তর চারি প্রকার—ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণবয়স্ক।	১০। রূপান্তর দুই প্রকার—ডিম ও মাকড়সা।
১১। স্থলের ও জলের পতঙ্গ আছে।	১১। স্থলের ও জলের মাকড়সা আছে।
১২। কঠিন ও তরল দুই-ই খাইতে পারে।	১২। কঠিন দ্রব্য খাইতে পারে না। কেবল তরল দ্রব্য খায়।
১৩। কেহ কেহ মানবের উপকারে আসে।	১৩। কেহই মানবের উপকারে আসে না।

Questions

Describe the external features of a spider. How does it prepare its web?
Narrate the life-history of a spider (T. T. April, 1936)
How do aquatic spiders live under water and how do they respire?
Compare an insect with a spider. (T. T. April, 1938; B. T. 1942)

পঞ্চম অধ্যায়

মাছ

(The fish)

মাছের স্বরূপ (Character of fish)—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছ সর্ব্বনিম্নস্তরের প্রাণী। পাখী মাত্রেরই যেমন পালক থাকে, স্তন্যপায়ী মাত্রেরই যেমন লোম থাকে, মাছ মাত্রেরই তেমনি

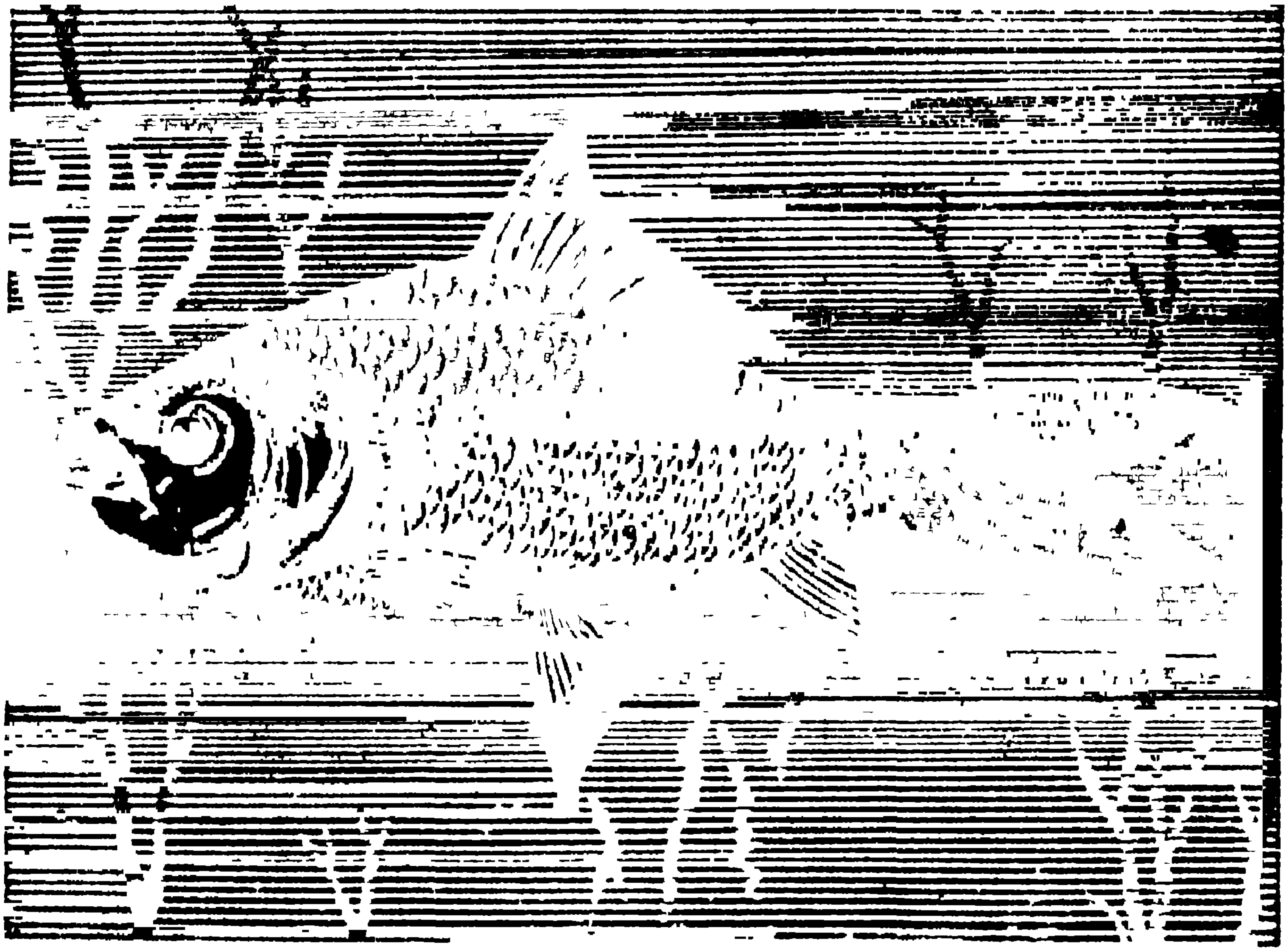

৬৪। কাতলা মাছ

জোড়া-পাখনা (paired fins) থাকে। লেজে বা পিঠের উপর পাখনা ব্যাঙাচিরও থাকে কিন্তু ব্যাঙাচি মাছ নয়। তাহা ছাড়া মাছের পাখনায় কাঁটা থাকে কিন্তু ব্যাঙাচির পাখনায় কাঁটা নাই।

মাছ সাধারণতঃ জলচর প্রাণী। ইহাদের শরীর এরূপ ভাবে গঠিত যে ইহারা অনায়াসে জলে বিচরণ করিতে পারে। ইহাদের শরীরে মাংসপেশী ও পিঠে শিরদাঁড়ায় অনেকগুলি অস্থি থাকায় জলে ইহারা সহজে চলাফেরা করিতে পারে। সাধারণতঃ জলে থাকে বলিয়া ইহাদের জল হইতে শ্বাস লইতে হয়। শ্বাস লইবার জন্য মাছ সর্ব্বদা মুখ দিয়া জল লয় ও কানকুয়া খুলিয়া তাহা বাহির করিয়া দেয়। এই কানকুয়ার নীচে চারিখানা করিয়া ফুলকা থাকে। জলে যে অক্সিজেন গ্যাস গোলা অবস্থায় থাকে, তাহা তাহারা ফুলকার লাল রক্তবহা নালী দিয়া টানিয়া লয়। এরকম ফুলকা দিয়া শ্বাসকার্য্য ব্যাঙাচিরও চলে।

উপাস্থি- ও অস্থি- বিশিষ্ট মাছ—বৈজ্ঞানিক হিসাবে মাছকে দুইভাগে ভাগ করা হয়—(১) যে সকল মাছে অস্থি বা হাড়ের বদলে একপ্রকার নরম পদার্থ থাকে, তাহাদিগকে উপাস্থি-বিশিষ্ট (cartilaginous) মাছ ; (২) আর যাহাদের অস্থি বা হাড় আছে তাহাদের অস্থি-বিশিষ্ট (bony) মাছ বলে। পুকুর বা নদীতে অর্থাৎ মিঠা জলে (fresh water) এই দ্বিতীয় প্রকার মাছ পাওয়া যায়। উপাস্থি-বিশিষ্ট মাছ প্রায়ই সামুদ্রিক (marine)। এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে উপাস্থি- ও অস্থি-বিশিষ্ট উভয় প্রকার মাছেরই বয়ঃপ্রাপ্তির আগে উপাস্থি থাকে ; পরিণত অবস্থায় উপাস্থি অস্থিতে পরিণত হয়। সমুদ্রে উপাস্থি- ও অস্থি- বিশিষ্ট উভয় প্রকার মাছই পাওয়া যায়। উপাস্থি-বিশিষ্ট মাছের উদাহরণ—হাঙ্গর, শঙ্কর প্রভৃতি।

মাছের দেহ—মাছের দেহের তিনটি ভাগ—(১) মস্তক, (২) দেহকাণ্ড, ও (৩) লেজ। ইহাদের গলা বলিয়া কিছুই নাই। মাছের শরীর কখনও কখনও শুধু চামড়ার দ্বারা ঢাকা থাকে। আবার কখনও কখনও এই চামড়ার উপর আঁশ থাকে। মাছের আঁশ নানা প্রকার।

আঁশযুক্ত মাছের আঁশের উপর এবং আঁশহীন মাছের চামড়ায় এক প্রকার হড়হড়ে পদার্থ মাখান থাকে; সেইজন্য ইহাদের শরীর পিচ্ছিল।

মাছের গোঁফ—সকল উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ হাড়ওয়ালা মাছের চোয়াল দেখা যায়। কোনও কোনও মাছের মুখের ধারে বড় বা ছোট গোঁফ থাকে, এইগুলিকে বারবেল বলে। এই বারবেল তীক্ষ্ণ স্পর্শশক্তিসম্পন্ন।

মাছের নাক—মাথার সামনে এক বা দুই জোড়া নাকের ছিদ্র থাকে। আমাদের নাকের দুইটি কাজ—(১) ঘ্রাণ লওয়া, (২) শ্বাসকার্য্য। মাছেরা ঘ্রাণই লইতে পারে, কিন্তু শ্বাসকার্য্যে তাহাদের নাকের দরকার হয় না। ফুলকা দিয়া শ্বাসকার্য্য চালায়।

মাছের চোখ—সাধারণতঃ মাছের চোখে পাতা নাই এবং ইহা চোখ খুলিয়াই ঘুমায়। এই ঘুমান চলে কাহারও ভাসমান অবস্থায়, কাহারও জলের তলায় সোজাভাবে বা পাশ ভাবে শুইয়া।

মাছের শ্রবণেন্দ্রিয়—বাহির হইতে ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় না, কিন্তু মাছেরা বেশ শুনিতে পায়।

মাছের পার্শ্বরেখা—কানকুয়ার পিছন হইতে দেহের উভয় পার্শ্বে দুই বা ততোধিক রেখা দেখা যায়। ইহাদিগকে **পার্শ্বরেখা** (lateral line) বলে। এই রেখার নীচে এক প্রকার বিশিষ্ট গঠনাদির সমাবেশ আছে। এই বিশিষ্ট গঠন থাকার জন্য মাছ জলের মধ্যে স্পন্দন, কম্পন ইত্যাদি বুঝিতে পারে।

মাছ জলপান করে কিনা—মাছ জলে বাস করে, কিন্তু কখনও জল পান করে না। ইহা একটু অদ্ভুত হইলেও সত্য। মুখ দিয়া যে জল খায় তাহা তাহাদের আমাশয়ে যায় না, তাহা তাহারা শ্বাসকার্য্যের জন্য ফুলকার ভিতর হইয়া কানকুয়া দিয়া বাহির করিয়া দেয়। ইহারা জলে বাস করে, সেজন্য সর্ব্বশরীর দিয়া জল শোষণ করিয়া তৃষ্ণা মিটায়।

মাছের বাসা নির্ম্মাণ (Nest of fishes)—আমাদের দেশেও কোন কোন মাছ জলের মধ্যে গাছপালার টুকরা দিয়া সুন্দর বাসা নির্ম্মাণ করে। এই বাসায় সাধারণতঃ তাহারা ডিম রাখে। বাসার একটি মাত্র মুখ থাকে। শিঙি মাছের এই প্রকার বাসা দেখিতে পাওয়া যায়।

রুই মাছ

বহিরাকৃতি (External characters)—ইহাদের শরীরের মধ্যভাগ চওড়া এবং মুখ ও লেজের দিক্ অপেক্ষাকৃত সরু ও পার্শ্বদিকে চাপা। শরীর বড় বড় আঁশ দিয়া আগাগোড়া ঢাকা থাকে। আঁশ ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে ইহাতে চতুষ্কোণ একটির বাহিরে আর একটি এই প্রকার বহু দাগ আছে। এই প্রকার আঁশকে **সাইক্লয়ড** (cycloid) আঁশ বলা হয়। মাথার সামনে ইহাদের দুইটি নাকের ছিদ্র আছে। নাক ইহাদের শ্বাসকার্য্যে কোনই সাহায্য করে না, আঘ্রাণের জন্য দরকার হয়। মুখগহ্বর বেশ বড়; ইহাদের এক জোড়া বেশ বড় চোখ আছে, কিন্তু পাতা নাই। কাজেই ইহাদের চোখ খুলিয়া ঘুমাইতে হয়। কোন মাছের কান শরীরের বাহির হইতে দেখা যায় না, কিন্তু তাহার মাথার মধ্যে লুকান থাকে।

মাছমাত্রই **ফুলকা** (gill) দ্বারা শ্বাসকার্য্য চালায়। রুই মাছের ফুলকা বেশ বড় ঝালরের মত ঝুলিতে থাকে। ফুলকার উপর একটি করিয়া শরীরের দুই পার্শ্বে দুইটি চাপা থাকে। এই চাপার নাম **কানকুয়া** (operculum)। কানকুয়া চারিটি অস্থির দ্বারা গঠিত।

পাখনা (Fin)—ইহাদের পিঠে একটি পাখনা থাকে। কানকুয়ার দুই পার্শ্বে ও দেহের মধ্যভাগের দুই পার্শ্বে এক জোড়া করিয়া পাখনা থাকে। ইহারাই মানুষের হাত-পায়ের তুল্য।

পায়ুর পশ্চাতে আর একটি পাখনা থাকে। সকলের বড় পাখনা লেজে থাকে। যদি মাছকে নৌকার সহিত তুলনা করা যায় ত ইহাদের লেজের পাখনাকে হালের সহিত ও জোড়া-পাখনাগুলিকে দাঁড়ের সহিত তুলনা করিতে হয়। হাল যেরূপ দিক্ নির্ণয় করে, লেজের পাখনাও সেরূপ দিক্ নির্ণয় করে। জোড়া-পাখনা দাঁড়ের ন্যায় উপর-নীচে নড়ে। নৌকা যেরূপ অগ্রসর হয়, সেইরূপ জোড়া-পাখনা জল টানাতে মাছের শরীরও সম্মুখে অগ্রসর হয়।

রুই মাছের পাখনায় কাঁটা থাকে এবং সেই কাঁটা বেশ শক্ত।

রক্তসঞ্চালন যন্ত্র (Circulatory system)—দুই ফুলকার মাঝে একটু নীচে ইহাদের হৃদয়। এই যন্ত্রের চারি ভাগ। তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান ভাগ বা প্রকোষ্ঠ—**অলিন্দ** বা অরিক্‌ল (auricle) ও **নিলয়** বা ভেণ্টি ক্‌ল (ventricle)। ইহাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ রক্ত থাকে না। হৃদয় হইতে দূষিত রক্ত **ধমনী** (artery) দিয়া ফুলকায় উপনীত হয় এবং তথায় জলে যে অক্সিজেন গোলা থাকে তাহার দ্বারা শুদ্ধীকৃত হইয়া পুনরায় সর্ব্বাঙ্গে চালিত হয়। আবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দূষিত রক্ত শুদ্ধীকরণের জন্য রক্তবাহী **শিরা** (vain) দিয়া হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। এই শুদ্ধীকরণ-ক্রিয়া ফুলকার পথে প্রবিষ্ট তাজা অক্সিজেনের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। হৃদযন্ত্র অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। এই সঙ্কোচ ও প্রসারের ফলেই রক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যাইতেছে ও ফিরিয়া আসিতেছে। শুধু যাইতেছে আসিতেছে নয়, একই পথে একই দিকে সর্ব্বদা চলিতেছে। হৃদয়ের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে ভাল্‌ভ বা **কপাটিকা** (valve) লাগান আছে। এইরূপ কপাটিকা একদিক্ হইতে খোলে। বিপরীত দিক্ হইতে যতই চাপ পড়ুক না কেন, খুলিবে না, বরং আরও জোরে বন্ধ হইয়া যাইবে।

ধমনীর ও শিরার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম অনেক রক্তবহা নালী আছে। ইহাদের নাম **জালক** (capillaries)। ইহাদের দ্বারা ধমনী ও শিরা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। হৃদয় হইতে চালিত হইয়া রক্ত ধমনীর পথে জালকের মধ্যে যায় ও তথা হইতে শিরার পথে হৃদয়ে ফিরিয়া আসে।

রক্ত (Blood)—মাছের রক্ত শীতল। এই রক্তে তরলাংশ অর্থাৎ **প্লাসমা** (plasma) ও দুই প্রকার—**লোহিত** ও **শ্বেত—রক্তকণিকা** আছে। শ্বেত কণিকার আকার অনবরত বদলাইতেছে। লোহিত কণিকার আকার বদলায় না, তাহা গোল, মধ্যভাগ মোটা ও নিউক্লিয়স যুক্ত। শ্বেত কণিকাতেও নিউক্লিয়স আছে।

শ্বাসতন্ত্র (Respiratory system)—রুইমাছের শ্বাসকার্য্য ফুলকার সাহায্যে সম্পাদিত হয়। জল হইতে ইহারা অক্সিজেন লয়।

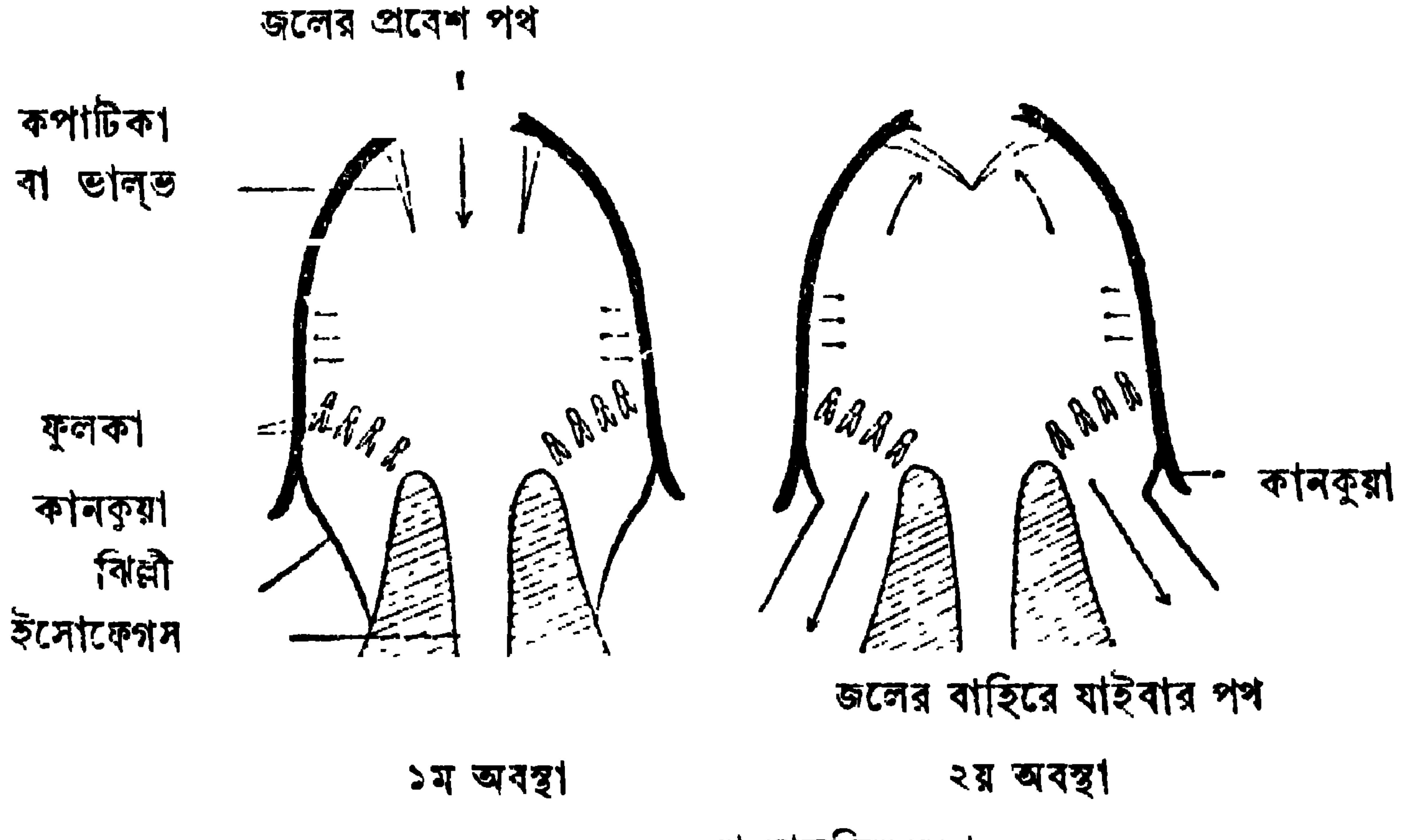

৬৫। মৎস্যের শ্বাসপদ্ধতির নক্সা

মুখবিবরের তলদেশ নীচু করিলেই গহ্বর বড় হয়। ফুলকা দুটি এই সময়ে কানকুয়া ও তাহার ভিতরের ঝিল্লী দিয়া চাপা থাকে। মুখবিবরে জল

প্রবেশ করিলে মাছ তখন মুখের সম্মুখের কপাটিকা ও মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং মুখবিবরের তলদেশ উঁচু করে। ইহাতে গহ্বরের আয়তন ছোট হয় ও গহ্বরস্থ জলের উপর চাপ পড়ে। চাপের ফলে খানিকটা জল ফুলকার মধ্যে চলিয়া যায়। মাছের কানকো তুলিলেই দেখিবে যে ভিতরে একটি বাঁকা হাড়ের উপর সাজান এক সারি চিরুণীর দাঁড়ার মত লাল টুকটুকে ফুলকা দেখা যায়। জলের মধ্যে যে অক্সিজেন গোলা থাকে তাহা এই চিরুণীর দাঁড়ায় যে রক্তবহা নালী থাকে তাহার পাতলা পর্দ্দা ভেদ করিয়া রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। তারপর মাছ তাহার মুখবিবর আরও ছোট করে। ইহাতে জলের উপর আরও চাপ পড়ে। সেই চাপের ফলে কানকুয়ার ঝিল্লী ও কানকুয়া খুলিয়া জল বাহির হইয়া যায়। যদি জোর করিয়া কানকুয়া খোলা রাখিয়া মাছকে জলে রাখা যায় তবে দেখা যায় যে ইহা শ্বাসকার্য্য বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়।

স্ত্রী-পুরুষ ভেদ—মৎস্যজাতির স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। একটি রুই মাছের দশ লক্ষ অবধি ডিম হইতে পারে। রুই মাছ নিজেরাই অনেক ডিম খাইয়া ফেলে।

অস্থি-তন্ত্র (Skeletal system)—রুই মাছের আঁশ ও পাখনার কাঁটার কথা বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর সব অস্থি দেহের মধ্যে থাকে। তোমরা রুই মাছের মাথার শক্ত খুলিটা দেখিয়াছ। মেরুদণ্ড এক সারি কশেরুকার (vertebræ) দ্বারা গঠিত। তাহা ছাড়া রুইএর বক্ষাস্থি ও জঙ্ঘাস্থি আছে। ইহাদের কাঁটাগুলি বেশ বড়।

পৌষ্টিক নালী (Alimentary canal)—রুই মাছের দাঁত নাই সত্য, তবে মুখবিবরের পরে যে **ফ্যারিংক্স্** আছে তাহার তলদেশে একপ্রকার দাঁতের মত থাকে। এই **ফ্যারিংক্স্ দাঁত** দিয়াই ইহারা খাদ্য চিবাইয়া নরম করে। মুখবিবর বেশ বড়। তাহাতে ছোট

একটি জিহ্বা আছে। ফ্যারিংক্সের পরে **ইসোফেগস** নামক নাতিদীর্ঘ এক নালী। তাহার পরেই **আমাশয়** (stomach)—অপ্রশস্ত লম্বা নলের মত। আমাশয়ের পরে **অন্ত্র**। অন্ত্র বেশ লম্বা নলের মত ও নানারকম পাক খাইয়া গিয়া **মল-নালীতে** (rectum) পড়িয়াছে। মলনালী **পায়ুতে** শেষ হয়।

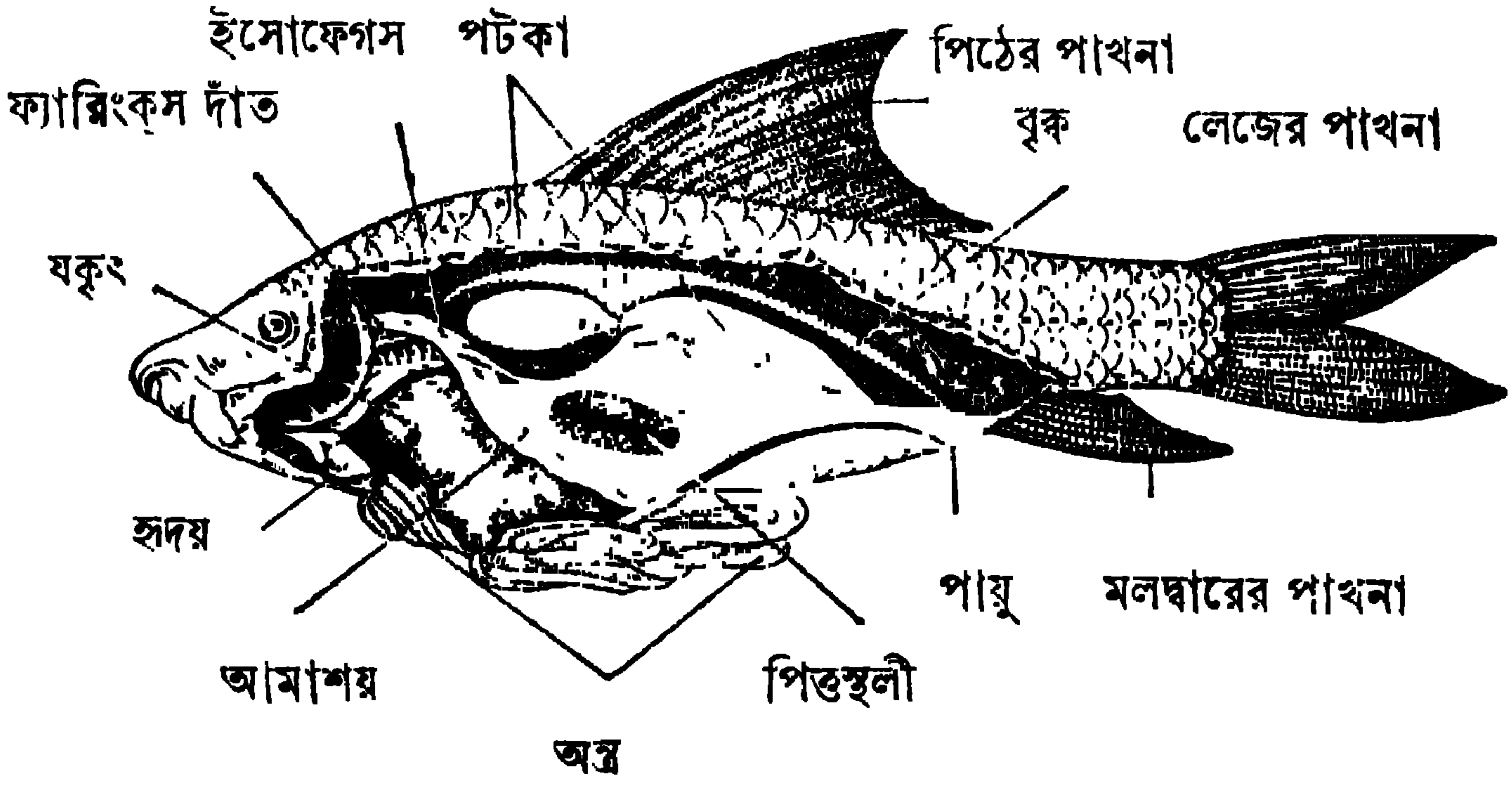

৬৬। রুই মাছের দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রগঠনাদি

যকৃৎ বা মেটুলি পাকস্থলীকে সামনে জড়াইয়া থাকে। যকৃতের দক্ষিণ অংশ লম্বমান, বাম অংশ খুব ছোট। **পিত্তস্থলী** (gall bladder) প্রকাণ্ড ও গদাকৃতি। মাছ কুটিবার সময় ইহা ফেলিয়া দিতে হয়, নইলে সমস্ত মাছটা তিক্ত হইয়া যায়। পিত্তস্থলীর সহিত অন্ত্র ও যকৃতের যোগ আছে; যকৃৎ ও পিত্তস্থলীর কাজ খাদ্য-পচন-ক্রিয়া সম্পর্কীয়। **অগ্ন্যাশয়** (pancreas) নামক উদরের এক অতি আবশ্যক যন্ত্র যাহা আমাদের পেটে আছে, তাহা রুই মাছের পেটে নির্দ্দিষ্টভাবে নাই। অগ্ন্যাশয় হজমের বিশেষ সাহায্য করে।

পটকা (Air-bladder)—রুই মাছের পটকা তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ। ইহার দুইটি কক্ষ। উভয় কক্ষ ফাঁপা ও বাতাস ভরা।

রেচনতন্ত্র (Excretory system)—শিরদাঁড়ার দুইপার্শ্বে একজোড়া **বৃক্ক** (kidney) আছে। ইহার আকৃতি বরবটির শুটির ন্যায়। বৃক্ক হইতে দুইটি নল বাহির হইয়া সম্মিলিত অবস্থায় দেহের বাহিরে পায়ুর অগ্রে যে ছিদ্র আছে তাহার সহিত যুক্ত হয়।

নানাপ্রকার মাছ

মাছের প্রকার-ভেদ (Different kinds of fish)—মাছ নানাপ্রকার,—সমুদ্রের ও নদীপুকুরের, অর্থাৎ লোনা জলের ও মিঠা জলের। লোনা জলের মাছ মিঠা জলে থাকিতে পারে না।

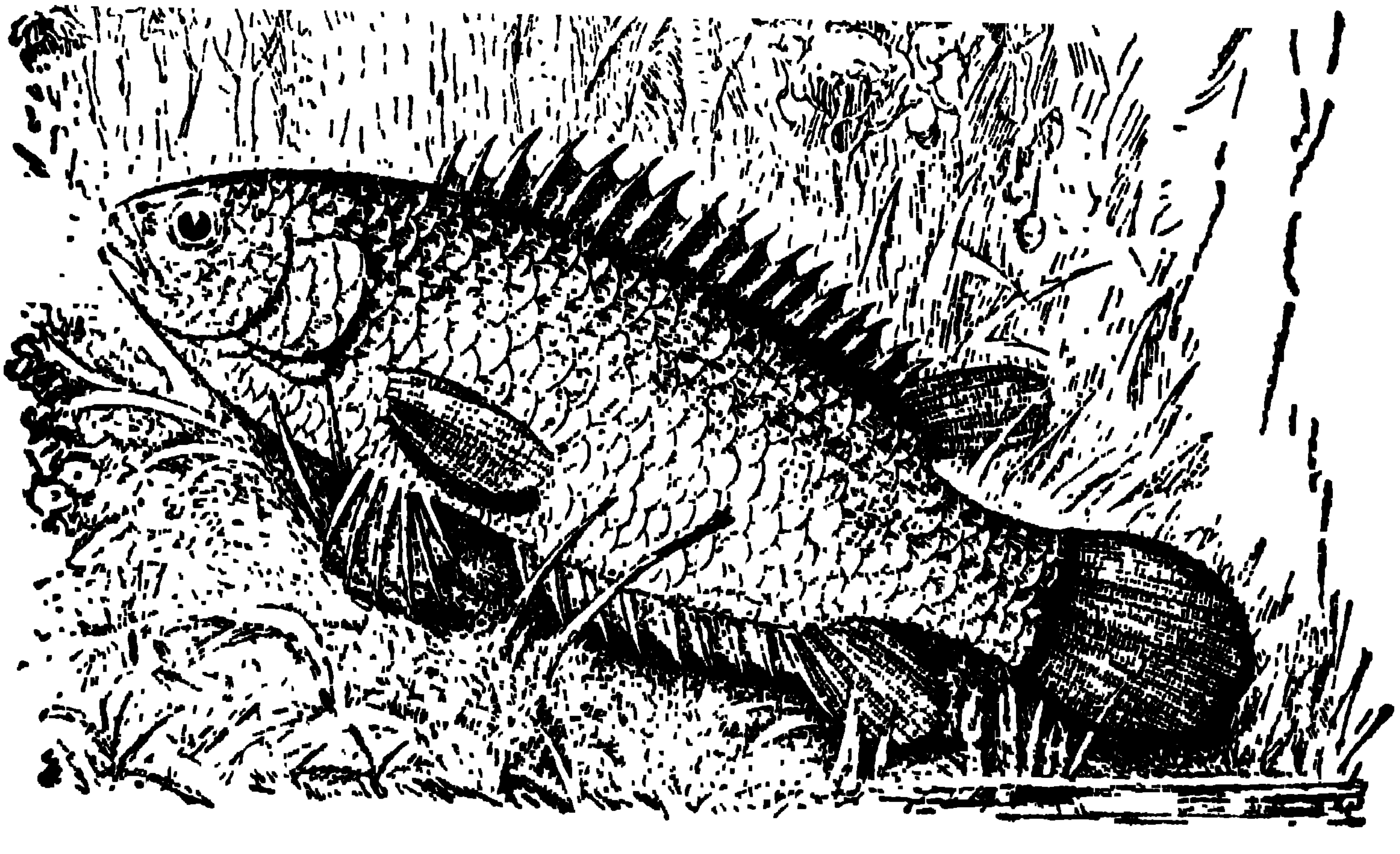

৬৭। কই মাছ

মিঠা জলের মাছ লোনা জলে বাঁচে না। মাছের বহিরাকৃতিও নানা প্রকার। রুই মাছের গঠনকেই মাছের সাধারণ গঠন বলা হয়।

সাপের মত বাইন, গোলাকার পায়রা-চাঁদা, পঙ্কবাসী শিঙি-মাগুর-গুলে, ইত্যাদির আকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার।

মাছের রংও নানাপ্রকার; যেমন কাল, লাল, রূপালী বা সোনালী।

নানাপ্রকার মাছের শ্বাসপ্রণালী (Accessary respiratory apparatus of certain fishes)—অস্থি-বিশিষ্ট মাছ সাধারণতঃ রুই মাছের মত ফুলকার দ্বারা শ্বাসকার্য্য চালায়

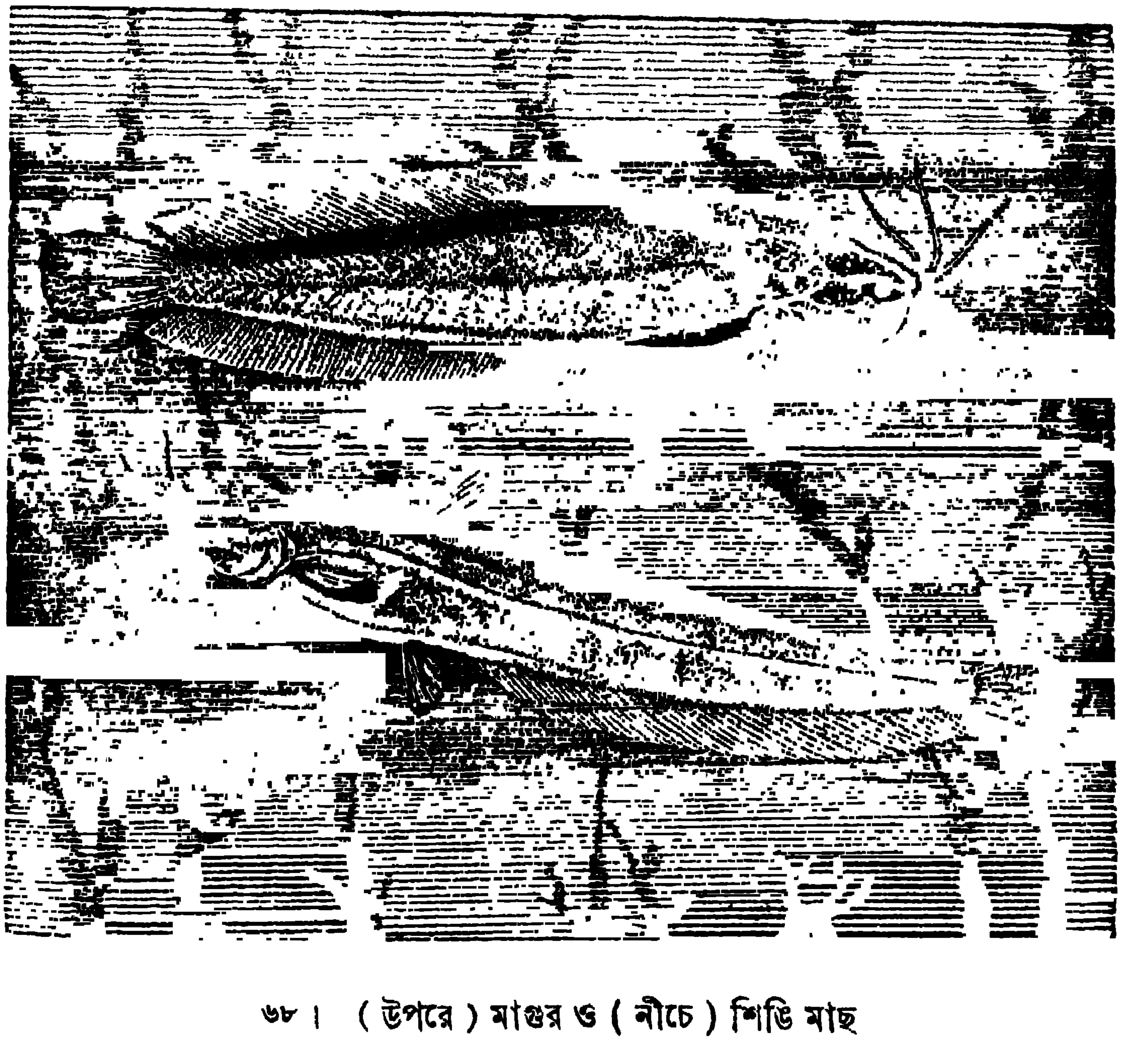

৬৮। (উপরে) মাগুর ও (নীচে) শিঙি মাছ

এবং এই ফুলকা কানকুয়ার দ্বারা চাপা থাকে। কখনও কখনও ফুলকা থাকা সত্ত্বেও হাড়ওয়ালা মাছ নানাবিধ অতিরিক্ত গঠনাদির দ্বারা জলের বাহিরের বাতাস শ্বাসকার্য্যে ব্যবহার করিতে পারে। কই,

মাগুর, শিঙি প্রভৃতি এই রকমের মাছ। ইহাদের ফুলকার দ্বারা অংশতঃ শ্বাসকার্য্য চলে। যে সব অঙ্গদ্বারা এই সকল মাছ জলের বাহিরের বাতাস লয় তাহা প্রায়ই ফুলকার পরে থাকে। ইহাদের কয়েকটির ছবি দেওয়া গেল। এই সকল মাছকে যদি জলের নীচে এরূপভাবে ডুবাইয়া রাখা যায় যে তাহারা কখনই জলের উপরে আসিতে পারিবে না, তাহা হইলে দেখা যায় যে তাহাদের শ্বাস বন্ধ হইয়া কিছু সময়ের মধ্যে মারা পড়ে। জলে যে অক্সিজেন গ্যাস গোলা থাকে তাহা তাহাদের শ্বাস-কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জলের বাহিরের বাতাসও চাই। মানুষ যেমন সাঁতার না জানার দরুণ বা সাঁতার দিতে না পারার জন্য শ্বাসবন্ধ হইয়া 'জলডুবি' হয়, এই সকল মাছও 'জলডুবি' হইতে পারে।

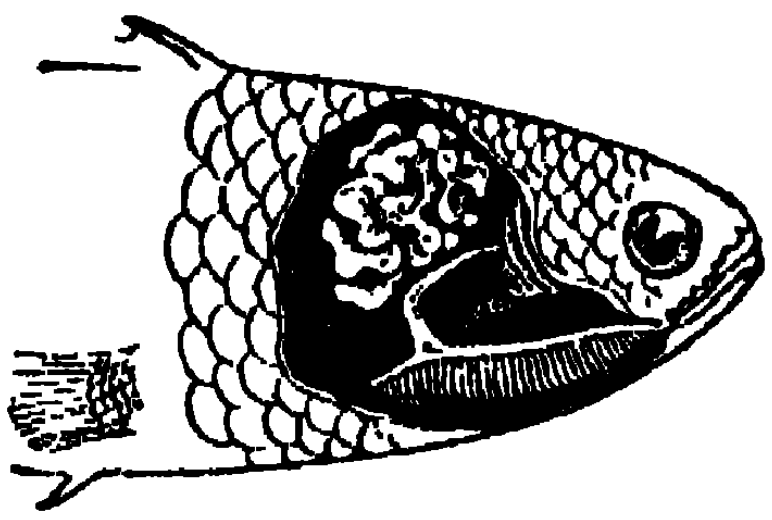

৬৯। কই মাছের ফুলের মত অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র

মাছের মেরুদণ্ড ও লেজ—(Vetebral column and tail of a fish)—মাছের পিঠের দিকে মেরুদণ্ড থাকে, সেইজন্য পিঠের দিক্ ভারী। জীবিতাবস্থায় যখন ইহারা জলে বিচরণ করে তখন পিঠের দিক্ উপরে থাকে। মরিয়া গেলে পিঠের দিক্ উল্টাইয়া পড়ে। লেজের শেষ কশেরুকা (vertebra) হইতে দুইদিকে পাখনা বাহির হয়। এইরূপ বাহ্যতঃ সমদ্বিখণ্ডিত লেজকে **হোমোসারকল** (homocercal) **লেজ** কহে।

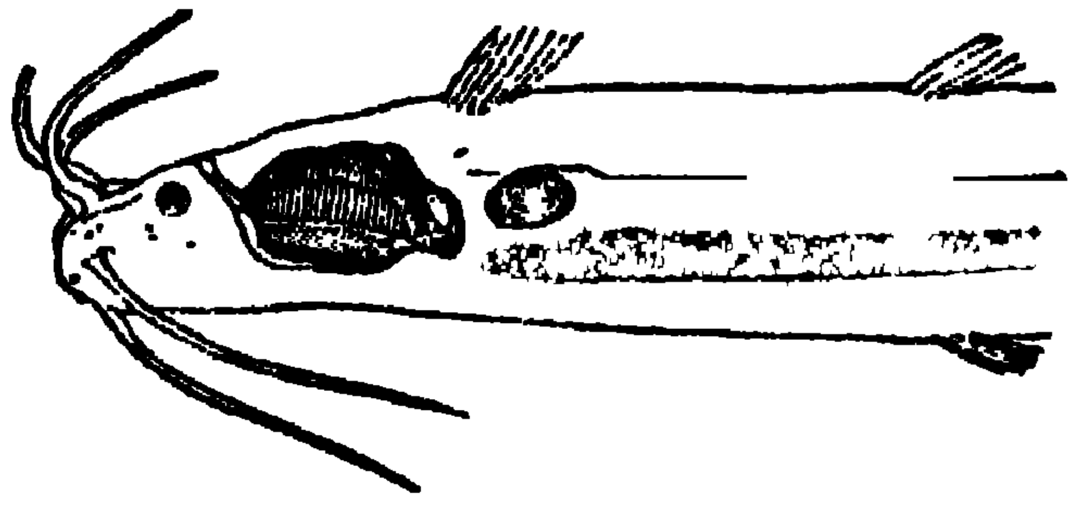

৭০। শিঙি মাছের দেহপার্শ্বে পটকার মত অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র

মাছের পটকার আবশ্যকতা (Use of swimming-bladder)—ইহার সাহায্যে মাছ জলে ভাসিতে পারে। পটকায় গ্যাস ভরাতে দেহ হালকা হয়

কাজেই ভাসার সুবিধা হয় ও সঙ্কোচনের ফলে নীচে ডুবিয়া যায়। উপাস্থি-বিশিষ্ট মাছের পটকা থাকে না।

মাছের খাদ্য (Food of fishes)—মাছের মধ্যে একেবারে তৃণভোজী বা একেবারে মাংসভোজী নাই বলিলেই হয়। যাহারা বেশী শেওলা বা জলজ উদ্ভিদ্ খায় তাহাদের তৃণভোজী ও যাহারা বেশী প্রাণী খায় তাহাদেরে মাংসভোজী বলে। কতকগুলি মাছ নানাপ্রকার পচা জিনিস, এমন

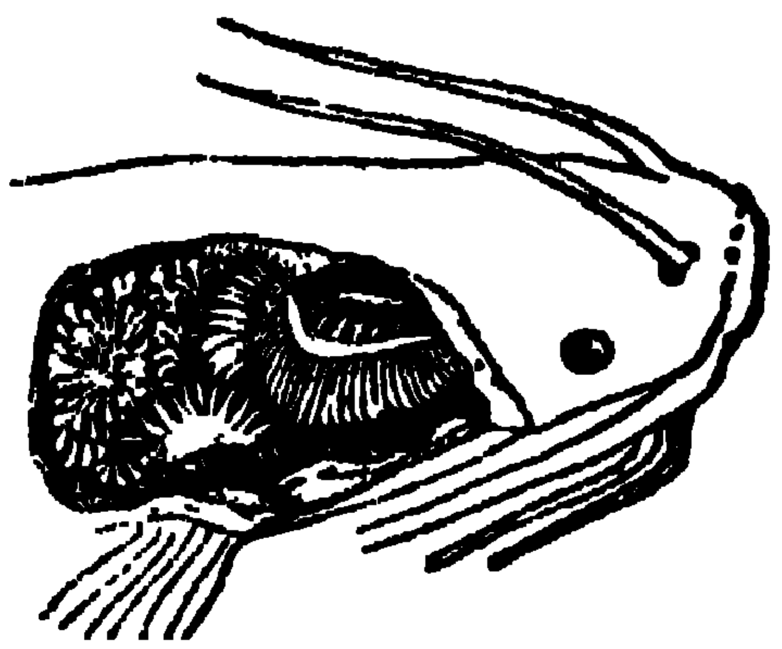

৭১। মাগুর মাছে ফুলকার পিছনে ফুলের মত অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র

৭২। (উপরে) বোয়াল ও (নীচে) চিতল মাছ

কি বিষ্ঠা পর্য্যন্ত খায়। চিতল, বোয়াল প্রভৃতি মাছ প্রায়ই অন্য মাছ

খাইয়া ফেলে। যে পুকুরে বা নদীতে চিতল বা বোয়াল থাকে তাহাতে শীঘ্রই অন্য মাছ কমিয়া যায়। পূর্ণবয়স্ক পোনামাছ তৃণভোজী এবং চিতল, বোয়াল, কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি মাংসভোজী। তবে উভয় পর্য্যায়ভুক্ত মাছের শিশু-অবস্থায় সকলেই প্রায় মাংসভোজী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য গবেষণাগার হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে মিঠাজলের মাছ যে কোন জলজ উদ্ভিদ্ই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঈষৎ পচা ও নরম অবস্থায় (semi rotten condition)। সাধারণ লোকের ধারণা যে তৃণভোজী মাছ মাত্রেই খুব বেশী শৈবাল (শেওলা) খায়। কিন্তু সাধারণ পুকুরে অন্য জলজ গাছের তুলনায় শৈবাল খুব কম থাকে ; তাহা খাইয়া পূর্ণবয়স্ক পোনা মাছ যাহাদের সংখ্যা প্রায়ই খুব বেশী, তাহারা বাঁচিতেই পারে না।

আবাদ যেমন জমির উর্ব্বরতার উপর নির্ভর করে, মাছ-চাষও জলের মধ্যে খাদ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। নূতন কাটা পুকুরে নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ্ ও প্রাণী (অর্থাৎ শৈবাল, এক কোষ প্রাণী, ক্ষুদ্র চিংড়ি ও পতঙ্গ) বেশী পরিমাণে জন্মে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ্ জন্মাইতে অনেক সময় লাগে। সে কারণ নূতন পুকুরে বড় মাছ বাড়ে না, কিন্তু মৎস্য-শিশু নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী পরিমাণে বেশী খাইয়া খুব দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

পোনার মধ্যে কাতলা জলের উপর দিকে যে সকল ক্ষুদ্র চিংড়ি থাকে, তাহাই খাইয়া শীঘ্র বাড়ে ; চিংড়ি না থাকিলে বাড়ে না। মৃগেল ও কালবোস মাছ পুকুরের তলায় যে সব উদ্ভিদ্ অর্দ্ধ-পচা অবস্থায় থাকে, তাহার সহিত তলার মাটি বা বালি খায়। মাটি বা বালির মধ্যে যে সব জান্তব পদার্থ থাকে তাহার বা লবণ জাতীয় দ্রব্যের জন্য উহারা মাটি খাইয়া থাকে ; রুই মাছ সাধারণতঃ কাতলা ও কালবোস মাছের

মাঝামাঝি খাদ্য খায়। অর্থাৎ তাহাদের পেট কাতলার মত মাটি বা বালি শূন্য নয় বা কালবোস মাছের মত বালিতে ভরাও নয়।

মাছদ্বারা মানবের উপকার (Uses of fish)—মাছ আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদেয় খাদ্য। রুই, কাতলা হইতে আরম্ভ করিয়া পুঁটি, মৌরলা প্রভৃতি কত ছোট মাছ যে আমরা খাই তাহার ইয়ত্তা নাই।

মাছ ম্যালেরিয়ার মশা এনোফিলিসের লাভা বা শূক খাইয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রায় প্রত্যেক অস্থি-বিশিষ্ট মাছ ছোট বাচ্চাবস্থায় এই শূক খায়, কিন্তু পূর্ণাবস্থায় তেচোকো, খলিসা, ভেদা, কই ইত্যাদি মাছেরা মশার শূক খাইয়া থাকে।

কড মাছের তৈল ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মাছ হইতে শিরিষ, চর্ম্ম, তৈল, চাবুক, সার এবং আঁশ হইতে নানাপ্রকার খেলনা তৈয়ারী হয়। মাছের আঁশ হইতে কৃত্রিম মুক্তা যাহা বোম্বাই মুক্তা বলিয়া বিক্রয় হয় তাহাও প্রস্তুত হয়।

মাছের চাষ (Fishery)—মিঠাজলের মাছের চাষের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল দুইটি—(১) জনন ও (২) পালন। নদীর তীরের নিকটস্থ বিস্তৃত নীচু জমিতে নূতন বৃষ্টির জল অগভীর অবস্থায় জমিয়া যখন নদীর জলে আসিয়া পড়ে তখন পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীপুরুষ পোনা মাছ নদী হইতে ঐ বৃষ্টিজলে যায় ও পরিশেষে উহাতে ডিম ছাড়ে। এই সকল ডিম হইতে বাচ্চা ফুটিয়া বদ্ধজল হইতে ক্রমশঃ নদীর স্রোতের সহিত নামিয়া আসে ও জেলেরা ছাঁকা দিয়া সেই সকল বাচ্চা ধরে ও কাল হাঁড়িতে জলসমেত রাখিয়া বিক্রয় করে। এই পোনার বাচ্চা লোকে পোনার ডিম বলিয়া কিনিয়া নিজ নিজ পুকুরে ফেলে। পোনা-বাচ্চা দূরে লইয়া যাইতে বা অনেকক্ষণ হাঁড়িতে রাখিতে হইলে, জেলেরা হাত দিয়া হাঁড়ির জলের উপর চাপড়

মারিতে থাকে, যাহাতে বায়ু বা অক্সিজেন গ্যাস জলে মিশ্রিত হয়। ইহাতে মৎস্য-শিশুর শ্বাসকার্য্যে সুবিধা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের মৎস্য-গবেষণাগার হইতে শ্বাসকার্য্যের সুবিধার জন্য হাত চাপড়াইয়া বায়ু দেওয়া অপেক্ষা আর এক সুবিধাজনক ব্যবস্থার আবিষ্কার করা হইয়াছে। মটর গাড়ীর চাকার বা বাইসাইকেল গাড়ীর চাকার ভিতরের টিউবে হাত-পাম্প দিয়া বাতাস পুরিয়া তাহাতে একটি ছোট রবারের নল লাগাইয়া সেই রবারের নলের মুখে pinch cock লাগাইয়া, সেই pinch cock একটু খুলিলে অতি মন্থরগতিতে হাওয়া বাহির হইবে। এখন জলের মধ্যে নলের মুখ ডুবাইয়া ধরিলে বুড়বুড়ি কাটিতে থাকিবে। এইভাবে বায়ু জলে মিশ্রিত করা, হাত চাপড়ানর মত শ্রমসাধ্য নয় এবং সর্ব্বসময়ে অর্থাৎ হাঁটিবার সময়েও বায়ু দেওয়া যায়। তাহা ছাড়া চাপড়ের দরুণ কিছু কিছু ছোট বাচ্চা মাছ মারা পড়ে, ইহাতে সে ভয়ও নাই। নৌকা করিয়া অথবা গরুর গাড়ীযোগে মাছ বা বাচ্চা আনিবার সময়েও ইহা ব্যবহার করা চলে। এমন কি জিওল মাছ রাখিতেও ইহার দ্বারা হাওয়া দিলে মাছ বেশ তাজা থাকে ও প্রত্যহ জল পাল্টাইবার আবশ্যক হয় না। ইহাতে খরচও অতি সামান্য।

পোনা মাছ সাধারণ পুষ্করিণীতে জন্মে না। ইহার কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞানের গবেষণা বিভাগ হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বৃষ্টি পড়িবার সময় ইহা বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্যাস বেশী লইয়া পড়ে। সেই কারণে নূতন বৃষ্টির জলে অক্সিজেন গ্যাস বেশী থাকে। এই বেশী অক্সিজেন গ্যাস সমেত নূতন বৃষ্টিজলই পোনা বা অন্যান্য মিঠাজলের মাছ জননের একমাত্র সহায়ক। সাধারণ পুষ্করিণীতে বৃষ্টির জল পড়িলেও তাহার বেশীর ভাগই পুরাতন জলে পূর্ণ থাকে। সেজন্য এরূপ

পুষ্করিণীতে অক্সিজেন গ্যাস পরিমাণমত না থাকাতে জননক্রিয়া চলে না। বৃষ্টির জল আবার গভীর অবস্থায় জমিলেও চলিবে না। ইহা অগভীর এবং দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অনেকটা স্থান অধিকার করিলে তবে জননের সুবিধা হয়। মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার বাঁধে মাছেরা ডিম্ব প্রসব করে। এই সকল স্থানে উঁচু ও নীচু জমি পাশাপাশি থাকে। উঁচু জমির নিকট· নীচু জমিতে পুকুর থাকে। এই পুকুর সংলগ্ন নীচু জমিতে বাঁধ দিয়া (মাটির দেওয়াল দিয়া) তিন দিক ঘেরিয়া দেওয়া হয় ও চতুর্থদিকে উঁচু জমি থাকাতে জল গড়াইয়া বাঁধে পড়ে। চট্টগ্রামে আবার উঁচু জমিতে মাটির দেওয়াল দিয়া কয়েক দিনের বৃষ্টির জল ধরা হয় ও একদিন, যখন বৃষ্টি পড়ে সেই সময়, মাটির দেওয়াল খানিকটা কাটিয়া প্রবল বেগে জল বাঁধের মধ্যে ফেলা হয়। ইহাতে মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের মত প্রাকৃতিক প্রবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয় না। বাঁধের অপরদিকে জল বাহির হইবার একটা পথ থাকে। বৃষ্টির জল বাঁধে পড়িলে পুকুরের পুরাতন জল ও বৃষ্টিজল মিশ্রিত অবস্থায় বাহির হইবার পথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। প্রায় সব জল বাহির হইয়া গেলে যখন কেবল নূতন বৃষ্টির জল বাঁধে থাকে সেই সময় জল বাহির হইবার পথটা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পুকুর-সংলগ্ন নূতন অগভীর বৃষ্টির জল পাওয়াতে মাছেরা ডিম্ব প্রসব করে। পোনা মাছের ডিম জলে পড়িলে ডুবিয়া যায়। কই, খলিসার ডিম জলের উপর ভাসিতে থাকে। সদ্যোজাত পোনার ডিম আকারে সরিষার মত। জল পাইয়া ইহারা ফুলিয়া মটরদানার মত আকার পায়। পরে পনের ষোল ঘণ্টা মধ্যে ডিমের খোলা ফাটাইয়া লম্বা অবস্থায় মাছের বাচ্চা বাহির হয়। প্রথমটা এই বাচ্চার মুখ থাকে না। পরে মুখ খুলিলে তাহারা এককোষ শৈবাল ও এক কোষ প্রাণী খায়। ইহার পর অতি ক্ষুদ্র চিংড়ি এবং শেষে বহুকোষ শৈবাল ও নানাপ্রকার জলজ উদ্ভিদ্ আধপচা অবস্থায় খায়! নানা প্রকার

কৃত্রিম খাদ্য অর্থাৎ আটা, ময়দা, ছাতু, বেসন প্রভৃতি খাদ্যরূপে পুকুরে বা নদীতে একেবারে চলিতে পারে না। তাহার কারণ এসব খাদ্যের অবশিষ্টাংশ পচিয়া জল অপরিষ্কার হইবেই। স্বাভাবিক অবস্থায় জান্তব বস্তু ছাড়া আর কোনও জিনিষই মাছের খাদ্য হিসাবে চলিবে না। এই জান্তব দ্রব্যাদি গামলায় বর্দ্ধিত করিয়া মধ্যে মধ্যে বীজ হিসাবে পুকুরে ফেলিতে হইবে। তাহা হইতে মাছ তাহার খাদ্য অংশতঃ গ্রহণ করিবে এবং বাকি অংশ জান্তব বলিয়া আরও বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে তাহা ব্যবহার করা চলিবে।

Questions

1. Name the special characteristic by which a fish can be identified from the rest of the vertebrates.
2. Write what you know about the general characteristics of fish. (C. U. 1940)
3. Draw a diagram of the alimentary canal of a fish and label its various parts.
4. Draw a diagram of the respiratory system of a fish and explain its mode.
5. What do you know of accessory respiratory apparatus of certain fishes?

ষষ্ঠ অধ্যায়

উভচর

(Amphibia)

উভচরের স্থান ও বিশিষ্টতা (Position of Amphibia and their peculiarity)—মাছের ঠিক উপরকার মেরুদণ্ডী হইল উভচর শ্রেণীর প্রাণী। সাধারণতঃ মাছ ফুলকার দ্বারা শ্বাসকার্য্য সম্পন্ন করে। কয়েকটি মাছের অবশ্য ফুলকা ও ফুসফুস দুইই থাকে, কিন্তু এ সব মাছের অন্যান্য অবয়ব সাধারণ মাছের ন্যায়। যেমন, তাঁহাদের জোড়া পাখনা কিংবা দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃদয় থাকে। মাছমাত্রই

জলে থাকে, সেজন্য সকল মাছের ফুলকা থাকে। কয়েকটি মাছের ফুলকা থাকা সত্বেও অন্যান্য অতিরিক্ত যন্ত্র থাকে যাহা দ্বারা তাহারা জলের বাহিরের বাতাস শ্বাসকার্য্যে ব্যবহার করে; কিন্তু তাহাদেরও মাছের যাহা বিশিষ্টতা তাহার সবগুলিই আছে। ইহা ছাড়া আর কতকগুলি প্রাণী আছে যাহারা জলে বাস করিলেও তাহাদের ফুলকা নাই, তাহাদের বদলে ফুসফুস থাকে। সেজন্য তাহাদের নাক ও মুখ জলের বাহিরে উঁচু করিয়া বাতাস লইতে হয়। যেমন, ব্যাঙ, সাপ, কুমীর, কচ্ছপ, শুশুক, জলহস্তী, তিমি ইত্যাদি। এ কারণে সাধারণ মাছের মত তাহারা বেশীক্ষণ জলের নীচে থাকিতে পারে না।

ফুলকা ও ফুসফুস (gills and lungs)—ব্যাঙ জাতীয় প্রাণী জীবনের প্রথমাবস্থায় জলের মধ্যে থাকে ও তখন তাহাদের ফুলকা থাকে। সে কারণ তাহারা মাছের মত জল হইতে অক্সিজেন গ্যাস লয় ও তাহার দ্বারা তাহাদের রক্ত পরিষ্কার হয় অর্থাৎ শ্বাসকার্য্য চলে। ব্যাঙাচির প্রথমাবস্থায় কেবল ফুলকা ঝালরের মত মাথার শেষ দিকে তিনটি করিয়া উভয় পার্শ্বে ঝুলিতে থাকে। পরে এই ফুলকার উপর এক প্রকার কানকুয়া তৈয়ারী হয় ও সেই সঙ্গে ফুসফুসও উৎপন্ন হইতে থাকে। ফুলকা ক্রমে শুকাইয়া আসে ও ফুসফুস বড় হইতে থাকে। এইজন্য ব্যাঙ জাতীয় প্রাণীকে উভচর (জলচর ও স্থলচর) শ্রেণীভুক্ত প্রাণী বলা হয়।

ব্যাঙ
(The Frog)

ব্যাঙের বাসস্থান ও বাংলার ব্যাঙ—ব্যাঙ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বদেশে দেখা যায়। জল, গর্ত্ত, ঝোপঝাপ, গাছ, সর্ব্বত্রই ইহাদের

বাসস্থান বলা চলে। ইহারা নানা জাতীয়। বাংলাদেশে সাধারণতঃ দুই প্রকার ব্যাঙ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম প্রকার—যাহারা জলে বাস করে। তাহাদের শরীর বেশ বড়। পেটের দিক্ হরিদ্রাবর্ণ ও পিঠের উপর গাঢ় সবুজের উপর কাল কাল ডোরা থাকে। তাহাদিগকে **সোনা ব্যাঙ** বা **কোলা ব্যাঙ** (Rana) বলে। সোনা ব্যাঙের শরীর মসৃণ।

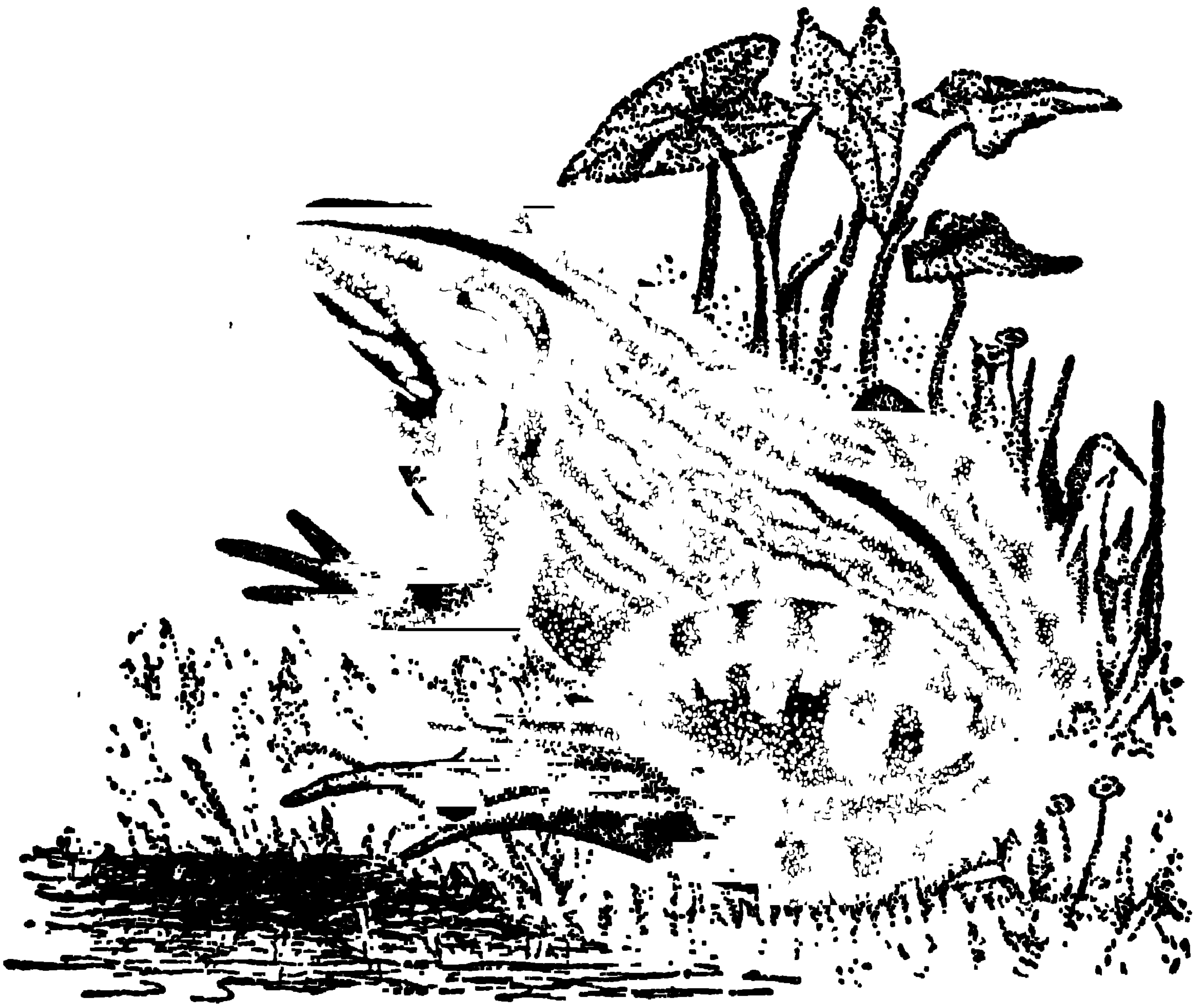

৭৩। সোনা ব্যাঙ

দ্বিতীয় প্রকার—ব্যাঙের দেহের রং ছাই বর্ণের ও তাহার উপর সরিষার মত কাল আব থাকে। এই আব হইতে এক প্রকার রস বাহির

হয়, সেই রস অন্যান্য জন্তুর পক্ষে বিষাক্ত। এই রস ক্ষারজাতীয়। এই প্রকার ব্যাঙকে **কুনো ব্যাঙ** (Bufo) কহে। কুনো ব্যাঙ দেখিতে অত্যন্ত বিশ্রী। ইহারা প্রায়ই ঝোপেঝাপে, নর্দ্দমায় ও গাছের তলায় বাস করে। বাংলা দেশে কুনো ব্যাঙই সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশী। পশ্চিমাঞ্চলে ও দক্ষিণ ভারতে কুনো ব্যাঙ অপেক্ষা সোনা ব্যাঙ বেশী দেখা যায়।

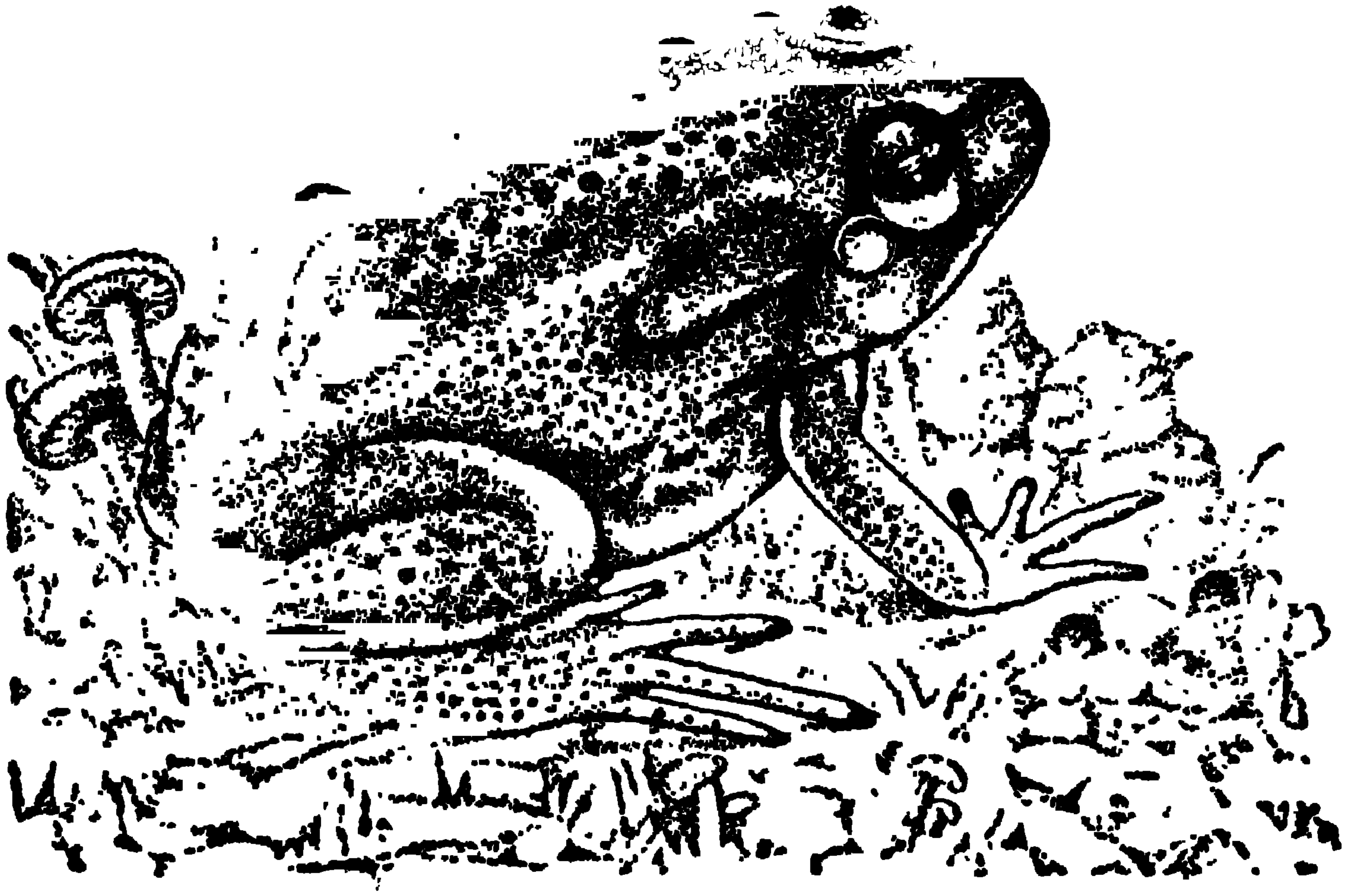

৭৪। কুনো ব্যাঙ

ব্যাঙের দেহ (The body of a frog)—ব্যাঙের নাকে দুইটি ছিদ্র আছে এবং তাহাতে দুইটি ডালা সংযুক্ত থাকে। এই ডালা দ্বারা তাহারা ইচ্ছামত নাকের ছিদ্র খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে। ইহাদের চোখ দুইটি খুব বড় ও গোলাকার এবং তাহাতে তিন প্রকার চোখের পাতা আছে। উপর ও নীচের চোখের পাতা অনেকটা আমাদের মত; কিন্তু তৃতীয় প্রকার পাতা খুব পাতলা। এই

তৃতীয় প্রকার পাতা আমাদের নাই, কিন্তু তাহার একটু চিহ্ন আমাদের চোখের কোণে দেখিতে পাওয়া যায়। কান দুইটি পাতলা চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে এবং অন্যান্য স্থানের ত্বকের সহিত সাদৃশ্য না থাকায় তাহাদের অস্তিত্ব সহজেই ধরা পড়ে। ব্যাঙের মাথা ও দেহের মধ্যে ঘাড় বলিয়া কিছু নাই। সম্মুখের পায়ে প্রায়ই ৪টি ও পশ্চাতের পায়ে ৫টি আঙুল থাকে। সম্মুখের পা পিছনের পা অপেক্ষা অনেক ছোট এবং পিছনের পা বড় হওয়াতে তাহার উপর ভর দিয়া অনেক জোরে লাফাইতে পারে। পিছনের পায়ের আঙুল হাঁসের মত জোড়া হওয়ায় ইহারা বেশ সাঁতার দিতে পারে।

ব্যাঙের মুখগহ্বর (buccal cavity)—সোনা ব্যাঙের উপর পাটিতে দাঁত আছে, কিন্তু কুনো ব্যাঙের দাঁত নাই। সোনা ব্যাঙের দাঁতগুলি সব এক প্রকার; আমাদের মত চারিপ্রকারের নহে। এই সকল দাঁতে তাহাদের চর্ব্বণের সাহায্য হয় না, কেবল শিকার ধরায় ব্যবহৃত হয়। মুখ-বিবরের তলে ইহাদের জিহ্বা থাকে। তাহা আমাদের জিহ্বা হইতে ভিন্ন। তাহাদের জিহ্বার অগ্রভাগ নীচে চোয়ালের ভিতর দিকে ঠোঁটের কাছে আটকান থাকে। মুখের আরও ভিতরে জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগের কোন বন্ধন নাই। সেইজন্য জিহ্বা বাহির করিতে হইলে ইহা উল্টাইয়া বাহির করে।

ব্যাঙের খাদ্য—ব্যাঙের প্রধান খাদ্য কীট-পতঙ্গ। মৃত কীট-পতঙ্গ সাধারণতঃ ইহারা খাইতে চাহে না। কিন্তু যদি মৃত কীট-পতঙ্গ সম্মুখে নাড়া যায় তবে তাহাদের জীবিত ভাবিয়া জিহ্বা দিয়া ধরিয়া ইহারা মুখে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। এমন কি, জ্বলন্ত কয়লা, পাথর প্রভৃতি সম্মুখে নাড়িলে খাইবার দ্রব্য ভাবিয়া প্রথমে মুখে প্রবেশ করাইয়া লয় এবং ভুল বুঝিয়া পড়িবামাত্র মুখ হইতে বাহির করিয়া দেয়। ব্যাঙ খাদ্যদ্রব্য গিলিয়া

খায়, কখনও চিবায় না। ইহারা কখনও জল বা অন্য কোনও তরলদ্রব্য পান করে না। ভিজা মাটি বা জলে থাকায় জল ত্বক্ দিয়া শরীরে প্রবেশ করে ও তাহাতে জলের দরকার মিটিয়া যায়।

ব্যাঙের শ্বাসপ্রণালী (Respiratory system)—বেশীক্ষণ হাঁ করাইয়া রাখিলে ইহারা শ্বাস লইতে না পারিয়া মারা পড়ে। যদি ব্যাঙকে হাঁ করাইয়া দুই চোয়ালের মধ্যে একটি কাঠি প্রবেশ করাইয়া একটু সূতা দিয়া সেই কাঠির সামনে মাথা ও নীচের চোয়াল একসঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া যায়, একদিনের মধ্যেই ব্যাঙটি মারা পড়ে।

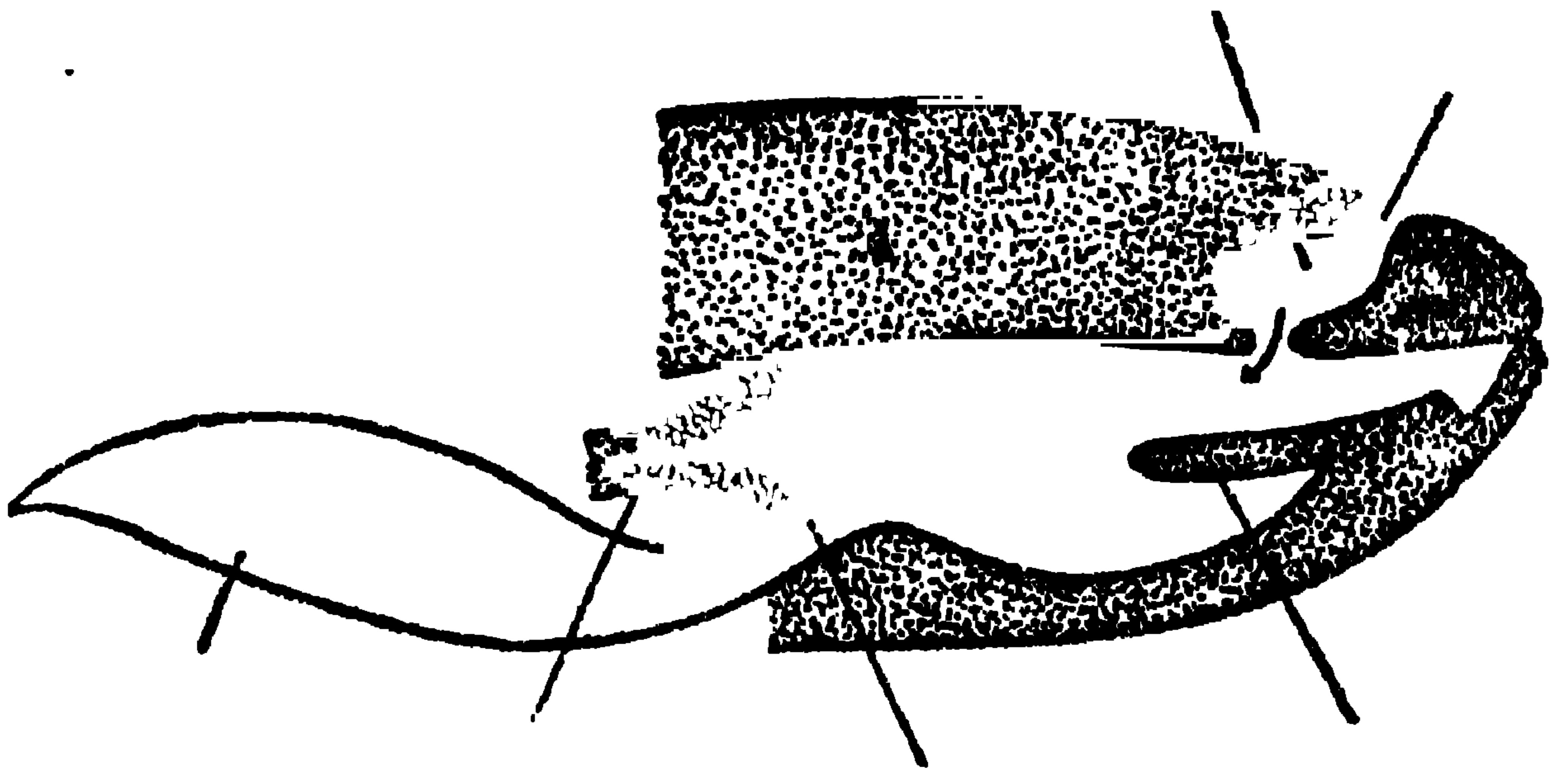

(১) শ্বাসগ্রহণের প্রথম অবস্থা

৭৫। ব্যাঙের শ্বাসপদ্ধতির নক্সা

শ্বাস লইবার সময় ইহারা মুখ বন্ধ করে ও নাকের ঢাকা খুলিয়া মুখ-বিবর ফুলাইয়া বাতাস লয়। পরে নাকের ঢাকা দুইটি বন্ধ করে ও মুখ-বিবরের ফুলা ছোট করে। ইহাতে মুখ-বিবরের আয়তন ছোট হয় ও তাহার মধ্যস্থিত বাতাসে চাপ পড়ে; সেই চাপে বাতাস ফুসফুসে চলিয়া যায়। শ্বাসত্যাগের সময় ফুসফুসের নিকট মাংসপেশী ফুসফুসে

চাপ দেয় ও ফুসফুসের দূষিত বাতাস ফুসফুস হইতে মুখের মধ্যে আনিবার জন্য ব্যাঙ মুখ-বিবর ফুলায়। ইহাতে মুখের গর্ত্ত বড় হয় ও বাতাস ফুসফুস হইতে সহজেই মুখ-বিবরে আসিয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ মুখ ও নাকের ঢাকা খোলে। ইহাতে দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায়। আবার মুখ বন্ধ করিয়া নাক দিয়া পরিষ্কার বাতাস গ্রহণ করে। এই ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলিতে থাকে। মুখের ভিতরে ও ফেরিংক্সে বহু রক্তবহা নালী থাকে, তাহাদের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা। সেজন্য মুখে বায়ু লওয়াতে ঐ সকল নালীমধ্যস্থ রক্ত কিছু অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারে।

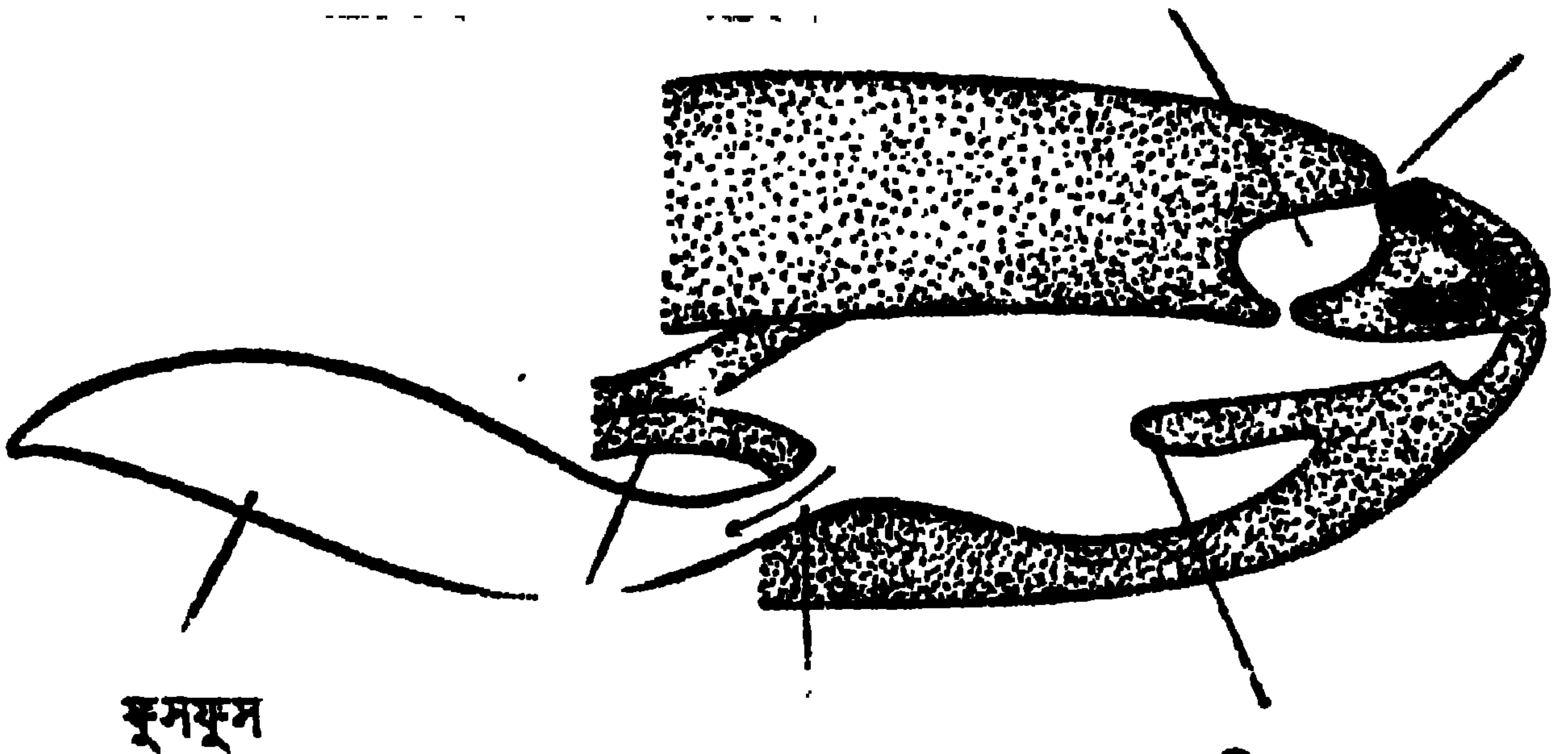

(২) শ্বাসগ্রহণের দ্বিতীয় অবস্থা

৭৬। ব্যাঙের শ্বাসপদ্ধতির নক্সা

ব্যাঙের ত্বক—ব্যাঙের ত্বক্ পাতলা হওয়াতে তাহার নীচে রক্ত-চলাচলের সময় বাহিরের বাতাস হইতে অক্সিজেন লইতে পারে; সেজন্য তাহাদের ত্বক্ দিয়াও কতকটা শ্বাসকার্য্যের অনুরূপ কার্য্য হওয়া সম্ভবপর হয়। ব্যাঙের ত্বকে তিনটি কার্য্য সম্ভবপর হয়ঃ

(১) সাধারণ প্রাণীর মত শরীরের অন্যান্য অবয়ব রক্ষা। (২) শরীরের মধ্যে জল লইবার সাহায্য। (৩) শ্বাসকার্য্যের সাহায্য।

ব্যাঙের শীত-ঘুম (Hebernation)—ব্যাঙ শীতের পূর্ব্বে যথেষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিয়া শরীরে চর্ব্বি সঞ্চয় করে। শীতকালে যখন তাহারা না খাইয়া ঘুমায়, তখন চর্ব্বি তাহাদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া শরীর রক্ষা করে। শীতের শেষে ব্যাঙকে অত্যন্ত রোগা দেখায়।

ব্যাঙের ডিম—গ্রীষ্মের শেষে স্ত্রী-ব্যাঙগুলির পেটে ডিম্বাণু থাকায় সেগুলিকে অতিশয় স্থূল দেখায়। বর্ষার সময় সোনা ও কুনো ব্যাঙ যেখানে অল্প জল পায় সেইখানেই ডিম পাড়ে। সোনা-ব্যাঙের ডিম একটি জমাট গঁদের চাপড়ার মধ্যে থাকে। এই চাপড়ার মধ্যে কাল কাল দানাই উহাদের ডিম। কুনো ব্যাঙ আবার এরূপ চাপড়ার পরিবর্ত্তে মটরমালার মত ডিম পাড়ে। প্রত্যেক মটর দানার মধ্যে একটি করিয়া ডিম থাকে। ডিমের খোলা অতি নরম ও পাতলা। সোনা ব্যাঙের ডিম দেখিতে কাল, কিন্তু কুনো ব্যাঙের মত অত কাল নয়। ডিমগুলি জল পাইয়া ফুলিয়া উঠে ও যত সময় যায় ততই নানা ভাগে বিভক্ত হয়, এবং শেষে ভ্রূণ লম্বা হইয়া পড়ে। ইহারাই ব্যাঙের বাচ্চা বা ব্যাঙাচি।

ব্যাঙাচির আকার (Structure of a tadpole)—ব্যাঙাচির মুখের দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র বাহির হয়, তাহার দ্বারা তাহারা জলে কোন বস্তুতে আটকাইয়া থাকিতে পারে। এই গদির মত যন্ত্র পরে মরিয়া যায়। সোনাব্যাঙের ব্যাঙাচিদের পেটের দিক্ হইতে ত্বকের ভিতর দিয়া পাক-যন্ত্র দেখা যায়। কুনো ব্যাঙের ব্যাঙাচি বেশী কাল বলিয়া তাহা দেখার অসুবিধা হয়। সোনা ব্যাঙের

ব্যাঙাচির লেজ বেশ বড়—এমন কি, ২॥ বা ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কুনো ব্যাঙের ব্যাঙাচি অত বড় হয় না, বিশেষতঃ লেজ অত্যন্ত ছোট হয়। ডিম পাড়িবার ১৫ দিন পর পর্য্যন্ত ব্যাঙাচিদের কিছু খাইতে হয় না। এ সময় তাহাদের মুখও খোলে না। তাহা বলিয়া যে তাহাদের দেহ-গঠনে কোন খাদ্যেরই প্রয়োজন হয় না তাহা নহে। পাখীর ডিমে যেমন কুসুম থাকে ও তাহা হইতে শাবকের শরীর পুষ্ট হয়, ব্যাঙাচিদেরও সেইরূপ কুসুম থাকে। তবে প্রভেদ এই যে ব্যাঙাচির কুসুম শরীরের

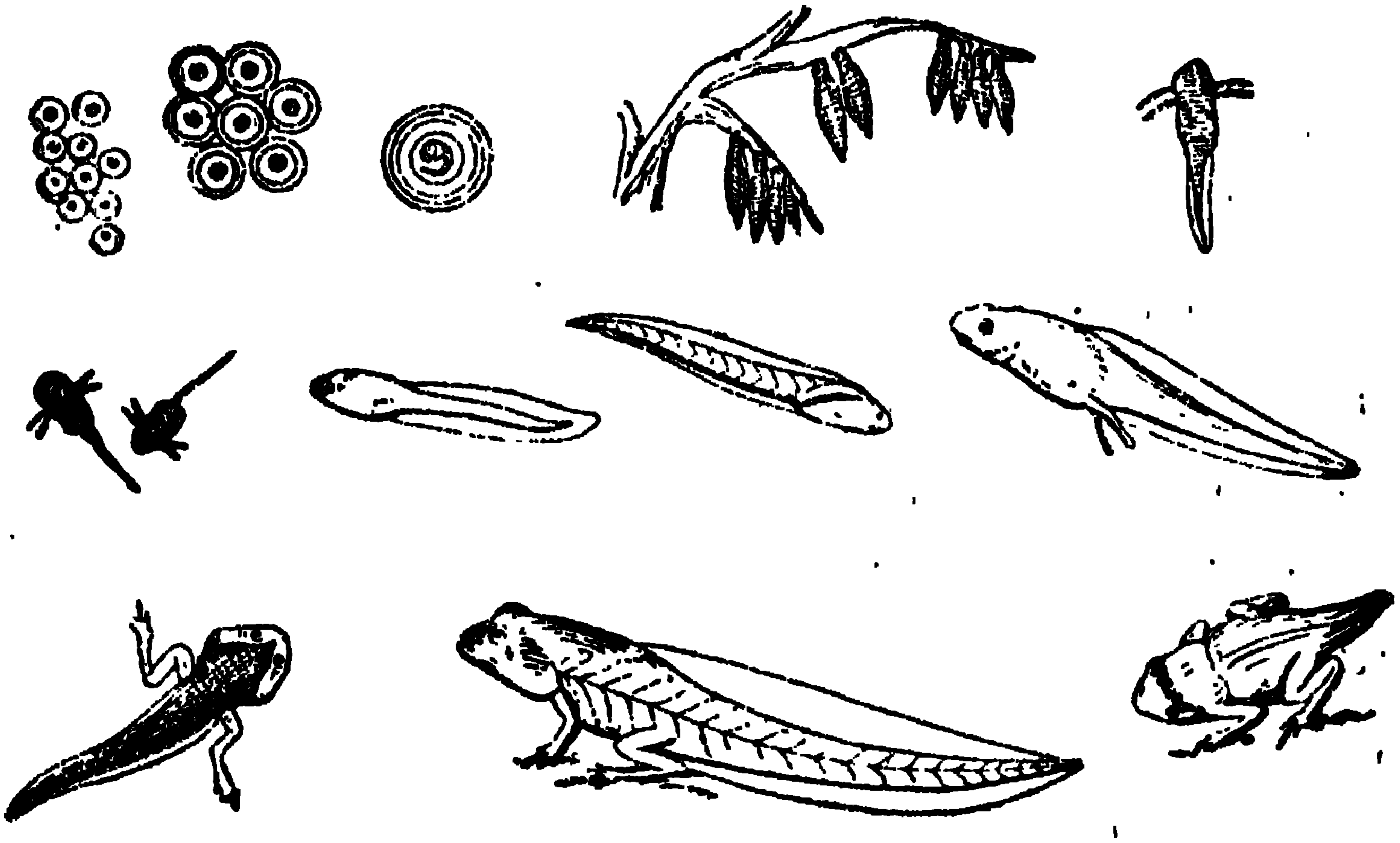

৭৭। ব্যাঙের ডিম ও ব্যাঙাচি

মধ্যেই থাকে, আর পাখীর ডিমে কুসুম শাবকের শরীরের বাহিরে ডিমের খোলার মধ্যে থাকে। শ্বাসকার্য্যের জন্য ফুলকাও থাকে না। কয়েকদিন পরে তাহাদের মুখ দেখা যায় ও তাহার চারিপার্শ্বে দাঁতের মত বাহির হয়।

এ সময় তাহারা জলের মধ্যে যত মৃত জীবজন্তু পায় তাহাদের মাংস খাইয়া বাড়িতে থাকে।

ব্যাঙাচির শ্বাসকার্য্য (Respiration)—মুখগহ্বরের উভয় পার্শ্বে ক্রমশঃ ফুলকা জন্মায় ও তাহার উপর **কানকুয়া** (operculum) চাপা পড়ে। মাছের ন্যায় ইহাদের প্রথমাবস্থায় মুখ দিয়া জল লইতে হয় না, কারণ ফুলকা বাহিরে ঝুলিতে থাকে, তখন ফুলকার দ্বারা জলে যে অক্সিজেন গোলা থাকে তাহাই লয়। পরে কানকুয়ার দ্বারা ফুলকা চাপা পড়িলে ব্যাঙাচি মুখ দিয়া জল লয় ও মুখগহ্বর বড়-ছোট করে। ইহাতে জলের উপর চাপ পড়ে। এই চাপের জন্য জল ফুলকায় যায় ও যখন মুখগহ্বর খুব ছোট হয় তখন জলের চাপ বেশ বাড়িয়া যায় ও শেষে কানকুয়া সরিয়া গিয়া জল বাহিরে আসিয়া পড়ে। সোনা অপেক্ষা কুনো ব্যাঙের ব্যাঙাচির কানকুয়া আগেই বাহির হয়। কানকুয়া চাপা পড়িবার সময় হইতে ব্যাঙাচিদের ফুসফুসও জন্মাইতে থাকে। এ সময় হইতে তাহারা ফুলকা দিয়া জল হইতে অক্সিজেন লইলেও মধ্যে মধ্যে জলের বাহিরের বাতাস ফুসফুসের শ্বাসকার্য্যের জন্য লইয়া থাকে। সেইজন্য দেখা যায় যে কানকুয়া চাপা ব্যাঙাচিরা মধ্যে মধ্যে জলের উপরে আসিয়া থাকে ও শ্বাসত্যাগের একবিন্দু বাতাস জলের বাহিরে ছাড়িয়া দেয়। যদি এ সময় ব্যাঙাচিদের জলের বাহিরে আসিতে না দেওয়া যায় ত দেখা যায় তাহারা কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা পড়ে।

ব্যাঙাচির রূপান্তর (Metamorphosis)—কুনো ব্যাঙের তিন চারি সপ্তাহ ও সোনা ব্যাঙের দেড় হইতে দুই মাসের সময় দেহ ও লেজের সংযোগস্থলের একটু পূর্ব্বে দুইটি গুটির মত জন্মায়। ইহাই ইহাদের পিছনের পায়ের নিদর্শন। পশ্চাতের পা বাহির হইবার

পূর্ব্বেই সম্মুখের পা গজায়, কিন্তু কানকুয়া সম্মুখের পা চাপা দেওয়ার দরুণ উহা বাহির হইতে দেখা যায় না। মনে হয় যে পশ্চাতের পা আগে বাহির হয়, তাহার অনেক পরে যখন কানকুয়া চলিয়া যায় তখন সম্মুখের পা দেখা দেয়। এখন ব্যাঙাচিটি প্রায় পূর্ণ ব্যাঙের অবস্থায় পরিণত হয়, কেবল একটি বৃহৎ লেজ থাকে। কানকুয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলকাও চলিয়া যায় এবং এই সময় হইতে ফুসফুসই শ্বাসকার্য্যের প্রধান সহায়। লেজটি অল্প অল্প ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে ও ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া যায়। অনেকের ধারণা টিকটিকির লেজ যেমন সময়ে সময়ে খসিয়া যায়, সেইরূপ ব্যাঙাচির লেজ খসিলে তবে পূর্ণ ব্যাঙে পরিণত হয়, কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

ব্যাঙাচিদের যখন বেশ বড় লেজ থাকে তখন যদি ঐ লেজ কাটিয়া দেওয়া যায় ত দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যেই আবার তাহাদের লেজ গজাইয়া উঠে। এই নূতন গজান লেজ পুরাতন অপেক্ষা কিছু ছোট ও নূতন মাংসপেশী কৃশ অবস্থায় দেখা দেয়। ব্যাঙাচি বা ব্যাঙ যখন খুব ছোট থাকে তখন দেখা গিয়াছে যে যদি তাহাদের হাত বা পা কাটিয়া দেওয়া যায় ত ক্ষতস্থান হইতে আবার নূতন করিয়া হাত বা পা বাহির হয়। বড় ব্যাঙের হাত পা কাটিয়া দিলে আর নূতন করিয়া গজায় না।

ব্যাঙ দ্বারা মানবের উপকার—ব্যাঙ পোকা-মাকড় খাইয়া আমাদের অনেক উপকার করে। যে সকল কীট-পতঙ্গ ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে ব্যাঙ তাহাদের খাইয়া ফেলে। সে কারণে বিদেশী কৃষকেরা ইচ্ছা করিয়া ক্ষেতে ব্যাঙ পোষে। ব্যাঙের চামড়ায় ছোট জুতা, মনি-ব্যাগ, দস্তানা প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।

মাছের সহিত ব্যাঙাচির তুলনা

মাছ	ব্যাঙাচি
১। জোড়া পাখনা ও তাহাতে কাঁটা।	১। বিজোড় পাখনা ও কাঁটা নাই।
২। চোখের পাতা নাই।	২। চোখের পাতা নাই।
৩। মুখের সংযোগ নাই।	৩। মুখের সংযোগ আছে।
৪। দুই প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট হৃদয়।	৪। হৃদয়ে প্রথমে দুই পরে তিন প্রকোষ্ঠ।
৫। ফুলকায় শ্বাস লয়। কয়েকটি মাছ জলের বাহিরের বাতাস লইতে পারে।	৫। ফুলকায় শ্বাস লয়; পরে ফুলকা ও ফুসফুস দুই-ই থাকে। ক্রমে ফুলকা মরিয়া যায়।
৬। সমুদ্রে যথেষ্ট আছে।	৬। সমুদ্রে একেবারে নাই।
৭। সাধারণতঃ মাছ উপাদেয় খাদ্য।	৭। অখাদ্য।
৮। মশার বাচ্চা খাইয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের সাহায্য করে।	৮। জলে মৃতদেহ খাইয়া জল পরিষ্কার করে।

Questions

1. What features of the life-history of the frog interest you and why? (C. U. 1944)
2. Narrate the life-history of a frog. (T. T. September, 1935, July, 1939)
3. Compare a fish with the tadpole of a frog. (T. T. October, 1936)

সপ্তম অধ্যায়

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরতা

(Interdependence of plants and animals)

উদ্ভিদ্‌জগতে প্রাণীর নির্ভরতা—উদ্ভিদ্ আকাশের হাওয়া পরিষ্কার রাখে বলিয়াই প্রাণী তাহার প্রয়োজনমত অক্সিজেন পায়। উদ্ভিদ্ মাটি হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া প্রাণীর অতি আবশ্যক প্রোটিন (protein) খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেয়। অক্সিজেন বা প্রোটিন কোনটার অভাব ঘটিলেই প্রাণীর জীবনযাত্রা অসম্ভব হইত। উদ্ভিদ্ বাতাস হইতে কার্ব্বন বা অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া প্রাণীকে দেয় বলিয়াই প্রাণীর দেহ গঠিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে।

উদ্ভিদ্ কত রকমে মানবের কাজে লাগে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। মানুষের খাদ্যস্বরূপ ফল-শস্য, তাহার পানীয়স্বরূপ চা, কফি, কোকো প্রভৃতি সম্পূর্ণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ। মৎস্য, মাংস ও দুগ্ধ মুখ্যতঃ না হইলেও গৌণতঃ উদ্ভিজ্জ দ্রব্য। উদ্ভিদ্ না থাকিলে গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি কি খাইত? ঘর, বাড়ী করিবার জন্য যে বাঁশ কাঠের দরকার, কাপড়ের জন্য যে তুলা পাট শন দরকার, তাহাও বৃক্ষজাত। কাপড় রং করিবার জন্য যে সমস্ত রং পাওয়া যায় তাহার মধ্যে বিখ্যাত নীলবড়ি—উদ্ভিজ্জাত পদার্থ। মেজেণ্টা প্রভৃতি যে সব রং বিদেশ হইতে আসে তার বেশীর ভাগ খনিজ কয়লা হইতে প্রাপ্ত। কিন্তু খনিজ কয়লা নিজেই ত উদ্ভিজ্জ দ্রব্য। গাছপালা না থাকিলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধগুলিও আমরা পাইতাম না। তাহা ছাড়া কাগজ, কালি প্রভৃতিও বেশীর ভাগ উদ্ভিজ্জ পদার্থ।

কেবল মানুষই যে গাছপালা হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঔষধরূপে ব্যবহার করে তাহা নহে, পশুপক্ষীও তাহাদের স্বাভাবিক বিবেকের দ্বারা এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়। কুকুরের যখন জোলাপের দরকার হয়, সে আপন হইতে ঘাস খায়। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর প্রাণী হইতে এককোষ প্রাণী পর্য্যন্ত যাহা যাহা খাইয়া জীবনধারণ করে, তাহা হয় মুখ্যতঃ নয় গৌণতঃ উদ্ভিজ্জ দ্রব্য।

অধিকাংশ প্রাণীরই আশ্রয়স্থল গাছ। গাছের কোটর, গাছের ডালই তাহাদের বাসস্থান। শত্রুর দৃষ্টি হইতে লুকাইবার স্থানও গাছ-ঝোপ। তেমনই হিংস্র জন্তুও গাছের ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া শিকার সন্ধান করে। সমুদ্রগর্ভে ও নদীর জলে এমন বহুপ্রকার প্রাণী আছে যাহারা একমাত্র জলজ উদ্ভিদের আশ্রয় ব্যতীত একস্থানে থাকিতেই পারিত না।

প্রাণিজগতে উদ্ভিদের নির্ভরতা—একদিকে যেমন উদ্ভিদ্ না থাকিলে প্রাণীর বাঁচিবার উপায় নাই, সেইরূপ প্রাণী না থাকিলে অনেক উদ্ভিদেরও চলে না। এমন কতকগুলি গাছ আছে যাহারা পতঙ্গ প্রভৃতি শিকার করিয়া খায় তাহা আগেই পড়িয়াছ। ছত্রক ও ব্যাঙের ছাতা জাতীয় গাছ পচা মাংস ও চামড়া প্রভৃতি খাইয়া বড় হয়।

ইহা ছাড়া পরোক্ষভাবেও প্রাণিজগতের উপর উদ্ভিদ্ অনেক নির্ভর করে। ক্ষেত্রে বা বাগানে সার অতি প্রয়োজন। এই সার হিসাবে বাংলার সর্ব্বত্র গোবরের প্রচলন আছে। গোবর উদ্ভিদের রূপান্তর, কিন্তু গরু না থাকিলে গোবর কোথা হইতে আসিত! তাহা ছাড়া জন্তু-জানোয়ারের দেহ, হাড়, এমন কি রক্ত ও মলমূত্রাদি উদ্ভিদের নিত্য প্রয়োজন। মাটিতে বাতাস না পাইলে গাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। সেজন্য কৃষকেরা মাটিতে লাঙ্গল দেয়। কিন্তু সকল উদ্ভিদ্ ত লাঙ্গলের সাহায্য পায় না; বনে জঙ্গলে অনবরত মাটি খুঁড়িয়া দিতেছে কেঁচো নামক প্রাণী।

কতকগুলি সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌কে আর এক রকমে প্রাণিজগতের উপর

নির্ভর করিতে হয়; সেটা বংশবৃদ্ধির জন্য। পতঙ্গকুল যদি এবিষয়ে সাহায্য না করিত তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে অনেকদিন লোপ পাইত। উদ্ভিদের বংশবিস্তারের জন্য জীবজন্তু, পশু-পক্ষী, এমনকি মানুষ পর্য্যন্ত কত রকমে সাহায্য করে!

রক্ষক হিসাবেও প্রাণী উদ্ভিদের অনেক সাহায্য করে। কোন কোন লাল কাঠ-পিপীলিকা গাছে বাস করিয়া আহার ও বাসস্থান পায় ও তাহার পরিবর্ত্তে গাছকে অন্য প্রাণীর হাত হইতে কামড়াইয়া রক্ষা করে।

আর এক প্রকারে প্রাণিজগৎ উদ্ভিদের জীবনযাত্রায় সাহায্য করে। উদ্ভিদের দেহপুষ্টির জন্য অঙ্গার বা কার্ব্বনের প্রয়োজন। এই অঙ্গার তাহারা বায়ু হইতে লয়। প্রাণীরা শ্বাসকার্য্যে ক্রমাগত কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া এবিষয়ে কতকটা সাহায্য করে।

Questions

1. What do you know of the interdependence of plants and animals. (T. T. September, 1935, July, 1939; C. U. 1940)
2. "Without plants, animal life would be impossible". Explain why. (C. U. 1946)

অষ্টম অধ্যায়

পরিবেশের সহিত অভিযোজন

(Adaptation to Environment)

অভিযোজন (Adaptation)—জীবনরক্ষার্থ জীব যে সকল উপায় অবলম্বন বা সামঞ্জস্যবিধান করে তাহাকে অভিযোজন কহে। খাদ্যসংগ্রহার্থে, আত্মরক্ষার্থে, প্রতিদ্বন্দ্বিত্বে, বংশরক্ষার্থে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানার্থে বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত জীবের বিভিন্নপ্রকার গঠনাদির সমাবেশ দেখা যায়। এই সকল গঠনাদি অভিযোজনের ফল।

1. Plastic

উদ্ভিদজগতের অভিযোজন (Adaptation of plants)—প্রতিকূল আবেষ্টন মধ্যে পতিত হইয়াও কোন কোন উদ্ভিদের বীজ চারা উৎপাদন করে। ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক চারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নিজেদের বংশগত আকৃতি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন করতঃ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে অসংখ্য জাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে।

আবেষ্টন সম্পর্কে উদ্ভিদ্জগৎকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) জলজ, (২) স্থলজ, (৩) আংশিকভাবে জলজ ও স্থলজ।

আলো ও জলের উপরই সাধারণতঃ উদ্ভিদ্কে নির্ভর করিতে হয় এবং এই দুইটির সাহায্য লাভ করিতে উদ্ভিদের নানাপ্রকার বাহ্যিক পরিবর্ত্তন ঘটে। যেমন লতাকাণ্ড আশ্রয়-গাছকে জড়াইয়া বা কেহ কেহ আকর্ষ দ্বারা উপরে উঠে। আরোহী লতার মূলও এইভাবে তাহাদের সাহায্য করে। এই সকল লতার আদি পুরুষের বড় বৃক্ষের নীচে জন্ম হওয়ায়, উপরে উঠিবার নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বৃক্ষরুহা ও বৃক্ষাদনী-দেরও এই একই কারণে গঠন ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

কতকগুলি জলজ উদ্ভিদের মূল অতি ক্ষুদ্র এবং মূলরোমও অতি অল্প। যে সকল গাছ জলে ভাসমান থাকে তাহাদের অনেকের মূলই থাকে না। কারণ সর্ব্বদেহ দিয়া জল হইতে ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ।

জলজ গাছের যে সকল পাতা জলের মধ্যে থাকে তাহা আয়তনে ছোট ও তাহাতে ষ্টোমা নাই। যে সকল পাতা জলের উপর ভাসে সেই সকল পাতা আয়তনে বেশ বড় এবং ষ্টোমা পাতার উপরপিঠে থাকে। পাতার নীচের পিঠে জল থাকায় ষ্টোমা থাকে না। ইহাদের কাণ্ড অত্যন্ত নরম এবং কাণ্ডে বায়ু আবদ্ধ থাকে যাহাতে ভাসিবার সুবিধা হয়। যেমন পদ্ম ইত্যাদিতে।

পর্ব্বতের উপরে অথবা মরুভূমিতে যে সকল গাছ জন্মে তাহারা অতি সামান্য জল পাইলেই জীবিত থাকিতে পারে। ইহাদের সাধারণতঃ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই কারণে তাহাদের শাখাগুলি অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে ও যথাসাধ্য জল সংগ্রহ করে।

মরুভূমির উদ্ভিদ্‌সকল মূল অনেক নীচে নামাইয়া জল-সংগ্রহের চেষ্টা করে। যে সামান্য জল ইহারা সংগ্রহ করিতে পারে তাহা দেহের বিভিন্নাংশে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। সেজন্য ইহাদের পাতা বা কাণ্ড প্রায়ই স্থূল। দেহের মধ্যস্থ জল যাহাতে অধিক পরিমাণে বাহির হইতে না পারে সেজন্য কাহারও কাহারও পাতা কাঁটায় পরিণত হয়, অথবা পাতা আকারে ছোট ও সংখ্যায় অল্প জন্মায়। ইহাদের উচ্চতা ও আয়তন সাধারণতঃ খুব কম এবং অনেক স্থলে কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা খুব শক্ত। কারণ উন্মুক্ত স্থানে প্রচণ্ড হাওয়ায় ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। যেমন, ফণীমনসা, বাবলা, শিয়ালকাঁটা, কণ্টকারী ইত্যাদি।

লবণাক্ত জমিতে যে সকল উদ্ভিদ্ জন্মে তাহারা মূলরোম সাহায্যে অস্‌মসিস প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের আবশ্যক জল সংগ্রহ করিতে পারে না। সেজন্য এই সম্প্রদায়ভুক্ত উদ্ভিদেরা পর্ব্বত ও মরুভূমিস্থ উদ্ভিদের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া থাকে।

সমুদ্রতীরস্থ জলাভূমিতে এক জাতীয় গাছ জন্মে, তাহাদিগকে ইংরেজীতে **ম্যাঙ্গ্রোভ** (Mangrove) বলে। ইহাদের মূল প্রথমে নীচে গিয়া পরে ঘুরিয়া জলের উপর আসে। এই সকল মূলের গাত্রে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, তাহা হইতে ইহাদের শ্বাসকার্য্য সম্পাদিত হয়। পাছে লবণাক্ত জলে ইহাদের বীজ পড়িলে নষ্ট হয়, সেজন্য বৃক্ষসংলগ্ন ফলের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরের স্থূলকায় মূল ফল হইতে ঝুলিতে থাকে।

যথাসময়ে ফল বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ঐ লম্বা মূল নিম্নস্থ কর্দ্দমের মধ্যে প্রোথিত হয়। সুন্দরী, গরান, হালসী এই জাতীয় উদ্ভিদ্।

সাধারণতঃ পতঙ্গ পরাগ বহন করে, কিন্তু সকল পতঙ্গ সকল প্রকার ফুল হইতে পরাগ লইতে পারে না। ফুলের আকার পতঙ্গ অনুসারে তৈয়ারী। এমন ফুল আছে, যাহাতে প্রজাপতি বসিতে পারে না, তাহার পাখা আটকাইয়া যায়, কিন্তু সেই সকল ফুলে ভ্রমর বা মৌমাছি অনায়াসে বসিতে পারে। আবার এমন ফুল আছে যাহাতে প্রজাপতি বসে, কিন্তু ভ্রমর বা মৌমাছি বসিতে পারে না। পতঙ্গ মুখের নল অনুসারে বিশেষ বিশেষ ফুল হইতে মধু লইতে পারে।

উদ্ভিদ্ প্রাণীর অত্যাচার হইতে নানা প্রকারে আত্মরক্ষা করে। আত্মরক্ষার্থ কোন কোন উদ্ভিদ্দেহে কাঁটা বা বিষাক্ত দ্রব্য থাকে অথবা দেহ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। দার্জ্জিলিং পাহাড়ে এক প্রকার গাছ জন্মে; দূর হইতে উহাদিগকে একেবারে সাপের মত দেখায়। জন্তু জানোয়ারেরা সাপ মনে করিয়া এই সকল গাছ হইতে দূরে পলায়। তাহাতে সাপের মত (কচু জাতীয়) গাছ জন্তু হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। রেঙ্গুন আলু দেখিতে অনেকটা মাটির ঢেলার মত, সেজন্য কোন কোন জন্তু ঢেলা মনে করিয়া উহা খাইতে আসে না।

প্রাণিজগতের অভিযোজন (Adaptation of animals)—উদ্ভিদের ন্যায় প্রাণীদের পরিবেশও বহুপ্রকার। কেহ জলে, কেহ স্থলে, কেহ বা গাছে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সামঞ্জস্য বিধানার্থ বিশিষ্ট গঠনাদি প্রত্যেকের দেহে বর্ত্তমান। বিভিন্ন দেশের পরিবেশ আরও বিভিন্ন প্রকার। শীতপ্রধান দেশে যে সকল প্রাণী বাস করে তাহাদের দেহের আবরণ শীতোপযোগী হইয়া থাকে।

পতঙ্গের মধ্যে অভিযোজনের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। মশকের শূক

জলে থাকিয়াও বাতাস হইতে অক্সিজেন লইয়া শ্বাসকার্য্য চালায়, অথচ বহু পতঙ্গ-শূকের জলমধ্যস্থিত অক্সিজেন লইবার জন্য ফুলকা বর্ত্তমান। অক্সিজেন-বিরল জলমধ্যে পতিত হইলেও মশক-শূকের শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় না; প্রকৃতি তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যথোপযোগী গঠন দিয়াছে। মৎস্য জলে বাস করে এবং জলে বাস করার উপযোগী যন্ত্র-গঠনাদি আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহাদের বসতির প্রকারভেদ হইয়া থাকে তাহাদের গঠনাদিরও সেই মত সমাবেশ দেখা যায়। সমুদ্রের গভীরতর অংশে যেসকল মাছ বাস করে তাহাদের দেহে জলের চাপ বেশী পড়ে। এ কারণ এই সকল মাছের দেহ অত্যন্ত চেপ্টা। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহাদের দেহ এইরূপ চেপ্টা হইয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে অগাধ জলে তাহাদের বাঁচাই দায় হইত। খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীর জলে দেখা যায় যে মাছের সাধারণ পাখনা পরিবর্ত্তিত হইয়া শোষকযন্ত্রে (sucker) পরিণত হইয়াছে এবং ইহাদের পাখনাগুলি সাঁতরাইতে বড় একটা সাহায্য করে না। এই শোষক-যন্ত্র আছে বলিয়াই ঐসব মাছ পাথর বা অন্য কিছুর সঙ্গে আটকাইয়া থাকিতে পারে । তাহা না হইলে উহারা বাঁচিত না। যেসকল স্থানে জল কমিয়া যায় বা অন্য কোন কারণে মাছের কাদায় থাকিতে হয় এমন স্থানের মাছের ফুলকা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য অতিরিক্ত গঠনাদির উদ্ভব হয় ও তাহার দ্বারা তাহারা বাহিরের বাতাস ব্যবহার করিতে পারে। কই, মাগুর, শিঙি এই প্রকার মাছ।

ব্যাঙের জীবনেতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যাঙাচি অবস্থায় ফুলকা থাকে। পরে ফুলকা ফুসফুস দুই-ই থাকে। যখন পূর্ণ ব্যাঙের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন ফুলকা একেবারে থাকে না।

আকাশে উড়িবার জন্য পাখীদের ডানা থাকে। সকল আধুনিক পাখীই উড়িতে পারে না। যাহারা উড়িবার ক্ষমতা প্রায় হারাইয়াছে

তাহাদের **চলা-পাখী** বলা হয়। অপর শ্রেণীকে **উড়া-পাখী** বলে। চলা-পাখী ভারতে নাই। ইহাদের বুকের হাড় হাঁড়ির তলার মত। উড়া-পাখীর বুকের হাড়ের উপর আর একখানি হাড় উঁচু হইয়া থাকে। তাহার উভয় পার্শ্বে দৃঢ় মাংসপেশী থাকে। তাহাতে উড়িবার সাহায্য হয়। খাদ্যানুসারে পাখীর চঞ্চু নানা প্রকার। বাসস্থান হিসাবেও ইহাদের কাহারও কাহারও আঙ্গুলের মধ্য পাতলা চাম দিয়া জোড়া থাকে। যাহাদের জোড়া থাকে তাহারা সকলেই জলজ-পাখী।

খাদ্য ও বাসস্থানের উপরই জন্তুর আকার প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকে। যাহারা শস্য বা তৃণ খাইয়া থাকে তাহাদিগকে তৃণভোজী বলে, যেমন—গরু, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি। যাহারা অন্য জীবের মাংস খায় তাহারা মাংসভোজী, যেমন—বাঘ, সিংহ, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি। তৃণভোজী জন্তুরা প্রায়ই মোটা হইয়া থাকে। প্রচুর ঘাস, পাতা ও শস্য খাইতে হয় বলিয়া ইহাদের পেট খুব বড়। মাংসভোজী জন্তুদের পেট বড় হয় না, কারণ মাংস ইত্যাদি পুষ্টিকর পদার্থ পরিমাণে কম খাইলেই চলে। খাদ্যানুসারে জন্তুর দাঁতের গঠন হইয়া থাকে। হিংস্র মাংসভোজীর দাঁত খুব তীক্ষ্ণ হয়; কারণ মাংস কাটিতে ধারাল দাঁতের প্রয়োজন হয়। তৃণভোজীর দাঁত ভোঁতা, কারণ তৃণাদি কাটিয়া খাইতে হয় না। ইহারা প্রায়ই খাদ্য পিষিয়া খায়। রোমন্থনকারী জন্তুরা প্রথমে খাদ্য তাড়াতাড়ি গিলিয়া খায়, পরে অবসর মত চিবায়। অল্প সময়ে খাদ্য আহরণ করাতে হিংস্র জন্তু দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় কম থাকে। এ কারণে রোমন্থনকারী জন্তুদের আমাশয়ের পরিবর্তন হইয়াছে। জলের অভাবে মরুভূমিতে অনেক জন্তুই বাস করিতে পারে না। কিন্তু উষ্ট্র অনায়াসে মরুভূমিতে বিচরণ করিতে পারে। তাহাদের আমাশয়ে জলসঞ্চয়ের একটি কুঠরী থাকে। উষ্ট্র জলহীন তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে

কয়েক দিন জলপান না করিয়াও বাঁচিতে পারে। বাঘ দেখিলেই অনেক প্রাণী প্রাণভয়ে পলায়ন করে। বাঘের গায় ডোরা থাকে। এই ডোরা গাছপালার সহিত মিশিয়া যাওয়াতে বাঘের শীকার ধরার সাহায্য হয়।

প্রাণী আত্মরক্ষার্থ নানা প্রকার গঠনাদি লাভ করে। কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর হুল, বিষাক্ত রস, কঠিন আবরণ প্রভৃতি থাকাতে তাহারা অন্য জন্তু হইতে রক্ষা পায়। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীরা খুর, তীক্ষ্ণ নখ, দাঁত, শিং প্রভৃতি দ্বারা আত্মরক্ষা করে।

ইহা ছাড়া আত্মরক্ষার্থ ও খাদ্য-সংগ্রহার্থ অনেক প্রাণীর ডানা থাকে। যাহারা জীবন-সংগ্রামে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে পারে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে। নচেৎ যে কোন জীবের বংশরক্ষা কেন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করাই অসম্ভব হইত।

Questions

1. What do you know of the adaptation to environment of plants and animals? (T. T. April 1937, April, 1938)
2. How do animals adapt themselves to environments? Give some interesting examples (C. U. 1943)

শারীর বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

শারীর-বিদ্যা ও সাধারণের অজ্ঞতা—মানব-দেহের বাহ্যাকৃতির বিষয়ে অনেকের কতকটা ধারণা থাকিলেও মানব-দেহাভ্যন্তরীণ নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিষয় সঠিক ধারণা অতি অল্প লোকেরই আছে। জীবন-ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক ক্রিয়া কি প্রকারে সাধিত হয়, তাহাই অনেকের জানা নাই। কি প্রকারে শ্বাসকার্য্য চলে, কি প্রকারে খাদ্যাদি পরিপাক দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন হয়, কিরূপে দেহের দূষিত পদার্থ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহা বহু লোকের ধারণা নাই। ইহা ছাড়া শারীর-বিদ্যার অন্যান্য বিষয়ে লোকে আরও অজ্ঞ। ইন্দ্রিয়াদি কিরূপে কাজ করে, বা মস্তিষ্ক ও তাহার ক্ষমতা কি, ইত্যাদি জটিল বিষয়ে লোকের ধারণা আরও কম। শারীর-বিদ্যা হইতে আমরা এই বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। ইহা অতি আবশ্যক ও আমাদের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়।

আধুনিক ভাবে শারীর-বিদ্যা অনুশীলন—অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারত, মিশর, প্রভৃতি সভ্যদেশে এই বিদ্যার চর্চ্চা হইলেও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইংলণ্ডের স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক **হারভে** (Harvey) মাত্র তিন শত বৎসরের কিছু পূর্ব্বে রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন; এমন কি বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই রুষ-বৈজ্ঞানিক **প্যাভলভ** (Pavloff) আমাদের

পৌষ্টিক নালীতে কি প্রকারে খাদ্য হজম হয়, তাহাদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া কি, কি প্রকারে দেহের পুষ্টিসাধন ঘটে, ইত্যাদি বিবিধ অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন।

৭৮। হারভে

যে ভিটামিন না হইলে দেহের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, খাদ্যের সেই ভিটামিন মাত্র কয়েক বৎসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শারীর-বিদ্যার সহিত চিকিৎসাশাস্ত্রের অতি নিকট সম্বন্ধ। সুস্থ দেহের ক্রিয়ার বিষয় জানিলে তবে অসুস্থ দেহের লক্ষণ ও তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

শারীর-বিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য—দেহাভ্যন্তরীণ বিভিন্ন যন্ত্রাদির ক্রিয়া কি নিয়মে সাধিত হইতেছে তাহার আলোচনা। জানিতে গেলে অগ্রে মানবদেহের সুস্পষ্ট ধারণা এবং কোন্ কোন্ উপাদানে এই দেহ গঠিত হইয়াছে তাহার মোটামুটি জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

৭৯। প্যাভলভ

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবদেহ

মানবদেহ প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত—(১) মস্তক, (২) দেহকাণ্ড বা ধড়, (৩) হস্তপদাদি অবয়ব।

আমাদের দেহের ভিতরে আছে প্রথমে কঙ্কাল বা অস্থির কাঠাম। কঙ্কাল ঢাকা থাকে মাংসপেশী দিয়া, মাংসপেশী আবার ত্বক্ দিয়া। **বন্ধনী** (tendon) দিয়া পেশীগুলি অস্থির উপর আবদ্ধ রহিয়াছে, ঠিক যেন হিন্দুবাড়ীর দেবী-প্রতিমা—সব নীচে বাঁশের কাঠাম, তার উপর রশি দিয়া বাঁধা খড়, সর্ব্বোপরি মাটির প্রলেপ ও রং।

মস্তক (Head)

ইহার প্রধান উপাদান **খুলি** (skull)। এই খুলি অস্থি দ্বারা গঠিত একটি আধার। তাহার মধ্যে থাকে আমাদের **মস্তিষ্ক** বা **মগজ** (brain)। মস্তকের সামনে নীচের দিকে থাকে **মুখমণ্ডল** (face)। মুখমণ্ডলে **চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ওষ্ঠ** ও **মুখবিবর**। আমাদের মাথার খুলিটি সর্ব্বসমেত ২২ খানি অস্থির দ্বারা গঠিত।

দেহকাণ্ড (Thorax and Abdomen)

ইহা তিন অংশে বিভক্ত—গ্রীবাদেশ, বক্ষঃস্থল ও উদর। দেহকাণ্ডের প্রধান অস্থির নাম **মেরুদণ্ড** (vertebral column)। **মেরুদণ্ড** তেত্রিশটি খণ্ডাস্থি বা **কশেরুকা** (vertebra) দ্বারা গঠিত। **গ্রীবায়** (cervical) সাতখানি, **পৃষ্ঠে** (dorsal) বারখানি; **কটিতে**

(lumbar) পাঁচখানি। **বস্তিতে** (sacral) পাঁচখানি এবং উহারা জুড়িয়া এক হইয়াছে। **শেষ পুচ্ছতে** (coccygeal) চারিটি এবং উহারা জুড়িয়া গিয়াছে। মেরুদণ্ড লম্বে ২৮ ইঞ্চি। প্রত্যেক দুইখানি

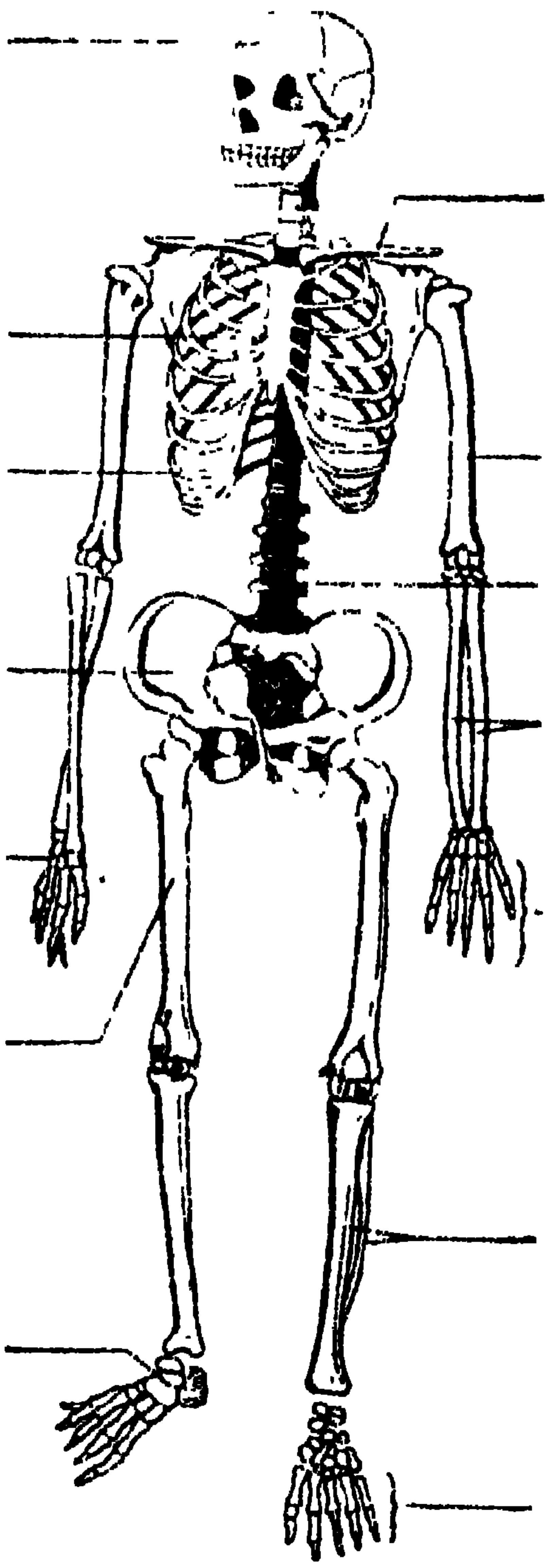

৮০। নরকঙ্কাল

কশেরুকার মধ্যে একটি **তরুণাস্থির** (cartilaginous) গদি থাকে। পিঠের দিকে এই কশেরুকাগুলির দ্বারা **মেরুমজ্জা** (spinal cord) চাপা থাকে।

মস্তক ও দেহকাণ্ডের ভিতর তিনটি গহ্বর বা বিবর আছে। যথা—

১। **মুখগহ্বর** (buccal cavity)—ওষ্ঠদ্বয় এই বিবরের দ্বারস্বরূপ। সম্মুখেই দুই পাটী দন্ত। এক এক পাটীতে ষোলটি করিয়া দন্ত থাকে। পাটীর সামনেই চারিটি **ছেদনদন্ত**। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি **শ্বদন্ত**। দুই কশের দিকে চারিটি **চর্ব্বণদন্ত** ও শেষের দিকে উভয় পার্শ্বে ছয়টি **পেষণদন্ত**। মুখবিবরের ভিতর দিকে **ফেরিংক্স**। এইখানে দুইটি ভিন্ন নালী আসিয়া মিলিয়াছে—একটি **শ্বাসনালী**

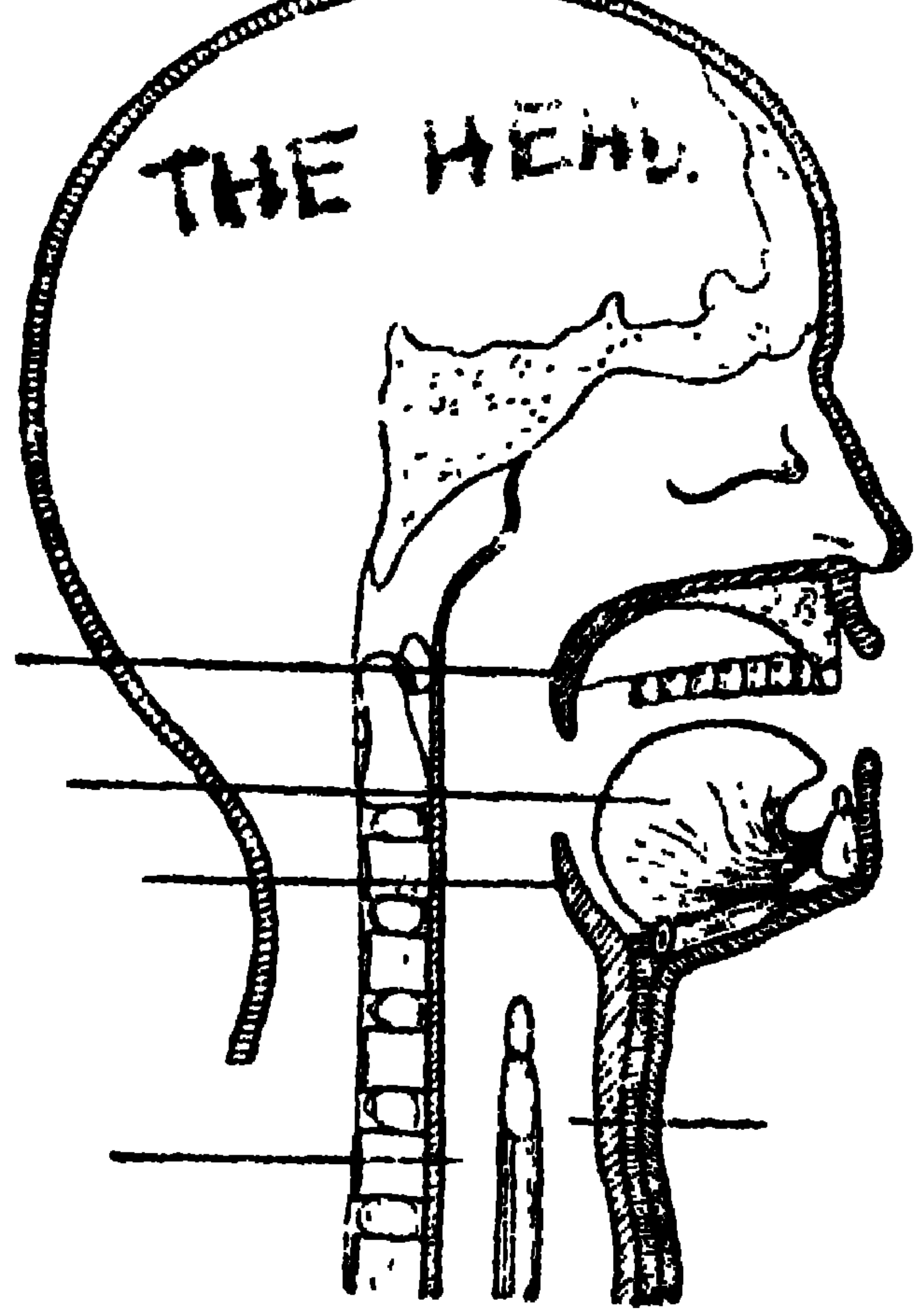

৮১। মুখ গহ্বর

(trachea) ও অপরটি **গলনালী** (gullet)। শ্বাসনালী অগ্রে ও গলনালী তাহার পশ্চাতে। গলনালী ও আমাশয়ের (stomach) মধ্যের নালীর নাম অন্ননালী (oesophagus)। জিহ্বা গলদেশে আরম্ভ হইয়া সম্মুখে প্রসারিত। জিহ্বার গোড়ায় ও শ্বাসনালীর উপরে এক ঢাকনা থাকে। তাহার নাম **অধিজিহ্বা** (epiglottis)। খাইবার সময় শ্বাসনালী

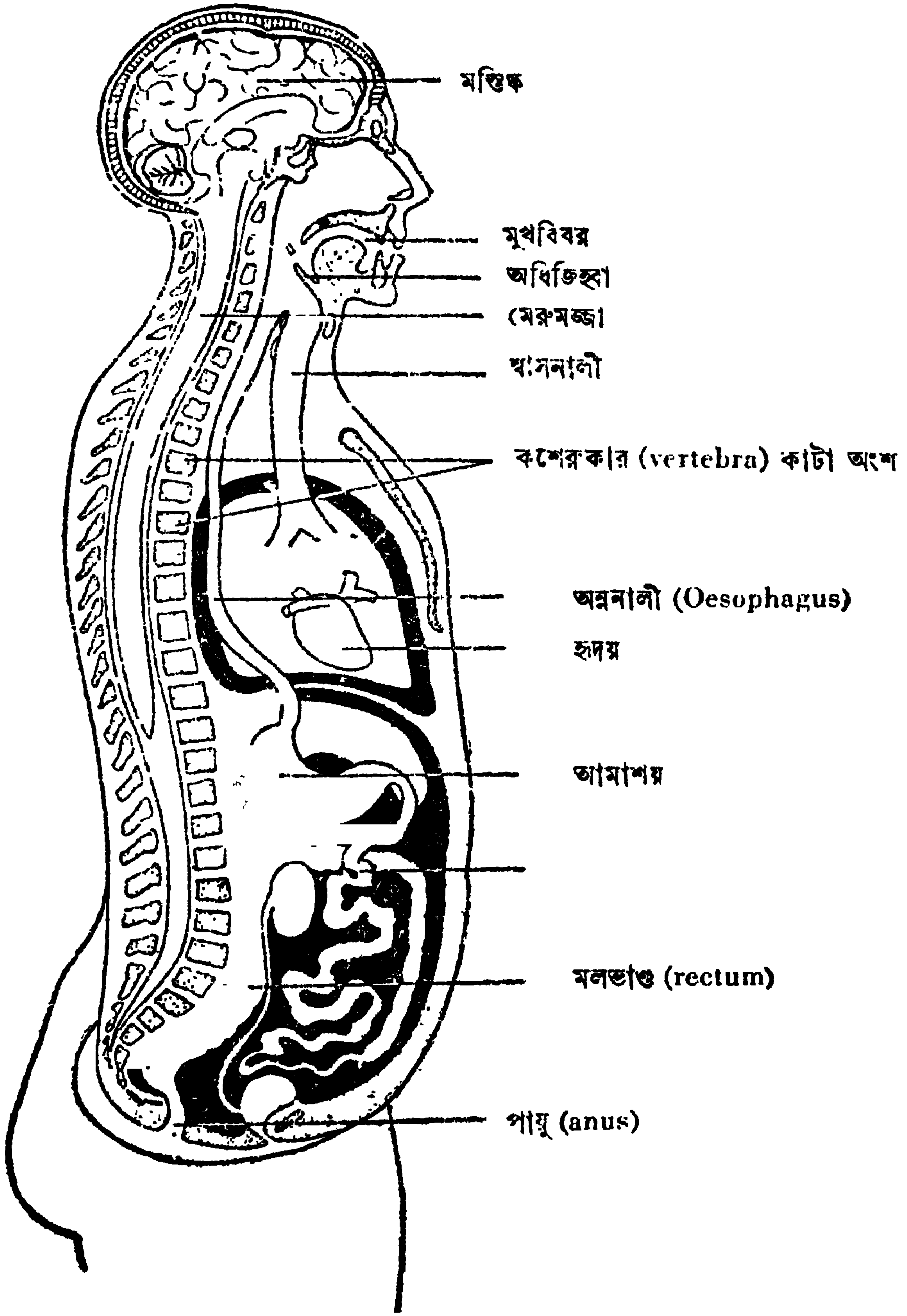

৮২। মানবদেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি

এই ঢাকনা দিয়া বন্ধ হইলে চর্ব্বিত খাদ্য গলনালী দিয়া নামিয়া যায়। মুখবিবরের ছাদের নাম **তালু** (hard palate)। এই তালু বেশ কঠিন। ইহার পিছনে আছে **নরমতালু** (soft palate)। এই নরম তালু নাসারন্ধ্রের মুখ বন্ধ করিয়া ফেরিংক্স হইতে পৃথক্ রাখে। খাইবার সময় এই দুই ঢাকনার (অধিজিহ্বা ও নরম তালুর) কার্য্যে কোন গোলযোগ ঘটিলে খাদ্যকণা শ্বাসনালী বা নাসারন্ধ্রে অকস্মাৎ ঢুকিয়া গিয়া বড় কষ্ট দেয়। ইহাকেই আমরা বলি **বিষম লাগা**।

২। **বক্ষোগহ্বর** (thoracic cavity)—ইহা দেহকাণ্ডের উপরিভাগ। দেখিতে একটি পিঞ্জরের ন্যায়। সম্মুখে **উরঃফলক** (sternum), পশ্চাতে মেরুদণ্ডের দ্বাদশটি কশেরুকা, দুই পার্শ্বে দ্বাদশ জোড়া **পঞ্জরাস্থি** (rib), যাহাকে চলিত কথায় পাঁজরা বলে। প্রত্যেক কশেরুকা হইতে এক এক জোড়া পাঁজরা বাহির হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উপরের দশ জোড়া উরঃফলক অর্থাৎ বুকের হাড়ের সহিত সংযুক্ত, নীচের দুই জোড়া অতদূর পৌঁছায় নাই। পাঁজরাগুলি চেপ্টা, বাঁকা হাড়। উহাদের সম্মুখভাগ নরম তরুণাস্থিদ্বারা গঠিত। উরঃফলকের সহিত সংলগ্ন আরও এক জোড়া হাড় দেখা যায়। তাহাদের নাম **কণ্ঠাস্থি** (clavicle)। তাহারা কণ্ঠদেশের নিম্নে দুই পার্শ্বে অবস্থিত।

৩। **উদর গহ্বর** (abdominal cavity)—ইহা দেহকাণ্ডের নিম্নভাগ। কাণ্ডের উপরিভাগ ও নিম্নভাগ এই দুই ভাগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে একটি পেশীর আবরণ, যাহাকে **মধ্যচ্ছদা** (diaphragm) বলা হয়। ইসোফেগস এই আবরণ ভেদ করিয়া নীচে যাইয়া **আমাশয়ের** (stomach) সহিত মিলিয়াছে। ইহা ছাড়া **অন্ত্র** (intestine), **প্লীহা** (spleen), **যকৃৎ** (liver), **অগ্ন্যাশয়** (pancreas), **বৃক্ক** (kidney), **মূত্রাশয়** (urinary bladder)

এবং **জননেন্দ্রিয়** (reproductive organs) ও এই গহ্বরে অবস্থিত।

এই গহ্বরের উপর-সীমা **মধ্যচ্ছদা** (diaphragm), পশ্চাৎ সীমা মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ ও নিম্ন সীমা **বস্তি প্রদেশ** (pelvic region)।

হস্তপদাদি অবয়ব

(Fore and hind limbs)

ইহারা দেহকাণ্ডের শাখাস্বরূপ। বাহুর তিন ভাগ—**প্রগণ্ড** (upper arm), **প্রকোষ্ঠ** (fore arm), ও **হস্ত** (hand)। প্রগণ্ডে একটি অস্থি—**প্রগণ্ডাস্থি** (humerus), প্রকোষ্ঠে দুইটি—**প্রকোষ্ঠাস্থি** (radius), **অনুপ্রকোষ্ঠাস্থি** (ulna) ও হস্তে সাতাইশটি। হস্তের সাতাইশটি অস্থি তিনভাগে বিভক্ত—**মণিবন্ধ** (carpals), **করভাস্থি** (metacarpals) ও **অঙ্গুলাস্থি** (phalanges)। পঞ্চ অঙ্গুলির নাম, অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা।

পদেরও তিন অংশ—**উরু**—(thigh), **জঙ্ঘা** (shank) ও **চরণ** (foot) উরুতে একটি অস্থি—**উর্ব্বস্থি** (femur), জঙ্ঘাতে দুইটি —**জঙ্ঘাস্থি** (tibia), **অনুজঙ্ঘাস্থি** (febula) ও চরণে ছাব্বিশটি। শেষোক্ত ছাব্বিশটি অস্থিকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। **চরণসন্ধ্যস্থি** (tarsal), **পদতলাস্থি** (metatarsal) ও **অঙ্গুলাস্থি** (phalanges)।

Questions

1. What are the main divisions of the human body?
2. What are the sub-divisions of the vertebral column?
3. What is epiglottis and what is uvula?
4. What are the structures that are found in the thorax and abdomen?
5. Mention the constituent parts of fore and hind limbs.

তৃতীয় অধ্যায়

মানবদেহের উপাদান

(Composition of the human body)

কোষ ও তন্তু (cell and tissue)—জীববিজ্ঞানে পড়িয়াছ যে জীবদেহমাত্রই কতকগুলি **কোষ** (cell) দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক কোষে **প্রোটপ্লাজ্‌ম্** (protoplasm) নামক জীবিত বস্তু থাকে। ইহাদের মধ্যে আরও একটি ঘন বস্তু থাকে, যাহাকে **নিউক্লিয়স** (nucleus) কহে। কতকগুলি কোষ দ্বারা নানাপ্রকার **তন্তু** (tissue) তৈয়ারী হয়। এই সকল তন্তু হইতে শরীরের যন্ত্রসমূহ ও অবয়বাদি গঠিত হয়। সাধারণতঃ এই তন্তু চারিপ্রকার।

(১) **আচ্ছাদক তন্তু** (Epithelial tissue)—শরীরের অনাবৃত স্থানসকল এই তন্তুর দ্বারা আবৃত থাকে। যেমন গাত্রচর্ম্মের উপরাংশ।

(২) **সংযোজক তন্তু** (Connective tissue)—ইহা শরীরের সর্ব্বস্থানে থাকিয়া যন্ত্রাদির বিভিন্ন অংশকে অথবা এক যন্ত্রের সহিত অন্য যন্ত্রকে যুক্ত করে। মেদ, তরুণাস্থি, অস্থি, দন্ত এবং রক্ত এইপ্রকার তন্তুর মধ্যে পড়ে ; কারণ এই সকল তন্তুর একইভাবে উৎপত্তি হয়।

(৩) **পেশী তন্তু** (Muscular tissue)—ইহা দ্বারা হস্ত-পদাদির সঞ্চালন, পরিভ্রমণ প্রভৃতি বিবিধ দৈহিক কার্য্য সাধিত হয়।

(৪) **বার্ত্তাবহ তন্তু** (Nervous tissue)—যাহার দ্বারা আমাদের বোধশক্তি হয়। মস্তিষ্ক হইতে দেহের অন্যস্থানে অথবা দেহের অন্যস্থান হইতে কোনও উদ্দীপনা ইহাদের সাহায্যে মস্তিষ্কে যায়।

১। রক্ত (Blood)

রক্ত ও উহার উপাদান (Blood and its ingredients)—রক্ত উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ তরল পদার্থ। ইহা হইতে শরীরের প্রত্যেক তন্তুর (tissue) পুষ্টি ও দূষিত পদার্থ যাহা তন্তু হইতে পরিত্যক্ত হয়, তাহা শরীর হইতে বাহিরে যাইবার সাহায্য হয়। রক্তের প্রধান উপাদান — **রক্তরস** (plasma), **লোহিত কণিকা** (red blood corpuscles), ও **শ্বেতকণিকা** (white blood corpuscles)। শরীর হইতে রক্তপাত হইলে দুই তিন মিনিটে তরল রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়। জমাট রক্তে শ্বেত ও লোহিত কণিকাগুলি পিণ্ডাকারে থাকে ও তাহা হইতে একপ্রকার তরল পদার্থ চুঁয়াইয়া বাহির হয়, এই রসকে **রক্তমণ্ড** (serum) বলে।

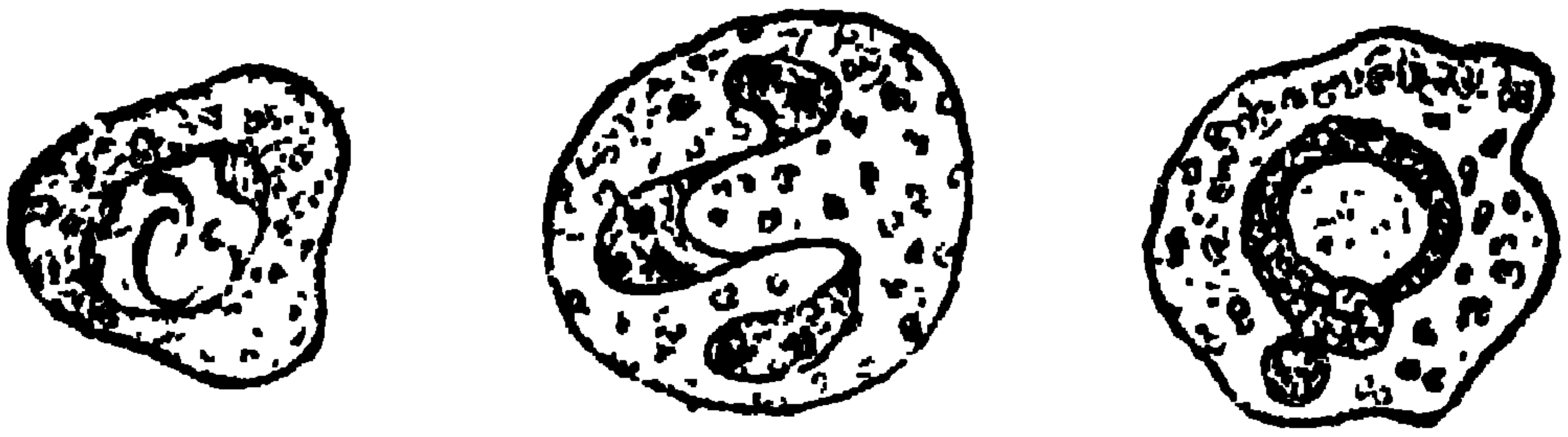

শ্বেত রক্ত কণিকা

লোহিত রক্ত কণিকা

৮৩। রক্ত

রক্ত শরীর হইতে বাহির হইলে রক্তরসে যে একপ্রকার পদার্থ থাকে তাহাকে **ফাইব্রিন** (fibrin) বলে, তাহা পৃথক্ হইয়া যায়। রক্ত যখন শরীরের মধ্যে তরলভাবে থাকে তখন এই সূতার মত ফাইব্রিন ফাইব্রিনোজেন অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সেই অবস্থায় ইহা তরল। ফাইব্রিনোজেন শরীর হইতে বাহিরে আসিলেই ফাইব্রিনে পরিণত হয় ও

তাহা কণিকার সহিত মিলিয়া জমাট রক্তে পরিণত হয়। রক্তরস (plasma) হইতে ফাইব্রিন ও শ্বেত এবং লোহিত কণিকা মিলিত হইলে রক্ত জমাট বাঁধে।

(১) **রক্তরস** (plasma)—ইহাতে জল, লবণ, অ্যাল্‌বুমেন (albumen) ও ফাইব্রিনোজেন থাকে। রং ফিকা হরিদ্রাভ।

(২) **লোহিতকণিকা** (red blood corpuscles)—ইহাদের আকার গোল, মাঝখানটা চেপ্টা। ইহাদের মধ্যে **হিমোগ্লোবিন** (hæmoglobin) নামক রঞ্জন পদার্থ থাকায় লাল দেখায়। হিমোগ্লোবিনের ভিতর খুব সামান্য মাত্রায় লৌহ থাকে। শ্বাস লওয়ার সঙ্গে বাতাস হইতে হিমোগ্লোবিন সত্বর অক্সিজেন লইতে পারে এবং সেই অক্সিজেন দেহকোষে পরিবেশন করে ও দেহকোষ হইতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ফুসফুসে লইয়া যায়। এইজন্য হিমোগ্লোবিনকে অক্সিজেনবাহক (carrier of oxygen) বলে। ইহাদের আয়তন $\frac{১}{৩০,০০}$ ইঞ্চি।

(৩) **শ্বেতকণিকা** (white blood corpuscles বা leucocytes লিউকোসাইট্‌স) বর্ণহীন। প্রায় প্রতি ৫০০ লোহিত-কণিকায় ১টি করিয়া শ্বেতকণিকা থাকে। ইহাদের আকৃতি লোহিতকণিকা অপেক্ষা অনেক বড়। ইহারা আমাদের দেহরক্ষীর কাজ করে। ইহাদের দেহ অত্যন্ত মোলায়েম এবং নানাদিকে বাঁকাইতে পারে। একটি জীবাণু যখন শ্বেতকণিকার কাছে আসে, তখন শ্বেতকণিকা ঐ জীবাণুর দিকে ছোট ছোট আঙ্গুলের মত অঙ্গ বাড়াইয়া দেয়; পরে দুইটি অঙ্গুলিসদৃশ অঙ্গদ্বারা জীবাণুটিকে ঘিরিয়া ফেলে এবং সর্ব্বতোভাবে নিজদেহ মধ্যে গ্রহণ করে। জয় করিতে না পারিলে নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমাদের দেহের

যে কোন অংশের ক্ষত হইতে যে পুঁজ পড়ে সেই পুঁজের কতকাংশ শ্বেতকণিকার মৃতদেহ। শ্বেতকণিকার আয়তন $\frac{১}{২৫,০০০}$ ইঞ্চি।

রক্তবহা নাড়ী (blood vessels)—যে সকল নালী বা নাড়ী (vessels) দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় তাহাদিগকে রক্তবহা নাড়ী কহে।

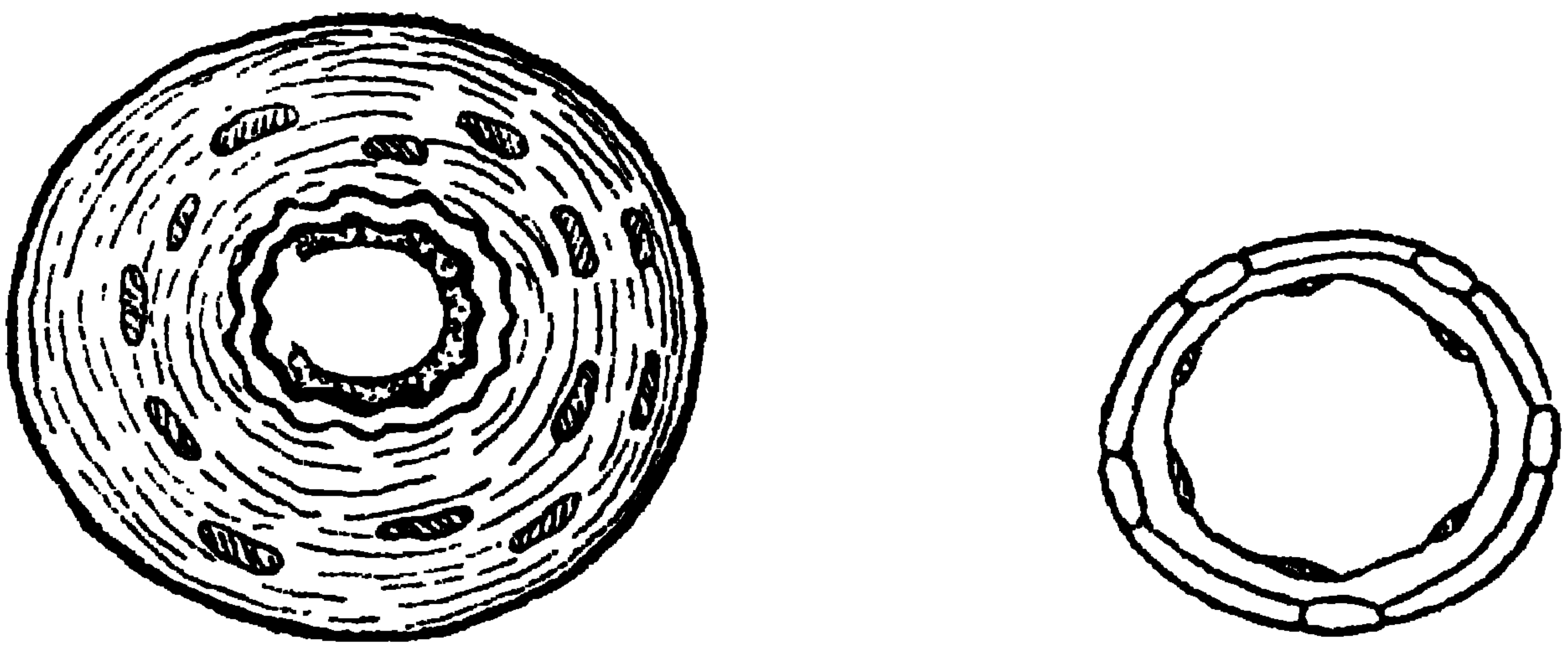

৮৪। ধমনী ও শিরার অনুপ্রস্থচ্ছেদ

ইহা তিন প্রকার—(১) **ধমনী** (artery)—হৃদয় হইতে বিশুদ্ধ রক্ত দেহের অন্যান্য স্থানে লইয়া যায়। ইহাদের গাত্র মোটা ও স্থিতিস্থাপক। (২) **শিরা** (vein)—দেহের অন্যান্য স্থান হইতে সাধারণতঃ অপরিষ্কার রক্ত সংগৃহীত করিয়া হৃদয়ে লইয়া যায়। ইহার গাত্র পাতলা ও তাহাতে **কপাটিকা** (valve) আছে যাহাতে রক্ত বিপরীত দিকে না যাইতে পারে, কারণ ইহাদের ধমনীর মত স্থিতিস্থাপক গুণ নাই। (৩) **কৈশিক নাড়ী** (capillary)—দেহকোষের নিকটে রক্ত লইয়া যাইবার মত ধমনী বা তথা হইতে রক্ত লইয়া আসিবার মত শিরা এত সূক্ষ্ম হইতে পারে না বলিয়া ইহাদের মাঝের স্থানটুকুতে এই কৈশিক নাড়ীজাল বিস্তৃত থাকে। ইহাদের গাত্র অত্যন্ত পাতলা এবং তাহার ভিতর দিয়া রক্তের

জলীয় অংশ, যাহাকে **লসিকা** (lymph) বলে তাহা বাহির হইয়া তন্তুমধ্যে প্রবেশ করে।

২। নার্ভ তন্ত্র Nervous System)

নার্ভ তন্ত্রের প্রধান বিভাগ—আমাদের দেহস্থ নার্ভগুলির গঠন সূত্রবৎ, বর্ণ পীতাভ। ইহারা প্রধানতঃ **মস্তিষ্ক** (brain) ও **মেরুমজ্জা** (spinal cord) হইতে উদ্ভূত হইয়া শরীরের যাবতীয় যন্ত্রাদিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের সমষ্টিকে **নার্ভতন্ত্র** (nervous system) নাম দেওয়া হইয়াছে। এই তন্ত্রই আমাদের দেহ-মনের প্রত্যেকটি গতি, অনুভূতি, চেষ্টা ও কার্য্যের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা এবং রাজ্যের শাসনকর্ত্তার মত দেহের প্রত্যেক ব্যাপারটির পরিচালন ও তদারক করিতেছে।

নার্ভের আকার ও অংশ—আমাদের দেহের অন্যান্য অংশের ন্যায় নার্ভগুলি কোষদ্বারা গঠিত। তবে প্রত্যেক **নার্ভ-সূত্র** (nerve fibril) এক একটি বিভিন্ন কোষ হইতে উৎপন্ন। প্রতি **নার্ভ-কোষের** (nerve cell) ভিতর **নিউক্লিয়স** (nucleus) থাকে। কোষমধ্যস্থ প্রোটপ্লাজ্‌ম একদিকে সূতার মত বর্দ্ধিত হয়। এই সূত্রবৎ বর্দ্ধিতাংশের নাম **অ্যাক্সন** (axon)। ক্রমে উহার চারিধারে আবরণ জন্মিলে উহার নাম হইয়া যায় নার্ভসূত্র ও অপরদিকে যে অংশ প্রবর্দ্ধিত হয় তাহাকে বলে **ডেনড্রাইট** (dendrites)। এই নার্ভ-সূত্র একটি কোষ হইতে উত্থিত হইয়া একেবারে যন্ত্র-গঠনাদিতে পৌঁছায় না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে উহা কতদূর আসিয়া ডেনড্রাইট সমূহের মত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং তাহারা আর একটি কোষের ডেনড্রাইটের সহিত যুক্ত হয়।

এই রকম করিয়া বাড়িয়া বাড়িয়া যন্ত্রগঠনাদিতে পৌঁছিয়া ছড়াইয়া পড়ে। ইহাই হইল নার্ভ-সূত্রের মূল গঠন। সচরাচর আমরা যাহা নার্ভ নামে অভিহিত করি, তাহা এইরূপ অনেকগুলি নার্ভ-সূত্রের সমষ্টি বা **নার্ভ-রজ্জু** (nerve fibril)।

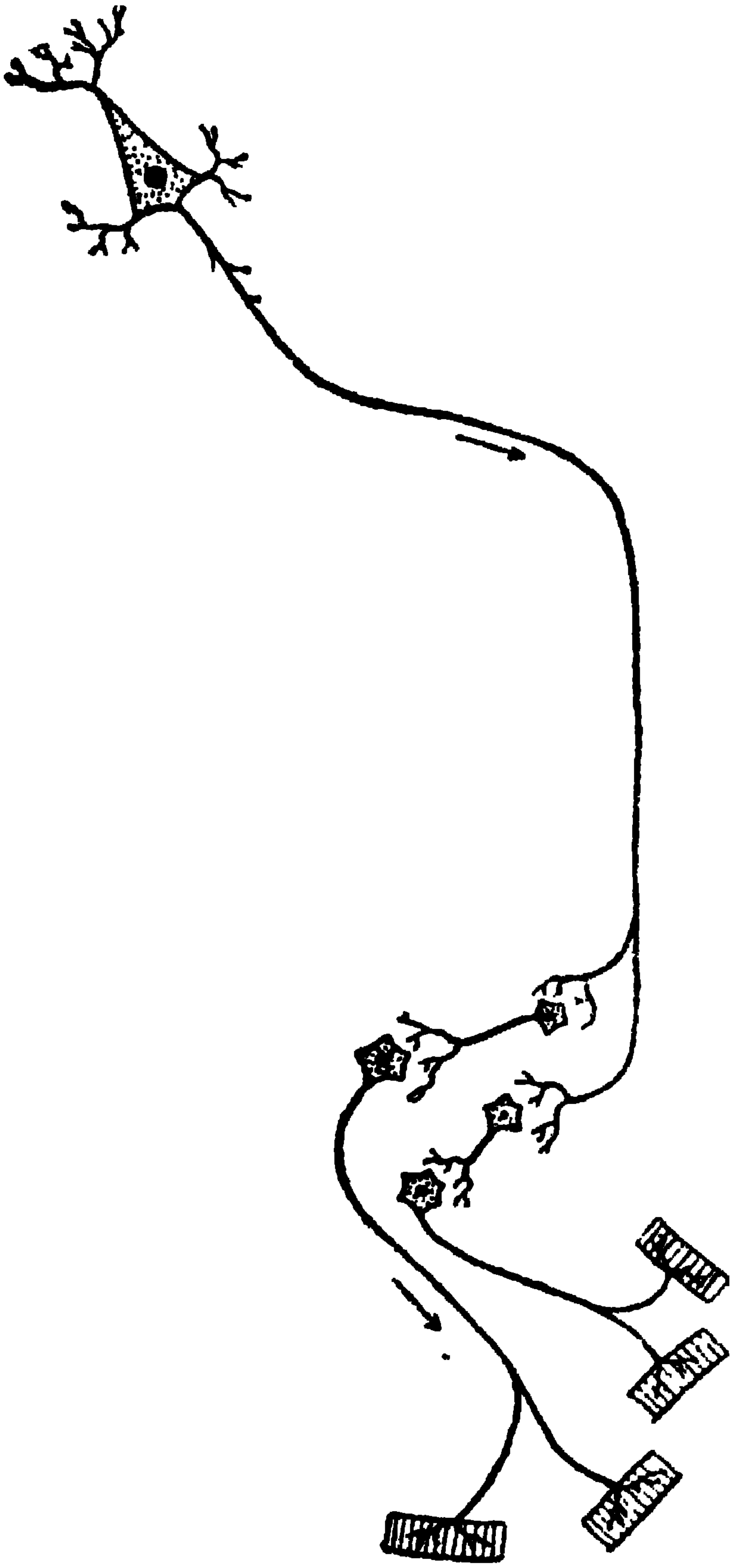

৮৫। নার্ভকোষ, উহার নিউক্লিয়স এবং প্রকাণ্ড নার্ভসূত্র অ্যাক্সন ও ছোট সূত্র ডেনড্রাইট। অ্যাক্সন আবার অন্য নার্ভ-কোষের ডেনড্রাইটের সহিত সংযুক্ত হয়।

কোথাও কোথাও এই নার্ভরজ্জুর উৎপত্তিস্থান ঈষৎ স্ফীতাকার। এই স্ফীত স্থানের নাম **গ্রন্থি** বা ganglion। যেমনভাবে একটি নার্ভ-সূত্র আর একটির সহিত সংলগ্ন, ঠিক সেই ভাবেই গ্রন্থিসমূহ মেরু-মজ্জা বা মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত। মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্ক নার্ভ কোষ সমূহ দিয়া গঠিত এবং তাহারাও উক্ত পদ্ধতিতে অ্যাক্সন বা নার্ভসূত্র দিয়া পরস্পর যুক্ত। মস্তক-প্রদেশের নার্ভসমূহ মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত এবং দেহ-কাণ্ডস্থ নার্ভসহ মেরুমজ্জার সহিত সংযুক্ত। মেরুমজ্জার সহিত মস্তিষ্কের

অন্তরঙ্গ যোগ থাকায় মস্তিষ্ককেই আমরা বোধশক্তির ও ক্রিয়ার প্রধান কেন্দ্র বলি।

নার্ভের প্রকার-ভেদ (Types of nerves)—সাধারণ নার্ভগুলি দুই প্রকারে **উত্তেজনার** (impulse) চালনা করিয়া থাকে। যাহারা প্রধান নার্ভকেন্দ্রের অভিমুখে impulse চালনা করে, তাহাদিগকে বলা হয় **অন্তর্ব্বাহী** (afferent) নার্ভ বা **সংজ্ঞাবাহী** (sensory) নার্ভ। অর্থাৎ ইহাদের সাহায্যে আমরা বাহ্যবস্তুর স্বরূপ বা জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারি। দ্বিতীয় প্রকার নার্ভের নাম **বহির্ব্বাহী** (efferent) নার্ভ বা **চালক** (motor) নার্ভ। ইহারা কেন্দ্র হইতে বহির্ম্মুখে উত্তেজনার চালনা করিয়া থাকে। অর্থাৎ ইহাদের সাহায্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চালিত হয়।

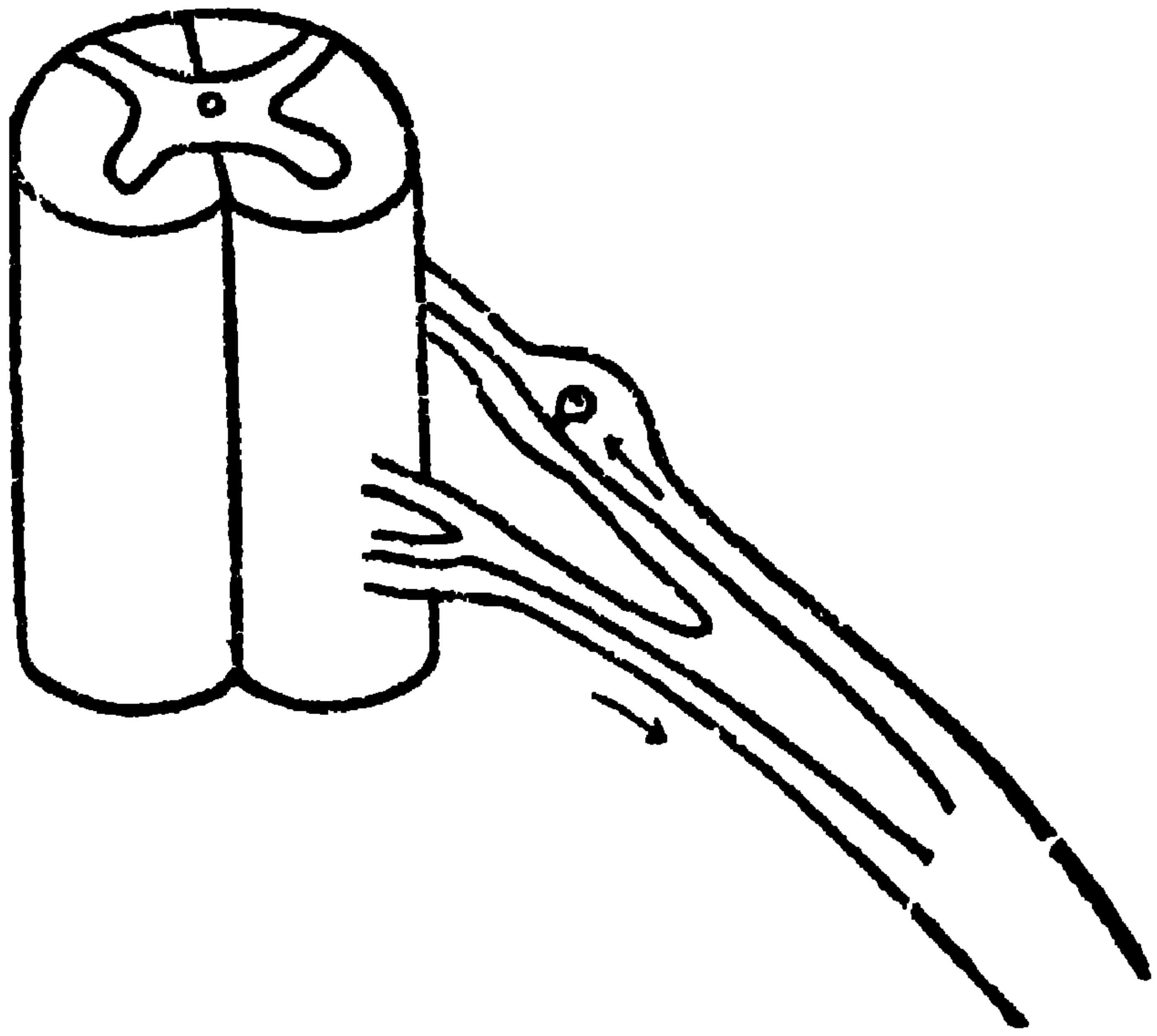

৮৬। মেরুমজ্জার অংশ ও দক্ষিণদিকের নার্ভগ্রন্থি ও সূত্র দেখান হইয়াছে। পেটের দিক্ দিয়া উত্তেজনা আসে ও পিঠের দিক্ দিয়া উত্তেজনা মেরুমজ্জায় যায়।

নার্ভতন্ত্রের সাধারণ ক্রিয়া ও প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া—মেরুমজ্জার যে স্থান হইতে নার্ভ উঠিয়াছে তাহাকে **নার্ভ-মূল** (nerve root) কহে। মেরু-মজ্জার পেটের ও পিঠের দিকে দুইটি করিয়া নার্ভ-মূল আছে, পিঠের দিকের নার্ভটি একটু স্বতন্ত্রপ্রকার। ইহার মূল স্ফীত অর্থাৎ গ্রন্থিময়। দুইটি একত্র মিশিয়া একটি নার্ভগুচ্ছ গঠিত হইয়াছে। পরে এই নার্ভগুচ্ছ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া যন্ত্র গঠনাদিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পেটের দিকের নার্ভ-রজ্জু দিয়া উত্তেজনা

(impulse) যন্ত্রাভিমুখে প্রসারিত হয় এবং যাবতীয় উত্তেজনা (impulse) যন্ত্র-গঠনাদি হইতে নার্ভরজ্জু দিয়া বাহিত হইয়া প্রথমে পিঠের দিকের গ্রন্থিতে পৌছায় এবং তাহার পর মেরুমজ্জার মধ্যস্থিত কেন্দ্রে পৌছায়। এই স্থানে পৌছিয়া ইহার গতি দুইদিকে প্রবাহিত

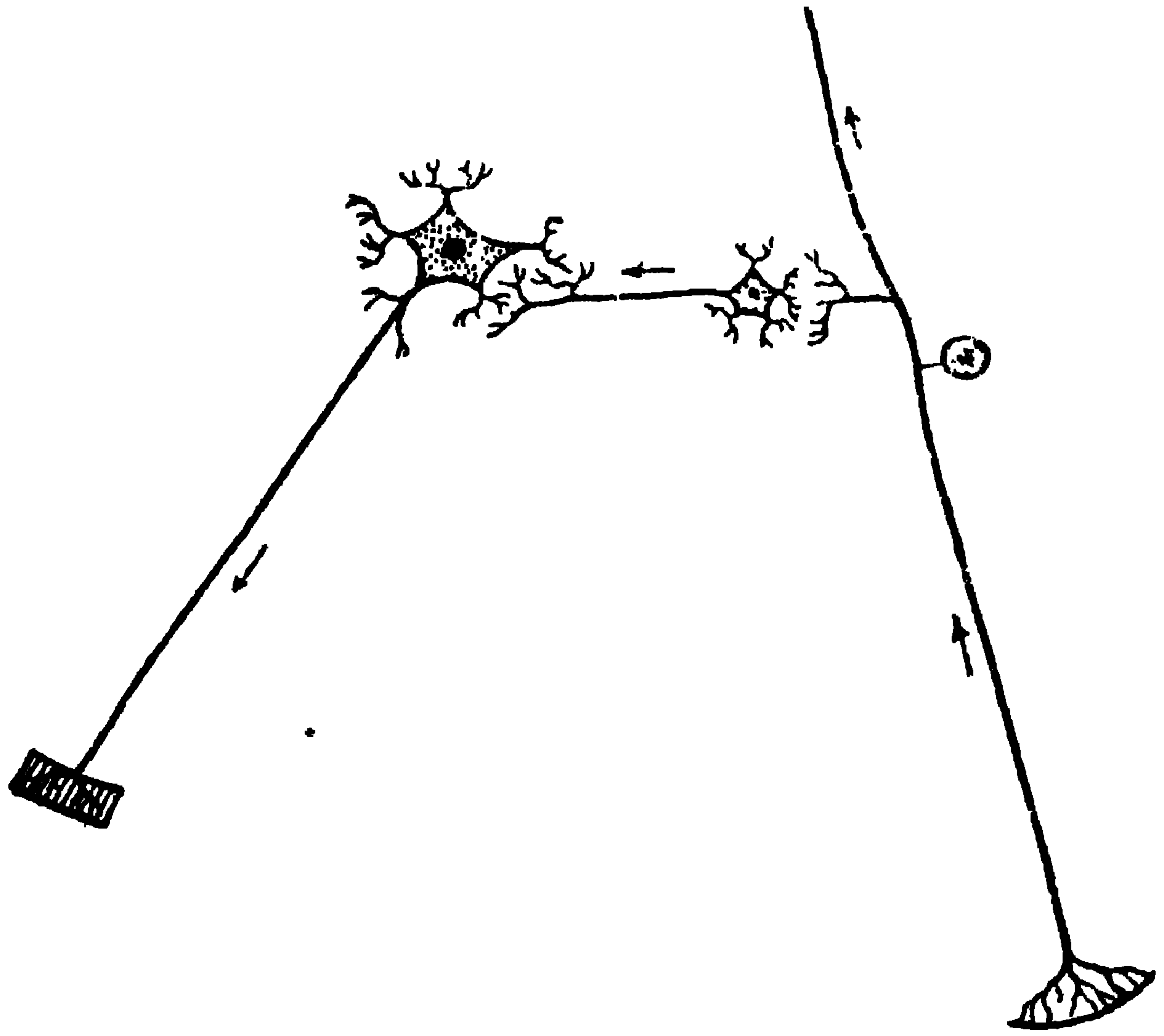

৮৭। ডানদিকের নীচে মশা কামড়াইলে উত্তেজনা কি ভাবে মাথার দিকে না গিয়া বামে অন্য নার্ভ দিয়া হাতের মাংসপেশীতে যায় তাহাই দেখান হইয়াছে।

হইতে পারে। একটি মস্তিষ্কের মূল কেন্দ্রের দিকে আর একটি পেটের দিকের নার্ভ দিয়া ফিরিয়া যাইতে পারে। মস্তিষ্কে পৌছানর প্রধান উদ্দেশ্য সংজ্ঞার স্বরূপ নিরূপণ। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখা যায় যে সংজ্ঞার স্বরূপ নিরূপণ না করিয়াও আবশ্যক কাজ সমাধা হইতে পারে। যেমন ঘুমন্ত লোক যে স্থানে মশা বসিয়াছে সেই স্থানে চপেটাঘাত করিতেছে

(না দেখিয়া বা মস্তিষ্ক দ্বারা উপলব্ধি না করিয়া)। এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে নার্ভ উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দিলেও চেতনা উদ্রেক করিতে পারে নাই। কারণ নিদ্রিত অবস্থায় মস্তিষ্ক সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয় থাকে। তখন দেখা যায় মধ্যপথে অর্থাৎ মেরুমজ্জার সহায়তায় মশা মারা বা তাড়ান হইয়া গিয়াছে। মশা যে স্থানে বসিয়াছিল সেই স্থানের কামড়ানর সংজ্ঞা নার্ভ দ্বারা বাহিত হইয়া পৃষ্ঠস্থ গ্রন্থি দিয়া মেরুমজ্জায় পৌঁছিল। সেই স্থান হইতে ঘুরিয়া পেটের দিকের চালক নার্ভ দিয়া চপেটাঘাতরূপে তাহা সাড়া দিল। নার্ভের এইরূপ ক্রিয়াকে **প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া** (reflex action) কহে। প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে মস্তিষ্কের সাহায্য ব্যতিরেকে ক্রিয়ানিয়ন্ত্রণ।

৩। অস্থি (Bone)

দেহের অস্থিগুলি খনিজ (mineral) ও জৈব (organic) পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। খনিজ পদার্থের প্রধান উপাদান **ক্যালসিয়ম ফসফেট** (calcium phosphate); কিন্তু তাহাতে **ক্যালসিয়ম কারবনেট** (calcium carbonate), **ক্যালসিয়ম ফ্লুয়োরাইড** (calcium fluoride) ও **ম্যাগনেসিয়ম ফসফেট** (magnesium phosphate) থাকে। জৈব পদার্থ বেশীর ভাগই **কোলাজেন** (collagen) নামক পদার্থ এবং ইহাকে ফুটাইলে **জেলেটিন** (gelatin) পাওয়া যায়।

আমাদের শরীরে ২০০ খানির বেশী হাড় আছে। আকার হিসাবে ইহাদিগকে চারিভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

(১) **লম্বা হাড়** (long bones)—ইহারা কাঠামোর কাজ করে।

(২) **ছোট হাড়** (short bones)—ইহারা পরস্পরকে দৃঢ় রাখে।

(৩) **চেপ্টা হাড়** (flat bones)—ইহারা মাথার, বক্ষের ও উদর গহ্বরের প্রাচীর তৈয়ার করে।

(৪) **অসম গঠন হাড়** (irregular bones)—ইহারা প্রধানতঃ হস্তপদাদিতে থাকে।

অস্থির উপর একটি পাতলা আবরণ থাকে, তাহাকে পেরিয়ষ্টিয়াম (periosteum) বলে। অস্থির উপরটা শক্ত ভিতরটা নরম,—এই নরম অংশকে মজ্জা (marrow) কহে। অস্থির সংযোগ-স্থলকে **সন্ধি** (joint) কহে। প্রত্যেক সন্ধিতে দুইখানি অস্থির প্রান্তদ্বয় কতকগুলি তন্তু দ্বারা শক্তভাবে সংযুক্ত থাকে। এই তন্তুগুলিকে **সন্ধি-বন্ধনী** (ligament) বলে।

ইহা ব্যতীত **তরুণাস্থি** (cartilage) আছে; অস্থি অপেক্ষা তরুণাস্থি কোমল ও স্থিতিস্থাপক কিন্তু উভয়ের উপাদান প্রায় একই প্রকার, বিশেষ প্রভেদ নাই।

৪। মাংস বা পেশী (Muscles)

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আমাদের হস্তপদাদির সঞ্চালন, হৃদয়ের স্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কার্য্য। এই সকল কার্য্যের প্রধান সহায়ক যে তন্তু তাহাকে পেশীতন্তু (muscular tissue) বলা হয়। এই পেশী দুই প্রকার—(১) **আয়ত্ত** (voluntary) —যাহারা সাধারণতঃ অস্থিগাত্রে সংলগ্ন থাকিয়া আমাদের ইচ্ছা অনুসারে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া আমাদের নড়ন চড়নের সহায়তা করে। (২) **অনায়ত্ত** (involuntary)—যাহারা যন্ত্রসমূহে থাকিয়া আমাদের

অজ্ঞাতে তাহাদের কার্য্য সম্পন্ন করে। হাত পায়ের পেশী ইচ্ছা করিলেই আমরা নাড়াইতে পারি, অতএব ইহারা আয়ত্ত। আমাশয়, হৃদয় ও অন্ত্র আমরা ইচ্ছা করিলে নাড়াইতে পারি না, অতএব ইহারা অনায়ত্তের মধ্যে পড়ে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় যে আয়ত্ত পেশীতন্তু ডোরাকাটা অর্থাৎ **চিহ্নিত** (striated)। এই সকল চিহ্নিত তন্তুমধ্যে যে নার্ভ প্রবেশ করে তাহারা **মেডালেটেড** (Medullated)। ইহাদের অধিকাংশই অস্থি-সংলগ্ন; কেবল ফ্যারিংক্স, ইসোফেগস্ (œsophagus) প্রভৃতি স্থানের পেশীতন্তু চিহ্নিত হইলেও অস্থিসংলগ্ন নহে। অনায়ত্ত পেশীসকল সাধারণতঃ **অচিহ্নিত** ও তাহাদের নার্ভ **নন মেডালেটেড** (non-medullated)। কতকগুলি অচিহ্নিত পেশী আছে তাহারা কিছু পরিমাণে আয়ত্ত, যেমন চক্ষুর **সিলিয়ারী** (ciliary muscles) পেশী ও **মূত্রাশয়ের** (bladder) পেশী। হৃদয়ের পেশী চিহ্নিত বটে কিন্তু তাহা অনায়ত্ত। সাধারণ চিহ্নিত পেশী হইতে ইহাদের দাগ ভিন্ন প্রকার।

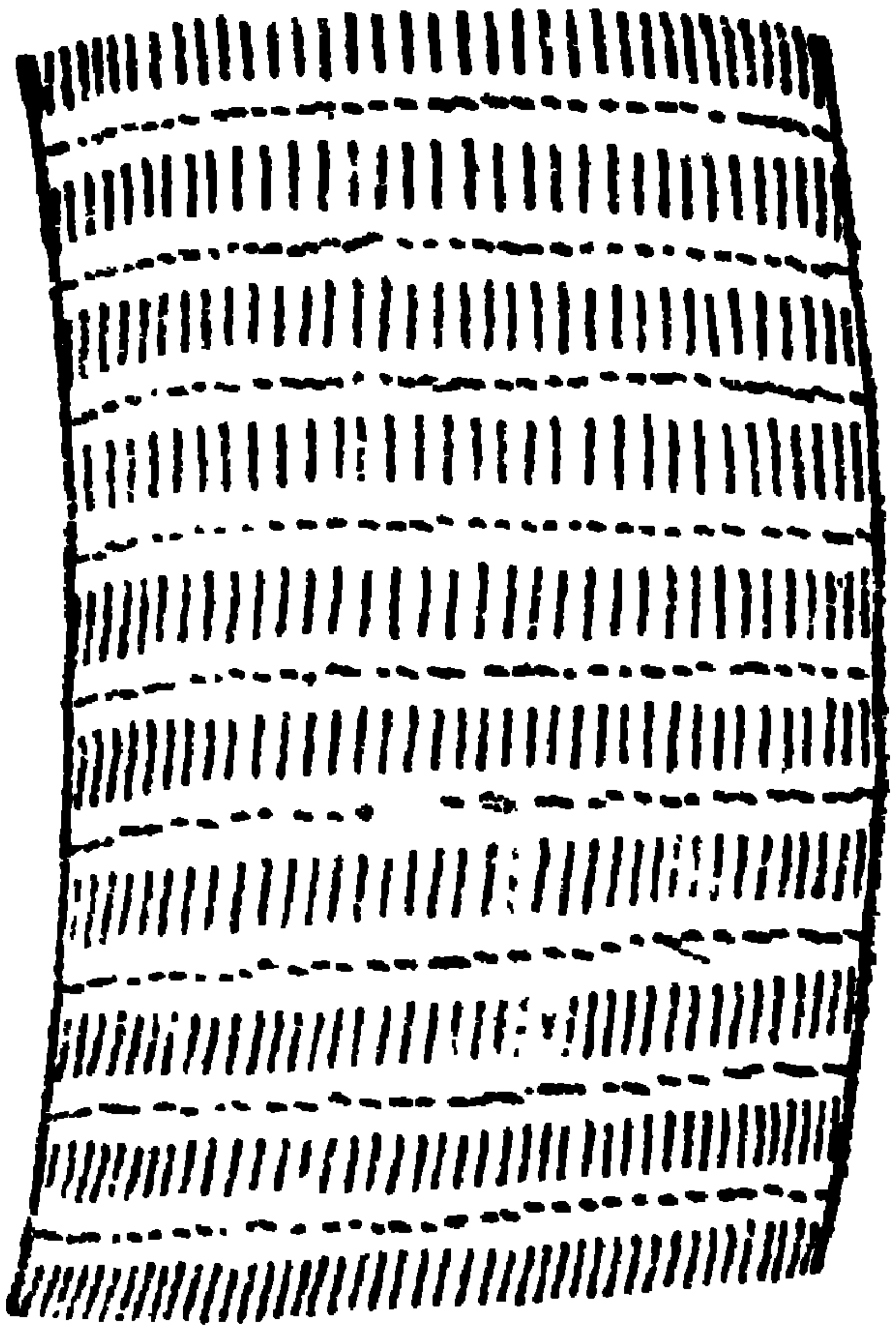

৮৮। চিহ্নিত পেশী

চিহ্নিত পেশী (striated muscle fibre)—পেশী সূচদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিলে ও অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া দেখিলে অনেক সূত্রবৎ দ্রব্য দৃষ্ট হয়। ইহাই পেশীকোষ। ইহাতে অনুপ্রস্থে সাদা ও কাল দাগ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক সাদা অংশমধ্যে বিন্দুময় একটি রেখা দেখা যায় তাহাকে **দোবির রেখা** (Dobie's line) কহে।

অচিহ্নিত পেশী (unstriped muscle fibre)—পৌষ্টিক নালী, মূত্রাশয়, ক্ষুদ্র বায়ুনল, পিত্তকোষ, ধমনী, শিরা প্রভৃতি স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কোষ দেখিতে পটলের ন্যায়। যদিও পূর্ব্বকথিত চিহ্নিত পেশীর ন্যায় নিয়মিত দাগ বা চিহ্ন নাই, তথাপি কোষমধ্যে দৈর্ঘ্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাগ দেখা যায়।

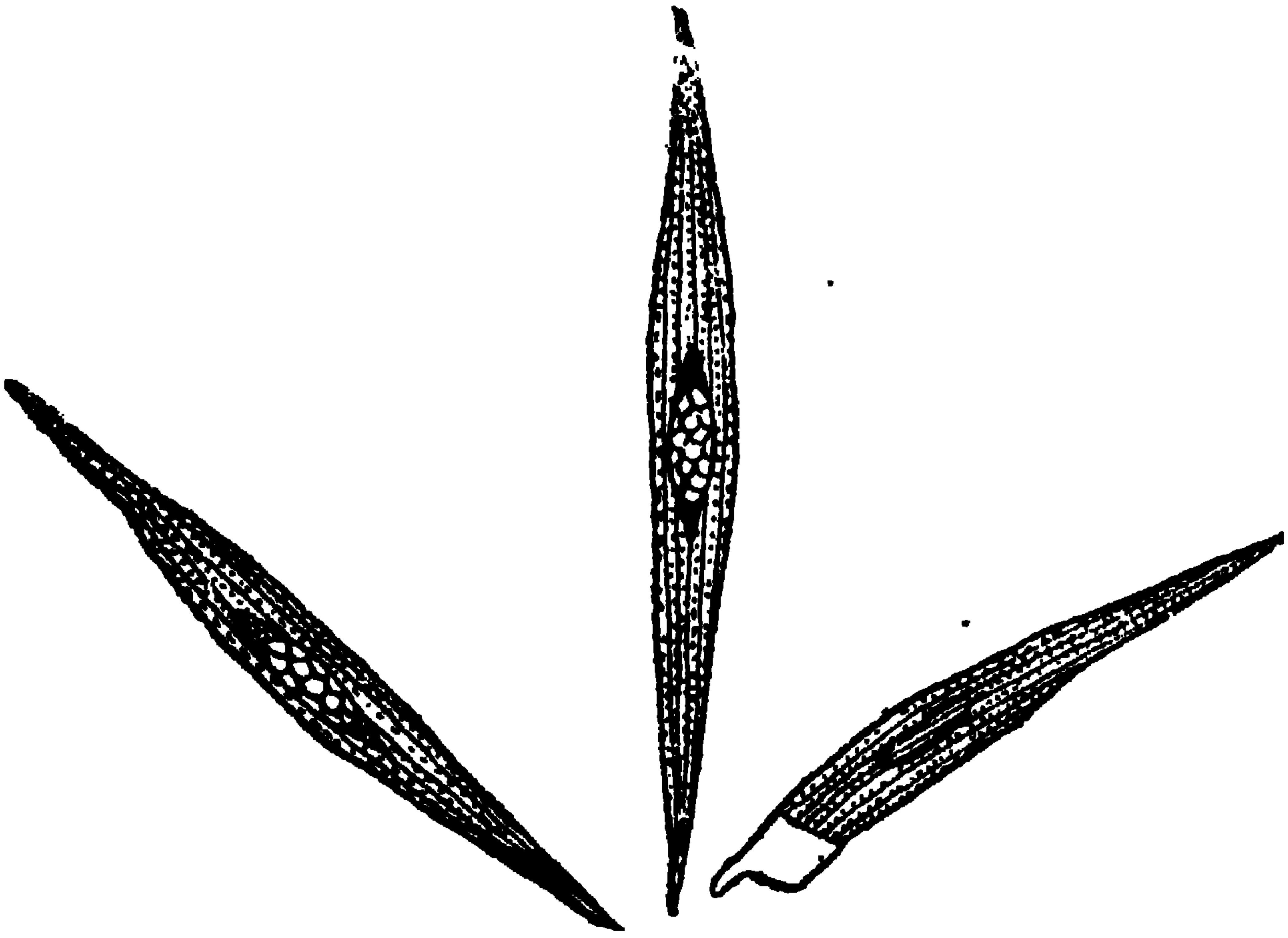

৮৯। অচিহ্নিত পেশী

হৃদয়ের অনায়ত্ত পেশী (striped involuntary muscle fibre)—ইহা অনায়ত্ত হইলেও চিহ্নিত। কোষসকল ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট। কাল চিহ্নসকল অস্পষ্ট ও নিয়মিত নহে।

পেশীর রাসায়নিক উপাদান—জীবন্ত দেহ হইতে পেশী কাটিয়া লইলে কিংবা মৃত্যু ঘটিলে পেশী কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাকে rigor mortis বলে। জীবন্ত ও মৃত পেশীর উপাদানে অনেক প্রভেদ।

জীবন্ত পেশীর উপাদান—মৃদুক্ষার জাতীয় ইহাতে myosinogen, glycogen, xanthin আছে।

মৃত পেশীর উপাদান—myosinogen-এর বদলে myosin এবং sarco-lactic acid আছে।

মৃত পেশীর rigor mortis-এর কারণ myosinogen জমাট বাঁধিয়া myosin হয়, যেমন রক্তের fibrinogen জমিয়া fibrin হয়।

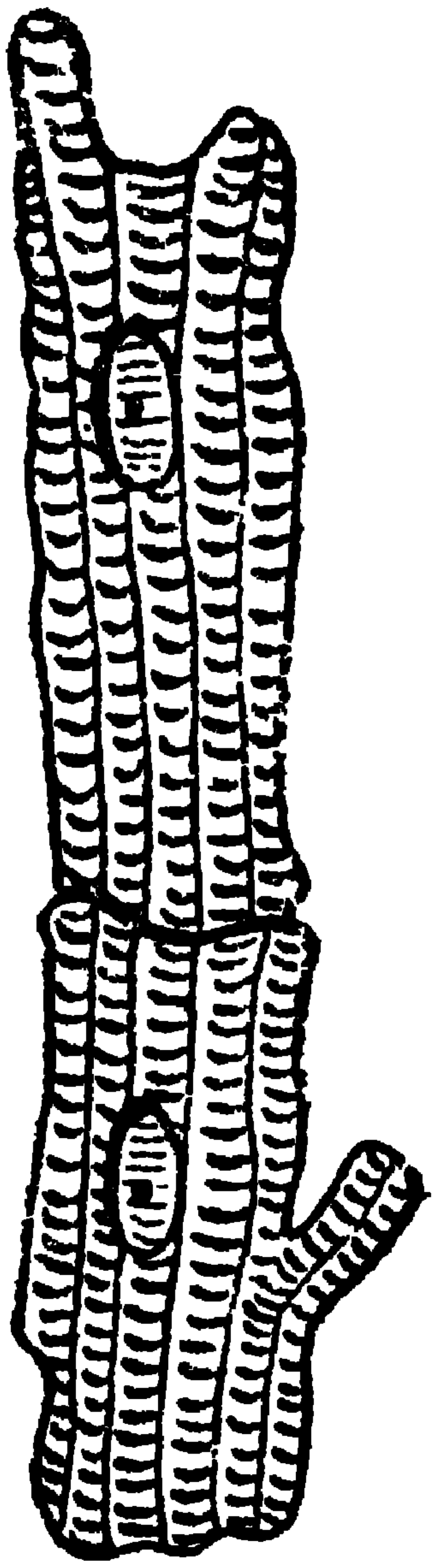

৯০। হৃদয়ের অনাবৃত্ত চিহ্নিত পেশী

৫। মেদ (Fat)

চর্ম্মের নীচে ও মাংসপেশীর উপরে যে সাদা তৈলাক্ত পদার্থ থাকে তাহাকে **মেদ** বা **চর্ব্বি** কহে।

মেদের কাজ—

১। শরীরকে নরম রাখাই মেদের প্রধান কাজ। ২। ইহা শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি করে। ৩। দেহে কর্ম্মশক্তি দেয়। ৪। আমরা যখন উপবাস করিয়া থাকি, তখন দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষার জন্য প্রথমে সঞ্চিত শর্করা, তারপর মেদ বা চর্ব্বি খরচ হয়

৬। ত্বক্ (Skin)

দেহের বহিরাবরণকে ত্বক্ কহে। ত্বকের কার্য্য নানাবিধ—

১। দেহাচ্ছাদন। ২। দেহোত্তাপের সমতা রক্ষা। ৩। স্পর্শবোধ, চাপানুভূতি, তাপানুভূতি ও বেদনানুভূতি। ৪। ঘর্ম্মসহ দেহমল নিষ্কাশন। স্বেদোদ্গম ত্বক্‌কে উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। ৫। মনের

সহিত ত্বকের নিকট সম্বন্ধ। ভয়ে বা আহ্লাদে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। ভয়ে মুখমণ্ডল সাদা রক্তশূন্য হইয়া যায়। ৬। ত্বক্ দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের শ্বাসকার্য্য সম্পন্ন হয়। স্নেহজাতীয় পদার্থ গ্রহণ।

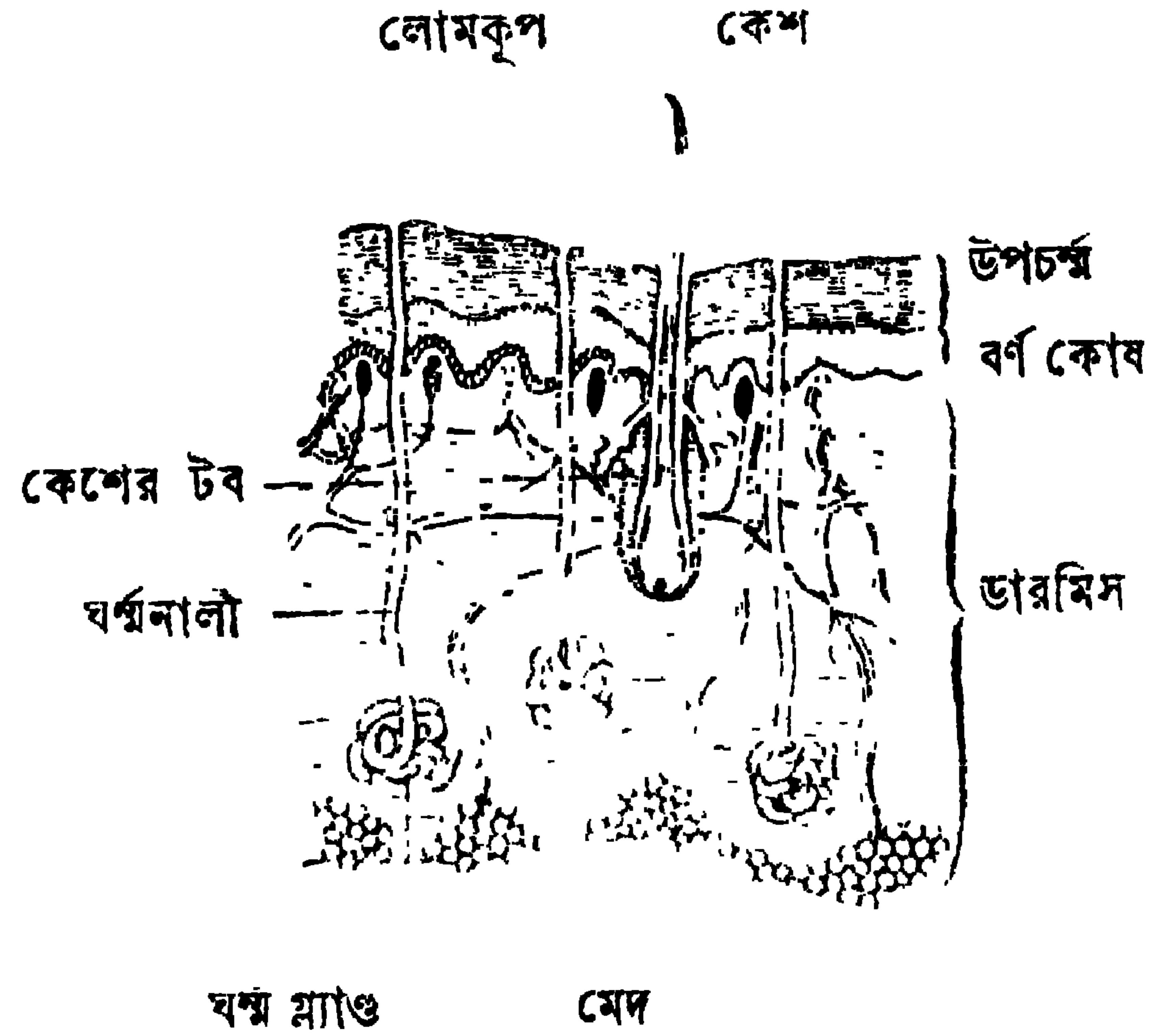

৯১। ত্বক

ত্বকের তিনটি স্তর—

১। **উপচর্ম্ম** (epidermis) বা নুনছাল—ঘর্ষণের ফলে নিত্যই উঠিতেছে ও দ্রুত নূতন করিয়া জন্মাইতেছে। ইহাতে নার্ভ নাই, সেজন্য সূচ ফুটাইলে লাগে না। রক্তবহা নালী (blood vessel) নাই, সেজন্য ফোসকা বা কড়া পড়িলে ছিঁড়িয়া বা তুলিয়া ফেলিলে রক্ত বাহির হয় না।

২। **বর্ণকোষ** ত্বক্ বা আসল চামড়ার বাহিরের স্তর।

৩। **ডারমিস** (dermis) আসল চর্ম্মের ভিতরের অংশ। ইহাতে নার্ভ, ধমনী, শিরা, ঘর্ম্ম (sweat gland) ও স্বেদ (sebaceous gland) নির্গমের গ্ল্যাণ্ড, লোম ও লোম খাড়া করিবার জন্য মাংসপেশী আছে।

লোমকূপ—(pores of the skin)—আমাদের ত্বকে যে অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম রন্ধ্র আছে তাহাদিগকে লোমকূপ কহে। লোমকূপ দেহের নর্দ্দমার কাজ করে। বহু দূষিত পদার্থ ঘর্ম্মাকারে এই কূপগুলি দিয়া বাহির হইয়া যায়। প্রত্যহ প্রায় আড়াই পোয়া ঘর্ম্ম আমাদের শরীর হইতে নির্গত হয়। যাহাতে ঘর্ম্মোদ্গম বন্ধ না হয় সেজন্য সর্ব্বদা ত্বক্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক।

কেশ (hair)—আসল চর্ম্মের (dermis) ভিতরে ঘামাচির মত ছোট টবে এক একটি কেশ প্রবিষ্ট থাকে ; ইহাকে **কেশের টব** (hair follicle) কহে। এই টবের মধ্যে নার্ভ, ধমনী প্রভৃতি গিয়া চুলের পুষ্টিসাধন করে। চুলের গোড়া ছাড়া আর কোথাও নার্ভ নাই বলিয়াই চুল কাটিবার সময় ব্যথা লাগে না।

নখ (nails)—নখ অঙ্গুলির প্রান্তে অবস্থিত। ইহা উপচর্ম্মেরই রূপান্তর। ইহার অগ্রভাগে নার্ভ নাই, এইজন্য নখ কাটিবার সময় আমরা বেদনা অনুভব করি না। নখ তিন অংশে বিভক্ত—১। অগ্রভাগ, ২। মধ্যভাগ, ৩। শেষভাগ।

Questions

1. How many forms of tissues are found in the human body? Mention their functions.
2. What do you know of human blood? Compare it with the blood of the earth-worm and of the mosquito. (C. U. 1944)
3. Distinguish between afferent and efferent nerves.
4. What is reflex action? (T. T. April, 1937)
5. Draw a diagram of the nervous system to show the different parts of which it is made up. What is 'reflex action'? Give some examples. (C. U. 1946)
6. What is the function of the skin?
7. Somebody hits you; you feel pain and hit back. What happens inside your body when this occurs? (C. U. 1943)

চতুর্থ অধ্যায়

শোণিতসঞ্চালন তন্ত্র

(Circulatory system)

রক্ত ও তাহার ক্রিয়া—রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া ধমনী, কৈশিকা বা জালক, শিরা প্রভৃতির পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। সমস্ত দেহ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে অৰ্দ্ধ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। অনবরত এইরূপে সারা দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্তের স্রোত বহিতেছে। শরীরের সমস্ত অংশ ক্রমাগতই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রক্তের কাজ নূতন উপাদান যোগাইয়া এই ক্ষয় পূরণ করা। কিন্তু রক্ত এ সমস্ত উপাদান পায় কোথায়? তোমার আহার্য্যদ্রব্য হইতে। রক্তসঞ্চালনের সহিত একদিকে পরিপাক যন্ত্রের যেমন নিকট-সম্পর্ক, অন্যদিকে শ্বাসক্রিয়ার সহিত তেমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্বাসকার্য্য দ্বারাই আমাদের রক্ত পরিশোধিত হইতেছে। হৃদয় বা হৃৎপিণ্ড এই স্রোতের নিয়ন্তা। অর্থাৎ হৃদয়ই ক্রমাগত পাম্প চালাইয়া সর্ব্বশরীরে এই স্রোত বহাইতেছে।

হৃদয় (heart)—ইহা ফুসফুস দুইটির মধ্যে অবস্থিত। গঠন অনেকটা নোনা আতার মত। আয়তনে প্রায় আমাদের হাতের মুষ্টির সমান। ইহা ফাঁপা মাংসপিণ্ড। ইহার উপর একটি পাতলা আবরণ থাকে, তাহাকে হৃদয়াবরণ (pericardium) কহে। হৃদয়ের ভিতরটা যেন দুই তলা বাড়ী—উপরে দুইটি প্রকোষ্ঠ, নীচে দুইটি প্রকোষ্ঠ। উপরের প্রকোষ্ঠের নাম **অলিন্দ** (auricle) ও নীচের

প্রকোষ্ঠের নাম **নিলয়** (ventricle)। অলিন্দ-প্রকোষ্ঠদুটি ছোট, তাহার প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পাতলা। নিলয়দুটি বড়, তাহার প্রাচীরও মোটা। অলিন্দদ্বয়ের মধ্যে বা নিলয়দ্বয়ের মধ্যে কোন দ্বার নাই। কিন্তু দক্ষিণ অলিন্দ হইতে দক্ষিণ নিলয়ে আসিবার ও বাম অলিন্দ হইতে বাম নিলয়ে আসিবার এক একটি দ্বার আছে। কিন্তু দ্বারে এরূপ **কপাটিকার**

(বামে) রক্ত দুই মহাশিরা দিয়া দক্ষিণ অলিন্দে এবং উহা সঙ্কোচনে ট্রাইকাসপিড কপাটিকা দিয়া দক্ষিণ নিলয়ে পড়ে। (দক্ষিণে) রক্ত দক্ষিণ নিলয় সঙ্কোচনে একমাত্র সেমিলুনার কপাটিকা দিয়া ফুসফুসের মহাধমনী দিয়া ফুসফুসে যায়।

৯২। হৃদয় ও রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া

(valve) ব্যবস্থা আছে যে উপর হইতে চাপ পড়িলেই খুলিয়া যায়, কিন্তু নীচে হইতে খোলা অসম্ভব।

দক্ষিণ অলিন্দ (right auricle)—মোটামুটি জানিয়া রাখ যে দক্ষিণের দুইটি কামরাতে শিরাপ্রবাহিত অপরিশুদ্ধ রক্ত থাকে ও বামের কামরাদুইটিতে ধমনীপ্রবাহিত নির্মল রক্ত থাকে। রক্তের গতি দক্ষিণ অলিন্দ হইতে কপাটিকা-পথে দক্ষিণ নিলয়ের মধ্যে। দক্ষিণ অলিন্দে রক্ত বহিয়া আসে দুইটি মহাশিরা দ্বারা। তাহাদের নাম **ঊর্দ্ধ**

মহাশিরা ও **নিম্ন মহাশিরা** (vena cava superior এবং vena cava inferior)। ঊর্দ্ধ মহাশিরার মুখে কপাটিকা নাই। নিম্ন মহাশিরার মধ্যে যে কপাটিকা আছে, তাহার নাম **ইউষ্টেকিয়ান** (eustachian) কপাটিকা। অলিন্দ হইতে নিলয়ে নামিবার পথকে বলে **এট্রিয়ো-ভেণ্ট্রিকুলার** (atrio-ventricular) ছিদ্র। আগেই বলিয়াছি এই পথে কপাটিকা লাগান আছে। এই তিন পাল্লাযুক্ত কপাটিকার নাম **ট্রাইকাস্‌পিড কপাটিকা** (tricuspid valve)। এই অলিন্দের আর একটি ছিদ্র আছে, তাহার নাম **করোনারি সাইনস্‌** (coronary sinus)। এই ছিদ্র দিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের দূষিত রক্ত শোধনার্থে দক্ষিণ অলিন্দে নীত হয়। ইহারও মুখে এক কপাটিকা লাগান আছে। উহার নাম **থিবেসিয়াস কপাটিকা** (thebesius valve)।

দক্ষিণ নিলয় (Right ventricle)—ইহার দুইটি ছিদ্র-পথ। একটি দক্ষিণ অলিন্দ হইতে রক্ত আসিবার পথ, **তিন পাল্লা কপাটিকা** ঢাকা, যাহার কথা উপরে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়টি **ফুসফুসীয় ধমনীর** (pulmonary artery) পথে অবস্থিত এবং ইহার নাম **অর্দ্ধচন্দ্র কপাটিকা** (semilunar valve)।

বাম অলিন্দ (left auricle)—ইহার মধ্যে দুই ফুসফুস হইতে দুইটি করিয়া, মোট চারিটি **ফুসফুসীয়** (pulmonary) **শিরা** আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং এই পথে কোনও কপাটিকা নাই। একটি কপাটিকাযুক্ত ছিদ্রের দ্বারা এই অলিন্দ বাম নিলয়ের সহিত যুক্ত। এই কপাটিকার দুটি পাল্লা, তাই ইহাকে **দ্বিপাল্লা কপাটিকা** (bicuspid valve) বলে।

বাম নিলয় (Left ventricle)—ইহার প্রাচীর অতি স্থূল, দক্ষিণ নিলয়ের প্রায় তিনগুণ। ইহাতেও দুইটি ছিদ্র। একটি দিয়া রক্ত

এওর্টা (aorta) নামক মহাধমনীতে যায়, অন্যটি দিয়া উপরের অলিন্দ হইতে ইহার মধ্যে রক্ত আসে।

উভয় ছিদ্রেই কপাটিকা লাগান আছে। প্রথমটি (semilunar), দ্বিতীয়টি **দুই পাল্লা** (bicuspid)।

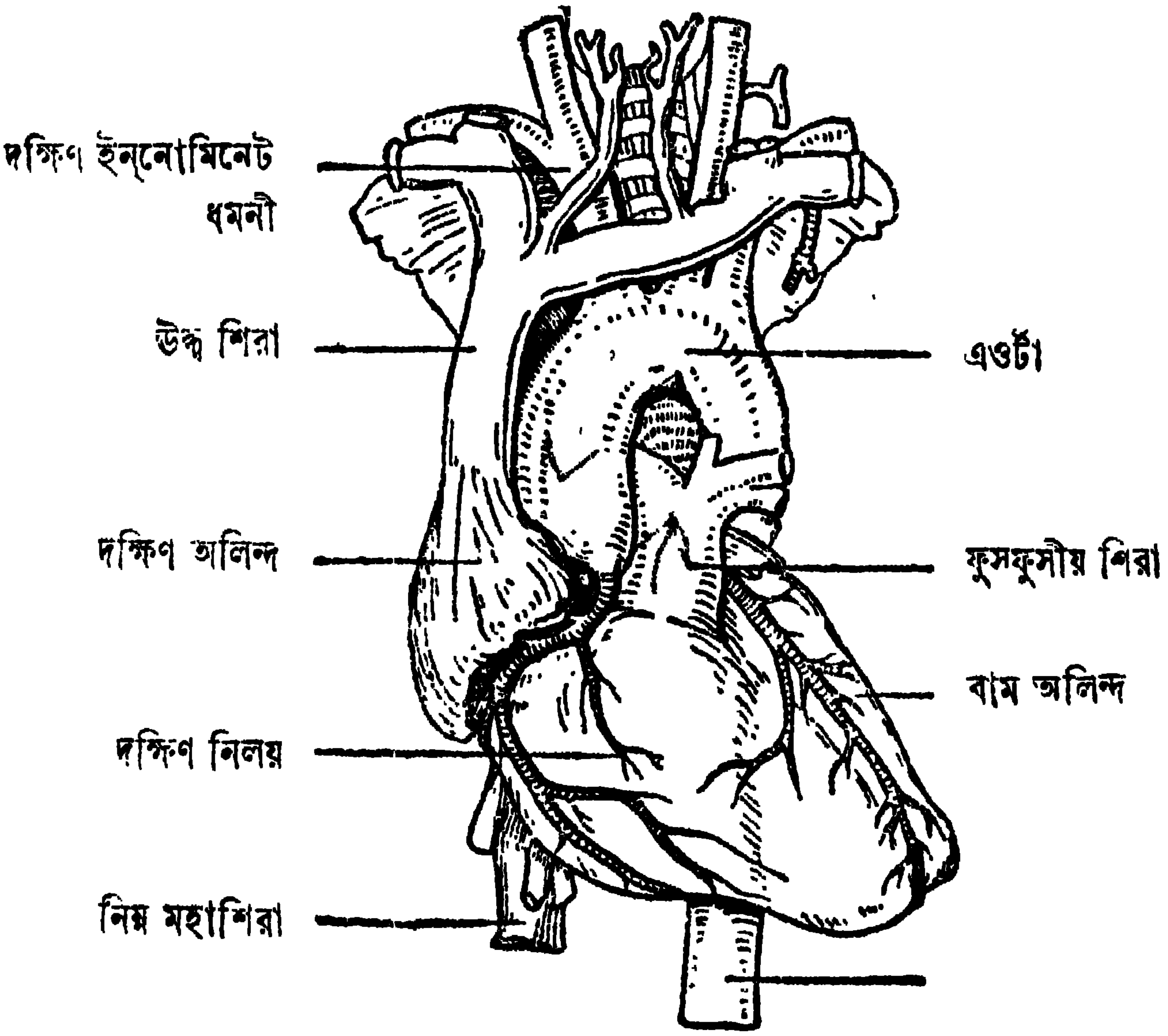

৯৩। হৃদয় ও তৎসংলগ্ন শিরা ও ধমনী

হৃদয় স্পন্দনের নিয়ম (heart beat)—মানুষ যখন মাতৃগর্ভে চারি মাসের ভ্রূণ তখন হইতেই তাহার হৃদয়ের স্পন্দন আরম্ভ হয়। মৃত্যুকাল পর্যান্ত এই স্পন্দন সমানে তালে তালে চলে। বুকে কান দিলে বা **বক্ষঃপরীক্ষা যন্ত্র** (stethoscope) দ্বারা পরীক্ষা করিলে বেশ বুঝা যায় একটা দীর্ঘ দুই মাত্রায় 'লাব' তারপর একটা হ্রস্ব এক মাত্রায়

'ডুপ্', তারপর সামান্যক্ষণ শব্দ বন্ধ থাকে। আবার দীর্ঘ, হ্রস্ব, নিঃশব্দ, এইরূপ ক্রমাগত চলিতেছে। ভয় পাইলে কি রাগ হইলে এই লাব-ডুপ্ দ্রুততর হয়। নহিলে সাধারণতঃ হৃদয় মিনিটে ৭২ বার স্পন্দিত হয়। আগেই বলিয়াছি যে, হৃদ্‌যন্ত্র পাম্পের মত চলিয়া রক্তস্রোত ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় কৈশিকে কৈশিকে চালাইতেছে। হৃদয়ের পেশীগুলি আপনা হইতে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। মস্তিষ্কের আদেশের অপেক্ষা রাখে না। প্রথম লাব শব্দটা হয় নিলয়দ্বয়ের সঙ্কোচনের ফলে। দ্বিতীয় ডুপ্ শব্দ হয় অলিন্দ ও নিলয়ের মাঝের কপাটিকাদ্বয় সজোরে বন্ধ হওয়ার ফলে। হৃদয়ের এই ক্রমান্বয়ে সঙ্কোচনকে systole ও প্রসারণকে diastole এবং দুইয়ের মিলিত অবস্থাকে cardiac cycle বলে।

রক্তপ্রবাহ তন্ত্র (Cirulatory system)—সমগ্র দেহে প্রবাহিত দূষিত রক্ত দুই মহাশিরার পথে দক্ষিণ অলিন্দে আসিয়া পড়ে, এই অলিন্দ রক্তবর্ণ হইলেই আপন হইতে সঙ্কুচিত হয়। সঙ্কোচনের ফলে এই রক্ত দক্ষিণ নিলয়ে নামিয়া যায়। দক্ষিণ নিলয়ও রক্তে ভরিয়া গেলেই সঙ্কুচিত হয়। তখন উপরে যাইবার তিন পাল্লা কপাটিকা বন্ধ হইয়া যায়। অতএব নিলয়ের রক্ত **পালমোনারি ছিদ্রপথে** বাহির হইয়া দুই **পালমোনারি ধমনী** দিয়া ফুসফুসে চলিয়া যায়। এদিকে ফুসফুস হইতে বিশুদ্ধ রক্ত অক্সিজেনসহ বাম অলিন্দে উপস্থিত হয়। এই অলিন্দ আবার রক্তে ভরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার সঙ্কোচন ঘটে। রক্ত কিন্তু আর শিরায় ফিরিয়া না যাইয়া দুই পাল্লা কপাটিকা ঠেলিয়া বাম নিলয়ে নামিয়া যায়। নিলয় রক্তপূর্ণ হইলেই সঙ্কুচিত হয়। তৎক্ষণে অলিন্দে উঠিবার কপাটিকা বন্ধ হয়। অতএব ঐ রক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকার ভিতর দিয়া **মহাধমনী** (aorta) মধ্যে সঞ্চালিত হয়। অলিন্দদ্বয়ের ও নিলয়দ্বয়ের একসঙ্গে সঙ্কোচন ও প্রসারণ হইয়া থাকে।

মহাধমনী (aorta) হইতে বিশুদ্ধ রক্ত ধমনীসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও পরে সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কৈশিকাবলীর ভিতর গিয়া পৌঁছে। কৈশিকাসমূহ দেহের সর্ব্বত্র রহিয়াছে। ইহাদের আবরণ অতি সূক্ষ্ম। এই আবরণের মধ্য দিয়া রক্ত চলাচল করিতে পারে। পেশীতন্তুসমূহের পুষ্টি, ক্ষয়পূরণাদি করিয়া রক্তপ্রবাহ দূষিত অবস্থায় শিরায় প্রবেশ করে। কৈশিকাগুলি ধমনী ও শিরার মাঝের সেতুর মত। ধমনী হইতে অক্সিজেন-সংবলিত বিশুদ্ধ রক্ত কৈশিকাতে প্রবেশ করিল। কিন্তু আপন কার্য্য সমাধা করিতে করিতে ঐ রক্ত দূষিত হইয়া যায় ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড বা অঙ্গারাম্ল বাষ্প অক্সিজেনের স্থান লয়। সেই দূষিত রক্ত সূক্ষ্ম শিরা হইতে বৃহত্তর শিরায়, অবশেষে **ভেনা কাভা** (vena cava) নামক বৃহত্তম শিরাদ্বয়ে প্রবাহিত হইয়া হৃদয়ের দক্ষিণ অলিন্দে নীত হয়। এই প্রবাহ-প্রণালীর নাম **বৃহত্তর সঞ্চালন প্রণালী**।

দক্ষিণ নিলয় হইতে দূষিত রক্ত পালমোনারি ধমনীর মধ্য দিয়া ফুস্‌ফুসে যাইয়া উপস্থিত হয়। সেখানে এই অবিশুদ্ধ রক্তের পরিশোধন ঘটে। পালমোনারি ধমনী হৃদয় হইতে বাহির হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। দুইটি নালী গিয়া ফুস্‌ফুসের দুইভাগে প্রবেশ লাভ করে। পরে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর শাখায় বিভক্ত হইয়া অবশেষে কৈশিকার আকার ধারণ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৈশিকার আবরণ অত্যন্ত পাতলা। এই আবরণের মধ্য দিয়া বায়ুকোষস্থ অক্সিজেন গিয়া দূষিত রক্তের পরিশোধন করে। পরে বিশুদ্ধ উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্ত পালমোনারি শিরাসমূহের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া হৃদয়ের বাম অলিন্দে প্রবিষ্ট হয়। প্রত্যেক ফুস্‌ফুস্ হইতে দুইটি করিয়া পালমোনারি শিরা বাম অলিন্দের সহিত মিশিয়াছে। ইহাই হইল **ক্ষুদ্রতর রক্ত-সঞ্চালন** প্রণালী।

এই দুই প্রণালী ছাড়া এক তৃতীয় সঞ্চালন প্রণালী আছে, নাম **পোর্টাল রক্ত-সঞ্চালন,** যাহা বস্তুতঃ বৃহত্তর সঞ্চালনেরই এক শাখা মাত্র। মূল ধমনীগুলির কতকগুলি শাখা-প্রশাখা আমাশয়, অন্ত্রমণ্ডলী, **অগ্ন্যাশয়** (pancreas) এবং প্লীহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে

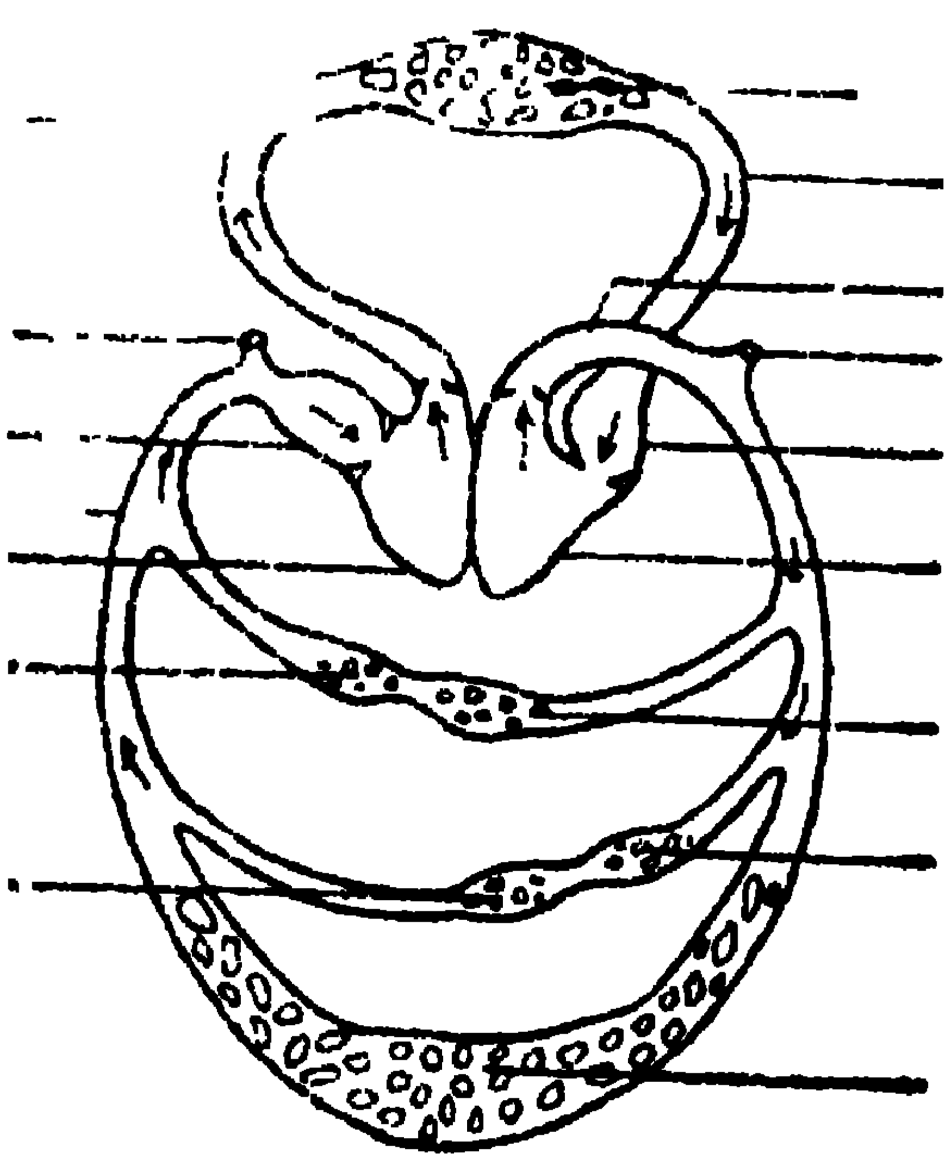

৯৪।' শোণিত-সঞ্চালনের নক্সা

বিশুদ্ধ রক্ত প্রদান পূর্ব্বক উহাদের পুষ্টিসাধন করে। পরে ঐ রক্ত **পোর্টাল** নামক এক বৃহৎ শিরায় পড়িয়া **যকৃতে** (lever) নীত হয়। পোর্টাল শিরা যকৃতের মধ্যে নানা সূক্ষ্ম শাখা কৈশিকায় বিভক্ত হইয়া যকৃৎকে আবশ্যকমত সার বস্তু দিয়া ও যকৃতের দূষিত পদার্থ লইয়া **নিম্ন ভেনা কাভায়** গিয়া পড়ে।

এ সকল প্রণালী ছাড়াও হৃদয়ের মাংসপেশীর একটি **আভ্যন্তরীণ রক্ত-সঞ্চালন প্রণালী** (coronary circulation) আছে। হৃদয়ের বাম নিলয় হইতে বিন্দু বিন্দু নির্ম্মল রক্ত প্রবাহিত হইয়া যে পথে পুনর্ব্বার **দক্ষিণ অলিন্দে** প্রবেশ লাভ করে সেই ক্ষুদ্র প্রণালীর নাম করোনারি রক্তসঞ্চালন প্রণালী।

Questions

1. How many chambers are there in the heart? Mention their utility. (B. T. 1942)
2. What do you understand by the cardiac cycle?
3. What do you know of the circulatory system of the human body?

পঞ্চম অধ্যায়

শ্বাসতন্ত্র (Respiratory System)

শ্বাসকার্য্য—শ্বাসকার্য্য বলিতে অক্সিজেন গ্রহণ (inhalation) ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ (exhalation) বুঝায়। প্রাণিমাত্রেরই জীবনধারণের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। খাদ্য বিনা মানুষের তিন সপ্তাহও চলে, কিন্তু অক্সিজেন বিনা মানুষ তিন মিনিটের বেশী বাঁচিতে পারে না। প্রধানতঃ ছয়টি যন্ত্রসাহায্যে শ্বাসকার্য্য সম্পাদিত হয়ঃ—(১) **নাসাপথ,** (২) **ফেরিংক্স,** (৩) **স্বরযন্ত্র,** (৪) **শ্বাসনালী** (wind pipe), (৫) **ফুসফুস** (lungs), (৬) **মধ্যচ্ছদা** (diaphragm)।

(১) **নাসাপথ** (nares)—ইহা একটি ত্রিকোণ গহ্বর। সম্মুখে দুইটি ও পশ্চাতে (মুখবিবরে) দুইটি দ্বার। পশ্চাৎ দিকে যেখানে ফেরিংক্সে শ্বাসনালী ও খাদ্যনালী আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে নাসাপথ শেষ হইয়াছে। বায়ু বাহিরের রন্ধ্র দিয়া নাকে ঢুকিয়া এই আঁকা বাঁকা নাসাপথ দিয়া দেহমধ্যে প্রবেশ করে। আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে বায়ু গরম হয়, ও তাহার ধূলাবালি নাসারন্ধ্রের লোমে আটকাইয়া যায়। ফলে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বা ধূলিকণা ফুসফুসের ভিতর যাইতে পারে না। মুখ দিয়া শ্বাস লওয়া খারাপ অভ্যাস, কেননা মুখে ছাঁকনির ব্যবস্থাও নাই, আর ঐটুকু পথ যাইতে হাওয়া গরমও হয় না।

(২) **ফেরিংক্‌স** (pharynx)—ইহা শ্বাসনালী ও খাদ্যনালীর সংযোগস্থল। ইহার দুই পাশে যে ছোট গ্রন্থি দেখা যায় তাহার নাম **তালুগ্রন্থি** (tonsil)। উপরাংশে ছোট জিহ্বার মত যে মাংসপিণ্ড ঝুলিতেছে, তাহাকে বলে **আলজিব** (uvula)।

(৩) **স্বরযন্ত্র** (larynx)—ফেরিংক্‌সের পরই শ্বাসনালীর (trachea) প্রথমাংশে স্বরযন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রের ছিদ্রের উপর **অধিজিহ্বা** (epiglottis) নামক এক ঢাকনা আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। খাদ্য গিলিবার সময় আপন হইতে এই ঢাকনা বন্ধ হইয়া যায়। সময় সময়, ঠিক বন্ধ না হইলে বিষম লাগে, খাদ্যকণা নাকের মধ্যে চলিয়া যায় ও তাহাতে দমবন্ধ হইবার মত বোধ হয়।

(৪) **শ্বাসনালী** (wind pipe or trachea)—শ্বাসনালীকে বলে wind pipe। ইহা স্বরযন্ত্রের পরে অবস্থিত। একটু নীচে ইহা গিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই দুই নালীর নাম **ব্রঙ্কাই**। শ্বাসনালী ও ব্রঙ্কাই ফাঁপা নালী। ইহাদের অঙ্গের সম্মুখ ভাগ অর্দ্ধাঙ্গুরী আকারের তরুণাস্থিশ্রেণীর দ্বারা গঠিত। পশ্চাৎ ভাগ নরম, সেখানে অস্থি নাই। শ্বাসনালীর দৈর্ঘ্য সাড়ে চারি ইঞ্চি, বেড় প্রায় ২$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ব্রঙ্কাই ফুসফুসে শেষ হইয়াছে।

(৫) **ফুসফুস** (lungs)—বুকের দুই পার্শ্বে দুইটি ফুসফুস আছে। ইহারা **প্লুরা** নামক এক পাতলা আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। দক্ষিণ ফুসফুস তিন খণ্ডে ও বাম ফুসফুস দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ড আঙ্গুরের থোকার ন্যায় কোষগুচ্ছের দ্বারা গঠিত। ফুসফুসের অঙ্গ স্পঞ্জ-এর মত ফোঁপরা। কোষগুলির গাত্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ও তাহাতে অসংখ্য কৈশিক নাড়ী রহিয়াছে। ঐ কৈশিক নাড়ীর মধ্যে রক্ত বায়ুকোষ হইতে অক্সিজেন গ্রহণ এবং বায়ুকোষে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করিতে পারে। কারণ

শ্বাস লইবার সময় যে বায়ু আমরা ফেরিংক্‌স, শ্বাসনালী ও ব্রঙ্কাই দিয়া লই তাহা ফুসফুসের মধ্যে বায়ুকোষে নীত হয়। শ্বাসত্যাগকালে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস যাহা বায়ুকোষে কৈশিক নাড়ী হইতে বাহির হয় তাহা

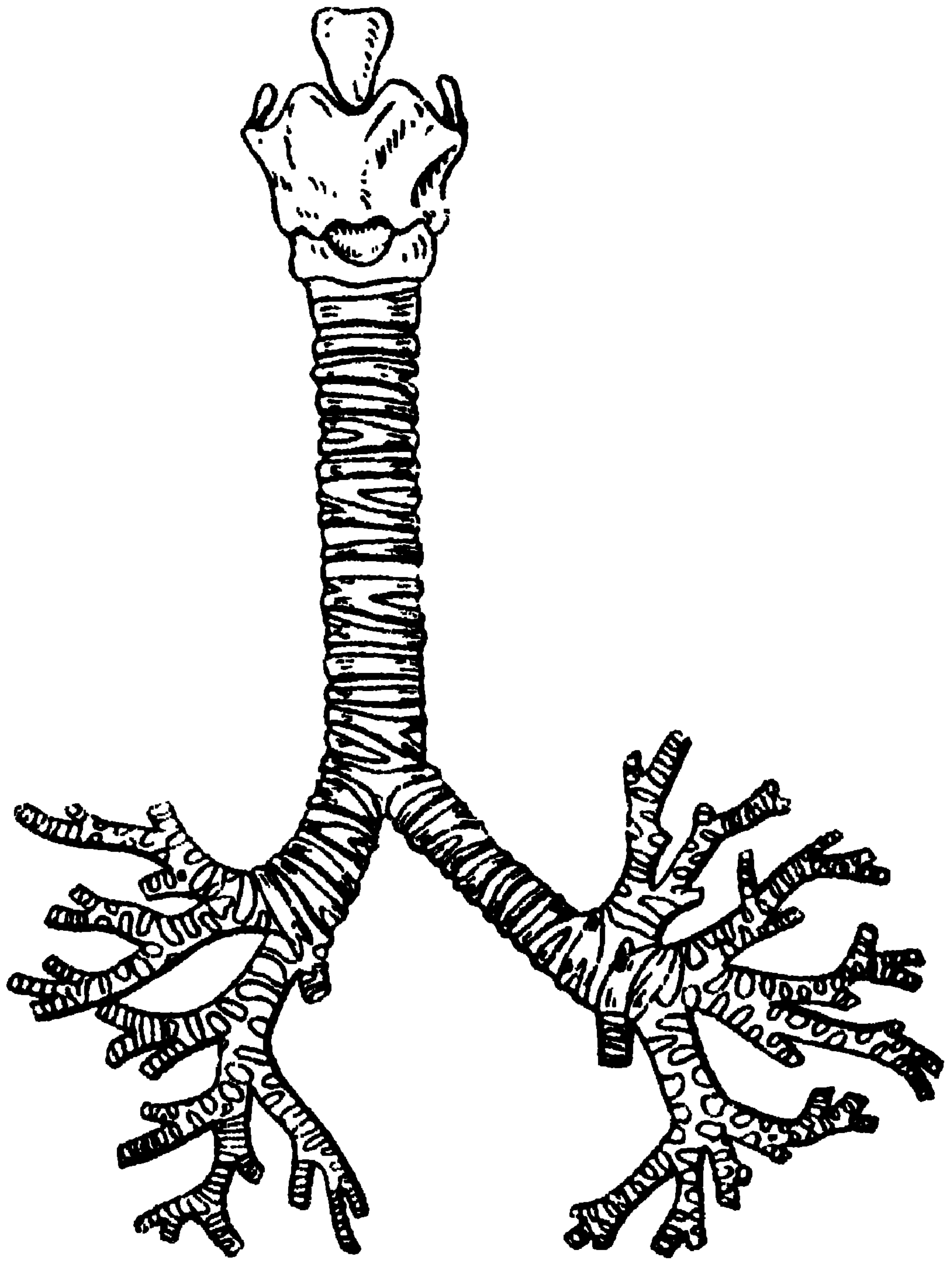

৯৫। স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী ও ব্রঙ্কাই

ব্রঙ্কাই, শ্বাসনালী, ফেরিংক্‌স এবং শেষে নাক ও মুখ দিয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

(৬) **মধ্যচ্ছদা** (diaphragm)—ইহা বুক ও পেটের মধ্যস্থলে অবস্থিত ও মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত পর্দ্দা বিশেষ।

শ্বাসক্রিয়ার বিশিষ্টতা
(Special features of respiration)

(১) **শ্বাস গ্রহণ** (inspiration)—সঙ্কোচনের ফলে মধ্যচ্ছদা দুই পার্শ্বে প্রায় আধ ইঞ্চি নামিয়া পড়ে। পঞ্জরের পেশীগুলির সঙ্কোচনের দরুণ **উরঃফলক** (sternum) বাহিরের দিকে বাড়িয়া যায় ও বক্ষোগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে ফুসফুসমধ্যস্থ বায়ুর চাপ কমিয়া যায়। তখন বাহিরের ও ভিতরের বায়ুর চাপের সমতা রক্ষা করিবার জন্য বাহিরের বায়ু নাসাপথে ফুসফুসে প্রবেশ করে। চাপ সমান হইলে আপনা হইতেই বায়ুপ্রবেশ বন্ধ হয়।

(২) **শ্বাস ত্যাগ** (expiration)—পেশীমাত্রই সঙ্কোচনের পরেই প্রসারিত হইতে চায়। সেই জন্য মধ্যচ্ছদা ও পঞ্জরের পেশী প্রভৃতি আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় ও বুকের আয়তন ছোট হয় এবং ভিতরের বাতাস মুখ ও নাক দিয়া দ্রুত বাহির হয়।

(৩) **অক্সিজেন ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময়**—বায়ুকোষগুলি অত্যন্ত পাতলা প্রাচীর দ্বারা নির্ম্মিত ও অসংখ্য কৈশিক নাড়ীর জাল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় ফুসফুসের আগত বায়ু হইতে (ক) অক্সিজেন লয় ও (খ) দেহকোষের কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, জলীয় বাষ্প ও উত্তাপ বায়ু কোষগুচ্ছে ছাড়িয়া দেয়।

(৪) **নার্ভের কার্য্য** (nervous mechanism)—মস্তিষ্ক হইতে আজ্ঞা না পাইলে কোনও পেশী কাজ করে না। কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড রক্তে বেশী থাকিলে তাহা মস্তিষ্কে খবর নিয়া **প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া** (reflex action) দ্বারা শ্বাসকার্য্যের পেশীগুলিকে সঙ্কোচনে আজ্ঞা দেয়।

Questions

What is respiration? How is it affected?

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিপাকযন্ত্র (Digestive System)

দেহকাণ্ডস্থ এক দীর্ঘ নালীমধ্যে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই নালীর নামই পৌষ্টিক নালী (alimentary canal)। ইহা মুখবিবর হইতে পায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নালীর বিবিধ ভাগ—

১। **মুখবিবর** (buccal cavity)—মুখবিবরস্থ দন্তগুলির কার্য্য খাদ্যদ্রব্যের চর্ব্বণ, কর্ত্তন, ছেদন, ও পেষণ; জিহ্বার কার্য্য নানা প্রকারে নড়িয়া চড়িয়া দন্তশ্রেণীর এই কার্য্যের সহায়তা করা। জিহ্বার দ্বারাই আমরা অম্ল, মিষ্ট, লবণ ও তিক্ত রস আস্বাদ করি।

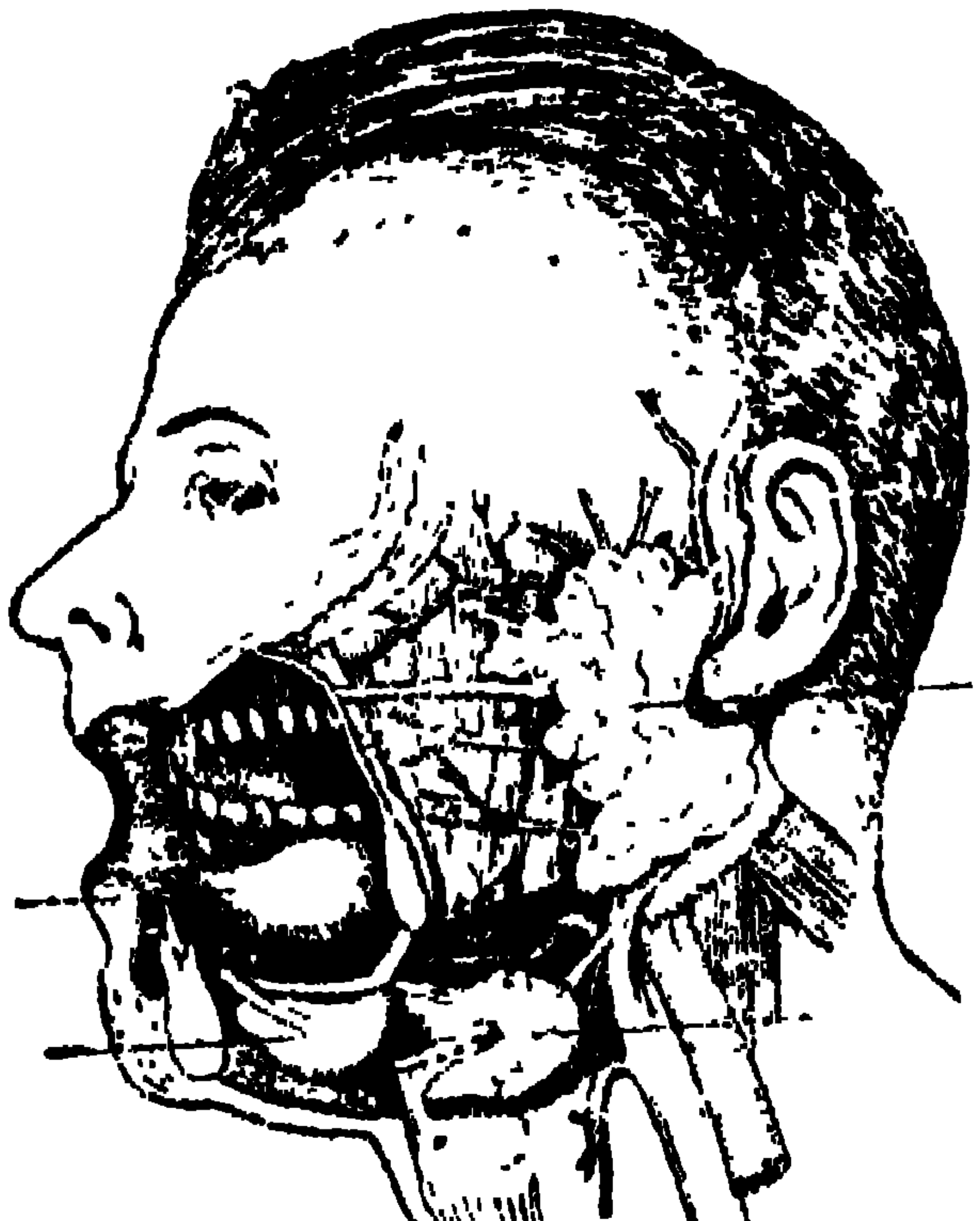

৯৬। মুখসংলগ্ন গ্ল্যাণ্ডসমূহ

মুখবিবর মধ্যে তিন জোড়া গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি লালা নিঃসারণ করে। প্রথম জোড়া কর্ণদ্বয়ের সম্মুখে অবস্থিত, নাম **প্যারটিড** (parotid)। দ্বিতীয় জোড়া নিম্ন চোয়ালের গায়ে অবস্থিত, নাম **সাব-ম্যাক্সিলারি** (submaxillary)। তৃতীয় জোড়া নিম্নচোয়ালের ঠিক নীচে অবস্থিত,

নাম **সাব-লিঙ্গুয়াল** (sublingual)। এই তিন জোড়া গ্রন্থিনিঃসৃত রসই মুখবিবরে আসিয়া পড়ে। প্যারটিডের রস পাতলা, ইহা শুষ্ক খাদ্যকে নরম করে; সাব-ম্যাক্সিলারির রস আঠাল, ইহা ভুক্তদ্রব্যকে পিচ্ছিল করে। সাব-লিঙ্গুয়ালের রসে **টায়ালিন** (ptyalin) নামক জারক থাকায় ইহা শ্বেতসার খাদ্যকে সহজে জীর্ণ করে।

লালা (saliva)—ইহার প্রধান জারক টায়ালিন। ইহা খাদ্যের শ্বেতসার ভাগকে চিনিতে পরিণত করে। লালা গ্রন্থিগুলির নার্ভতন্ত্র

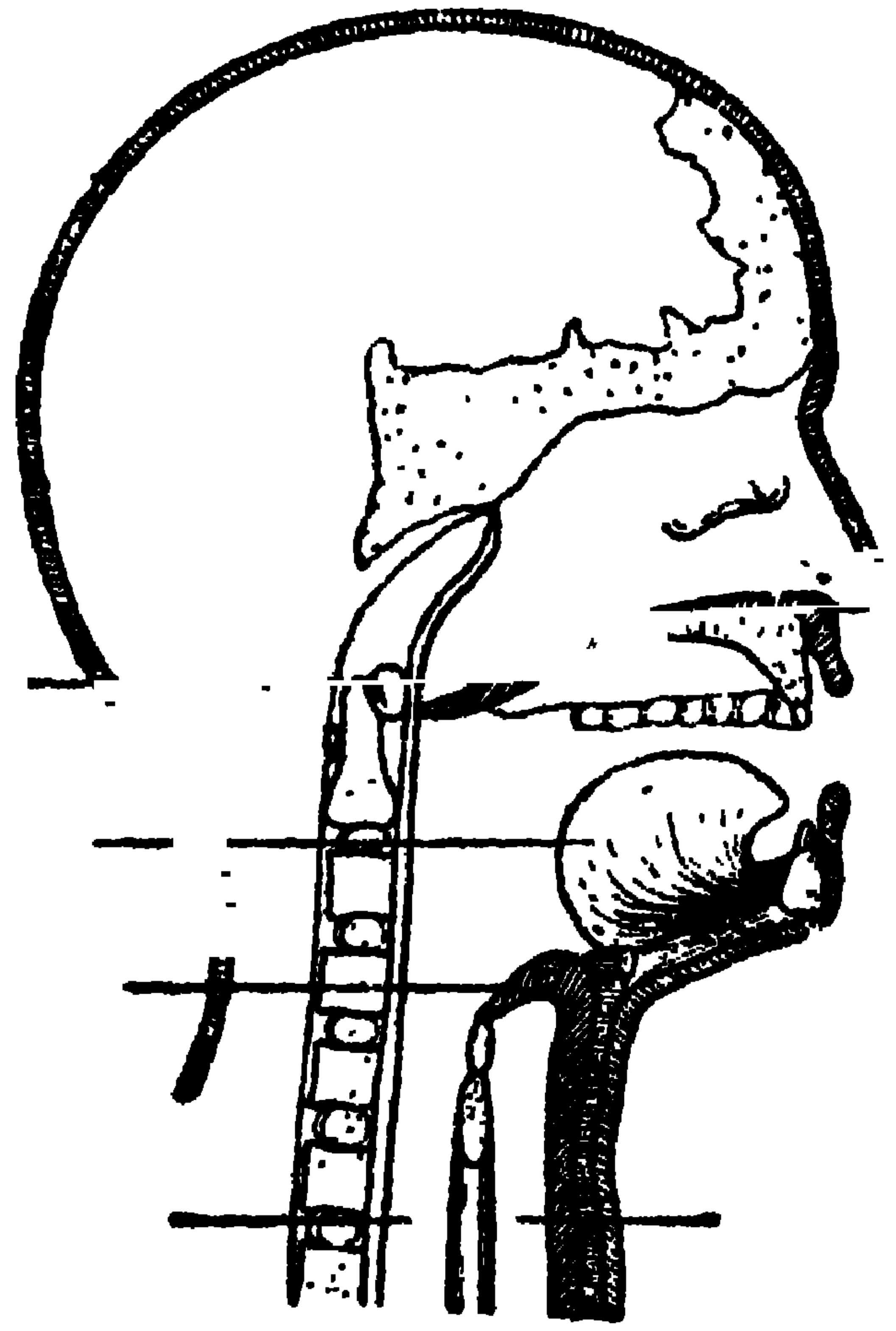

৯৭। খাদ্যগ্রহণের সময়ে আলজিহ্বা কি ভাবে কাজ করে তাহা দেখান হইয়াছে

ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত নহে। খাদ্যের স্বাদ পাইলে, এমন কি লোভনীয় খাদ্য দেখিলে বা তাহার কথা মনে আসিলে, স্বতঃই লালা ক্ষরণ হয়।

খাদ্যদ্রব্য গিলিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে চিবান কর্ত্তব্য, কেননা চিবাইবার সময় নানারূপ পাচক রস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় উহা সহজপাচ্য হইয়া যায়। ভাল করিয়া না চিবাইলে খাদ্যের বড় টুকরা অন্ত্রে অজীর্ণ অবস্থায়

পৌঁছিয়া অম্লরোগ উৎপন্ন করে। লালা ক্ষারধর্ম্মী। স্বল্পাম্ল বলে উহার কার্য্য বাড়ে, কিন্তু অম্ল অধিক হইলে উহার জারকশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

জিহ্বামূলের পশ্চাৎ দিকে অর্থাৎ **ফ্যারিংক্‌সের** (pharynx) শেষে হাতার ন্যায় যে ঢাকনি—**অধিজিহ্বা** (epiglottis) আছে, গলাধঃকরণ কালে কণ্ঠদেশের মাংসপেশীর সঙ্কোচন হেতু উহা বায়ুনালীর ঊর্দ্ধমুখে নীত হয়। সেই সময়ের নিমিত্ত ঐ ঢাকনিখানির দ্বারা বায়ুনালী ঊর্দ্ধমুখে আবৃত হওয়ায় শ্বাসকার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই সুচর্ব্বিত ও লালামিশ্রিত খাদ্য, ঐ ঢাকনির উপর দিয়া আসিয়া **ইসোফেগস** (œsophagus) মধ্যে পতিত হয়।

২। **ইসোফেগস** (œsophagus)—ইহা দৈর্ঘ্যে নয় ইঞ্চি। ইহা বায়ুনালীর পশ্চাৎ গাত্রে সংলগ্ন থাকে। এই নল দিয়া খাদ্যদ্রব্য আমাশয়-মধ্যে নীত হয়।

৩। **আমাশয়** (stomach)—ইহার আকার ভিস্তির মশকের ন্যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে ১ ফুট ও প্রস্থে ৪ হইতে ৫ ইঞ্চি। আমাশয় পেটের ঊর্দ্ধভাগে বাম অংশে **মধ্যচ্ছদার** (diaphragm) নিম্নে অবস্থিত। যখন কোনও দ্রব্য ইহাতে না থাকে, তখন ইহা চেপ্টা অবস্থায় থাকে। খাদ্য প্রবিষ্ট হইলেই ইহা ফুলিয়া উঠে। ইহার দুই দ্বার; প্রথম দ্বার ইসোফেগসের মুখে ও দ্বিতীয় দ্বার অন্ত্রের দিকে। আমাশয়ের তিন অংশ—

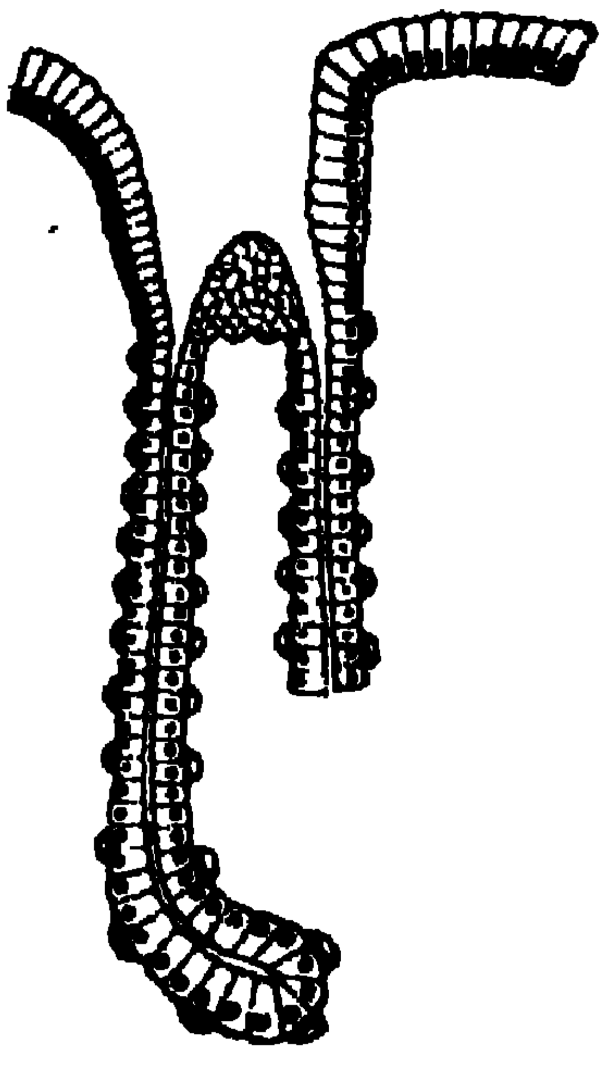

১৮। নিগম দ্বারে গ্রন্থির নল—বড়

(১) **আগমদ্বার** (cardiac end), (২) **আমাশয় স্কন্ধ** (fundus) বা মধ্যভাগ, (৩) **নিগমদ্বার** (pyloric end)।

আমাশয়ের ভিতরটা মৌচাকের মত বহুরন্ধ্রময়। প্রতি রন্ধ্রে এক

একটি পচন-গ্রন্থির রসবাহী নলের মুখ। খাদ্য আমাশয়ে প্রবেশ করিলেই এই গ্রন্থিগুলি হইতে পচন-রস ক্ষরণ হয়। আগমদ্বারের গ্রন্থির নল (duct) ছোট, কিন্তু নিগম দ্বারের গ্রন্থির নল খুব লম্বা। আগম দ্বারের নিকট গ্রন্থি হইতে **পেপ্‌সিন** ও **হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড** ও নিগম দ্বারের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রন্থি হইতে পেপ্‌সিন ও ঈষৎ **ক্ষারধর্ম্মী শ্লেষ্মা** নিঃসৃত হয়।

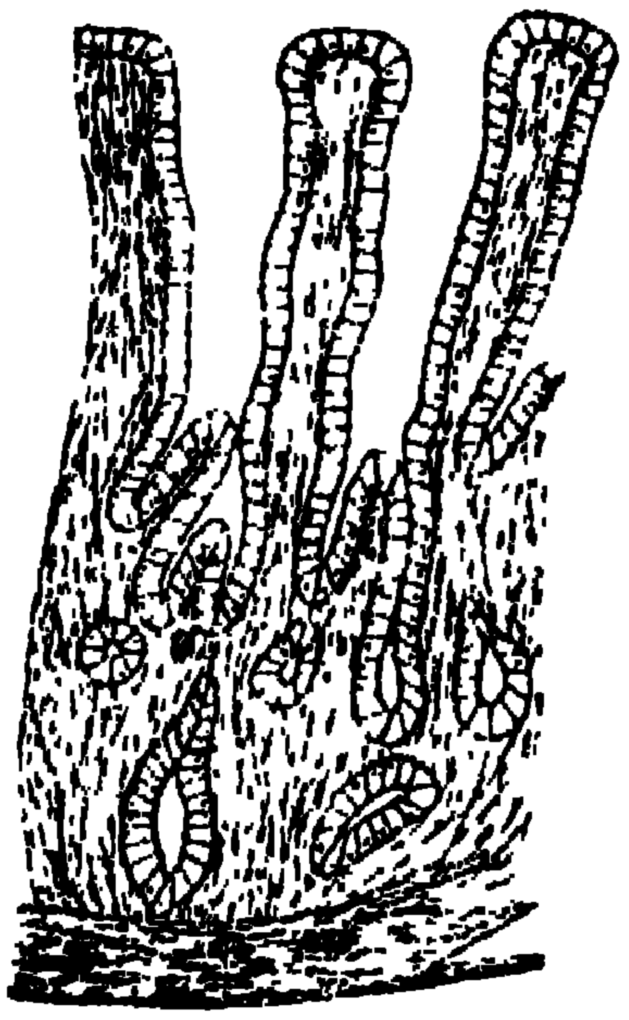

৯৯। আগম দ্বারে গ্রন্থির নল—ছোট

আমাশয় রস (gastric juice)—প্রধান উপাদান পেপ্‌সিন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। ইহা পাতলা অম্লরস। প্রধান কার্য্য খাদ্যমধ্যস্থ প্রোটিনকে বিশ্লেষণ করিয়া সহজ-পাচ্য করা। পেপ্‌সিন ও তাহার সহকারী হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা প্রোটিন পেপটোনে পরিণত হয়। যে সকল রোগ-জীবাণু আমাশয়ে আসিয়া পড়ে তাহা আমাশয়ের অম্লরসে প্রায়ই মরিয়া যায়। ইহা ছাড়া অম্লরস **কার্ব্বোহাইড্রেট** ও **স্নেহপদার্থকে** জটিল অবস্থা হইতে সরল পদার্থে পরিণত করে। অম্লরস থাকাতে দুগ্ধ ছানায় পরিণত হয়। সেজন্য ছোট ছেলেরা দুগ্ধ পান করার সঙ্গে সঙ্গে সেই দুগ্ধ বমন করিলে তখনই ছানা হইয়া বাহির হইয়া আসে।

৪। **অন্ত্র** (intestine)—আমাশয় ও অন্ত্রের সংযোগস্থলে একটি পেশী আছে। সাধারণতঃ উহা বন্ধ থাকে। যখন খাদ্য আমাশয়ে পরিপাক হয়, তখন উহা মধ্যে মধ্যে খোলে ও খাদ্য অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় **ক্ষুদ্রান্ত্রে** (duodenum) প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের সঙ্কোচন ও পেশীগুলির প্রসারণের ফলে অন্ত্রাবরণও ক্ষণে ক্ষণে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত

হইতে থাকে। খাদ্য ও পাচকরসের সহিত এইরূপে আন্দোলিত হইয়া সুন্দরভাবে মিশিয়া যায় এবং ক্রমে পায়ুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর **সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম** শুঁয়ার ন্যায় অনেকগুলি **শোষণ যন্ত্র** (villus) আছে। তাহাদের সাহায্যে জীর্ণ খাদ্য শোষিত হইয়া রক্তকৈশিকা মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। পরিপাকক্রিয়ার সময় উদরস্থ খাদ্য এক দিকে হজম হয় ও অন্য দিকে জীর্ণ খাদ্য রক্তে শোষিত হয়।

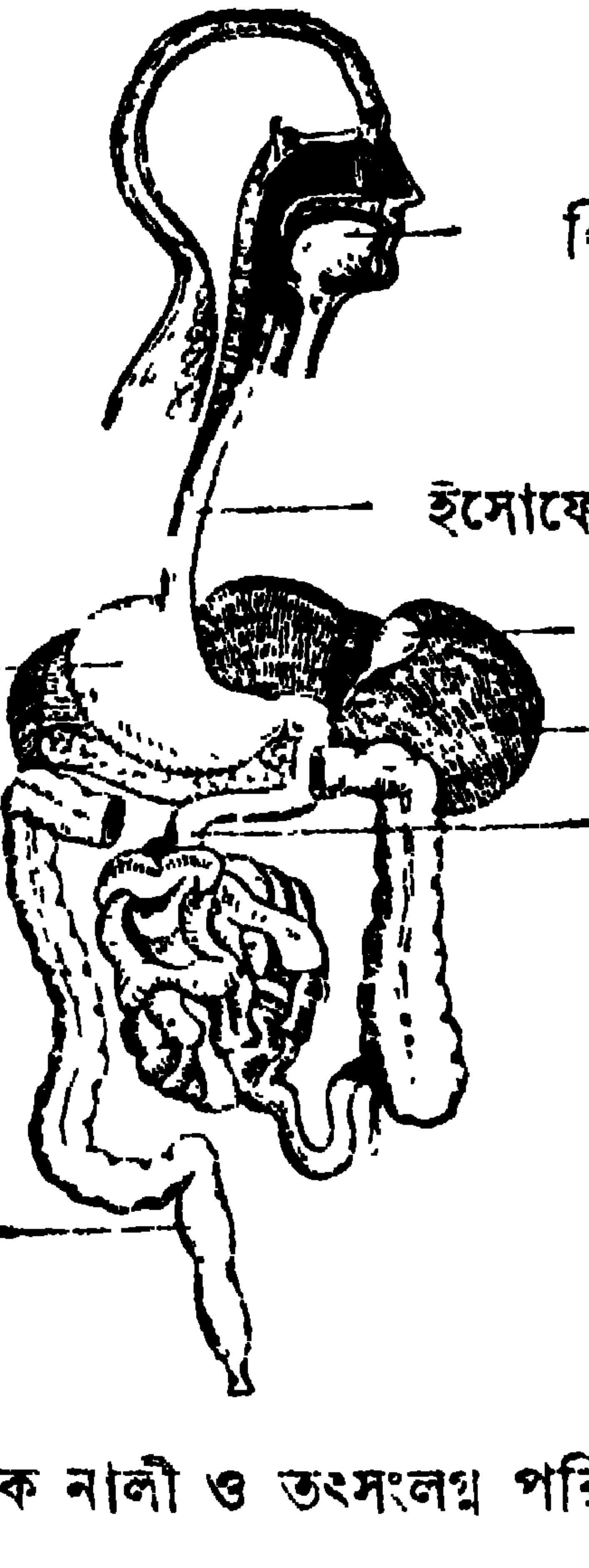

১০০। পৌষ্টিক নালী ও তৎসংলগ্ন পরিপাক-গ্রন্থিসমূহ

আমাশয় ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সংযোগস্থলের কয়েক অঙ্গুলি নীচেই একটি নল আসিয়া উহাতে পড়িয়াছে। ঐ নলটিতে আবার দুইটি নল আসিয়া মিলিয়াছে। একটি আসিয়াছে **যকৃৎ** হইতে ও **অপরটি** আসিয়াছে **অগ্ন্যাশয়** (pancreas) হইতে। তাহা হইলে ক্ষুদ্রান্ত্রে তিন প্রকার রস পাওয়া যায়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের রস (duodenal juice)—প্রথম, **পিত্ত** (bile), যাহা যকৃৎনিঃসৃত। উদরের ডানদিকের পাঁজরার নিম্নে **যকৃৎ** থাকে। পিত্তরস অনবরত ক্ষরিত হইতেছে। আমাশয়ে খাদ্য প্রবেশ করিলে ক্ষরণ আরও বেশী হয়। যকৃৎ রস অর্থাৎ পিত্ত প্রধানতঃ স্নেহপদার্থ জীর্ণ করে এবং শোষণকার্য্যে সহায়তা করে। ইহা ছাড়া যকৃতের আর এক কাজ আছে। শ্বেতসার পদার্থ ক্ষুদ্রান্ত্রে চিনিতে পরিণত হইলে সেই চিনি glycogen রূপে যকৃতে জমা থাকে। এই চিনি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে দেহে তাপ সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়, **আন্ত্রিক রস** (succus entericus)—যাহা অন্ত্রে থাকে। ইহা অজীর্ণ প্রোটিনকে হজম করে এবং ইহার সহিত অগ্ন্যাশয় রস (pancreatic juice) মিলাইয়া সক্রিয় করে। ইক্ষুচিনিকে glucoseএ পরিণত করে।

তৃতীয়, **অগ্ন্যাশয় রস** (pancreatic juice)। অগ্ন্যাশয় রসে আবার তিন প্রকার জারক (enzyme) আছে—(১) **শ্বেতসার জারক**—ইহা মুখবিবরের লালার অপেক্ষা তীব্র শক্তিসম্পন্ন; (২) **স্নেহ জারক**—ইহা স্নেহপদার্থকে হজম করিয়া শোষণোপযোগী করে; (৩) **প্রোটিন জারক**—আমাশয়ে অর্দ্ধ-জীর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত প্রোটিনকে হজম করে।

অগ্ন্যাশয়ে **ইনস্যুলিন** নামক এক প্রকার অন্তঃস্রাব্য (internal secretory) পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহা চিনিকে সম্পূর্ণ দগ্ধীভূত করিয়া দেহে তাপের সৃষ্টি করে। অগ্ন্যাশয়ে অন্তঃস্রাবী কোষগুলি নষ্ট হইয়া গেলে রক্তে চিনি জমিয়া বহুমূত্র (diabetes) রোগের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ রোগীর প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি বাহির হয়।

খাদ্যের অবশিষ্টাংশ মলরূপে বাহির হইবার কালে জল কেবল **বৃহদন্ত্রে** (rectum) শোষিত হয় এবং কঠিন মল **পায়ুর** (anus) দিকে অগ্রসর হয়।

খাদ্য ও তাহার উপাদান

(Food and its ingredients)

খাদ্যের প্রয়োজন (necessity of food)—দেহের পরিপুষ্টির জন্য আহারের প্রয়োজন। খাদ্য এমন হওয়া উচিত যে আমরা প্রয়োজনমত তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া রক্তে চালিত করিতে পারি। খাদ্যের সারপদার্থ এইরূপে রক্তে প্রবিষ্ট হইলে তবে দেহের তন্তুকে পুষ্ট করিতে পারে। ভক্ষিত দ্রব্যের এই পরিবর্ত্তন সংঘটনের নাম পরিপাকক্রিয়া।

আহার্য্যদ্রব্য নিম্নলিখিত কয়ভাগে বিভক্ত—

(১) কার্ব্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় পদার্থ। ইহা কর্ম্মশক্তি উৎপাদন করে। (২) প্রোটিন বা মাংসজ দ্রব্য। ইহা কোষমধ্যস্থ প্রোটপ্লাজ্‌ম্‌কে পুষ্ট করে। (৩) স্নেহজাতীয় দ্রব্য, ঘৃত তৈলাদি। তাপ উৎপাদন করে। (৪) লবণজাতীয় খনিজ পদার্থ। (৫) জল। (৬) ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ (vitamin)।

(১) **কার্ব্বোহাইড্রেট** (carbo-hydrate)—শর্করাজাতীয় দ্রব্য। উদাহরণ, আকের চিনি, দুধের চিনি, আঙ্গুরের চিনি। চাউল, আলু প্রভৃতি খাদ্য শ্বেতসার প্রধান।

সকল কার্ব্বোহাইড্রেট অতি সহজে দ্রাক্ষা-চিনিতে পরিণত হইয়া রক্তে প্রবেশলাভ করে। শুধু কার্ব্বোহাইড্রেট খাইলে শরীরের মঙ্গল হইবে না। বরং অতিরিক্ত দ্রাক্ষা-চিনির উপস্থিতির ফলে আমাশয়-

আবরণ ত্বরায় শুষ্ক ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। রক্তে চিনি কম হওয়াও ভাল নয়, বেশী হওয়াও ভাল নয়। যকৃতে এক প্রকার **জারক রস** (enzyme) আছে, যাহা অতিরিক্ত চিনিটুকুকে রূপান্তরিত করিয়া যকৃতকোষ মধ্যে জমা রাখে। উপবাস-অনশনের সময় জারকরস ঐ পদার্থকে আবার চিনিতে পরিণত করিয়া রক্তে মিশাইয়া দেয়।

(২) **প্রোটিন** (protein)—মাংস, ডিম, ছানা ও পনির এই জাতীয় খাদ্য। খাদ্যের এই অংশ পরিপাকের ফলে এক অম্লরসে (অ্যাসিডে) পরিণত হয়। তখন উহা পাকযন্ত্র ও রক্তবহা নালীর আবরণ-ত্বক্ দিয়া রক্তের মধ্যে চলিয়া যায়। বালক-বালিকার দেহগঠনের জন্য প্রোটিনের একান্ত আবশ্যক।

(৩) **স্নেহজাতীয় দ্রব্য** (fat)—জান্তব চর্ব্বি বা মেদ এই শ্রেণীভুক্ত। আমাদের দেহের সমস্ত মেদই ভক্ষিত স্নেহপদার্থ হইতে প্রাপ্ত হই না। প্রোটিন বা শর্করা-জাতীয় খাদ্য হইতেও মেদ গঠিত হইতে পারে। স্নেহময় পদার্থ শরীরকোষগুলির বহির্ভাগে সূক্ষ্ম ত্বকের আকারে অবস্থিত। ইহা আংশিকভাবে দেহ-সংরক্ষণের কার্য্য করে।

(৪) **লবণ** (salt)—আমরা নানাজাতীয় লবণ খাইয়া থাকি, তন্মধ্যে সোডিয়ম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণই প্রধান। এই পদার্থের অভাবে রক্ত তরল ও দেহ শীর্ণ হইয়া যায়।

(৫) **জল** (water)—ইহার অভাবে দেহের কোন কোষই বাঁচিতে পারে না। শরীরের অনেক দূষিত পদার্থকে জলই ঘর্ম্ম ও মূত্ররূপে নিঃসারিত করে।

(৬) **ভিটামিন** বা **খাদ্যপ্রাণ** (vitamin)—প্রোটিন, কার্ব্বোহাইড্রেট, স্নেহ-লবণাদি জাতীয় খাদ্য **অতি-পরিশুদ্ধ** অবস্থায় খাইলে দেহের সম্যক্ পুষ্টিসাধন হয় না, কিন্তু **স্বাভাবিক** অবস্থায়

খাইলে হইতে পারে। স্বাভাবিক খাদ্যকে কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্ত্তিত করার অর্থ অনেক সময় এই যে উহাকে বিকৃত অবস্থাপ্রাপ্ত করান। যেমন কলে পালিশ করা সাদা চাউল; ভূষিবিহীন সাদা ময়দা ইত্যাদি। নিয়মিত এই সমস্ত পদার্থ খাইলে মানুষকে **বেরি-বেরি** রোগ সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। স্বভাব-জাত পদার্থের মধ্যে এমন কোন অত্যাবশ্যক পদার্থ আছে, যাহার অভাবে এই সমস্ত অনর্থ ঘটে। এই পদার্থের নামই ভিটামিন। ভিটামিন যাহা আছে তাহাদের A, B, C, D এই চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(১) ভিটামিন (এ)—মেদে দ্রবণীয় ও মেদবর্দ্ধক। এই ভিটামিন ভাল ঘি ও তৈলে প্রচুর আছে। দুধ ও শাকপাতাতেও ইহা পাওয়া যায়। মাছ শৈবাল ভক্ষণ করে, সেইজন্য তাহাদের যকৃতের তৈলে প্রচুর ভিটামিন (এ) থাকে। তোমরা কড্‌লিভার অয়েলের নাম শুনিয়াছ। দুর্ব্বল রোগজীর্ণ মানুষকে উহা যে খাওয়ান হয় তাহা প্রধানতঃ এই ভিটামিনের জন্য। মাখন, গুড়, লাল ও হরিদ্রাবর্ণের ফল, নারিকেল প্রভৃতিতেও ভিটামিন (এ) আছে।

(২) ভিটামিন (বি)—জলে দ্রবণীয় ও নার্ভমণ্ডলীর পরিবর্দ্ধক। ইহারই অভাবে বেরি-বেরি ব্যাধি হয়। আছাঁটা অবস্থায় মোটা লাল চাউলে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মৎস্য, দাল, আনাজ ইত্যাদিতেও পাওয়া যায়।

(৩) ভিটামিন (সি)—জলে দ্রবণীয় ও শোণিতবর্দ্ধক। নেবু, তেঁতুল, বিলাতী বেগুনে (টোমাটো) প্রচুর পাওয়া যায়। ইহার অভাবে **স্কার্ভি** নামক রোগ হয়।

(৪) ভিটামিন (ডি)—ইহা অস্থিগঠনে সহায়তা করে। ইহার অভাবে শিশুদের রিকেট্‌স্ রোগ হয়। মাছ, মাংস, আনাজে এই ভিটামিন

যথেষ্ট পাওয়া যায়। হাড়ের মধ্যের মজ্জা বা marrow-তে ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে। মনুষ্যের অনাবৃত চর্ম্মের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িলে কৈশিকাগুলি রক্তে এই ভিটামিন প্রচুর গ্রহণ করিতে পারে।

মানবের খাদ্য—মানুষের খাদ্য দেহের পুষ্টিসাধনোপযোগী হওয়া উচিত। যেমন-তেমন, যা-তা খাইলেই উপকার হইবে না; সকলপ্রকার আহার্য্যই মানবের সমান প্রয়োজন। শ্বেতসার শর্করারও যত দরকার, ঘৃত-মাংসাদিরও তত দরকার; তবে এই সকল বিভিন্ন প্রকারের আহার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। খাদ্য সম্ভবমত স্বাভাবিক হওয়া উচিত, নহিলে ভিটামিনের অভাব ঘটিবে। ভিটামিনের অভাব ঘটিলে নানা রোগের উৎপত্তি হইবে।

আমাদের নিত্য ভোজ্য পদার্থ এরূপ হওয়া উচিত যে তাহা আমাদের রক্তবৃদ্ধি করে, অস্থি ও পেশীসমূহকে পরিপুষ্ট করে। উপরন্তু খাদ্য সহজপাচ্য হওয়া উচিত। অনর্থক পরিপাক-তন্ত্রকে ভারগ্রস্ত করা অকর্ত্তব্য। যন্ত্রমাত্রেরই এই নিয়ম যে তাহার যতটা কাজ সহিবে ততটা কাজ তাহাকে দিবে, ততোধিক দিবে না। দিলে পর যন্ত্র অকালে বিকল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। প্রচুর অক্সিজেন না পাইলেও পরিপাক-যন্ত্র বিকল হইবে। এই অক্সিজেন সরবরাহ করিবার জন্য রীতিমত ব্যায়াম করিতে হইবে।

খাদ্য মুখরোচক হওয়া উচিত তাহা না হইলে মুখে যথেষ্ট পরিমাণে লালাক্ষরণ হইবে না, ফলে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিবে। তবে রুচিও স্বাভাবিক হওয়া উচিত। যদি জিহ্বা এরূপ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে যে তীব্র গন্ধ, তীব্র স্বাদ, বা ঘৃতবহুল খাদ্য না পাইলে লালাক্ষরণ হইবে না, তাহা হইলে কিছু রোগের সূত্রপাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে; ডাক্তার কবিরাজের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নাই। মোট কথা, খাদ্য সাদা-সিধা হইলেও মুখরোচক হয়, যদি না জিহ্বা অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত

হইয়া থাকে। খেলাধূলা কসরতাদি করিয়া শরীরকে এমন করিতে হইবে যে সাদা পুষ্টিকর খাদ্য রুচিপূর্ব্বক খাওয়া যায়।

পরিষ্কার খাদ্য (clean food)—আহার্য্য দ্রব্য দেখিতে পরিষ্কার হওয়া উচিত, তাহা বলিয়া শুভ্রবর্ণ পালিশ করা চাউলের ভাত, কি গমসার শ্বেতবর্ণ ময়দার লুচি খাইলে চলিবে না। চাউল বা গমের বাহিরের খোসাটা ভিটামিন-পূর্ণ। সেটা ফেলিয়া দেওয়া বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। আলুপটলের খোসাতে নানারকম স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর পদার্থ আছে, সেগুলি বাদ দিয়া কেবল ভিতরের শাঁসটা খাইতে নাই।

এক সময় আমাদের দেশে প্রচুর ফলমূল খাওয়ার প্রথা ছিল। রাঁধিয়া খাইলে ফলমূলের অনেক গুণ নষ্ট হইয়া যায়। কাঁচা মূলা, শশা, পেঁয়াজ ইত্যাদি মুড়ির সহিত খাইলে শরীরের উপকার হয়। ভিজা ছোলা, ভিজা মুগ, ইত্যাদিও খাওয়ার অভ্যাস খুব ভাল। ইহাতে এমন সব গুণ আছে যাহা রান্না ছোলার দাল বা মুগের দালে নাই।

সবুজ শাকপাতাও খুব উপকারী। সাহেবরা প্রচুর পরিমাণে কাঁচা সালাদ শাক, ক্রেস্ ইত্যাদি খাইয়া থাকে। আমাদের দেশে কাঁচা শাক খাওয়ার প্রথা নাই। তবে রান্না শাকেও কাঁচা শাকের অনেক গুণ অব্যাহত থাকে।

নিরামিষ খাদ্য (vegetarian food)—মাছমাংসের প্রোটিন সহজলভ্য। কিন্তু নিরামিষ অনেক পদার্থেও প্রচুর প্রোটিন আছে। যাহারা মাছমাংস খায় না, তাহাদের প্রোটিন-বহুল ছানা-পনিরাদি যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে হইবে।

স্বাভাবিক আহার্য্যদ্রব্যের মধ্যে একমাত্র দুগ্ধেই প্রোটিন শর্করাদি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য মানুষের প্রয়োজনানুসারে মিশ্রিত আছে। ইহাতে যথেষ্ট ভিটামিন রহিয়াছে; প্রোটিন, শর্করা, শ্বেতসার, মাখন, লবণ ও

জলের অভাব নাই। প্রতিদিন অল্পাধিক দুগ্ধ সকলেরই পান করা উচিত। বিশেষতঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদিগের পক্ষে দুগ্ধই সকল আহার্য্যের শ্রেষ্ঠ।

Questions

1. What is the utility of digestion?
2. How is food digested? (C. U. 1945)
3. Why do we need food? What are the important ingredients of food? (C. U. 1940)
4. What are the chief constituents of human diet? State the advantages and disadvantages of cooking food. (C. U. 1946)
5. What effects are likely to be produced on our people by the scarcity of food? Explain with reference to the functions of food. (C. U. 1944)
6. Explain what you understand by 'vitamins'. Which are the principal vitamins? Indicate their sources. (C. U. 1945)
7. What would be the result of vitamin deficiency?
8. Mention the various forms of enzymes that are present in the alimentary canal.
9. What is the utility of the spleen?

পরিভাষা

পদার্থ-বিদ্যা—Physics

অতি-বেগনি—ultra-violet

অন্তরক—insulator

অঙ্গার-বিহীন লৌহ—soft iron

অপরিবাহী—non-conductor

অবলোহিত—infra-red

অভিলম্ব—normal

অভেদ্যতা—impenetrability

অস্বচ্ছ—opaque

আপতন কোণ—angle of incidence

আপতিত রশ্মি—incident ray

আপেক্ষিক গুরুত্ব—specific gravity

আলোক—light

আলোক বিচ্ছুরণ—dispersion of light

ইথার—ether

ঈষদচ্ছ—translucent

উপচ্ছায়া—penumbra

উষ্ণতা—temperature

ঋণাত্মক—negative

ওজন—weight

কাল—period

কুপী—flask

কৈশিক নল—capillary tube

গতিশক্তি—kinetic energy

ঘননীল—indigo

ঘর্ষণ—friction

ঘর্ষ-বিদ্যুৎ—frictional electricity

চল-বিদ্যুৎ—current electricity

চাপমান যন্ত্র বা ব্যারমিটার—barometer

চাপ—pressure

চুম্বক—magnet

চুম্বক পাথর—lodestone

চুম্বকন – magnetisation
জড়তা —inertia
ডাঁটি —piston
ঢাকন—valve
তড়িৎ চুম্বক – electro-magnet
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য wave length
তাপ—heat
থার্মোমিটার—thermometer
দিগদর্শী—compass
দোলক— pendulum
দোলক পিণ্ড—bob
ধনাত্মক – positive
নারঙ্গ—orange
নিষ্ক্রিয়তা—inertia
নীল—blue
পদার্থ—matter
পরিচলন—convection
পরিপূরক—complementary
পরিবহন—conduction
পরিবাহী— conductor
পাতন বিন্দু— point of incidence
পাম্প—pump
পীত—yellow

প্রচ্ছায়া— umbra
প্রতিফলক reflector
প্রতিফলন – reflection
প্রতিফলন কোণ angle of reflection
প্রতিফলিত রশ্মি reflected ray
প্রতিবিম্ব image
প্রতিবিহিত দোলক— compensated pendulum
প্রতিসরণ refraction
প্লবতা – buoyancy
বর্ণালী— spectrum
বিকিরণ—radiation
বিক্ষিপ্ত রশ্মি –diffused light
বিভব—potential
বিভব প্রভেদ – potential difference
বিভাজ্যতা – divisibility
বিভিন্নমুখী রশ্মি— divergent ray
বিদ্যুতাধার—electric cell
বিদ্যুৎ চুম্বক— electro-magnet
বিদ্যুৎ প্রবাহ—electric current
বিদ্যুদ্‌বিশ্লেষণ electrolysis

বিশোষণ—absorption
বিস্তার—amplitude
বিস্তৃতি—extension
বেগনি—violet
মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকা—mirage
মহাকর্ষ—gravitation
মেরু—pole
রশ্মি—ray
রোধ—resistance
লোহিত—red
হরিৎ—green
শক্তি—energy
সচ্ছিদ্রতা—porosity
স্ফুলিঙ্গ—spark
স্তম্ভক—cylinder
স্বচ্ছ—transparent
সংনম্যতা—compressibility
সংসক্তি—cohesion
স্থিতিস্থাপকতা—elasticity
স্থৈতিক শক্তি—potential energy

রসায়ন-বিদ্যা—Chemistry

অণু—molecule
অস্থায়ী—temporary
উপকরণ, উপাদান—ingredients
ঊর্ধ্বপাতন—sublimation
কেলাসন—crystallisation
কেলাসিত—crystalline
কৈশিক আকর্ষণ—capillary attraction
খরতা—hardness
খর জল—hard water
চয়ন—distillation
ছাঁকন বা পরিস্রাবণ—filtration
ঢালা (কাত করিয়া)—decantation
দস্তা—zinc
দহন—combustion
দ্রব—solution
দ্রবণ—dissolution
দ্রাব্য—solute
দ্রাবক—solvent
দীপ—burner
পরীক্ষা-নল—test tube

পরমাণু—atom
পাতন—distillation
প্রাকৃতিক জল—natural water
মিশ্রণ—mixture
মৃদু জল—soft water
মৌলিক—element
যৌগিক—compound
লবণাম্ল—hydrochloric acid
বায়বীয়—gaseous
শীতক—condenser
সংপৃক্ত দ্রবণ—saturated solution
স্থায়ী—permanent

জ্যোতির্বিদ্যা—Astronomy

অক্ষ—axis
অগস্ত্য—Canopus
আকুইলা—Aquila
আগ্নেয়গিরি—Volcano
আর্দ্রা—Betelgeux
আপাত (গতি)—apparent (motion)
আলোকমণ্ডল—photosphere
উত্তর-ফল্গুনী—Denebola
উত্তর ভাদ্রপদ—Alpheratiz
উত্তরায়ণ বৃত্ত—Tropic of বা কর্কটক্রান্তি বৃত্ত Cancer
উল্কা—meteor
উপগ্রহ—Satellite
উষ্ণমণ্ডল—Torrid Zone
ঋতু—season
কক্ষ—orbit
কন্যারাশি—Virgo
কর্কট ক্রান্তি—Summer Solstice
কর্কট রাশি—Cancer
কার্ত্তিকেয়—Bellatrix
কালপুরুষ—Orion
কুকুরমণ্ডল (বৃহৎ)—Canis Major
কুকুরমণ্ডল (ক্ষুদ্র)—Canis Minor
কুমেরু—South Pole
কুমেরু বৃত্ত—Antarctic Circle
কুম্ভরাশি—Aquarius

কৃত্তিকা—Pleiades
ক্যাষ্টর—Castor
ক্রান্তিবৃত্ত—ecliptic
গুরুবৃত্ত—great circle
গোপদ—Algenib
গ্রহ—planet
গ্রহণ—eclipse
গ্রহকণিকা—asteroids
গ্রহাণুপুঞ্জ—asteroids
চান্দ্র বৎসর—lunar year
চান্দ্র মাস—lunar month
চিত্রা—Spica
ছটামণ্ডল—corona
ছায়াপথ—milky way
জলবিষুব—autumnal equinox
জ্যেষ্ঠা—Antares
তারা—star
তারামণ্ডল—constellation
তুলারাশি—Libra
দক্ষিণায়ন বৃত্ত বা মকরক্রান্তি বৃত্ত—Tropic of Capricorn
দূরবীন, দূরবীক্ষণ—telescope
ধনুরাশি—Sagittarius
ধূমকেতু—comet
ধ্রুবতারা—Pole star
নক্ষত্র—constellation
নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল—Temperate Zone
নাভি—focus
নীহারিকা—nebulae
নীহারিকাপুঞ্জ—clusters of nebulae
পুনর্ব্বসু—Pollux
পূর্ব্বভাদ্রপদ—Markab
প্রজাপতি মণ্ডল—Auriga
বৎসর—year
বর্ণমণ্ডল—Chromosphere
বর্ণালীবীক্ষণ—spectroscope
বাণরাজা—Rigel
বিষুব রেখা—equator
বুধ—Mercury
বুটিস—Boötes
ব্যাস—diameter
বৃশ্চিক রাশি—Scorpio
বৃষরাশি—Taurus
বৃহস্পতি—Jupiter
ব্রহ্মহৃদয়—Capella
মকর ক্রান্তি—Winter Solstice

মকর রাশি—Capricornus
মঘা—Regulus
মহাবিষুব—vernal equinox
মঙ্গল—Mars
মিথুন রাশি—Gemini
মীন রাশি—Pisces
মেষ রাশি—Aries
রোহিণী—Hyades
লঘু সপ্তর্ষি—Little Bear
লাইরা—Lyra
লুব্ধক—Sirius
শঙ্কু—cone
শনি—Saturn
শুক্র—Venus
শ্রবণা—Altair
সপ্তর্ষিমণ্ডল—Great Bear
সরমা—Procyon
সিংহরাশি—Leo
সুমেরু—North Pole
সুমেরু বৃত্ত—Arctic Circle
সৌর কলঙ্ক—Sun-spot
সৌর বৎসর—Solar year
সৌর দিবস—Solar day
স্বাতী—Arcturus
হাইড্রা—Hydra
হারকিউলিস—Hercules
হিম মণ্ডল—frigid zone

ভূতত্ত্ব—Geology

অভ্র—mica
আগ্নেয়—igneous
আগ্নেয় গিরি—volcano
আন্দোলন—movement
কনগ্লোমারেট—conglomerate
কর্দ্দম শিলা—shale
কাত—tilted
কোয়ারট্জ—quartz
খনিজ তৈল—petroleum
খাড়া—vertical
চুনা—calcareous
চুনাপাথর—limestone
চুল্লী—oven
ছিদ্র—boring
জীবাশ্ম—fossil
জৈব—organically derived

জ্বালামুখ--crater
ডায়াটম--diatom
ধাতুমল--slag
পরিধি--circumference
পরিবর্ত্তিত metamorphic
পালল- sedimentary
প্রকম্পন কটিবন্ধ- seismic belt
ফাটল fissure
ফেলস্পার- -felspar
বদ্বীপ- -delta
বেধ --thickness
বেলে পাথর - sandstone
ব্যাস- diameter
ভাঁজ --fold
ভূত্বক্ - earth's crust
ভূকম্পন-লেখক যন্ত্র Seismo-graph
শিলা - rock
সমান্তরাল--horizontal
স্তরচ্যুতি- -fault
হিমসরিৎ glacier

উদ্ভিদ্-বিদ্যা---Botany

অঙ্কুরোদ্গম germination
অজৈব--inorganic
অন্তঃফলত্বক—(বীজ) exalbuminous
অপুষ্পক--cryptogam
অস্থানিক--adventitious
আকর্ষ--tendril
অগ্র—apex
আত্মীকরণ---assimilation
আবর্ত—whorl
আবৃত বীজ--angiosperm
আমাশয়--stomach
আরোহিণী--climbing
উপবৃতি -epicalyx
একদল বীজ --monocotyledon
একলিঙ্গ-- unisexual
করতল শিরা -palmate venation
গর্ভকেশর--carpel
গর্ভকোষ—ovary
গুচ্ছফল-- aggregate fruit
গুচ্ছমূল -fibrous root

চক্রাকৃতি—rotund
ছত্রক—fungus
আলশিরা—reticulate venation
জৈব—organic
ডিম্বক—ovum
ডিম্বক রন্ধ্র—micropyle
ডিম্বকোষ—ovule
ডিম্বাকৃতি—ovate
দল—corolla
দ্বিদল বীজ—dicotyledon
দীর্ঘশীষ—acuminate
ধনুঃশিরা—curved venation
নগ্নবীজ—gymnosperm
নিষিক্ত—fertilised
পর্ব্ব—internode
পর্ব্বসন্ধি—node
পরাগ—pollen
পরাগকোষ—anther
পরাগসংযোগ—pollination
পাপড়ি—petal
পুষ্পাধার—thalamus
পুংকেশর—stamen
পুং বীজ—generative nucleus
পৌষ্পিক পত্র—bract
প্রধান মূল—tap-root
প্রবীজ নাভি—hilum
প্রস্বেদন—transpiration
ফলক—blade
ফলত্বক্—pericarp
বল্লমাকৃতি—lanceolate
বহির্ফলত্বক্—epicarp
বহিঃসার (বীজ)—albuminous or endospermic
বাণাকৃতি—sagittate
বৃক্কাকৃতি—reniform
বৃতি—calyx
বৃত্যংশ—sepal
বৃন্ত—petiole
বৃক্ষরুহা—epiphyte
বৃক্ষাদনী—parasite
ভাবী মূল—radicle
ভাবী কাণ্ড—plumule
ভ্রূণ—embryo
মধ্যফলত্বক্—mesocarp
মধ্যশিরা—mid-rib
মূলত্র—root-cap
মূলরোম—root hair

মূলাকৃতি—fusiform
মৌলিক—simple
যৌগিক—compound
রন্ধ্র পথ—stomata
রাস্না—orchid
লম্বাকৃতি—linear
শালগমাকৃতি—napiform
শিরা—vein
শিরাবিন্যাস—venation
শৈবাল—algae
সপুষ্পক—phanerogam
সবুজ কণা—chlorophyll
সূচাকৃতি—acicular
সূচাগ্র—mucronate
সূত্র—filament
সূক্ষ্মাগ্র—acute
হংসপদাকৃতি—crisped
হৃদয়াকৃতি—cordate or heart shaped

প্রাণিবিদ্যা—Zoology

অগ্ন্যাশয়—pancreas
অধিত্বক্—dermis
অন্ত্র—intestine
অলিন্দ—auricle
অস্থিতন্ত্র—skeletal system
উপত্বক্—epidermis
কশেরুকা—vertebra
কানকুয়া—operculum
কুনো ব্যাঙ—Bufo
কুসুম—yolk
কোলা ব্যাঙ—Rana
কৈশিকনাড়ী, জালক—capillaries
গুটি—cocoon
গেছো ব্যাঙ—Rhacophorus
ডিম্বাধার—egg case
তারামাছ—Starfish
দেহপ্রাকার—body wall
ধমনী—artery
ধাত্রীব্যাঙ—alytes
নিলয়—ventricle
পটকা—air bladder

পায়ু—anus
পিত্তস্থলী—gall bladder
পুঞ্জাক্ষি—compound eye
পৌষ্টিক নালী—alimentary canal
পৃষ্ঠছিদ্র—dorsal pore
প্রাকারাবরণ—coelomic epithelium
ফুলকা—gill
ফুলকা রন্ধ্র—gill slits
বায়ু নালী—air tube
বৃক্ক—kidney
মলনালী—rectum
মুখগহ্বর—buccal cavity
রক্তসঞ্চালন তন্ত্র—circulatory system
রূপভেদ, রূপান্তর—metamorphosis
রেচন তন্ত্র—excretory system
শিরা—vein
শীর্ষপদ—Cephalop
শীত-ঘুম—hibernation
শুঙ্গ—antenna
শূক—larva
শোষণ—absorption
শ্বাস কার্য্য—respiration
শ্বাস রন্ধ্র—stigmata ; spiracle
সমুদ্রশসা—sea cucumber

শারীর-বিদ্যা—Physiology

অগ্ন্যাশয়—pancreas
অঙ্গুলাস্থি—phalanges
অধিজিহ্বা—epiglottis
অনায়ত্ত—involuntary
অন্তর্ব্বাহী—afferent
অন্ননালী—oesophagus
অলিন্দ—auricle
অন্ত্র—intestine
অর্দ্ধচন্দ্র কপাটিকা—semilunar valve
আগম দ্বার (আমাশয়ের)—cardiac end
আমাশয়—stomach
আমাশয় স্কন্ধ—fundus

আমাশয় রস—gastric juice
আলজিব—uvula
আয়ত্ত—voluntary
আচ্ছাদক তন্তু—epithelial tissue
আন্ত্রিক রস—succus entericus
উত্তেজনা—impulse
উদর গহ্বর—abdominal cavity
উপচর্ম—epidermis
উরঃ ফলক—sternum
উরু—thigh
ঊর্দ্ধ মহাশিরা—vena cava superior
কণ্ঠাস্থি—clavicle
কপাটিকা—valve
করভাস্থি—metacarpals
কশেরুকা—vertebra
কৈশিক, জালক—capillary
কোষ—cell
খাদ্যপ্রাণ—vitamin
খুলি (মস্তকের)—skull
গলনালী—gullet
গ্রন্থি—ganglion
চরণ সন্ধ্যস্থি—tarsal
চর্ম্ম (ভিতরের অংশ)—dermis
চালক (নার্ভ)—motor
জঙ্ঘা—shank
জননেন্দ্রিয়—reproductive organ
জারক—enzyme
তন্তু—tissue
তরুণাস্থি—cartilage
তালু—hard palate.
তালু (নরম)—soft palate
দ্বিপাল্লা কপাটিকা—bicuspid valve
দেহকাণ্ড—Thorax and abdomen
ধমনী—artery
নখ—nails
নল—duct
নাসাপথ—nares
নিগম দ্বার (আমাশয়ের)—pyloric end
নিলয়—Ventricle
নিম্ন মহাশিরা—vena cava inferior

পদতলাস্থি—metatarsal
পঞ্জরাস্থি—rib
পায়ু—anus
পেশীতন্তু—muscular tissue
প্রকোষ্ঠ—lower arm
প্রগণ্ড—upper arm
প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া—reflex action
প্লীহা—spleen
ফুসফুসীয়—pulmonary
বন্ধনী—tendon
বস্তিপ্রদেশ—pelvic region
বহির্বাহী—efferent
বক্ষোগহ্বর—thoracic cavity
বার্ত্তাবহ তন্তু—nervous tissue
বৃক্ক—Kidney
বৃহদন্ত্র—rectum
মগজ—brain
মণিবন্ধ—carpals
মধ্যচ্ছদা—diaphragm
মহাধমনী—aorta
মুখমণ্ডল—face
মুখগহ্বর—buccal cavity
মূত্রাশয়—urinary bladder
মেরুদণ্ড—vertebral column
মেরুমজ্জা—spinal cord
যকৃৎ—liver
রক্তবহা নাড়ী—blood vessels
রক্তমণ্ড—serum
রক্তরস—plasma
লসিকা—lymph
লোহিত কণিকা—red blood-corpuscles
শিরা—vein
শোণিত সঞ্চালন তন্ত্র—circulatory system
শ্বাসনালী—trachea
শ্বেত কণিকা—white blood-corpuscles
সংজ্ঞাবাহী—sensory
সংযোজক তন্তু—connective tissue
স্বরযন্ত্র—larynx
হস্ত—hand
ক্ষুদ্রান্ত্র—duodenum
ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষকযন্ত্র—villus

SYLLABUS

Elementary Scientific Knowledge

1. Observation and identification of the principal constellations, major stars and planets throughout the year at night. The Sun--its dimension and distance from the Earth. Planetary system— relative positions. Solar year and seasons. The Moon and its phases— lunar year. Eclipses of Sun and Moon. Comets and meteors.

2. The Earth—condensation from a hot gaseous state--its crust—igneous and sedimentary rocks. Probable condition of the interior of the Earth. Earth movements (earthquake)—folding, landslide, volcano. Varieties of soil and their bearing on plant-life and agricultural operations. The story of the formation of coal and mineral oil.

3. Structure of any common flowering plant. Functions of root, stem, leaf, flower and fruit. Special characteristic of the living—locomotion, respiration, nutrition, growth, response to stimulus, propagation and death; adaptation to environments. Examples from plants like rice and pea and animals like earth-worm and fish. Life-history of (*a*) rice and pea and(*b*) ant, bee, spider, mosquito, butterfly and frog.; Interdependence of plants and animals.

4. Simple consideration of the Human Body, and its principal systems, *viz.*, circulatory, respiratory and digestive systems. Foods—their relative values and their essential ingredients. Functions of the skin and nerves.

5. The three states of matter. Physical properties of air and water. Buoyancy and Archimedes' principle. Pressure of atmosphere. Effect of heat on water. Effect of heat on air. Ventilation. Effect of heat on solid bodies. Pendulum Clock and Thermometer. Transference of heat. Simple ideas regarding energy and its tans-formations with examples. Rectilineal propagation of light. Phenomena of reflection and refraction of light, colour and rainbow. Lodestone, magnetisation, terrestrial magnetism and compass. Simple Electric Cell. Conductors and insulators. Effects of current: (*a*) heating and lighting, (*b*) chemical, (*c*) magnetic. Electro-magnet and Electric Bell. Telegraphy.

6. Separation of Mixtures—solution, filtration, crystallisation, distillation, sublimation. Rusting of iron and burning of candle, magnesium and sulphur in a closed volume of air over water. Air, its composition. Properties of Oxygen, Nitrogen and Carbon dioxide. Water, its composition. Properties of Hydrogen. Natural and aerated waters. Properties of hard and soft water. Characteristics of chemical compounds.

Candidates will be expected to have had a training in observation and in accurate and clear description, with reference to their practical applications and phenomena as observed in daily life. No detailed technical knowledge will be required.

Questions should be distributed over different portions of the syllabus and should be sufficiently varied and numerous to allow considerable option.